মণি-মুক্তা
১

Peace tv

ডা. জাকির নায়েক

লেকচার সমগ্র

Dr. Zakir Naik Lecture Series

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ডা. জাকির নায়েক

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

Dr. Zakir Naik Lecture Series - 1

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র - ১

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট

ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল

জুন ২০০৯

সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৩

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

Dr. Zakir Naik Revealed & Published By Md. Rafiqul Islam,
Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 400.00 Only.

সূচিপত্র
[প্রথম খণ্ড]

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ্ব পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়। অবশ্য পরবর্তীর্তে বোম্বে পিস টিভি কার্যালয়ে তাঁর সাথে আবারো স্বাক্ষাত হলো ১০ জানুয়ারী ২০১০। আলহামদুলিল্লাহ

কলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

বাংলা ভাষায় ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। আমাদের পিস পাবলিকেশন হতেও বিষয়ভিত্তিক ৩০ খানা বই বাজারে রয়েছে। তবে ব্যাপক পাঠক চাহিদার জন্য ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র নামক ১, ২, ৩ ও ৪ শিরোনামে চার খণ্ড পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এতে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক রচিত অধিকাংশ বইয়ের সমাহার ঘটেছে। আশা করি ধর্ম; বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের অন্তরের নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান পাবে। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক কামনা করি।

বর্তমানে পরিতাপের কথা হলো যে, কতিপয় মানুষ এমনকি কিছু সংখ্যক আলেমও না জেনে না বুঝে ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। অনেকে তার টিভিতে প্রচারিত প্রোগ্রাম সরাসরি না দেখে তার বিরুদ্ধে গিবত করে যাচ্ছেন। তাদের দলিল হলো মুরুব্বিরা বলেছেন। অথচ তারা সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

১ জানুয়ারী ২০১৩ – প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ

আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে'– 'আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১শ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২শ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি

সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সব বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখলদারিত্ব। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সাধারণ প্রশ্নের জবাব

REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
এফ.এম, এম.কম.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লেখক : শব্দে শব্দে আল কুরআন

সূচিপত্র

ভূমিকা

দ্বীনের দাওয়াত দেয়া একটি অর্পিত দায়িত্ব

অধিকাংশ মুসলমান জানেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা যা সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি মুসলমানদেরকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম জাতি তাদের সে দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদিও উত্তম জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে আমাদের নিজেদের জন্যই পুরোপুরি গ্রহণ করা ছিল আমাদের কর্তব্য; কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই সেসব সত্যকে জানাতে ও পৌঁছাতে অনিচ্ছুক যাদের নিকট সত্যের বাণী এখনো পৌঁছানো হয় নি।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۔

অর্থ : আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? যে গোপন করে সেই সত্যের সাক্ষ্যকে, যা তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অজানা নন। (সূরা বাকারা : ১৪০)

অত্যন্ত সাধারণ বিশটি প্রশ্ন

ইসলামে পৌঁছাবার লক্ষ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কানুষ্ঠান কাঙ্খিত ও অনুমোদিত পদ্ধতি।

কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۔

অর্থ : আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি ডাকুন হিকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। (সূরা নাহ্ল : ১২৫)

একজন অমুসলিমের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো সামনে নিয়ে আসাই যথেষ্ট হতে পারে না। অধিকাংশ

অমুসলিম ইসলামের যথার্থ সত্য বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করে নিতে পারে না। এর কারণ হলো, ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনের গভীরে কিছু প্রশ্ন জেগে আছে যার উত্তর তারা পায় নি।

তারা হয়তো ইসলামের কল্যাণকর ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে আপনার যুক্তির সাথে একমত হতে পারে; কিন্তু তার সাথে সাথে তারা এও বলবে, 'ওহ, তোমরা তো সেই মুসলমান যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে থাক। তোমরা সেই লোক যারা নারীদেরকে পর্দার নামে চার দেওয়ালে বন্দি করে রাখ। তোমরা তো মৌলবাদী, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে অমুসলিমদেরকে উদাত্তকণ্ঠে বলতে চাই যে, তারা ইসলাম সম্পর্কে যা ধারণা করে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত, তা ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক এবং যে উৎস থেকেই তা গৃহীত হোক না কেন। আমি সরাসরি তাদেরকে বলতে চাই যে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণার অনুভূতি একেবারেই ভুল। আমি তাদেরকে উৎসাহিত করছি খোলা মনে সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য। আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে তাদের গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

গত কয়েক বছরের আমার দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এটা অনুধাবন করেছি যে, একজন সাধারণ অমুসলিম ব্যক্তির মনে ইসলাম সম্পর্কে সর্বোচ্চ ২০টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। আপনি যখন অতি সাধারণ অমুসলিমকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমার মতে ইসলামে কী কী ভুল রয়েছে?' সে তখন পাঁচ কি ছয়টি প্রশ্ন করতে পারবে, যে প্রশ্নগুলো উক্ত বিশটি অতি সাধারণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে শামিল রয়েছে।

অধিকাংশ মানুষ যুক্তিনির্ভর উত্তরে আশ্বস্ত হয়

২০টি অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর যুক্তি-প্রমাণ ও কার্যকারণ উদাহরণ সহকারে দেয়া যেতে পারে। অধিকাংশ অমুসলিম-ই এসব উত্তরে আশ্বস্ত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। যদি কোনো মুসলমান এ উত্তরগুলো মুখস্থ করেন অথবা মনে রাখতে চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি সফল হবেন, যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে কোনো অমুসলিম গ্রহণ না-ও করে, অন্ততপক্ষে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণাসমূহ দূর করা এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ অবস্থানে অবশ্যই নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। একেবারে হাতে গোনা কিছু সংখ্যক অমুসলিম এসব উত্তরের বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি পেশ করতে সক্ষম হতে পারে, যার জন্য অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রচার মাধ্যমের সৃষ্ট ভুল ধারণাসমূহ

ইসলাম সম্পর্কে অধিকাংশ অমুসলিমের মনে ভুল ধারণাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রবাহের অনবরত ভুল তথ্য প্রচারের কারণে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করে পাশ্চাত্য জগৎ, তা এটি আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেল, রেডিও স্টেশন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন বা বই-পুস্তক যা-ই হোক না কেন। সম্প্রতি ইন্টারনেট একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও এটি কোনো বিশেষ পক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই। তারপরও এর মধ্যে একজন মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক হিংসাত্মক প্রচারণা দেখতে পারে। ইদানিং মুসলমানরাও প্রচার মাধ্যমটির মাধ্যমে ইসলামের সার্বিক ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। আমি আশা করি মুসলমানদের এ প্রচেষ্টা দিনে দিনে আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং স্থায়ী হবে।

ভুল ধারণা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ থেকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এ বিশটি প্রশ্ন বাছাই করে নেয়া হয়েছে। কয়েক দশক আগেও প্রশ্নগুলোর ধরন ভিন্ন আঙ্গিকে ছিল, আর কয়েক দশক পরেও এগুলোর ধরন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এটা নির্ভর করবে প্রচার মাধ্যমগুলো কীভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করবে, তার ওপর।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকদের সাথে মত বিনিময়ের পর আমি ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছি। সমাজ ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে হয়তো দু' একটি প্রশ্ন এর সাথে যুক্ত হতে পারে। যেমন আমেরিকাতে এ প্রশ্নটি যোগ হতে পারে যে, সুদ গ্রহণ ও প্রদানে ইসলাম নিষেধ করে কেন?

আমি ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষিতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সাথে ভারতীয় অমুসলিমদের একটি প্রশ্ন যোগ করেছি। যেমন মুসলমানরা এতো আমিষ খায় কেন অর্থাৎ তারা নিরামিষভোজী নয় কেন? এ প্রশ্নটি যোগ করার কারণ হলো, ভারতীয় বংশভূতরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ। অতএব তাদের প্রশ্নটি সাধারণ প্রশ্নগুলোর সাথে যুক্ত হতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নকারী অমুসলিমদের ভুল ধারণা

অনেক অমুসলিম রয়েছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন। তবে তারা যা পড়ছেন তা সবই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং ইসলামের বই-পুস্তকের সমালোচনায় মুখর। এসব অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ বিশটি সাধারণ প্রশ্নের সাথে আরো ভুল ধারণা

উদ্ভূত কিছু প্রশ্ন সংযোজন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তারা আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা-বার্তা থাকার দাবি করে। তারা আরো দাবি করে যে, আল-কুরআন অবৈজ্ঞানিক। ইসলামকে যারা উল্লিখিত পক্ষপাত দুষ্ট উৎস থেকে জানার চেষ্টা করেছেন তাদের ভুল ধারণা নিরসনে বিশটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরের সাথে এখানে বাড়তি কিছু উত্তর সংযোজিত হয়েছে। আমি অবশ্য অমুসলিমদের জন্য অতিরিক্ত আরো বিশটি প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়েছি।

১. বহু বিবাহ

প্রশ্ন ১. ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ ইসলামে একাধিক বিবাহের বৈধতা কেন দেয়া হয়েছে?

উত্তর : ১. বহু বিবাহের সংজ্ঞা

'বহু বিবাহ' (Polygamy) অর্থ এমন এক বিবাহ পদ্ধতি যেখানে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু বিবাহ দু'প্রকার হতে পারে। এক প্রকার হলো, (Polygamy) যেখানে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাদের বিবাহ করে। অপরটি হলো (Polyandry) যখন একজন মহিলা একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসলামে সীমিত পর্যায়ে 'বহু বিবাহ' অনুমোদিত। অথচ একজন নারীর জন্য একই সাথে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

এবার আমি মূল কথায় আসছি। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার কেন অনুমোদন দিয়েছে?

২. 'আল-কুরআন'-ই পৃথিবীতে একমাত্র ঐশীগ্রন্থ, যে নির্দেশ করে, 'একটি মাত্র বিবাহ করো'।

আল-কুরআনই হলো একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে এই সম্বন্ধে এ শব্দগুচ্ছ রয়েছে যে, 'একটি মাত্র বিবাহ করো'। এছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এমন নেই যাতে একটি মাত্র বিবাহ করার নির্দেশ রয়েছে। এক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বাইবেল, তালমুদ প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থের যে কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও বহু বিবাহ বা স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নি। এসব ধর্মগ্রন্থ অনুসারে একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু পুরোহিত ও খ্রিস্টান পাদ্রিগণ অনেক পরে স্ত্রীদের সংখ্যা 'এক'-এ সীমিত করে দিয়েছে।

অনেক হিন্দুধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন অনুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল।

একইভাবে ভগবান শ্রী কৃষ্ণেরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল। আগেকার খ্রিস্টানদের জন্য যত ইচ্ছে স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন ছিল। কেননা বাইবেলে স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিস্টান পাদ্রিদগণ স্ত্রীদের সংখ্যা একজনে সীমিত করে দেয়।

ইহুদি ধর্মে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন রয়েছে। তালমুদের বিধান অনুসারে আব্রাহাম অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলেমান অর্থাৎ সুলায়মান (আ)-এর শতাধিক স্ত্রী ছিল। ইহুদি রাব্বী জারসম বেন ইয়াহুদাহ পর্যন্ত (৯৬০ খ্রি. থেকে ১০৩০ খ্রি.) বহু বিবাহের এ ধারা জারি ছিল। অতঃপর তিনি এর বিরুদ্ধে একটি ফরমান জারি করেন।

ইহুদি শেফারডিক সম্প্রদায় যারা মুসলিম দেশসমূহে বসবাস করে তারা বেশির ভাগ বহু বিবাহের এ প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু রাখে। তারপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বী একটি সংশোধনী বিধি জারির মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করেন।

৩. হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক বহুপত্নীক

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'কমিটি অভ্ দ্য স্ট্যাটাস অভ্ উমেন ইন ইসলাম'-এর ৬৬ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠায় এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহের হার উল্লিখিত হয়েছে অধিক। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বছরগুলোতে দেখা গেছে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৫.০৬ ভাগ হিন্দু বহুপত্নীক। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ হার শতকরা ৪.৩১ ভাগ। ভারতীয় আইনের বিধান অনুসারে ভারতে কেবল মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী রাখা অর্থাৎ বহু বিবাহ অনুমোদিত। ভারতে কোনো অমুসলিমের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। আগে এ ব্যাপারে সেখানে কোনো বিধি-নিষেধই ছিল না। এমনকি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। ১৯৫৪ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' পাস করার পর হিন্দুদের জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি ঘোষিত হয়। বর্তমান ভারতীয় আইনে একজন হিন্দু পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের বিধান নয়।

এবার চলুন, ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন কেন দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যাক।

৪. আল-কুরআন সীমিত 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন করে

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ভূপৃষ্ঠে আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা নির্দেশ করে, 'কেবল একটি বিবাহ করো।' এ কথার সমর্থন রয়েছে কুরআন মাজীদের

সূরা আন-নিসার এ আয়াতে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ : তবে বিয়ে করে নাও নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত, কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিয়ে করো)।

আল-কুরআন নাযিলের আগে বহুবিবাহের কোনো উর্ধ্বতম সীমা সংখ্যা ছিল না। অনেক লোক স্ত্রী-র সংখ্যার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চালাতো, কেউ কেউতো শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো। ইসলাম-ই চারজন স্ত্রী রাখার উর্ধ্বতম সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই, তিন অথবা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমোদন দেয় এ শর্তে যে, সে (স্বামী) তাদের মধ্যে সুবিচার করতে সমর্থ হবে।

একই অধ্যায়ে তথা সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ ـ

অর্থ : আর তোমরা কখনো স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না ...।

সুতরাং বহু বিবাহ কোনো বিধিবদ্ধ বিধান নয় বরং একটি ব্যতিক্রমী বা বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। অনেক লোকই এ ভুল ধারণায় রয়েছে যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা একটি বাধ্যতামূলক বিধান।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে 'করো' বা 'করো না' অর্থাৎ আদেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। যথা :

১. ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় যা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব অর্থাৎ অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত।

৩. মুবাহ অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য।

৪. মাকরূহ অর্থাৎ অনানুমোদিত বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম বা বে-আইনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

'বহু বিবাহ' এ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ বহু বিবাহ ইসলামী বিধানে অনুমোদনযোগ্য বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এটা সরাসরি বলা সঙ্গত হবে না যে, মুসলিমের তিন বা চার জন স্ত্রী আছে, বরং বলা উচিত, যার একাধিক স্ত্রী আছে, তার চেয়ে ঐ ব্যক্তি উত্তম যার একজন স্ত্রী আছে।

৫. পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু অধিক

প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের জন্ম হার প্রায় সমান। একটি পুরুষ শিশুর চেয়ে একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। একটি নারী শিশু রোগ-জীবাণু ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সাথে বেশি লড়াই করতে পারে। আর এ জন্যই মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের মৃত্যুর হার বেশি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় নারীদের তুলনায় পুরুষরাই অধিক হারে নিহত হয়। দুর্ঘটনায় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যু বেশি হয়। এসব কারণে পুরুষদের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি এবং কালের যে কোনো যুগে বিপত্নীক পুরুষদের চেয়ে বিধবাদের সংখ্যা অধিক খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. ভারতে নারী শিশুর ভ্রুণ হত্যা এবং নারী শিশু হত্যার কারণে পুরুষ জনসংখ্যা নারী জনসংখ্যার চেয়ে অধিক

পরস্পর প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে পুরুষ জনসংখ্যার চেয়ে নারী জনসংখ্যা কম। ভারতে উচ্চহারে নারী শিশু হত্যার মধ্যেই এর কারণ নিহিত এবং প্রকৃত সত্য হলো, অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে ভ্রুণ চিহ্নিত করে এ দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে দশ লক্ষ নারী শিশুর ভ্রুণ গর্ভপাত করে ফেলা হয় এ অশুভ প্রবণতা যদি বন্ধ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, ভারতেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে।

৭. বিশ্বে পুরুষ জনসংখ্যার তুলনায় নারী জনসংখ্যা অধিক

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার বেশি। নিউ ইর্য়ক শহরে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা দশ লক্ষ বেশি এবং এ পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আবার সমকামী অর্থাৎ এরা কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। সমগ্র আমেরিকাতে ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি সমকামী রয়েছে। এর অর্থ এ লোকগুলো কোনো নারীকে বিয়ে করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। গ্রেট বৃটেনে পুরুষদের অপেক্ষা ৪০ লক্ষ নারী বেশি রয়েছে। জার্মানিতে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বেশি। রাশিয়াতে পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ বেশি। এমনকি আমাদের বাংলাদেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় শতকরা সাত ভাগ বেশি। সারা বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি হবে, তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৮. 'একজন পুরুষের জন্য এক স্ত্রী'— প্রত্যেকের জন্য এমন বিধি আরোপ করা বাস্তব সম্মত নয়

যদি একজন পুরুষ কেবল একজন স্ত্রী গ্রহণ করে একমাত্র আমেরিকাতেই তিন কোটি নারীর ভাগ্যে কোনো স্বামী জুটবে না (মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকাতে

২ কোটি ৫০ লক্ষ সমকামী পুরুষ রয়েছে)। এমনিভাবে গ্রেট বৃটেনে ৪০ লক্ষ, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ নারী উল্লিখিত বিধান জারির ফলে কোনো স্বামী পাবে না।

মনে করুন, আমার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা। তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে এবং তাকে হয়তো এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আছে। অথবা সে গণ সম্পদে পরিণত হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো রুচিবান নারী প্রথমটিই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যে পুরুষের একজন স্ত্রী রয়েছে, তার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে আপত্তি করবে না।

পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা একটি সাধারণ ব্যাপার; অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার সেখানে একান্তই স্বাভাবিক। আর এজন্যই সেখানে নারীরা অতৃপ্ত ও যৌন নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করে। অথচ এই একই সমাজ একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারকে গ্রহণ করতে পারে না। যেখানে হতে পারতো নারী তার সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদার অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপদ জীবন।

যা হোক, যেখানে নারীকে এমন দুটো ব্যবস্থার একটাকে গ্রহণ করতে হবে যে দুটোর কোনো বিকল্প নেই। হয়তো তাকে একজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আগে থেকে আছে, অথবা তাকে গণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। এ অবস্থায় ইসলাম নারীকে সম্মানজনক প্রথম ব্যবস্থাটাকেই গ্রহণের অনুমতি দান করে, দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয় না। ইসলাম যে সীমিতআকার 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন দেয় তার আরো কারণ রয়েছে। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য নারীর সম্মান-সম্ভ্রমকে রক্ষা করা।

২ একাধিক স্বামী গ্রহণ

প্রশ্ন ২. একজন পুরুষকে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তখন একজন নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণে ইসলাম বাধা দেয় কেন?

উত্তর : বেশ কিছু লোক যাদের মধ্যে কিছু মুসলিমও রয়েছেন— যারা এ বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম যেখানে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়, সেখানে একজন নারীকে একই অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায় কেন? এখানে বলে নেয়া আবশ্যক যে, একটি ইসলামি সমাজের ভিত্তি সাম্য ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তাআলা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন তবে সামর্থ্য, যোগ্যতা ও দায়িত্বের ভিন্নতা দিয়ে। শারীরিক ও মানসিক

দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়।

কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার ২২ নং থেকে ২৪ নং আয়াতে যেসব নারীর একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এরপরে ২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে–

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ ـ

অর্থ : অন্য পুরুষের বিবাহাধীন স্ত্রী-ও এ নিষেধের তালিকায় রয়েছে।

একজন নারীর একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ কেন নিষিদ্ধ তার কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলেও তাদের পরিবারে জন্ম লাভকারী শিশুর পিতা কে তা চিহ্নিত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। পিতৃপরিচয় যেমন সহজেই পাওয়া যায় তেমনি মাতৃপরিচয়ও সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকার ক্ষেত্রে সন্তানের মাতৃপরিচয় সহজেই পাওয়া গেলেও পিতৃ পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। মাতা ও পিতা উভয়ের পরিচয়ের ব্যাপারটাতো ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞানীরা (Psychologist) বলেন যে, যেসব শিশু তাদের মাতা-পিতার পরিচয় জানে না তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হীনমন্যতায় ভোগে। তাদের শিশুকাল কাটে অসুখীভাবে। এ কারণেই দেহোপজীবিনী বা বেশ্যাদের সন্তানদের শিশুকাল সুখময় হয় না। একাধিক স্বামী গ্রহণকারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে গেলে যদি সে নারীকে শিশুর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তাকে দুই বা ততোধিক নাম বলতে হবে। আমি জানি যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মাতা ও পিতার উভয়কে সনাক্ত করাটা পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। তাই এ পয়েন্টটি অতীতের জন্য প্রযোজ্য হলেও বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

২. প্রকৃতিগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষ বহুপত্নীক হবার ব্যাপারে অধিক যোগ্য।

৩. জৈবিক দিক থেকে একজন পুরুষ তার একাধিক স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সহজেই পালন করতে পারে। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন সহজ নয়। একজন নারীকে তার মাসিক ঋতু স্রাবকালীন অবস্থায় ভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কারণ এ সময় তার মধ্যে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন আসে।

৪.একাধিক স্বামীর স্ত্রীকে একই সাথে কয়েক জনের যৌনসঙ্গী হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা

থাকে যা যৌনাচারের মাধ্যমে তার অন্য স্বামীদের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। এমন কি যদি তার স্বামীদের অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক না-ও থেকে থাকে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর স্বামীর জন্য এ জাতীয় সংক্রমণের আশঙ্কা নেই, যদি তার স্ত্রীদের কারো সাথে বিবাহ বহির্ভূত অন্য কোন পুরুষেরযৌন সম্পর্ক না থাকে।

এখানে উল্লিখিত কারণগুলো একজন লোক খুব সহজেই চিহ্নিত করতে এবং বুঝতে সক্ষম। এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যেজন্য অনন্ত অসীম জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ্ নারীদের জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. হিজাব বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন ৩. ইসলাম পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে কেন?

উত্তর : সেকুলার তথা ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল প্রায়ই ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয় হয়ে থাকে। ইসলামি বিধি বিধানে নারী নিগ্রহের বড় প্রমাণ হিসেবে প্রায়ই হিজাব বা ইসলামি পোশাককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নারীর জন্য 'হিজাব' তথা ইসলামি পোশাক প্রবর্তনের পেছনে ধর্মীয় কারণগুলো বিশ্লেষণের আগে ইসলামের সক্রিয় আগমনের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কীরূপ ছিল তা আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ইসলাম-পূর্বকালে সমাজে নারী ছিল অত্যন্ত মূল্যহীন এবং তারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো

ইতিহাস থেকে সংগৃহীত নিম্নে বর্ণিত উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে যে, অতীতের সভ্যতাগুলোতে নারীর মর্যাদা কীরূপ ছিল। ইসলাম-পূর্ব তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি তাদেরকে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা দিতেও তাদের অস্বীকৃতি ছিল।

ক. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা : ব্যাবিলনীয় আইনে নারী ছিল নিতান্ত মূল্যহীন। যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হতো, তা হলে সেই পুরুষের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

খ. গ্রিক সভ্যতা : প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে গ্রিক সভ্যতাকে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়েছে। তথাকথিত এই

গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিচে এবং সর্বপ্রকার অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত 'প্যানডোরা' নামীয় কাল্পনিক নারীকে মানবজাতির সকল দুর্ভাগ্যের মূল বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রিক জাতি নারীকে যদিও অপূর্ণাঙ্গ মানুষ তথা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী বলে মনে করতো। নারীর সতীত্ব অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এক নারীকে গ্রিকরা দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করতো। কিন্তু কিছুকাল পরেই আত্মঅহঙ্কারে মেতে উঠে অবাধ যৌনাচার সংস্কৃতিতে তারা ডুবে যায়। এমনকি গ্রিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বেশ্যালয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এটা সর্বশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

গ. রোমান সভ্যতা : রোমান সভ্যতা যখন তার উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল, তখন নারীর প্রতি আচরণ এমন ছিল যে, একজন পুরুষ যখন ইচ্ছে তার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতো। নগ্নতা ও বেশ্যালয়ে যাতায়াত রোমানদেরও সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

ঘ. মিসরীয় সভ্যতা : মিসরীয় সভ্যতায় নারীকে 'অলক্ষুণে এক শয়তানের চিহ্ন' বলে গণ্য করতো।

ঙ. ইসলাম পূর্ব আরব : আরবে ইসলাম আবির্ভাবের আগে নারীকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো এবং নারী-শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবিত কবর দেয়া হতো।

২. ইসলাম নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এবং তাদেরকে দিয়েছে সাম্য আর আশা করে যে, তারা তাদের মর্যাদা ধরে রাখবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলেছে এবং ১৪ শত বছর আগে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়েছে।

পুরুষের জন্য পর্দা : পর্দার আলোচনায় মানুষ সাধারণত নারীদের পর্দার কথাই বলে। যা হোক কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা নারীদের পর্দার কথা আলোচনার আগে সূরা নূরে বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (সূরা নূর : ৩০)

নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি পড়লে কোনো অসঙ্গত ও নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। সেজন্য তার দৃষ্টিকে অবনত রাখা উচিত।

নারীর জন্য পর্দা : সূরা নূর -এর ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে —

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ .....

অর্থ : আর (হে নবী!) আপনি মু'মিনাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর সাধারণভাবে প্রকাশিত থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; আর তারা যেন তাদের চাদর নিজ বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে এবং তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে, এদের ছাড়া– তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র...।

৩. 'হিজাব' বা পর্দার ৬টি শর্ত

ক. **সীমানা :** প্রথম শর্ত হলো দেহের যে সীমা পর্যন্ত তাকানো যাবে তা। নারী ও পুরুষের এ সীমায় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হলো কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। আর নারীর ক্ষেত্রে এ সীমা হলো কব্জি পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। তবে তারা যদি চায় হাত ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে পারে। ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার পক্ষপাতি। তারা এ দুটো অংশকেও 'হিজাব' বা পর্দার আওতাভুক্ত মনে করেন।

বাকি ৫টি শর্ত পুরুষ ও নারীর জন্য সমান

খ. পোশাক পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, যেন শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়।

গ. পোশাক এমন স্বচ্ছ বা পাতলা হবে না, যাতে পোশাকের ঢেকে রাখা অংশ দেখা যায়।

ঘ. বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয় এমন জাঁকজমকপূর্ণ আকর্ষণীয় পোশাক হবে না।

ঙ. পোশাক বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ নারী পুরুষের মতো এবং পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরতে পারবে না।

চ. পোশাক অবিশ্বাসীদের পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ এমন পোশাক পরা যাবে না যা অন্য ধর্মালম্বীদের পরিচয় বহন করে। অথবা যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত এমন পোশাক পরা যাবে না।

৪. ভাব-ভঙ্গি এবং আচার-আচরণও 'হিজাব' বা পর্দার অর্ন্তগত বিষয়

পোশাক সম্বন্ধীয় ছয়টি শর্তের পাশাপাশি ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপরও পূর্ণাঙ্গ পর্দা নির্ভরশীল হতে হবে। একজন ব্যক্তি পোশাক সংক্রান্ত পর্দার শর্তগুলো পূরণ করলে সীমিত অর্থেই পর্দা পালন করলো। পোশাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তা-চেতনার পর্দা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। এর সাথে ব্যক্তির চলাফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদিও পর্দায় শামিল হয়।

৫. 'হিজাব' বা পর্দা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীর জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান দেয়ার কারণ কুরআন মাজীদে সূরা আল-আহযাবের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে —

يَآَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন ওড়না নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না। আর আল্লাহতো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : আয়াত ৫৯)

পবিত্র আল-কুরআন বলে যে, নারীদের জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে তারা যেন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে।

৬. যমজ দু'বোনের দৃষ্টান্ত

ধরে নেয়া যাক দু বোন যমজ। উভয়ই সমানভাবে সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উভয়ে। তাদের একজন ইসলামি হিজাবে আবৃতা; অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া তার সারা শরীর ঢাকা। অপরজন পশ্চিমা পোশাক, একটি মিনি স্কার্ট অথবা শর্টস্ পরিহিতা। সামনে রাস্তার ওপারে কয়েকজন বদমাশ ছেলে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। এখন বলুনতো তারা কাকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামী 'হিজাব' পরিহিতা তাকে, না-কি যে মেয়েটি পশ্চিমা পোশাক মিনি স্কার্ট বা শর্টস্ পরিহিতা তাকে? স্বাভাবিকভাবেই গুণ্ডাগুলো পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা মেয়েটিকেই উত্যক্ত করবে। এ ধরনের পোশাক পরোক্ষভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি পোশাক পরিহিতার নিজেকে উত্যক্ত করা এবং নির্যাতন করার আমন্ত্রণ বলা যায়। আল-কুরআন যথার্থই বলেছে যে, 'হিজাব' নারীকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

৭. ধর্ষকের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামি শরীয়াহ আইনে কোনো পুরুষ যদি ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং আদালতে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। এ কঠিন কথা শুনে অনেকে অবাক হয়ে যান। কেউ কেউ বলেই ফেলেন যে, ইসলাম একটি নিষ্ঠুর এবং বর্বর ধর্ম। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি যে, ধরেন আল্লাহ না করুন, কোনো বদমাশ আপনার স্ত্রী, আপনার মাতা বা বোনকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে আসীন। অপরাধীকে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছে যে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তাদের কেউ কেউ বাড়িয়ে এতোটুকু বলেছেন যে, তারা তাকে নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, কেউ আপনার স্ত্রী বা মাতাকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু একই অপরাধ যদি অন্যদের স্ত্রী বা কন্যার উপর সংঘটিত হয়, তখন আপনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে বলবেন বর্বরতা, একই অপরাধ দু'রকম বিচার কেন?

৮. নারীকে উচ্চ মর্যাদা দেয়ার পশ্চিমা দাবি একেবারে মিথ্যা

নারীকে স্বাধীনতা দেয়ার পশ্চিমাদের দাবি মূলত নারীদেরকে পেষণ, তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়ার একটি ছল ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, তারা নারীকে ঊর্ধ্বে উঠিয়েছে। আর বাস্তবতা হলো তারা নারীকে তাদের মর্যাদা থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা ও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছেড়েছে। তারা নারীদেরকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ ও যৌন ব্যবসায়ীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে যা শিল্প সংস্কৃতির রঙিন পর্দা দ্বারা আড়াল করা হয়েছে।

৯. বিশ্বে নারী ধর্ষণের হার আমেরিকাতে সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হয়। অবশ্য বিশ্বের মধ্যে নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হারও আমেরিকাতে। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. (F.B.I.) রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকাতেই গড়ে দৈনিক ১,০৫৬টি ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ১,৯০০ ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। রিপোর্টটিতে সাল উল্লিখিত হয় নি। তবে সম্ভবত তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হবে। সম্ভবত উল্লিখিত বছরগুলোতে আমেরিকানরা আরো অধিক হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আসুন একটা চিত্রনাট্য অঙ্কন করা যাক। যেখানে দেখা যাবে যে, আমেরিকাতে 'ইসলামি হিজাব' অনুসৃত হচ্ছে। যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে এবং তার মনে কোনো অসৎ অশ্লীল চিন্তা আসতে পারে মনে করে তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রত্যেকটি নারী 'ইসলামি হিজাব' তথা পর্দার বিধান অনুসরণ করছে অর্থাৎ প্রত্যেক নারী মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাস্তায় বের হচ্ছে। এর পরেও কোনো অসৎ পুরুষ ধর্ষণের মতো অপরাধ করলে ইসলামের দণ্ডবিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান তার ওপর বলবৎ করা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ দৃশ্য পটে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে আমেরিকাতে ধর্ষণের ঘটনা কি বাড়বে, একই সমান থাকবে, নাকি কমবে?

১০. ইসলামি শরীআহ আইন বলবৎ হলে ধর্ষণের হার অবশ্যই কমে আসবে

ইসলামি শরীআহ আইন কার্যকর হলে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে এবং অপরাধের হার আশাতীতভাবে কমে যাবে। বিশ্বের যে কোনো দেশে ইসলামের শরীআহ আইন কার্যকর হলে, তা আমেরিকা হোক বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ হোক, সমাজে বসবাসকারীরা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। 'হিজাব' বা পর্দা নারীকে অবমূল্যায়ন করে না বরং নারীকে যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং তার সতীত্ব সম্ভ্রমকে সুরক্ষা করে।

৪ ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে?

প্রশ্ন ৪. ইসলামকে শান্তির ধর্ম কীভাবে বলা যায়, অথচ তা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে?

উত্তর : কিছু কিছু অমুসলিমের একটি সাধারণ অভিযোগ যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী এত কোটি কোটি অনুসারী পেতে সক্ষম হতো না, যদি তা শক্তি প্রয়োগে প্রসার লাভ না করতো। নিচের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইসলাম তরবারির সাহায্যে ভয় দেখিয়ে প্রসার লাভ করে নি। বরং এটা ছিল সত্যের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রভাব, কার্যকারণ ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল যৌক্তিকতা যা ইসলামকে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়তা দান করেছে।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দের মূল উৎস শব্দ হলো 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এর অপর অর্থ। সুতরাং ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম যা অর্জিত হয় সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছের কাছে স্বীয় ইচ্ছেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে।

২. শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয়

এ বিশ্বের সকল মানুষই শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে নয়। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের হীন স্বার্থে শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই কখনো কখনো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আর এ সুনির্দিষ্ট কারণেই আমাদের পুলিশ বাহিনী রয়েছে যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে দুষ্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ইসলাম শান্তির প্রযোজক, সাথে সাথে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক সময় শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বা শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলামে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরেই শক্তি প্রয়োগ করার বৈধতা রয়েছে।

৩. বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী-এর মতামত

ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে– এ ভুল ধারণার উত্তম জবাব দিয়েছেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী (De Lecy o, Leary)। তিনি তাঁর রচিত 'ইসলাম এট দি ক্রস রোড' (Islam at the cross road) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লিখিত অভিযোগের এ জবাব দিয়েছেন–

'অবশেষে ইতিহাসই এটাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। ইসলামকে নিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামকে তরবারির অগ্রভাগে নিয়ে বিজিত জাতিগুলোকে তা মানাতে বাধ্য করেছে– এ প্রচারণা অনেকের মধ্যে একটি কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী যা ইতিহাসবিদগণ বারবার বলে বেড়াচ্ছেন।'

৪. স্পেনে আটশত বছর মুসলিম শাসন ছিল

মুসলমানরা আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে। সেখানে মুসলমানরা কখনো তরবারির সাহায্যে কোনো লোককে ধর্মান্তরিত করে নি। পরবর্তীতে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে আসে এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর সেখানে এমন একজন মুসলমানও বেঁচে ছিল না, যে প্রকাশ্যে নামাযের জন্য আযান দিতে পারতো।

৫. এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব মিসরীয় খ্রিস্টান

মুসলমানরা সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডের ১৪০০ বছর মালিক ছিল। মাঝখানে কয়েক বছর ব্রিটিশ শাসন এবং কয়েক বছর ছিল ফরাসি শাসন। মুসলমানরাই আরব ভূ-খণ্ড শাসন করেছে ১৪০০ বছর। অথচ আজো সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরবীয় খ্রিস্টান বংশানুক্রমে বসবাস করছে। মুসলমানরা যদি তরবারি তথা শক্তি প্রয়োগ করতো তাহলে সেখানে একজন আরবও খ্রিস্টান থাকতে পারতো না।

৬. ভারতে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অমুসলিম রয়েছে

মুসলমানরা আনুমানিক এক হাজার বছর ভারত শাসন করেছে। তারা চাইলে এবং তাদের ক্ষমতাও ছিল ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। অথচ আজো শতকরা ৮০ ভাগের অধিক অমুসলিম ভারতে বহাল তবিয়তে আছে। এ অমুসলিম ভারতীয়রা আজো সাক্ষী যে, মুসলমানরা তরবারির জোরে ইসলামকে প্রসারিত করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক মুসলমান বাস করে। মালয়েশিয়ার মেজরিটি অধিবাসী মুসলমান। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী উল্লিখিত দুটো দেশে গিয়েছিল?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

একইভাবে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীর অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। যে কেউ আবার প্রশ্ন ছুঁড়তে পারে যে, ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করে থাকে, তাহলে 'আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল?'

৯. টমাস কার্লাইল

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল তাঁর রচিত 'হিরোজ অ্যান্‌ড হিরো ওয়ার্শিপ' (Heroes and Hero worship) গ্রন্থে ইসলামের প্রসার লাভ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভ্রান্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন– 'তরবারি! কিন্তু কোথায় তুমি আমার তরবারি পাবে? সকল মতাদর্শই সূচনায় একজনের সংখ্যালঘু থাকে। মাত্র একজন মানুষের মাথায় তা থাকে। সেখানেই তা থাকে। নিখিল বিশ্বে মাত্র একজনই তা বিশ্বাস করে, একক একজন মানুষ সমগ্র মানুষের বিরুদ্ধে। সেই মানুষটি একটি তরবারি নিল এবং তা দ্বারা তার মতাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা চালায়। তাতে তার সামান্যতম কাজ হয়েছে কি? তোমার তরবারি তোমার নিজেকেই খুঁজে পেতে হবে। মোটকথা কোনো জিনিস যেমনভাবে সে পারে নিজে নিজেই প্রচারিত হবে।'

১০. দীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই

যে তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়। সেই তরবারি যদি কোনো লোক পেয়েও থাকতো তবুও তা সে ব্যবহার করতো না। কেননা কুরআন মাজীদ বলছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী নেই; নিঃসন্দেহে সত্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুল পথ থেকে। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

১১. জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি

ইসলাম যে তরবারি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে তা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি। কুরআন মাজীদের সূরা আন নাহলে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : আপনি মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং উত্তম উপদেশ দানের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বির্তক করুন উত্তম পন্থায়। (সূরা নাহ্‌ল : ১২৫)

১২. ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ধর্মসমূহের প্রবৃদ্ধির হার

'রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক' তথা বার্ষিক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের অর্ধ শতাব্দীর [১৯৩৪-৮৪] একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধটি 'প্লেইন ট্রুথ' নামক ম্যাগাজিনেও এসেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। ইসলামের প্রবৃদ্ধির হার তাতে ২৩৫% [শতকরা দু'শত পঁয়ত্রিশ] উল্লিখিত হয়েছে। অথচ খ্রিস্টধর্মের প্রবৃদ্ধির হার তাতে শতকরা ৪৭% ভাগ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ শতাব্দীতে কোন যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, যা কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

১৩. আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম-ই সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম

আজকাল সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম আমেরিকাতে যেমন ইসলাম তেমনি ইউরোপেও সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম ইসলাম। পাশ্চাত্যের এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে কোন্ তরবারি?

১৪. ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন

ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন যথার্থই বলেছেন, 'যেসব লোক আশঙ্কা করছে যে, আণবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে, তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা ইতোমধ্যে বর্ষিত হয়ে গেছে, এটা সেদিনই বর্ষিত হয়েছে যেদিন মুহাম্মদ ﷺ আরবের বুকে জন্মলাভ করেছে।'

৫. মুসলমানরা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী

প্রশ্ন ৫. অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন ?

উত্তর : যখনই ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া হয়। প্রচার মাধ্যমগুলোতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বিরামহীনভাবে বিভিন্ন ভুল ও মিথ্যা তথ্য সহকারে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে এ ধরনের ভুল তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা মুসলমানদেরকে বর্বর ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং অন্য ধর্মানুসারীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। আমেরিকার ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণের পরে আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো এ ধরনের মুসলিম বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত তাদের প্রচার মাধ্যমগুলো ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এ আক্রমণের নেপথ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র রয়েছে। অবশেষে আমেরিকার আর্মড ফোর্সের একজন সৈনিক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

চলুন, 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) এবং 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism) -এর অভিযোগ দুটো পর্যালোচনা করা যাক।

১. 'মৌলবাদী' শব্দের সংজ্ঞা

'মৌলবাদী' এমন এক ব্যক্তি, যে অনুসরণ ও আনুগত্য করে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের মূলনীতির। একজন লোক যদি ডাক্তার হতে চায়, তাকে অবশ্যই ওষুধ সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ওষুধের মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায় ওষুধের ক্ষেত্রে তাকে 'মৌলবাদী' হতে হবে। একইভাবে যে গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হতে চায় তাকে অবশ্যই গণিত শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। বলা যায় যে, তাকে অবশ্যই গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে এবং তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে।

২. সকল মৌলবাদী এক রকম নয়

সকল মৌলবাদীর ছবি একই রং তুলিতে আঁকা যাবে না। সকল মৌলবাদীকে তাই একই শ্রেণীতে ফেলে সব মৌলবাদী ভালো বা সব মৌলবাদী মন্দ একথা বলা যাবে না। মৌলবাদীর শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে কোনো ব্যক্তি যে বিষয়ের ভিত্তিতে 'মৌলবাদী' বলে চিহ্নিত হয়েছে সে বিষয় ও তার কার্যাবলির ওপর। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা একজন মৌলবাদী চোর সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ জাতীয় মৌলবাদী সমাজে অনাকাঙ্খিত। অপরদিকে একজন মৌলবাদী ডাক্তার সমাজের জন্য উপকারী। তাই মৌলবাদী ডাক্তার সমাজে কাঙ্খিত এবং সম্মানিত।

৩. আমি একজন 'মুসলিম মৌলবাদী' হতে পেরে গর্বিত

আল্লাহর রহমতে আমি ইসলামের মূলনীতিসমূহ জানি, বুঝি এবং অনুসরণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। একজন সত্যিকার মুসলিম মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে গর্বিত। কেননা আমি জানি ইসলামের মূলনীতিগুলো বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর। মানবজাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর ইসলামের এমন একটি মূলনীতিও নেই। অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষাকে তারা অলৌকিক ও অবিচারমূলক বলে মনে করে। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপ্রতুল ও ভুল জ্ঞানের কারণে হয়েছে। একজন মানুষ যদি মুক্তমনে সূক্ষ্মভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তার প্রকৃত সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পর্যায়েই মানব কল্যাণের অনন্য বিধান।

৪. 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) শব্দের আভিধানিক অর্থ

ওয়েবস্টার ডিকশনারি অনুযায়ী 'মৌলবাদ' হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদী খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলনের নাম। এটা ছিল আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া, বাইবেলের অকাট্যতার ওপর একটি জোর প্রচেষ্টা। তা শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে নয় বরং সাহিত্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও। এ আন্দোলন বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে 'গড'-এর বাণী বলে বিশ্বাস করার ওপর জোর দেয়। যা হোক 'মৌলবাদী' এমন একটি শব্দ যা সূচনায় খ্রিস্টানদের একটি দলের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যারা বিশ্বাস করতো যে, বাইবেল আক্ষরিক অর্থেই 'গড'-এর বাণী যাতে কোনো ভুল নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'ফান্ডামেন্টালিজম' অর্থ যে কোনো ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা।

অধুনা কোনো লোক ফান্ডামেন্টালিজম তথা 'মৌলবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করলে তার মনে আসে একজন মুসলিমের কথা যে সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানের সত্যের পক্ষে সন্ত্রাসী হওয়া উচিত

দয়া করে বুঝতে ভুল করবেন না প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী সেই ব্যক্তি যে সন্ত্রাসের মূল কারণ। ডাকাত যখনই পুলিশকে দেখে, সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সুতরাং পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী। তেমনিভাবে একজন মুসলমানকে সমাজ বিরোধী শক্তি যেমন চোর, ডাকাত ও ধর্ষকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়া কর্তব্য। যখনই উল্লিখিত সমাজ বিরোধী শক্তি একজন মুসলমানকে দেখবে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এটা সত্য যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে সাধারণ জনগণের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়। কিন্তু একজন সত্যিকার মুসলিম শুধু কিছু লোকের জন্য যেমন : সমাজ বিরোধী শক্তি যারা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় তাদের জন্য সন্ত্রাসী। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য একজন মুসলিম সন্ত্রাসী নয়। সত্যিকার অর্থে সর্বসাধারণ তথা নিরীহ জনসাধারণের জন্য একজন মুসলিম হবে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।

৬. এইক ব্যক্তিকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করা

একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে সন্ত্রাসী ও দেশ প্রেমিক হিসেবে। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা যারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থন দেয় নি তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। একই ব্যক্তিদেরকে একই কাজের জন্য ভারতবাসী 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করে। এভাবে একই ব্যক্তিদেরকে একই কার্যাবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেবেল এঁটে দেয়া হয়। একপক্ষ তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয় অথচ অপরপক্ষ তাদেরকে 'দেশপ্রেমিক' নামে আখ্যায়িত করে। যারা বিশ্বাস করতো যে, ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার আছে, তারা বিপ্লবীদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়। অপরদিকে যারা মনে করতো যে, বৃটেনের ভারত শাসনের কোনো অধিকার নেই, তারা বিপ্লবীদেরকে আখ্যা দেয় 'দেশপ্রেমিক' ও 'স্বাধীনতা যোদ্ধা'।

কাজেই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করার আগে তার কথা শুনে নিতে হবে। পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিই শুনে নিতে হবে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তার কার্যাবলির কারণ সামনে রেখে সে অনুসারে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

৭. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শান্তি'। ইসলাম শান্তির ধর্ম যার মৌলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয় এবং তা বজায় রাখার জন্য কাজ করে যেতে বলে। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানকে মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলনীতিসমূহ

তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সমাজ বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যই সে হবে একজন 'সন্ত্রাসী' তথা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, তাহলেই সমাজে শান্তি ও ন্যায়-ইনসাফ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির ধারাও বজায় থাকবে।

৬. আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন ৬. প্রাণী হত্যা করা একটি নিষ্ঠুর কাজ। মুসলমানরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে কেন?

উত্তর : 'নিরামিষবাদ' (Vegetarianism) আজকাল বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন। অনেকে এটাকে পশু অধিকারের সাথে যুক্ত করে। অধিকন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ মাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য আমিষ জাতীয় উৎপাদন সামগ্রী ভোগ ও ব্যবহার করাকে পশু অধিকার লঙ্ঘন বলে সাব্যস্ত করে।

ইসলাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নির্দেশ ঘোষণা করে। সাথে সাথে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এ বিশ্ব এবং এ বিশ্বের উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীকুল মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন এসব নিয়ামত ও আমানত তথা আল্লাহর দেয়া সামগ্রী ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ভোগ-ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

চলুন এ বিতর্কের আরো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. একজন মুসলমান বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজী হতে পারে

একজন মুসলিম খাঁটি মুসলমান হয়েও খাঁটি নিরামিষ ভোজী হতে পারেন। আমিষ জাতীয় খাদ্যগ্রহণ একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

২. কুরআন মাজীদ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দান করে

আল-কুরআন একজন মুসলমানকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। নিচের আয়াত তার প্রমাণ–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ـ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু সেগুলো ছাড়া যা...। (সূরা মায়েদা : ১)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরো রয়েছে অনেক উপকার এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাকো।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিজয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে। আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা তাদের ভক্ষণ করে থাকো। (সূরা মু'মিনুন : ২১)

৩. একমাত্র পুষ্টিকর ও আমিষে পরিপূর্ণ খাদ্যমান পাওয়া যায় মাংস থেকে

আমিষ জাতীয় খাদ্যই প্রোটিনের উত্তম উৎস। এতে জৈবিকভাবেই প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। যেমন ৮টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড যা শরীর দ্বারা পূর্ণ হয় না, তা সুষম খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

৪. মানুষের রয়েছে এক সেট সর্বভুক দাঁত

আপনি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখে আশ্চর্য হবেন যে, তৃণভোজী প্রাণী, যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁতের বিন্যাস একই রকম, অর্থাৎ এসব পশুর দাঁত ভোঁতা ও সমতল যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী, অপরদিকে আপনি যদি মাংসাশী প্রাণীদের যেমন সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এসব পশুর দাঁত সুঁচালো ও ধারালো যা মাংস জাতীয় খাদ্য খাওয়ার উপযোগী। এমনিভাবে আপনি যদি মানুষের দাঁতগুলো লক্ষ্য করেন তাহলে বিস্ময়করভাবে দেখতে পাবেন যে, তাদের দু' ধরনের দাঁত রয়েছে। তাঁদের যেমন রয়েছে ভোতা দাত, তেমনি রয়েছে সুঁচালো দাঁত। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। অতএব মানুষের দাঁত সর্বভুক। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন যে, মানবজাতি শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, তাহলে তিনি মানুষকে ধারালো ও সুঁচালো দাঁত কেন দিলেন? এটা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয় যে, তিনি জানেন মানুষকে প্রয়োজনেই নিরামিষ ও আমিষ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

৫. আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য মানুষ হজম করতে পারে

তৃণভোজী প্রাণীগুলো শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীগুলো কেবল মাংস হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ নিরামিষ ও আমিষ উভয়

জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। মানুষের খাদ্য পরিপক তন্ত্র উভয় ধরনের খাদ্য হজম করতে সক্ষম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি তাই চাইতেন, আমরা শুধু নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে আমিষ নিরামিষ উভয় ধরনের খাদ্য হজম করার শক্তি কেন দিলেন?

৬. হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়

ক. অনেক হিন্দু আছেন যারা কার্যকরভাবে নিরামিষ ভোজী। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তারা তাদের ধর্মবিরোধী মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো ধর্মগ্রন্থগুলো আমিষ তথা মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়। ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে যে, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

খ. হিন্দুধর্মের আইনের গ্রন্থ মনু শ্রুতি'র ৫ম অধ্যায়, ৩০ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে—

'খাবার গ্রহণকারী সেসব পশুর মাংসই খায়, যা খাওয়া যায়, তবে এতে সে কোনো মন্দ কিছু করে না। এমনকি সে যদি এটা দিনের পর দিনও করে যায়; কেননা ঈশ্বর-ই কতককে ভক্ষিত হওয়ার জন্য এবং কতককে ভক্ষক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

গ. আবার মনুশ্রুতির একই অধ্যায়ের পরবর্তী ৩১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

'উৎসর্গের শুদ্ধতার জন্য মাংস ভক্ষণ যথার্থ, এটা ঈশ্বরের বিধান হিসেবে প্রচলিত।'

ঘ. অতঃপর মনুশ্রুতির ৫ম অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর নিজেই উৎসর্গের উপযোগী পশু সৃষ্টি করেছেন— সুতরাং উৎসর্গের জন্য প্রাণী বধ হত্যা নয়।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৮ নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পিতামহ ভীষ্মদেবের মধ্যে শ্রাদ্ধের সময় কি খাদ্য পরিবেশন করলে পিতৃপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে— এ সম্পর্কে যে কথোপকথন হয়েছে তা নিম্নরূপ :

'যুধিষ্ঠির বলল, 'হে মহাশক্তিমান প্রভু, আমাকে বলুন, সেসব জিনিস কী কী— যেগুলো পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করলে তারা শান্তি পাবে? কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা স্থায়িত্ব লাভ করবে? আর কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা চিরস্থায়ী হবে?'

ভীষ্মদেব বললেন, 'যুধিষ্ঠির! তুমি আমার কাছে শোনো— যেসব দ্রব্যসামগ্রী শ্রাদ্ধের জন্য উপযোগী ও যথাযথ এবং যেসব ফল-ফলাদি তার সঙ্গে দিতে হবে, তা হলো সীমের বিচি, চাউল, বার্লি, মাসা, পানীয় এবং বৃক্ষমূল ও ফলাহার যদি শ্রাদ্ধের সাথে যায় তাহলে হে রাজা, পিতৃপুরুষ এক মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। যদি শ্রাদ্ধে

মৎস্য উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা দু'মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভেড়ার মাংস পরিবেশন করলে তারা (পিতৃপুরুষগণ) তিন মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। খরগোশের মাংস দ্বারা চার মাস, ছাগলের মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, শূকরের মাংস দ্বারা ছয় মাস, পাখির মাংস দ্বারা সাত মাস, 'প্রিসাতা' হরিণের মাংস দ্বারা তারা আট মাস পরিতৃপ্ত থাকবে। রুরু হরিণ দ্বারা নয় মাস, গয়ালের মাংস দিলে দশ মাস এবং মহিষের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করালে তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় এগারো মাস। গরুর মাংস দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় পুরো একটি বছর।

ঘি মিশ্রিত পায়েশ পিতৃপুরুষদের কাছে গরুর মাংসের মতোই গ্রহণীয়। ভদ্রিনাশার (এক প্রকার বড় ষাড়) মাংস দ্বারা সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় বার বছর। শুক্ল পক্ষের কোনো দিবসে তাদের মৃত্যু হলে এবং সেই দিবসে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গণ্ডারের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যায়। 'কালাসকা' নামক সবজি, কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি ও লাল ছাগলের মাংস দিতে পারলেও তাদের সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

অতএব আপনি যদি চান যে, আপনার পিতৃপুরুষদেরকে চিরস্থায়ীভাবে সন্তুষ্টি করতে তাহলে আপনাকে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করাতে হবে।

৭. 'হিন্দুবাদ' অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

যদিও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের অনুসারীদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবুও অনেক হিন্দুই নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তার সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছে। কেননা তারা অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমন : জৈনধর্ম।

৮. উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম তাদের খাদ্যনীতিতে নিরামিষবাদকে সংযোজন করে নিয়েছে। কারণ তারা জীবহত্যার একেবারেই বিরোধী। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রাণী হত্যা ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারেন, তাহলে আমিই এ ধরনের জীবন পদ্ধতি গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হবো। আগেকার লোকেরা মনে করতো যে, উদ্ভিদের প্রাণ নেই, তারা প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু আজকাল এটা সার্বজনীন সত্য যে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রাণ আছে। সুতরাং খাঁটি নিরামিষ ভোজী হলেও তাদের জীব হত্যা না করার যুক্তি যথার্থ হয় না।

৯. উদ্ভিদ ব্যথা বেদনা অনুভব করতে পারে

নিরামিষবাদীরা পুনর্যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করতে পারে না। সুতরাং একটি প্রাণী হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা লঘু অপরাধ। অধুনা বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে, উদ্ভিদও ব্যথা অনুভব করতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের সেই

কান্না মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। এটা এজন্য যে, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ২০ হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ-এর বাইরের শব্দ শুনতে সক্ষম। ২০ হার্টজ -এর নিচের এবং ২০,০০০ হার্টজ এর উপরের কোনো শব্দ মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর ৪০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। তাই কুকুরের জন্য নীরব হুইসেল তৈরি করা হয়েছে যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর মধ্যে। এসব হুইসেলের শব্দ একমাত্র কুকুরই শুনতে সক্ষম। মানুষ এর শব্দ শুনতে সক্ষম না। এ হুইসেলের শব্দ শুনে কুকুর তার প্রভুকে চিনে নিতে পারে এবং প্রভুর কাছে ছুটে আসে। আমেরিকার একজন কৃষি খামারের মালিক অনেক গবেষণা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে উদ্ভিদের কান্না মানুষের শ্রুতিযোগ্য করে তোলা যায়। সে বুঝে নিতে পারতো উদ্ভিদ কখন পানির জন্য কাঁদে। সর্বশেষ গবেষণার ফল হলো, উদ্ভিদ সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতে।

১০. দুই ইন্দ্রিয়বিহীন প্রাণী হত্যা করা কোনো লঘু অপরাধ নয়

একদা নিরামিষ ভোজীরা যুক্তি দিতেন যে, উদ্ভিদের মাত্র দুটো ইন্দ্রিয় আছে, অথচ প্রাণীদের রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘু অপরাধ। ধরা যাক, আপনার এক ভাই জন্ম থেকেই বোবা ও কানা এবং সে অন্য একজন মানুষের চেয়ে দুটো ইন্দ্রিয় কম পেয়েছে। সে যখন বয়োপ্রাপ্ত হলো, তখন এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। এখন বলুন, আপনার ভাইয়ের যেহেতু দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। আপনি কি বিচারককে অপরাধীর সাজা কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ করবেন? কেননা আপনার ভাইয়ের দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। প্রকৃতপক্ষে আপনি তখন বিচারককে বলবেন যে, হত্যাকারী একজন মাসুম বা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই বিচারকের কর্তব্য অপরাধীকে কঠোরতর শাস্তি দেয়া।

আল-কুরআন ঘোষণা করেছে —

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا .

অর্থ : হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে পবিত্র ও উত্তম জিনিসগুলো খাও। (সূরা বাকারা : ১৬৮)

১১. গো-মহিষাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি

প্রত্যেকটি মানুষ যদি নিরামিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে গো-মহিষাদীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। যেহেতু তাদের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত জ্যামিতিক হারে বেড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম জ্ঞানের দ্বারা অবগত কীভাবে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে সঠিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে গো-মহিষাদীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দান করলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১২. সবাই আমিষভোজী না হওয়ায় মাংসের মূল্য সঙ্গত আছে

কিছু কিছু মানুষ খাঁটি নিরামিষভোজী হলেও আমি তাতে কিছু মনে করি না। তবে আমিষভোজীদের প্রতি তাদের নির্মমভাবে নিন্দা প্রকাশ উচিত নয়। মূলত যদি সব ভারতীয় আমিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান আমিষভোজীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তখন মাংসের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

৭. পশু যবেহ্ করার ইসলামি পদ্ধতি দৃশ্যত অত্যন্ত নির্মম

প্রশ্ন ৭. মুসলমানরা পশুকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে যবেহ্ করে কেন?

উত্তর : পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতিটি বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার আগে আমি পশু যবেহ্ সম্পর্কে একজন শিখ ও একজন মুসলিমের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করতে চাই।

একদা একজন শিখ একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা পশুকে গলা কেটে যন্ত্রণা দিয়ে নির্মমভাবে কেন যবেহ্ কর? আমরা তো এক ঝটকায় পশুর গলা কেটে ফেলি। মুসলমান লোকটি উত্তর দিলেন, 'আমরা অত্যন্ত সাহসী, তাই সামনে থেকে আক্রমণ চালাই। আমরা 'মরদ কা কাচ্চা'। আর তোমরা কাপুরুষ তাই পেছন থেকে আক্রমণ কর।' এটা নিছক একটা হাস্যরসাত্মক গল্প বটে। তবে ইসলামি যবেহ পদ্ধতি যে শুধু মানবিক তা নয় বরং এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক, তা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি

পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করতে এ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

ক. পশু যবেহের হাতিয়ার (ছুরি) অত্যন্ত ধারালো হতে হবে : পশুকে অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যবেহ্ করতে হবে, যাতে পশুর যন্ত্রণা যথা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

খ. গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী নালী কেটে ফেলতে হবে : 'যাবীহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ যবেহকৃত পশু। পশুর গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের দু' পাশের রক্তবাহী নালী কেটে পশুকে যবেহ করতে হবে। পেছন দিকে মেরুদণ্ডের শিরা কাটা যাবে না।

গ. রক্ত বের করে দিতে হবে : মাথা আলাদা করার আগে রক্ত সম্পূর্ণরূপে বের হতে দিতে হবে। এটা এজন্য যে রক্তই হলো যাবতীয় জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আবাস। এজন্য ঘাড়ের শিরা কোনো ক্রমেই কাটা যাবে না। কারণ হৃদযন্ত্রের দিক থেকে যেসব শিরা-উপশিরা রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যেতে পারে। ফলে মাঝ পথে রক্ত আটকে পড়তে পারে।

২. রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ পরিবহন মাধ্যম হলো রক্ত

রক্ত হলো রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ ইত্যাদির সহজ পরিবহন মাধ্যম। সুতরাং ইসলামি যবেহ পদ্ধতি সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা রক্তের মধ্যে রোগ-জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত বের করে দেয়ার ফলে গোশ্ত বা মাংস উল্লিখিত ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৩. গোশত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভালো থাকে

ইসলামি যবেহের মাধ্যমে গোশ্ত দীর্ঘসময় পর্যন্ত সতেজ থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে যবেহে করার ফলে অন্যান্য যবেহ পদ্ধতির চেয়ে গোশতের সাথে রক্তের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে।

৪. পশু ব্যথা অনুভব করে না

অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গলনালীগুলো কেটে দেয়ার ফলে মস্তিষ্কের স্বায়ুতন্ত্রের সাথে রক্তবাহী শিরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ব্যথার অনুভূতি আর থাকে না। কারণ মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে রক্ত প্রবাহ-ই ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। মৃত্যুর সময় পশু যে পাগুলো ছুঁড়ে লাফালাফি করে এবং ছটফট করে তা ব্যথার জন্য নয়; বরং তা পেশিগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের কারণে গোশতের মধ্যে রক্তের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং দ্রুতগতিতে রক্ত পশুদেহের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে।

৮. আমিষ জাতীয় খাদ্য মুসলমানদের অত্যন্ত উগ্র করে তোলে

প্রশ্ন ৮ : বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, যে যা খায় তার আচরণে সে খাদ্যের প্রভাব পড়ে। অতএব, ইসলাম মুসলমানদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অনুমতি কেন দিয়েছে, যেখানে পশুর গোশত মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তোলে?

উত্তর : ১. ইসলাম কেবল তৃণভোজী পশুর গোশ্ত-ই খাওয়ার অনুমতি দেয়

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, একজন ব্যক্তি যা খায়, তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এটাই হলো কারণ যে, ইসলাম মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়া

নিষিদ্ধ করেছে। যেমন : সিংহ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্র। সম্ভবত উল্লিখিত পশুর মাংসই মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তুলতে পারে। ইসলাম মুসলমানদেরকে কেবল তৃণভোজী পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমন : গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত শান্ত ও পোষমানা। আমরা কেবল শান্ত, নিরীহ ও পোষমানা পশুর গোশতই খেয়ে থাকি। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয় ও অহিংস্র।

২. আল-কুরআন বলে, রাসূল ﷺ যাবতীয় মন্দ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ ـ

অর্থ : তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং যিনি হারাম করেন তার জন্য যাবতীয় অপবিত্র বস্তু। (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

পবিত্র কালামে আরো ইশরাদ হয়েছে–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থ : আর রাসূল তোমাদের যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর :৭)

আল্লাহ একজন মুসলমানকে কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন নি এ ব্যাপারে রাসূলের বর্ণিত এ বাণীই যথেষ্ট।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর 'শিকার ও যবেহ' পর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম-এর উল্লিখিত পর্বে ৪৭-৫২ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহ'র ১৩শ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত পশুগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। যথা–

ক. তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু অর্থাৎ মাংসাশী হিংস্র পশু। এসব পশু সাধারণত বিড়াল প্রজাতির। যেমন : সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়েনা ইত্যাদি।

খ. তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। যেমন : ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, ধারালো নখ বিশিষ্ট খরগোশ ইত্যাদি।

গ. সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। যেমন : সাপ ও কুমীর ইত্যাদি।

ঘ. ধারালো ঠোঁট ও নখ বিশিষ্ট পাখি। যেমন : কাক, চিল, শকুন ও পেঁচা ইত্যাদি।

৯. মুসলমানরা কা'বার পূজা করে

প্রশ্ন ৯ : মুসলমানরা মূর্তি পূজার বিরোধী, তবে তারা তাদের সালাত আদায়ের সময় কা'বার পূজা এবং কা'বার সামনে মাথা অবনত করে কেন?

উত্তর : কা'বা হলো কিবলা অর্থাৎ সালাত আদায়ের সময় মুসলমানদের যে দিকে ফিরতে হয়, তার দিক নির্দেশক স্থান। লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলমানেরা তাদের সালাত আদায়ের সময় যদিও কা'বার দিকে তাদের মুখ ফেরায় কিন্তু তারা কা'বার পূজা করে না। তারা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করে না। কারো সামনে মাথা নত করে না।

কুরআন মাজীদের সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে—

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .

অর্থ : বারবার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি; কাজেই এমন কিবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো, যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাও। (সূরা বাকারা : ১৪৪)

১. ইসলাম ঐক্যকে উৎসাহিত করার নীতিতে বিশ্বাসী

মুসলমানরা যখন তাদের সালাত আদায় করতে চায়। তাহলে তাদের কেউ হয়তো উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করার ইচ্ছে করবে। আবার কেউ হয়তো দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে। সকল মুসলমানকে এক আল্লাহর ইবাদতে চূড়ান্তভাবে

ঐক্যবদ্ধ করার জন্য– তারা তাদের এক আল্লাহর ইবাদতে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে একই কা'বার দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেসব মুসলমান কা'বার পশ্চিম পাশে বাস করে তারা পূর্ব দিকে ফিরে এবং যারা কা'বার পূর্ব পাশে বাস করে তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে কা'বার দক্ষিণের লোকেরা উত্তর দিকে এবং কা'বার উত্তরের লোকেরা দক্ষিণ দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্য সৃষ্টি হবে।

২. বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে। তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দক্ষিণ দিক নির্দেশিত উপরের দিকে এবং উত্তর দিকে নির্দেশিত ছিল নিচের দিকে। কা'বা ছিল কেন্দ্রস্থল। অতঃপর পশ্চিমা মানচিত্র অঙ্কন করে উপরের দিককে নিচের দিকে এবং নিচের দিককে উপরেরর দিকে রেখে মানচিত্র অঙ্কন করে। অর্থাৎ তারা উত্তর দিককে উপরের দিকে নির্দেশ করে এবং দক্ষিণ দিককে নিচের দিকে নির্দেশ করে। আল-হামদুলিল্লাহ, তা সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

৩. কা'বাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশক

মুসলমানরা যখন কা'বা দর্শনে যায়, তখন তারা তাওয়াফ করে অর্থাৎ কা'বাকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এটা বিশ্বাসের প্রতীক এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতীক। যেহেতু প্রত্যেক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি। কাজেই ইবাদাতের যোগ্য সত্তা একমাত্র এক আল্লাহ এটা তারই নিদর্শন।

৪. ওমর (রা)-এর হাদীস

'হাজরে আসওয়াদ' তথা কালো পাথর সম্পর্কে ওমর (রা)-এর হাদীস রয়েছে, যাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আসার' তথা প্রথা-ঐতিহ্য বলা হয়। ওমর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্যতম।

সহীহ্ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড-এর হজ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫-এ উল্লিখিত আছে যে, ওমর (রা) বলেছেন, "আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না।

৫. মানুষ কা'বার উপরে উঠে 'আযান' দিতো

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মানুষ কা'বা ঘরের উপরে উঠে আযান দিতো অর্থাৎ সালাতের জন্য আহ্বান জানাতো। যারা অভিযোগ করেন যে, মুসলমানরা কা'বার পূজা করে তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কোনো মূর্তিপূজক এমন আছে যে, তার পূজ্য মূর্তির উপরে উঠে দাঁড়ায়।

১০. মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন ১০. পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : এটা অনস্বীকার্য যে, পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনায় অমুসলিমদের আইনগতভাবে প্রবেশাধিকার নেই। নিচের বিষয়গুলো এ নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য কারণগুলো উদঘাটনে সহায়তা করবে।

১. ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তথা সেনানিবাস অঞ্চলে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার নেই।

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। যেমন : সেনানিবাস। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নেই। কেবল সেসব নাগরিক যারা দেশের সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত অথবা যারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর দুটো হলো– ইসলামের সেনানিবাস এলাকা। এখানে প্রবেশাধিকার তাদেরই থাকা উচিত, যারা ইসলামে বিশ্বাস করে এবং যারা ইসলামকে সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মুসলমানদের।

একজন সাধারণ নাগরিকের সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশাধিকারে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা অযৌক্তিক। সুতরাং মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলমানের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করাও সঙ্গত নয়।

২. মক্কা-মদিনায় প্রবেশের ভিসা

ক. কোন লোক যদি নিজ দেশ থেকে বহির্দেশে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে সে দেশের ভিসা তথা সে দেশে প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য আবেদন জানাতে হয়। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের বেশ কিছু নিজস্ব বিধি-বিধান ও শর্তাবলি থাকে, যা পূরণ না হলে ভিসা দেয়া হয় না।

খ. ভিসার ব্যাপারে যেসব দেশ খুব কড়াকড়ি করে, তন্মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের নাগরিকের ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে এ কড়াকড়িটা অত্যন্ত বেশি। ভিসা ইস্যুর বেশ কিছু পূর্ব শর্ত তাদের রয়েছে, যা পূরণ সাপেক্ষে ভিসা ইস্যু করা হয়।

গ. আমাকে একবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যখন সিঙ্গাপুর পৌঁছি তখন দেখি যে, তাদের ইমিগ্রেশন ফরমে লেখা আছে যে, 'মাদক দ্রব্য বহনকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড' আমি যদি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে চাই, তাহলে আমাকে তাদের শর্তাবলি তথা আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাকে একথা বলার অধিকার নেই যে, মৃত্যুদণ্ড একটি বর্বর শাস্তি। আমি যদি তাদের চাহিদা ও শর্তাবলি পূরণ করতে পারি, তাহলেই আমি তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি।

ঘ. যে কোনো মানুষের মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের জন্য পূরণীয় প্রথম শর্ত হলো– তাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এটা হলো তার ভিসা পাওয়ার তথা প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত।

১১. শূকর-মাংসের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ১১. শূকরের মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর : এটা সবাই জানে যে, ইসলামে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ নিষিদ্ধতার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করবে

১. কুরআন মাজীদে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ

কুরআন মাজীদে কমপক্ষে চার জায়গায় শূকরের মাংস ভোগ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হলো : (২ : ১৭৩); (৫ : ৩); (৬ : ১৪৫); এবং (১৬ : ১১৫)। আরো বলা হয়েছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ -

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু...। (সূরা মায়েদা : ৩)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটিই শূকরের মাংস নিষিদ্ধতার কারণ হিসেবে একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

২. বাইবেলেও শূকর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে

একজন খ্রিস্টান এ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে যথাসম্ভব ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারে। বাইবেলের লেভিটিকাস' গ্রন্থে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে—

And the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you.

অর্থ : 'আর শূকর যদিও তার খুর দু'খণ্ডে বিভক্ত এবং খুর বিশিষ্ট পায়ের অধিকারী এবং খাদ্য চিবিয়ে খায় জাবর কাটে না, তবুও ওটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র)।'

of their flesh sholl ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you [leviticas 11 : 7-8]

অর্থ : 'এগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি কখনো স্পর্শ করবে না, এগুলো তোমার জন্য নোংরা অপবিত্র)।' (লেভিটিকাস ১১ : ৭ :৮)

বাইবেলের 'ডিউটারনমী' গ্রন্থেও শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

And the swine because it divided the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean to you, you shall not eat of their flesh, not touch their deed carcass.

অর্থ : 'আর শূকর কেননা তার খুর দ্বিখণ্ডিত, যদিও চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, এটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র) এগুলোর মাংস তুমি খাবে না, আর না এগুলোর মৃতদেহ স্পর্শ করবে।' (ডিউটারনমি ১৪ : ৮)

বাইবেলের 'ইয়াইয়াহ্' গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ নং শ্লোকে এ একই নিষিদ্ধতা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শূকরের মাংস খাওয়া বেশ কিছু রোগের কারণ

যথার্থ কারণ যুক্তি প্রমাণ ও বিজ্ঞানের মন্তব্য উপস্থাপনের দ্বারা অমুসলিম ও নাস্তিকরা একমত হতে পারে এবং মেনে নিতে পারে যে, একজন ব্যক্তির শূকরের মাংস খাওয়া দ্বারা অন্ততপক্ষে ৭০টি বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সে বিভিন্ন রকম কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন : গোলাকার কৃমি, সূঁচালো কৃমি, বক্র কৃমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কৃমি হলো টায়েনিয়া সোলিয়াম (Taenia Solium) বা ফিতা কৃমি, এটা পেটের ভেতরে অনেক লম্বা হয়ে যায়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এবং শরীরের প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি মস্তিষ্কে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তার স্মৃতিভ্রষ্টের কারণ ঘটে। যদি এটা হৃদযন্ত্রে ঢুকে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবে যদি এটা চোখে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। আর

লিভারে ঢুকে পড়লে লিভার পঁচে যেতে পারে। মোটকথা ফিতা কৃমির ডিম শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপর আছে ভয়ঙ্কর ত্রিচুরা টিচুরাসীস' (Trichura tichurasis)। শূকরের মাংস সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো– এটা যদি ভালো করে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ওভা বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২৪ জন উল্লিখিত রোগীর মধ্যে ২২ জনই শূকরের মাংস ভালোভাবে রান্না করে খেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিতা কৃমির এ ডিম বা 'ওভা' রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয় না।

৪. শূকর মাংসে চর্বি তৈরির প্রচুর উপাদান রয়েছে

শূকরের মাংসে মাংসপেশী তৈরির উপাদান অত্যন্ত কম, কিন্তু চর্বি তৈরির উপাদান অনেক বেশি। এ জাতীয় চর্বিই শিরা-উপশিরায় জমে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়। এটা আশ্চর্যের কিছুই না যে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনে ভোগে।

৫. শূকর পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা প্রাণী

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী হলো শূকর। এ প্রাণীটি নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও অত্যন্ত নোংরা জায়গায় বাস করে। আমার জানামতে আল্লাহ তাআলা এ প্রাণীটিকে উত্তম মেথর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক টয়লেট নেই এবং গ্রামীণ লোকেরা যেখানে খোলা আকাশের নিচে নিজেদের প্রয়োজন সারে, সেখানে শূকর-ই সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, উন্নত দেশগুলোতে আজকাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় শূকর প্রতিপালন করা হয়। এসব স্বাস্থ্যসম্মত খামারগুলোতেও শূকরগুলোকে গাদাগাদি করেই রাখা হয়। আপনি তাদেরকে যত পরিচ্ছন্নই রাখতে চান না কেন, এ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই নোংরা। এগুলো খুব আনন্দের সাথে নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা ও মলমূত্র চোখ নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে থাকে।

৬. শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী

শূকর হলো এ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য নির্লজ্জ প্রাণী। এটাই একমাত্র পশু যা তার স্ত্রীর সাথে সংগম করার জন্য অন্য সঙ্গীদের ডেকে আনে। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত। যার ফলে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে তারা অপরের সাথে স্ত্রী বদল করে নেয়। অর্থাৎ অনেকে বলে যে 'তুমি আমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাও আমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাই।'

আপনি যদি শূকেরর মাংস খেতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনার আচরণও শূকরের মতো হবে। আমরা ভারতীয়রা উন্নত ও রুচিবান হওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুসরণ করি। তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমরা তা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকি। আয়ল্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মর্ম অনুসারে বোম্বের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে স্ত্রী বদলের এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২ মদপানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ১২. ইসলামে মদপান ও এর ব্যবহার কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর : স্মরণাতীত কাল থেকেই মানবজাতির যন্ত্রণার কারণ হিসেবে অ্যালকোহল বা মদকেই দায়ী করা হয়ে আসছে। এটা অগণিত মানুষের দুর্দশার কারণ। অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্বজুড়ে আতঙ্কজনক দুর্দশার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আসছে। সমাজে অনেক সমস্যার মূল কারণ হলো মদপান। বিরাজমান পরিসংখ্যানগত দিক থেকে জঘন্য অপরাধের ক্রমবর্ধমান হারে মানসিক রোগীর সংখ্যা এতো প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ভগ্ন সংসার বিশ্বব্যাপী মদের ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ প্রমাণ বহন করছে।

১. কুরআন মাজীদে মদের নিষিদ্ধতা

আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মদের ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছো! মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্দেশক তীর–এসব নোংরা অপবিত্র শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা মায়েদা : ৯০)

২. বাইবেলে মদপানের নিষিদ্ধতা

বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে মদপানের নিষিদ্ধতা ঘোষিত হয়েছে–

a. Wine is a mocker, strong drink is raging and whosoever is deceived is not wirse.

অর্থ : 'মদ হলো প্রতারক, কঠিন পানীয়, যা মন্দ কাজের উদ্দীপক এবং যে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো, সে জ্ঞানীর পরিচয় দিল না।' (দাইবেল, নীতিবাক্য ২০ : ১)

b. And be not drink with wine. মদ্যপান করে মাতাল হয়োনা।' [এসিয়ান্স ৫ : ১৮]

৩. মদপান বিবেকের ভূমিকা পালনে বাধা দেয়

মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিবেচনা কেন্দ্র রয়েছে, যাকে আমরা বিবেক বলি। বিবেক মানুষকে এমন কাজ করতে বাধা দেয়, যে কাজকে সে মন্দ বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণত কোনো ব্যক্তি মাতা-পিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বোধন করার সময় অশালীন ভাষা ব্যবহার করে না। কারণ তার বিবেক তাকে এটা হতে বাধা দেয়। কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায় তার বিবেক তাকে জনসমক্ষে এ কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে, তাই সে টয়লেট তালাশ করে।

আর যখন কোন ব্যক্তি মদপান করে, তখন তার বিবেক স্বয়ং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মদপানকারীকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে যে দেখা যায়, তার মূল কারণ এটাই। এমনকি মাতাল ব্যক্তি যখন তার মাতাপিতার সাথে কথা বলে, তখনো সে তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করতে থাকে; সে তার ভুল বুঝতে পারে না। ভালো-মন্দ বিবেচনার শক্তি তার লোপ পেয়ে যায়। মাতাল হয়ে অনেকে নিজের পরিধানের পোশাকে পেসাব করে দেয়। মাতাল অবস্থায় সে ভালোভাবে কথা বলতে বা হাঁটতে পারে না। এমনকি তারা মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে।

৪. ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিষিদ্ধ মহিলাকে ধর্ষণ এবং এইডস্ ইত্যাদি মদ্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়

'আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জ্যাস্টিস' (US, Department of Justice)-এর জরিপ অনুসারে কেবল ১৯৯৬ সালে সেখানে গড়ে প্রতি দিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষক এ ঘটনার সময় মাতাল ছিল। নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রেও একই প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা আট ভাগ আমেরিকান তাদের নিষিদ্ধ আত্মীয়কে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনকি মা, বোন, কন্যাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না অর্থাৎ প্রতি ১২ কি ১৩ জনের মধ্যে একজন নিষিদ্ধ আত্মীয়কে ধর্ষণের সাথে জড়িত। এসব ঘটনার প্রায় সবই তাদের একজনের বা উভয়ের মদ পানের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ এইডস্ বিস্তারের প্রধান কারণ মদপান। সুতরাং মদপানই একটি মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

৫. প্রত্যেক মদপায়ী-ই প্রথম দিকে শখ করে মদপান করে থাকে

মদপানের পক্ষে অনেকেই যুক্তি দেখাতে চান এবং মদ্যপায়ীদেরকে সামাজিক পানকারী বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা বলতে চান যে, তারা কোনো পার্টিতে হয়তো এক চুমুক বা দু চুমুক পান করেন এবং তারা কখনো মাতাল হন না। তাদের নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা

যায় যে, প্রত্যেক মদপায়ীই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। একজন মদপায়ীও শুরু থেকে মাতাল হওয়ার জন্য মদপান শুরু করে নি। এমন একজন সৌখিন মদপায়ীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলতে পারে যে, আমি দীর্ঘদিন থেকেই দু-এক পেয়ালা করে মদপান করে এসেছি, কিন্তু আমি কখনো সীমা ছাড়াই নি এবং মাতাল হই নি।

৬. জীবনে কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে তা যন্ত্রণা দেবে

ধরা যাক একজন সৌখিন মদ্যপায়ী একবার মাত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তখন মাতাল অবস্থায় কোনো নারীকে ধর্ষণ করেছিল, অথবা কোনো নিষিদ্ধ আত্মীয়াকে ধর্ষণ করেছিল। এর জন্য তাকে যদি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে হয় এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে, তবুও একজন স্বাভাবিক মানুষকে এ লজ্জাকর ঘটনার দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। ধর্ষক এবং ধর্ষিতা উভয়কেই এ অপূরণীয় ও অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হয়।

৭. হাদীসে মদপানের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন—

ক. সুনানে ইবনে মাজার ভলিউম-৩ মাতলামি' ৩০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৩৬৭১।
অর্থ : 'মদই-হলো সকল মন্দের মা তথা মূল এবং এটা সবচেয়ে লজ্জাকর ও মন্দ।'

খ. উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩.৩৯২ নং হাদীসে আছে, 'মাদকতা উৎপাদন করে তার বেশি পরিমাণ যেমন নিষিদ্ধ, তার কম পরিমাণও নিষিদ্ধ।'
সুতরাং এক ঢোক বা এক ড্রাম কোনোটাই ক্ষমাযোগ্য নয়।

গ. শুধু মদ পানকারীর উপরই আল্লাহর লানত তথা অভিশাপ নয়; বরং যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করে, তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
অর্থ : দশ শ্রেণীর লোকের ওপর আল্লাহর অভিশাপ যারা মদের সাথে জড়িত। ১. যারা চোলাই করে, ২. যার জন্য মদ্দ চোলাই করা হয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার জন্য মদ বহন করে নেয়া হবে, ৬. যে মদ পরিবেশন করে, ৭. যে মদ বিক্রয় করে, ৮. যে মদ বিক্রিত টাকা ব্যবহার করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে এবং ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

৮. মদপানের সাথে যেসব রোগ জড়িত

মদপান নিষিদ্ধ করার পেছনে বেশকিছু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু মদপানের সাথে সম্পর্কিত। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদপানের কারণে অকালে ঝরে যায়। এ

ব্যাপারে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা, এর কুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবহিত। নিম্নে মদপান জনিত কারণে যেসব রোগ হয়, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো–

১. লিভার সিরোসীস, যাতে কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়।

২. বিভিন্ন ধরনের ক্ষতরোগ বা ক্যান্সার, অন্ননালীর ক্যান্সার, মস্তিষ্কে ক্ষতজনিত প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার (Hepatoma),মল-নালীর ক্যান্সার ইত্যাদি।

৩. অন্ননালী, কণ্ঠনালী, পাকস্থলির প্রদাহ, হজমি শক্তি কমে যাওয়া যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদি রোগ মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

৪. হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, হৃদকম্পন, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির সাথে মদপানের সম্পর্ক রয়েছে।

৫. হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন নালীর যাবতীয় রোগ যে জন্য হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফিট হয়ে যাওয়া ও গলনালীর প্রদাহ ইত্যাদিও অধিকাংশ মদপানজনিত কারণে হয়ে থাকে।

৬. বিভিন্ন প্রকার প্যারালাইসিসের অধিকাংশ মদপানের প্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

৭. মস্তিষ্কের যাবতীয় জটিল রোগ এবং স্নায়ুর যাবতীয় রোগ অধিকাংশই মদপানের কুফল।

৮. বেরিবেরি এবং শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদানের-শূন্যতাজনিত অনেক রোগই মদপানের ফলে হয়ে থাকে।

৯. যাবতীয় চর্মরোগ মদপানের ফলে হয়ে থাকে।

[মদপানের কারণে আরো যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, সেসব রোগের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। এছাড়া এসব রোগের নাম বাংলায় ভাষান্তর করতে হলে প্রত্যেক রোগের পরিচয় দিতে টীকা সংযোজন করতে হবে। যার ফলে বইয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে বিধায় এখানে সমাপ্ত করা হলো। — অনুবাদক]

১০. মাদকাসক্তি স্বয়ং একটি রোগ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানিগণ মদপানকে আর মাদকাসক্তি না বলে এটাকে স্বয়ং একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্প্রতি একটি প্রচারপত্রে উল্লেখ করেছে যে, মদ যদি একটি রোগই হয়ে থাকে, তবে এটাই একমাত্র রোগ যা—

১. বোতলের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

২. পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও ও টেলিভিশনে যার প্রচার করা হয়।

৩. যার প্রচার-প্রসারের জন্য শুল্ক নিয়ে লাইসেন্স পারমিট দেয়া হয়।

৪. যার মাধ্যমে সরকার রাজস্ব লাভ করে।

৫. যার মাধ্যমে রাজপথে মৃত্যুর আগমন হয়।

৬. যার কারণে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং অপরাধ বাড়ে।

৭. যার কোনো জীবাণু নেই অথবা আনুষঙ্গিক কারণ নেই।

মাদকাসক্তি কোনো রোগ নয়— এটা শয়তানের কারসাজি।

মহান আল্লাহ যিনি অনন্ত জ্ঞানের মালিক, তিনি শয়তানের এই লোভনীয় ফাঁদ থেকে আমাদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন। ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের জন্য স্বভাবসম্মত জীবন-ব্যবস্থা বলা হয়েছে। ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ মানব কল্যাণের লক্ষ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। যাতে করে মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থান সংরক্ষিত থাকে। মদপান হলো মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি একটি সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। মদপান মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। অথচ মানুষের দাবি হলো তারা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আর এজন্যই ইসলামে মদ পানকে হারাম তথা নিষিদ্ধ ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৩. নর-নারীর সাক্ষ্যের সমতা

প্রশ্ন ১৩. দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান –এটা সত্য নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য। আল-কুরআনের ন্যূনপক্ষে ৫টি আয়াতে নারী-পুরুষ কারো উল্লেখ ব্যতীত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। তার মধ্যে একটি মাত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন নারীর সাক্ষ্যের সমান। আর তা হলো সূরা আল-বাকারার ২৮২ নং আয়াত। এটা কুরআন মাজীদের দীর্ঘতম আয়াত। এতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۔ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۔ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ

اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۔ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۔ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ۔۔۔۔۔ ۔

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাকে লেখতে শিখিয়েছেন; সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর তাতে যেন বিন্দুমাত্র কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন অভিভাবক লেখার বিষয়বস্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলে দেয়। আর দু'জন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে তবে যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, তাদের একজন ভুল করলে অপরজন তা স্মরণ করে দেবে। (সূরা বাকারা : ২৮২)

কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি করার জন্য দু:পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দু'জন সাক্ষী রাখার নির্দেশও দান করা হয়েছে। এতে সাক্ষী দু' জন পুরুষ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু:জন নারী সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো লোক কোনো বিশেষ অসুবিধার জন্য অপারেশন করাতে ইচ্ছে করল। তার চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সে দু'জন অভিজ্ঞ সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কিন্তু কোনো কারণে সে যদি দু'জন সার্জন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন সে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ সার্জনের সাথে দু'জন সাধারণ এম. বি. বি. এস. ডাক্তারের পরামর্শ নেবে।

একইভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম আশা করে যে, নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করবে। যেহেতু অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক দক্ষ। এটাই আশা করা হয়ে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী হিসেবে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে নারীদের একজন যদি ভুল করে অন্যজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কুরআন

মাজীদে এক্ষেত্রে 'তাদিল্ল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তাল পাকিয়ে ফেলা বা ভুল করা। অনেকে এ শব্দের ভুল অর্থ করে যে, এর অর্থ ভুলে যাওয়া। সুতরাং একমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই একজন পুরুষের সাক্ষীকে দু'জন নারীর সাক্ষ্যের সমতুল্য করা হয়েছে।

যা হোক, ইসলামি আইনে কতেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও নারীসুলভ দুর্বলতা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। নারীরা তাদের আবেগপ্রবণতার জন্য হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সংশয়িত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞগণ হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান দু' জন নারী— রায় দিয়েছেন। এছাড়া অন্য সকল মামলায় একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। কুরআন মাজীদে পাঁচ স্থানে পুরুষ নারী-কোনটা উল্লেখ না করে সাক্ষ্যদানের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উইল প্রস্তুত কালে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা আবশ্যক। সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে—

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ...... ـ

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যু বিপদ, উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকেদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। (সূরা মায়েদা : ১০৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ـ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ـ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ ـ

অর্থ : আর যখন তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হয় তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে, এ দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। (সূরা তালাক : ২)

যৌন অপরাধের সাক্ষী সম্বন্ধে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

অর্থ : আর যারা কোনো সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই প্রকৃত ফাসিক। (সূরা নূর : ৪)

বেশ কিছু ইসলামি বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন স্ত্রী লোকের সমান এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য এ মতামত সকলে সমর্থন করেন না। কারণ কুরআন মাজীদের সূরা নূরের একটি আয়াতে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। যেমন বলা হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তখন সে আল্লাহর নামে চার বার কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর : ৬)

আয়েশা (রা)-এর মতে, একক সাক্ষী হাদীসের বিশুদ্ধতায় গ্রহণযোগ্য

ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ভেবে দেখুন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হল রোযা। সেই রোযার ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্য মুসলিম জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন সাক্ষী এবং রমযানের শেষে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের পুরুষ বা না নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য অগ্রগণ্য, সেক্ষেত্রে কোনো পুরুষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন সমস্যাটি মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন : কোনো মহিলার মৃতদেহের গোসল দেয়ার সাক্ষ্য একজন নারীর পক্ষেই দেয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে যে ইসলামে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে নয়; বরং তা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে।

১৪. উত্তরাধিকার আইন

প্রশ্ন ১৪. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা মিরাসের ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যথার্থ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মিরাসি সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

আল-কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. সূা আল-বাকারা, আয়াত ১৮০, ২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪০, ৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭—৯, ৪. সূরা নিসা, আয়াত ১৯, ৫. সূরা নিসা, আয়াত ৩৩, ৬. সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ১০৬—১০৮।

নিম্নোক্ত তিনটি আয়াতে আত্মীয়দের অংশ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ ـ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ـ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেন : এক পুত্রের অংশ দু' কন্যার সমান; তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দু' জনের অধিক তা হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ। আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেক পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু যদি তার ভাই বোন থাকে, তবে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ–এসবই মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা দেয়ার পরে ও ঋণ পরিশোধ করার পরে। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক

থেকে কারা তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জানোনা— এ ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা। (সূরা নিসা : ১২)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তবে যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে ওরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে—তোমরা যে অসিয়ত করবে, তা দেয়া ও ঋণ পরিশোধ বরার পরে, যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, এ অবস্থায় যে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা এক বৈপিত্রেয় তার কোনো উত্তরাধিকারী, তবে তারা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ; কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয়, তবে তারা তিনভাগের একভাগ সমান অংশীদার হবে তার অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধ করার পর। অসিয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, সহনশীল।(সূরা নিসা : ১২)

পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে—

يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ـ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ـ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তারা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়, আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন 'কালালা' (পিতৃমাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্পর্কে— যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় (তার পিতা-মাতাও না থাকে) এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি সে সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। তবে যদি কোনো দু'জন থাকে, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পারে। আর যদি ভাই-বোন কয়েকজন থাকে, তবে একপুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহ্ কার্য বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা নিসা : ১৭৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার বিপক্ষ পুরুষের তুলনায় মিরাসি সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে থাকে। তবে এটা সকল ক্ষেত্রেই নয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তান বিহীন হয়ে থাকে এবং তার মাত্র একটি বৈপিত্রেয় ভাই ও একটি বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে তারা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃতের পুত্র-কন্যা থাকে, তবে মাতা-পিতা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। মৃত ব্যক্তি যদি এমন নারী হয়ে থাকে যার পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন কেউ না থাকে, শুধু স্বামী ও মাতাপিতা থাকে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক সম্পত্তি, মা পাবে তিন ভাগের একভাগ ও বাবা পাবে ছয় ভাগের একভাগ। এক্ষেত্রে নারী তার পুরুষ প্রতিপক্ষ তথা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এটা সত্য যে, সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মিরাস পায়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত বিধানই কার্যকর।

ক. পুত্রসন্তান যা পায় কন্যা তার অর্ধেক পায়।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী পায় আট ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তি নারী হলে সন্তান না থাকা অবস্থায় স্বামী পায় চার ভাগের এক ভাগ।

গ. মৃতের সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী পায় দু ভাগের এক ভাগ।

ঘ. মৃতের যদি মাতা-পিতা ও সন্তান না থাকে, তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ইসলামে নারীর ওপর এমন কোনো অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়-দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর

দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের ওপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী এবং ছেলেদের ওপর। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়-দায়িত্ব পূরণে যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উত্তরাধিকারের অংশ দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে। যেমন : এক ব্যক্তি তার এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে মারা গেল এ অবস্থায় ছেলে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুত্রের ওপর ন্যস্ত।

অতএব দেখা গেল সেসব প্রয়োজন পূরণে তার প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে যায়। ধরা যাক, তার এক লক্ষ টাকার মধ্যে আশি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, তাহলে বাকি থাকল বিশ হাজার টাকা। ফলে দেখা গেল যে, ছেলে এক লক্ষ টাকা পেয়েও তার টিকল মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে মেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে কোনো খরচ না থাকাতে পঞ্চাশ হাজার টাকাই গচ্ছিত থেকে গেল। কেননা তার এ টাকা থেকে কারো জন্য একটি টাকাও ব্যয় করতে হলো না। এখন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, একদিকে এক লক্ষ টাকা যার আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে, আর অপরদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যার একটি পয়সাও খরচ হবে না। আপনি কোনটা নেবেন? তাহলে কোনো বোকাও এক লক্ষ টাকা নিতে চাইবে না।

১৫. আল কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা?

প্রশ্ন ১৫. আল কুরআন যে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কী?

উত্তর : ১. আল-কুরআন সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস

১৪০০ বছর আগে যখন আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখনই মুসলিম বিশ্বে হিদায়াতের আলো জ্বলে উঠেছিল। মুসলমানদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ এই যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতপার্থক্যও নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, আল-কুরআনই ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছে এবং এর হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ এ কিতাবকে সংরক্ষণ করবেন। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হিসেবে এ কিতাবের বিধানই প্রযোজ্য।

২. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্ব মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ

মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমতস্বরূপ।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। (আল আম্বিয়া : ১০৭)

মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল। তাই তাঁর বাণীও চিরস্থায়ী। অতএব তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়গুলো চিরস্থায়ী এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এগুলোর কার্যকারিতা থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত অনেক অলৌকিক বিষয় বা ঘটনা রয়েছে, যাতে মুসলমানরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৩. আল-কুরআন হলো শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

আল-কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ -কে চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। আল-কুরআন সর্বকালের জন্যই এক অনন্য মু'জিযা। তাই এটাকে 'মুজিযার মুজেযা' বলা যায়। আর এটা প্রমাণিত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

৪. কুরআনের উৎসের দিক থেকে তিনটি ধারণা ও তার পরীক্ষা

ক. মুহাম্মাদ ﷺ সচেতন, অর্ধসচেতন বা অবচেতন অবস্থায় নিজেই রচনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ﷺ কখনো এ দাবি করেন নি যে, আল-কুরআন তাঁর নিজের রচিত। তিনি সর্বদা এটাই বলেছেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। তাঁর একথা অবিশ্বাস করার অর্থ (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একটি মিথ্যাও বলেন নি। তাঁকে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে 'আল-আমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল। সমসাময়িক সকল মানুষ তাঁকে একজন সৎ, আমানতদার ও সৎচরিত্রের অধিকারী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বলেই জানতো। অথচ নবুয়াত লাভের পর একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। এ অবস্থায়ও তাদের সকল মূল্যবান অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছেই জমা রাখতো। অতএব এমন একজন মানুষ আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী— এ সম্বন্ধে মিথ্যা দাবি করতে পারেন না।

দুনিয়াবি স্বার্থে অনেক লোকই নিজেকে সাধক পুরুষ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা প্রচারক হিসেবে দাবি করে এবং বিপুল সম্পদ অর্জন করে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। যেমন– ভারতেও এরূপ লোকের সমাগম দেখা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়াত লাভের আগে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সচ্ছল ছিলেন। তিনি নবুয়াত লাভের ১৫ বছর আগে 'খাদীজা' নাম্নী এক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করেন।

অথচ নবুয়াত লাভের পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলে নি। কেননা তাঁর ঘরে রান্না করার মতো কিছু ছিল না। তাঁরা পানি ও খেজুর এবং মদিনাবাসীদের দেয়া দুধ খেয়ে জীবন-যাপন করতেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন চিত্র। বিলাল (রা) যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখনই কোনো দিক থেকে হাদীয়াস্বরূপ কিছু পেতেন, তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনো নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তাঁর এ জীবন চিত্র থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বস্তুগত স্বার্থে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না। অতএব আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর ওপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঘোষণা করেছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থ : সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ', যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পেতে পারে; কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও। (সূরা আল-বাকারা : ৭৯)

এ আয়াতে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে যারা নিজ স্বার্থে নিজে কিতাব রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়। অতএব আল-কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ নিজে রচনা করেন নি; বরং এটা আল্লাহর বাণী, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল করেছেন।

খ. মুহাম্মাদ ﷺ কোনো মানুষ থেকে বা কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে আল-কুরআন লাভ করেছেন?

আল-কুরআন সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা হলো মুহাম্মাদ ﷺ এটা অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন। অথবা এটা অন্য কোনো মানুষ থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি বিষয় বিবেচনা করলেই এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। পবিত্র কুরআনেও এর সাক্ষ্য রয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ

অর্থ : আর আপনিতো আগে আর কোনো কিতাব পাঠ করেননি, এবং নিজের ডান হাত দিয়ে কোনো কিতাব লিখেননি, যাতে অসত্যপন্থীরা কিছু মাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারে। (সূরা আনকাবূত : ৪৮)

অতএব এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-কুরআন অন্য কোনো উৎস তথা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো মানব উৎস থেকে সংগ্রহ করেন নি, বরং এটা আল্লাহর বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন ওহীর মাধ্যমে।

আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : 'আলিফ, লাম, মীম' এ কিতাব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা কি বলে যে, এটাতো সে নিজে রচনা করে নিয়েছে? বরং এটাতো আপনার রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। যেন আপনি এমন লোকদের সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা সৎপথ পেয়ে যাবে। (সূরা সাজ্দা : ১-৩)

গ. আল-কুরআন মানব রচিত নয়— এটা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী : আল-কুরআনের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় এবং সঠিক ধারণা হলো এটা কোনো মানুষ রচনা করেনি; বরং এটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

[কুরআন মাজীদ যে, আল্লাহর বাণী সে সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর সে আলোচনা Is the Quran Gods Words নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় যা 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থটি পড়ে নেয়া যেতে পারে। — অনুবাদক।]

১৬. আখিরাত–তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন ১৬. আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী কোন জীবন আছে? তার প্রমাণ কী?

উত্তর : ১. মৃত্যুর পরে জীবন আছে তা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়

অনেক মানুষ আশ্চর্য বোধ করে যে, এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে একজন সচেতন মানুষ কিভাবে মৃত্যুর পরে আর একটি জীবন আছে'— একথা বিশ্বাস করতে পারে? আখিরাতে অবিশ্বাসীরা মনে করে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যই অন্ধভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে। তবে আমার আখিরাতে বিশ্বাস যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত— অন্ধবিশ্বাস নয়।

২. আখিরাত একটি যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস

আল-কুরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। (এ বিষয়ে আমার রচিত 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ' দ্রষ্টব্য) কুরআনে বর্ণিত অনেক সত্যই গত কয়েক শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হতে পারে নি যে, কুরআনে বর্ণিত সব বিষয়ই সত্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

ধরা যাক, কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ ১০০% সত্য বলে প্রমাণিত। বাকি ২০ ভাগ সম্পর্কে বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য নেই। কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় নি যাতে যেসব বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়। অতএব সেই ২০ ভাগ-এর একটি আয়াত সম্পর্কেও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা তা মিথ্যা একথা বলতে পারিনা। সুতরাং কুরআনের শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে সত্য বলে প্রমাণিত এবং বাকি ২০ ভাগ এখনো অপ্রমাণিত, সেখানে যুক্তি বলে যে, সেই ২০ ভাগও সত্য হবে। আখিরাত তথা পরকালের অস্তিত্বও সেই ২০ ভাগের অন্তর্গত একটি সত্য, যা যুক্তির নিরিখে সত্য বলেই প্রমাণিত হবে।

৩. শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধসমূহের ধারণা পরকালের ধারণা ছাড়া অর্থহীন

ডাকাতি করা ভালো কাজ না মন্দ কাজ? এ প্রশ্নের জবাব একজন সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ মানুষও বলবে যে, এটা মন্দ কাজ। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তেমন এক ব্যক্তি একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে 'ডাকাত বা সন্ত্রাস' একথা কেমন করে বোঝাতে সক্ষম হবে?

মনে করুন, আমি বিশ্বের মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। একই সাথে আমি বুদ্ধিমান ও যুক্তিতে বিশ্বাসী একজন মানুষও বটে। আমি বলি যে, ডাকাতি একটি ভালো কাজ। কারণ এটা আমাকে বিলাসী জীবন-যাপনে সাহায্য করে। সুতরাং ডাকাতি আমার জন্য ভাল কাজ।

ডাকাতি আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে কেউ যদি আমার সামনে একটি যুক্তিও পেশ করতে পারে, আমি তা হলে ডাকাতি সাথে সাথে ছেড়ে দেবো। মানুষ সাধারণত যেসব যুক্তি পেশ করে থাকে, সেগুলো হলো—

ক. যার সম্পদ ডাকাতি হয়ে গেছে সে সমস্যার সম্মুখীন হবে

কেউ হয়ত যুক্তি দেবে যে, যার ডাকাতি হয়ে গেছে, সে খুব অসুবিধায় পড়বে। এ ব্যাপারে আমিও তার সাথে একমত যে, সে লোকটি অসুবিধায় পড়বে; কিন্তু এটা আমার জন্য ভালো। আমি ৫ হাজার ডলার অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতির মাধ্যমে অর্জন করে নিতে পারি, তাহলে আমি একটি পাঁচতারা হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেতে পারবো।

খ. তুমিও ডাকাতির শিকার হতে পার

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তুমিও অন্য কোনো ডাকাতের ডাকাতির শিকার হতে পারো। আমি বলবো, কেউ আমাকে তার ডাকাতির শিকার বানাতে পারে না। কারণ আমি অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। শত শত দেহরক্ষী আমাকে সার্বক্ষণিক ঘেরাও করে রাখে। আমি যে কোনো মানুষকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারি। কিন্তু কোনো ডাকাত আমাকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারে না। ডাকাতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

গ. পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে

কেউ হয়তো বলবে যে, তুমি যদি ডাকাতি কর, তাহলে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। আমি বলবো যে, পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে না। কারণ আমি পুলিশকে রীতিমত চাঁদা দিয়ে থাকি। আমি এতে একমত যে, একজন সাধারণ মানুষ ডাকাতি করলে সে শীঘ্রই পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একজন অত্যন্ত অসাধারণ শক্তিশালী অপরাধী। এটা আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে কেউ আমাকে যুক্তিপূর্ণ একটি কারণ দেখাতে পারলেও তাৎক্ষণিক আমি এটা ছেড়ে দিব।

ঘ. এটা সহজে পাওয়া টাকা

কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, এটা সহজে পাওয়া টাকা। এটা শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত নয়। আমি বলবো যে, আমার ডাকাতি করার আসল কারণতো এটাই। কোনো মানুষের সামনে টাকা উপার্জনের যদি দুটো পথ থাকে—একটি সহজ পথ, অপরটি কঠিন পথ। তবে সে যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, সে সহজ পথটিই বেছে নেবে।

ঙ. এ কাজ মানবতা বিরোধী

এ যুক্তিও কেউ দেখাতে পারে যে, এটা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য তৎপরতা। মানুষকে অপর মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি পাল্টা যুক্তি খাড়া করাবো যে, 'মানবতার' এ বিধান কে রচনা করেছে? তার বিধান আমি মানবো কেন?

এ আইন তাদের জন্য ভালো হতে পারে, যারা আবেগপ্রবণ ও দুর্বলচিত্ত লোক। কিন্তু আমি একজন যৌক্তিক ও শক্তিশালী ব্যক্তি, অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মধ্যে আমার কোনো কল্যাণ দেখি না।

চ. এটা একটা স্বার্থপর কাজ

কেউ কেউ এটাকে একটা স্বার্থপর কাজ বলতে পারে। আমি বলবো— এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটা একটা স্বার্থপর কাজ; কিন্তু আমি স্বার্থপর কেন হবো না? এটাইতো জীবনটাকে উপভোগ করতে আমাকে সাহায্য করে। ডাকাতির কাজটা মন্দ হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

অতঃপর ডাকাতির কাজটাকে মন্দ বলে প্রমাণ করার পক্ষে উপস্থাপিত সকল যুক্তি-প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে গেল। এসব যুক্তি-প্রমাণ একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন যথেষ্ট শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোনো যুক্তিই কেবল কার্যকর ও বির্তকের বলিষ্ঠতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পৃথিবী জুড়ে অনেক অপরাধী বিরাজমান।

একইভাবে আমার মতো লোকের জন্য নারী ধর্ষণ ও প্রতারণা প্রভৃতি কাজ খুব ভালো এবং এ কাজগুলো মন্দ হওয়ার পক্ষে এমন কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, যা উক্ত কাজগুলোকে মন্দ বলে আমাকে বোঝাতে সক্ষম।

২. একজন মুসলিম শক্তিমান ও প্রভাবশালী একজন অপরাধীকেও বোঝাতে সক্ষম

এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধরুন আপনি বিশ্বখ্যাত একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। আপনি পুলিশ এমনকি মন্ত্রীকে পয়সা দিয়ে

কিনে রেখেছেন। আপনার নিরাপত্তার জন্য রয়েছে একটা বিশাল অনুগত বাহিনী। আমি একজন মুসলিম। আমি আপনাকে বোঝাতে চাই যে, ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত মন্দ। এখন আমি যদি উপরিক্ত যুক্তিগুলো আপনার সামনে পেশ করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তা আপনি আগের মতোই উত্তর দেবেন যেমনটা আপনি ইতিপূর্বে দিয়েছেন। আমি আপনার সাথে একমত যে, আপনি যদি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী হন, তবে আপনার যুক্তিগুলো যথার্থ সত্য।

৩. প্রত্যেকটি মানুষ সুবিচার চায়

মানুষ যদি অন্যের জন্যে সুবিচার না-ও চায় তবুও সে নিজের জন্য তা কামনা করে। কতেক লোক শক্তি ও প্রভাবের কারণে অবশ্যই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদের দুঃখ কষ্টের কারণে পরিণত হয়। এ লোকেরাই আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে, যখন তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয়। কারণ এ ধরনের মানুষরা অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীন হয়ে থাকার কারণে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পূজা করে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সহায়তায় তারা অন্যের ওপর অবিচার করতে সুযোগ পাচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, ববং অন্যরা যেন তাদের প্রতি একই অন্যায় আচরণ দেখাতে না পারে, তা-ও তারা প্রতিরোধ করছে।

৪. 'আল্লাহ' সবচেয়ে শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক

একজন মুসলিম হিসেবে আমি অপরাধীকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে, আল্লাহ তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিমান এবং সাথে সাথে তিনি ন্যায়বিচারকও বটে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ কখনো বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। (সূরা নিসা : ৪০)

৫. আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

অপরাধী, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনা হবার কারণে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে তার সামনে পেশ করার পর সে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একমত। এখন সে যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আল্লাহ যদি শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক হয়ে থাকবেন, তাহলে তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

৬. যারা অন্যায়-অবিচার করে, তাদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক

আর্থিক বা সামাজিকভাবে যুলুমের শিকার প্রতিটি ব্যক্তিই চায় যে,যালিমের শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা, ডাকাত, প্রতারক ও ধর্ষকের উচিত শিক্ষা হোক। অসংখ্য অপরাধী যদিও ধরা পড়ছে, তাদের মধ্যে কারো কারো শাস্তি হচ্ছে, কিন্তু আরো অনেক অপরাধী মুক্ত রয়েছে এবং তারা মানুষকে নির্যাতন

করেই যাচ্ছে। যখন কোনো শক্তিশালী বা প্রভাবশালী কারোর ওপর তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী কারও দ্বারা অত্যাচার-অবিচার হয়, তখন এ অপরাধী লোকটিও তার ওপর যুলুমকারী অপরাধীর শাস্তি দাবি করে।

৭. এ জীবন পরকালীন জীবনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ

পরকালীন স্থায়ী জীবনে সফলতার সাথে প্রবেশের জন্য ইহকালীন জীবন একটি পরীক্ষা- স্বরূপ। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কর্মের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি তো অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা মূল্‌ক্ : ২)

৮. শেষ বিচার দিনেই চূড়ান্ত ফয়সালা

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ

অর্থ : প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর তোমাদেরকে (তোমাদের কাজের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিন দিয়ে দেয়া হবে, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার বেহেস্ত এবং খারাপ কাজের প্রতিদান জাহান্নাম। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে, সে-ই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করলো। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

শেষ বিচার দিনেই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। কোনো ব্যক্তি যখন মরে যাবে তাকে পুনরায় শেষ বিচার দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সকল মানুষের সাথে। কোনো অপরাধী দুনিয়ার জীবনে তার অপকর্মের কিছু শাস্তি পেয়েও যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত শাস্তি বা পুরস্কার তাকে দেয়া হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তথা আখিরাতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো ডাকাত বা ধর্ষককে এ দুনিয়াতে শাস্তি না-ও দিতে পারেন; কিন্তু শেষ বিচারের দিনে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে এবং তাকে সেখানে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৯. হিটলারকে মানবরচিত আইন কী শাস্তি দেবে?

হিটলার তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমকালে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে পুড়িয়ে মেরেছে। পুলিশ যদি তখন তাকে আটক করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানব রচিত আইন ন্যায়বিচার করে তাকে কি শাস্তি দিতে পারতো? বড়জোর তাকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এতে হয়তো একজন ইহুদিকে হত্যার প্রতিবিধান হতো, কিন্তু বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন ইহুদিকে হত্যার বিচার করা সম্ভব হতো কীভাবে?

১০. আখিরাতে হিটলারকে জাহান্নামে ফেলে ৬০ লক্ষ বারের চেয়ে বেশি বারে জ্বালানো একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۔ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

অর্থ : নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আগুনে জ্বালাবো; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখনই আমি তাদের চামড়া পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী। (সূরা নিসা : ৫৬)

আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি আখিরাতে হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার জাহান্নামে পুড়ে মরার স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন।

১১. আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মানবিক মূল্যবোধ ও ভালো-মন্দের ধারণার কোনো দাম নেই

এখন প্রমাণিত হলো যে, কোনো ব্যক্তিকে আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থাশীল করা ছাড়া তার মানবিক মূল্যবোধ ও কুফল সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করা অর্থহীন, বিশেষ করে সে যদি হয় একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও শক্তিশালী অত্যাচারী ব্যক্তি।

১৭ দলে-উপদলে মুসলমানদের বিভক্তি প্রথা তাদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য

প্রশ্ন ১৭. সকল মুসলমান যখন একই আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন মেনে চলে, তাহলে তাদের মধ্যে এত উপদল কেন? তাদের চিন্তা-চেতনায় এতো পার্থক্য কেন?

উত্তর : ১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।

এটা সত্য যে আজকের মুসলমানরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ বিভক্তি ইসলামে মোটেই অনুমোদিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের নিরেট ঐক্যে বিশ্বাসী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ : তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আল্লাহর সেই রুজ্জুটি কি যাকে আঁকড়ে ধরার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনই হলো আল্লাহর সেই রুজ্জু বা রশি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত। আয়াতে দ্বিগুণ জোর দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে–

'ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো।' আবার বলা হয়েছে 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে–

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থ : তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (সূরা নিসা : ৫৯)

অতএব মুসলমানদের আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করা উচিত এবং পরস্পর মতপার্থক্য করা উচিত নয়।

২. ইসলামে দলাদলী ও বিভক্তি নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করতো। (সূরা আন্‌আম : ১৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু যখন একজন মুসলিম প্রশ্ন করে বসে, আপনি কে? তখন আমাদের একটি সাধারণ উত্তর হলো, 'আমি একজন সুন্নী' অথবা' আমি একজন শিয়া' অনেকে তাদের নিজেদেরকে' হানাফী' অথবা' শাফেয়ী' অথবা 'মালেকী' অথবা 'হাম্বলী' বলে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে বলে, 'আমি একজন দেওবন্দি' আর কেউ কেউ বলে 'আমি একজন বেরলভী'।

৩. আমাদের নবী ছিলেন একজন মুসলিম মাত্র

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'আমাদের প্রিয়নবী ﷺ কি ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন না-কি 'শাফেয়ী' না-কি 'মালেকী না-কি 'হাম্বলী'-এর উত্তর হলো— 'না, তিনি পূর্বে আগত নবী-রাসূলদের মতোই একজন মুসলিম ছিলেন। আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۖ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ـ

অর্থ : ঈসা (আ) ও তাঁর অনুসারীরা মুসলিম ছিলেন। উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান কোনটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম।

আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ـ

৪. আল-কুরআন নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে বলে

নবী করিম ﷺ অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময় চিঠি লিখে ছিলেন। সেসব চিঠিতে তিনি সূরা হাম-মিম-আসসাজদাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছিলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ـ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ـ

অর্থ : আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকাজ করে। আর বলে, আমিতো একজন 'মুসলিম' তথা আত্মসমর্পণকারী। (আল-কুরআন ৪১ : ৩৩)

৫. ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান

আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান আলেমদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছে চার ইমাম : যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম মালিক (র.)।

আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরষ্কার দান করুন। সর্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে?' এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে যে, আমি একজন মুসলিম।

কেউ কেউ সুনানে আবু দাউদের ৪৫৭৯ নং হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিভক্তির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।'

হাদীসটির মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি একথা বলেন নি যে, তাঁতে উম্মতকে ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদ আমাদেরকে দল-উপদল সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মেনে চলে এবং দল-উপদল সৃষ্টি করে না, তারাই সঠিক সত্য পথে আছে।

তিরমিযীর ১৭১ নং হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এবং একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামে যাবে।' সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'সেই দলটি হবে যার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবো।'

কুরআন মাজীদের বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের'। একজন খাঁটি মুসলমানের উচিত হলো আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং তাঁতে রাসূলের সহীহ হাদীসসমূহের নির্দেশ মেনে চলা। সে যে কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞের মত অনুসরণ করতে পারে, যদি সে বিশেষজ্ঞ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী

হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাঁর মত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার মতের কোনো মূল্যই নেই— এতে সে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন।

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে পড়ে এবং সেই মূলনীতি অনুসারে রাসূলের হাদীসকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠবো।

১৮. সকল ধর্মই মানুষকে সত্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন?

প্রশ্ন ১৮. মৌলিকভাবে সব ধর্মই তার অনুসারীদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে একজন লোককে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করে চলতে হবে কেন? সে কি অন্য কোনো ধর্ম মেনে চলতে পারে না?

উত্তর : ১. ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

সব ধর্মই মানুষকে মন্দ থেকে বেঁচে থেকে সৎপথে চলার পরামর্শ দেয়। তবে ইসলামে এর বাইরে কিছু রয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায় ও সত্যকে পাওয়ার জন্য এবং মন্দকে দূর করার জন্য আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সামষ্টিক জীবনে ব্যবহারিক পন্থা অনুসরণ করার দিক-নির্দেশনা দেয়। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও তার সমাজের জটিলতাকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম হলো স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশ। সুতরাং ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা' বলা হয়।

২. উদাহরণ— যেমন ইসলাম আমাদের ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করতে নির্দেশ দেয়, সাথে সাথে ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করার পদ্ধতিও বাতলে দেয়।

ক. ইসলাম ডাকাতি ও রাহাজানি নির্মূল করার পদ্ধতি বাতলে দেয়

সব কটি প্রধান ধর্মই চুরি ও ডাকাতিকে একটি মন্দ কাজ বলেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সত্যি বলতে কি ইসলাম 'চুরি-ডাকাতি একটি মন্দ কাজ' এ শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে এমন একটি সমাজ গড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়, যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতি করবে না।

খ. ইসলাম যাকাতের বিধান দেয়

ইসলাম যাকাতের বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশ দান করে। এটি বাধ্যতামূলক বার্ষিক একটি দান বিশেষ। ইসলামি আইনের বিধান হলো– এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ 'নিসাব' পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা ৫২·৫ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে, তাকে প্রতি চান্দ্র বছরে বাধ্যতামূলকভাবে তার সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ বিধান অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি ধনী লোক যথাযথভাবে হিসেব করে যাকাত দেয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য নির্মূল হয়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে একটি মানুষও অনাহারে মারা যাবে না।

গ. চুরি-ডাকাতির শাস্তির বিধান হলো হাত কেটে দেয়া

ইসলাম চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য চোর-ডাকাতের হাত কেটে দেয়ার বিধান পেশ করে। কুরআন মাজীদের সূরা আল-মায়েদায় আল্লাহ বলেন—

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ : আর তোমরা চোর বা চুরনীর হাত কেটে দাও, তারা যা করেছে তার শাস্তি এটাই। তাদের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে : আর আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ। (সূরা মায়েদা : ৩৮)

অমুসলিমরা বলতে পারে যে, 'এ বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা– ইসলাম একটি বর্বর ও নিষ্ঠুর ধর্ম।'

ঘ. ইসলামি শরীআহ্ আইন বাস্তবায়িত হলেই এর সুফল পাওয়া যাবে

ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত একটি রাষ্ট্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক হারে অপরাধ সংঘটিত হয় চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে। মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামি শরীআহ আইন জারি করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত (সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের উপরে চন্দ্র বার্ষিক বাধ্যতামূলক দান) দেয় এবং প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বা মহিলার হাত কেটে দেয়া হয়, তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এখন বলুন, অতঃপর আমেরিকাতে চুরি-ডাকাতি বাড়বে না-কি একই থাকবে অথবা কমে যাবে? স্বভাবত এটা কমে যাবে। এ ধরনের কঠিন আইন জারি থাকলে অনেক স্বভাবগত অপরাধী নিজেকে ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। ফলে ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় চোরও নিজেকে সংশোধন করে নেবে এবং চুরি ও ডাকাতি নির্মুল হয়ে যাবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিশ্বে চোর-ডাকাতের যে বিশাল সংখ্যা রয়েছে তাতে যদি তাদের হাত কাটা হয় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কাটা। তবে ব্যাপারটা হলো– যখনই হাত কাটার বিধান জারি হবে, তার পর মুহূর্ত থেকেই চুরি-ডাকাতির সংখ্যা কমে যাবে। পেশাধারী চোরও এ পথে পা বাড়াবার আগে একবার পরিণতির কথা ভেবে দেখবে যে, ধরা পড়লে তার পরিণতি কেমন হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই অধিকাংশ চোর-ডাকাতের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর নিতান্ত দুর্ভাগা ছাড়া এ পেশায় কেউ টিকে থাকবে না। অতএব একান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের হাত-ই শুধু কাটা যাবে। ফলে কোটি কোটি লোক চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে নিরাপত্তা পেয়ে শান্তিতে বাস করবে। আর চুরি-ডাকতি বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক চোরের হাত-ই কাটা যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে। অতএব ইসলামি আইন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ।

৩. উদাহরণ

ইসলাম উৎপীড়ন ও ধর্ষণের মত জঘন্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছে। 'হিজাব' বা পর্দাকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং প্রমাণিত ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু দণ্ডের বিধান দিয়েছে –

ক. নারী উৎপীড়ন ও ধর্ষণ নির্মূল করার পদ্ধতি দিয়েছে ইসলাম

সব কটি প্রধান ধর্মই নারী-উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো– ইসলাম নারীদের মর্যাদা রক্ষার উপদেশ দিয়েই এবং নারীদেরকে উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকে নি; বরং সমাজ থেকে এ জঘন্য অপরাধ যাতে নির্মূল হয়ে যায় তার পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

খ. পুরুষের জন্য পর্দা

ইসলামে রয়েছে পর্দার বিধান। ইসলাম প্রথমে পুরুষের জন্য পর্দার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর ঘোষণা করেছে নারীর পর্দার কথা। নিম্নোক্ত আয়াতে পুরুষের পর্দার কথা ঘোষিত হয়েছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (আল-কুরআন ২৪ : ৩০)

পুরুষের দৃষ্টি নারীর প্রতি পড়লে যদি তার মনে কোনো অশ্লীল ও লজ্জাকর চিন্তা এসে যায়, তাই তাৎক্ষণিক তার দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া উচিত।

গ. নারীর জন্য পর্দা

এ আয়াতে নারীর পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে —

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ ..... ـ

অর্থ : হে নবী! আর আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর তারা যেন সাধারণভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে; আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে এদের ছাড়া– তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র...। (আল-কুরআন ২৪ : ৩১)

নারীর জন্য বর্ধিত 'হিজাব' তথা পর্দা হলো তার পুরো শরীর (ঢিলে ঢালা) পোশাক দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে, কেবল মুখমণ্ডল কব্জী পর্যন্ত দু'হাত খোলা থাকবে। তবে তারা যদি চায় তা-ও ঢেকে নিতে পারে। ইসলামি আইনের কতেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মুখমণ্ডল ঢাকার ওপর জোর দিয়েছেন।

ঘ. 'হিজাব' নারীকে উৎপীড়ন থেকে বাঁচায়

আল্লাহ্ তাআলা নারীর জন্য পর্দার বিধান কেন দিয়েছেন– তার মূল কারণ সূরা আহ্যাবের নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন —

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না; আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে যে, নারীর জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তাদেরকে উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

ঙ. যমজ দু'বোনের উদাহরণ

ধরা যাক, দু বোন যমজ এবং তারা উভয়েই সুন্দরী; তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামি 'হিজাব' বা পর্দাবৃতা অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা। অন যমজ বোনটি মিনিস্কার্ট বা সর্টস (সংক্ষিপ্ত পোশাক) পরিহিতা। রাস্তার মোড়ে এক বখাটে যুবক, যে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। বলুন তো, বখাটে যুবকটি কোন্ মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামি 'হিজাব' ঢাকা তাকে, না-কি যে মেয়েটি মিনি স্কার্ট বা সর্টস্ পরা তাকে? পোশাক-ই তা প্রকাশ করে, যা তারা গোপন করতে চায় এবং এর দ্বারাই বিপরীত লিঙ্গকে উত্যক্ত করা ও ধর্ষণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ সঠিক বলেছে যে, পর্দা নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

চ. ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি

ইসলামি শরীআহ প্রমাণিত ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আধুনিক যুগে এ ধরনের কঠোর শাস্তির কথা শুনে অমুসলিমরা ভীত হয়ে পড়তে পারে। অনেকে ইসলামকে নিষ্ঠুর বর্বতার দোষে দোষারোপ করতে পারে। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষকে একটি প্রশ্ন করেছি। ধরা যাক, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, কোনো নরাধম আপনার স্ত্রী, মাতা বা কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট, ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন? প্রশ্নকৃত সবাই বলেছে যে, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কিছু লোকতো এমন বলেছে যে, 'আমরা তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো।' এখন প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার স্ত্রী, মাতা বা কন্যার ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু অপর কারো স্ত্রী, মাতা বা কন্যার ধর্ষকের জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে আপনি বর্বরতা বলে বেড়াবেন– এমন দ্বিমুখী ভূমিকা কেন?

ছ. আমেরিকায় ধর্ষণের রেকর্ড সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ১৯৯০ সালের একটি এফ. বি. আই-এর ফেডারেল ব্যুরো অব ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সে দেশে উক্ত বছরে ১,০২,৫৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ধর্ষণের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য নথিভুক্ত সংখ্যাকে ৬. ২৫ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৬,৪০, ৯৬৮। এটা হলো আমেরিকায় ১৯৯০ সালে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। মোট সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই ১,৭৫৬ যা সেই দেশে দৈনিক গড়ে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা।

পরবর্তী অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে, ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিসটিক্স (ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)-এর পরিসংখ্যান অনুসারে শুধু ১৯৯৬ সালেই ৩,০৭,০০০ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১% ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। বাকি ঘটনায় অভিযোগ না করে নিরব থাকা হয়। অতএব ৩.০৭০০০× ৩.২২৬ = ৯.৯০,৩২২টি ধর্ষণের ঘটনা ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে সংঘটিত হয়েছে। তাহলে ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯,৯০,৩২২ ÷ ৩৬৫ = ২,৭১৩টি। উক্ত বছরে প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত আমেরিকান ধর্ষকেরা ক্রমান্বয়ে হিংস্র হয়ে উঠছে। এফ.বি.আই-এর ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, নথিভুক্ত ঘটনায় ১০% ধর্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনার মোট সংখ্যার মাত্র ১.৬% ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের ৫০% অপরাধী বিচার কর্ম শুরু হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। এতে করে গ্রেফতারকৃতদের কেবল ০.৮% অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়।

অন্য কথায় যদি কোনো অপরাধী যদি ১২৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাহলে তার সাজা পাবার আশঙ্কা মাত্র একটি ঘটনায়। অনেক ধর্ষক এটাকে একটা নিশ্চিন্ত বাজি ও জুয়ার মতো ধরে নিতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, যেসব অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়, তাদের ৫০% এর শাস্তি হয় এক বছরেরও কম সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার বিচারকরা প্রথমবার ধর্ষকের প্রতি নমনীয় রায় দেন। চিন্তা করে দেখুন, কোনো ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের পর মাত্র একবার সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং ৫০% ধর্ষকের প্রতি বিচারকরা নমনীয় রায় দেন অর্থাৎ ১ বছরের কম সময়ের কারাদণ্ড দেন।

জ. ইসলামি শরীআহ আইন জারি হলে এর সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে

মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামি আইন জারি হয়েছে। কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোনো নারীর প্রতি পড়লে সে তার মনে কোনো কুচিন্তা আসার আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। নারীরা ইসলামি 'হিজাব'-এর বিধান মেনে চলছে অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে চলাফেরা করছে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাকে চরম শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কোনো মতেই ধর্ষণের অপরাধ বাড়তে তো পারেই না; এমনকি স্থিরও থাকতে পারে না; বরং এ অপরাধ কমতে বাধ্য।

৪. ইসলাম মানবীয় সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান দেয়

ইসলাম মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। কারণ এর বিধানসমূহ কেবল তত্ত্বগত বুলি নয়; বরং তা হচ্ছে মানব সন্তানদের এক বাস্তবমুখী কল্যাণধর্মী বিধান। ইসলামের বিধানসমূহ যেমন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও এ বিধানসমূহ অনন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা, কারণ এটা সবচেয়ে বাস্তবমুখী, বিশ্বজনীন ব্যবস্থা, যা বিশেষ কোনো জাতি-গোষ্ঠির জন্য নির্ধারিত নয়।

১৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অনুশীলনের মধ্যে অনেক পার্থক্য

প্রশ্ন ১৯. ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত অসৎ, অবিশ্বস্ত, অনির্ভর যোগ্য লোক কেন? আর কেনই বা তারা প্রতারণা, ভ্রান্ত ও আসক্তি ইত্যাদি অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত?

উত্তর : ১. প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচার

ক. ইসলাম নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; তবে প্রচার মাধ্যমগুলো পাশ্চাত্য বাসীদের হাতে। যারা ইসলামকে ভয় পায়। এসব প্রচার মাধ্যম অনবরত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুল তথ্যাবলি প্রচার করে যাচ্ছে। ছেপে চলছে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যাবলি। অথবা তারা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্যে পরিণত করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা বিস্ফোরিত হলে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পশ্চিমারা সর্বপ্রথম সেটাকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রচারণা শুরু করে দেয়। পত্র-পত্রিকায় এটাকেই ব্যানার হেডিং করে ছেপে দেয়। পরবর্তীতে যদি প্রমাণিত হয় যে, এ বিস্ফোরণের জন্য কোনো অমুসলিম দায়ী, তখন এটাকে গুরুত্বহীনভাবে পরিত্যাগ করে।

গ. ৫০ বছর বয়স্ক কোনো মুসলমান যদি ১৫ বছর বয়সের কোনো মেয়েকে তার সম্মতিতেই বিয়ে করে, তখন এটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার মতো একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আর ৫০ বছর বয়স্ক কোনো অমুসলিম যদি ৬ বছরের কোনো বালিকাকে ধর্ষণ করে, তখন এটা পত্রিকার ভেতরের পাতায় সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ-এর কলামে ছাপা হয়। আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে; কিন্তু এসব ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। যেহেতু এসব ঘটনাইতো আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ।

২. লঙ্কায়ও ভিখেরি আছে

আমি ভালো করেই জানি যে, কতেক মুসলমান অসৎ, অনির্ভরযোগ্য যারা প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো এটাকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে, শুধু মুসলমানরাই এসব অপকর্মের সাথে জড়িত। প্রত্যেক সমাজেই অসৎ লোক আছে এবং থাকবে। আমি জানি, মুসলিম সমাজেও মদ্যপায়ী লোক আছে ও থাকবে। কিন্তু যারা মদ্যপায়ী এবং তৎসঙ্গে অন্য অনেক অপকর্মের সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই অমুসলিম।

৩. সামগ্রিকভাবে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ

মুসলিম সমাজে কিছু কিছু অসৎ লোকের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এবং মুসলিম সমাজ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সামগ্রিকভাবে আমরাই মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত সর্ববৃহৎ সমাজ। আমরাই সামাজিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দান-দক্ষিণা করে থাকি। নৈতিকতা, সংযম, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে এখনও মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫. গাড়ির চালক দিয়ে গাড়ির বিচার করবেন না

আপনি যদি কোনো গাড়ি সম্পর্কে তা কতটুকু ভালো বা মন্দ, তা জানতে চান, তাহলে ড্রাইভিং সিটে এমন একজন এক্সপার্ট ড্রাইভারকে বসাতে হবে যে গাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান রাখেন। একইভাবে ইসলামকে জানতে হবে তার সঠিক বাস্তবায়নকারী ও যথার্থ অনুসারী আল্লাহ্ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ থেকে। বিশ্বের মুসলিম মনীষিগণ ছাড়াও অমুসলিম নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ রয়েছেন, যারা পক্ষপাতহীনভাবে দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ. হার্ট যিনি'The Hurdred most Influential men in History'(মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশত ব্যক্তি) নামক বইয়ের রচয়িতা। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রিয় নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তালিকার প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া থমাস কার্লাইল ও লা-মার্টিন এবং আরো অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ বিচারে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন।

২০. অমুসলিমদের 'কাফির' বলা

প্রশ্ন ২০. মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করে কেন?

উত্তর : ১. 'কাফির' অর্থ অস্বীকারকারী

'কাফির' শব্দটি' কুফর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'গোপন করা' অস্বীকার করা বা প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামের পরিভাষায় 'কাফির' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ইসলামের সত্যকে গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজিতে যাকে আমরা 'নন-মুসলিম' বলে থাকি।

২. অমুসলিমরা এতে মনোকষ্ট পেলে তাদের উচিত ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়া

কোনো 'অমুসলিম' যদি 'কাফির' তথা 'নন-মুসলিম' শব্দটিকে 'গালি' মনে করে তবে তার উচিত ইসলাম গ্রহণ করে 'মুসলিম' জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। আর তখনই কেবল আমরা তাকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবো। নচেৎ যতদিন সে ইসলামের বাইরে থাকবে, ততদিন তাকে 'কাফির' তথা 'অমুসলিম' বলা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সুসংগত না অসংগত

THE QURAN & MODERN SCIENCE COMPATIBLE OR INCOMPATIBLE

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কুদ্দূস

বি.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এম. (অল ফাস্ট ক্লাশ এ্যান্ড স্কলারস)

বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস. (অর্থনীতি) ঢা. বি.

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

এ গ্রহে মানুষ প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন থেকেই সে সর্বদা প্রকৃতি, সৃষ্টি পরিক্রমায় তার অবস্থান এবং তার জীবনের একান্ত উদ্দেশ্যকে বুঝতে চেষ্টা করছে। সত্য অনুসন্ধানের এ পরিক্রমায় বহু শতাব্দী এবং ইতিহাস গতিপথকে বহুলাংশে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এরই ধারবাহিকতায় এসেছে বিভিন্ন ধর্ম। এসব ধর্মের মধ্যে কতিপয় ধর্ম বইভিত্তিক। আর এসব বইকে ঐসব ধর্মের অনুসারীরা ঐশী প্রত্যাদেশ বলে দাবি করেন। এছাড়া অন্য ধর্মগুলো মানবীয় অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে।

ইসলামি আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান উৎস হচ্ছে আল-কোরআন, মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, এটি সম্পূর্ণভাবে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। মুসলমানরা আরও বিশ্বাস করেন যে, এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক। যেহেতু কোরআনের বাণীকে সকল যুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য বলে বিশ্বাস করা হয়, সেহেতু এটি সকল যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোরআন কি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ? এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে আমি কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে, ঐশী উৎসের ভিত্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দিতে চাই।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একদা এমন সময় ছিল, যখন 'অলৌকিকতা' বা যা অলৌকিক হিসেবে বিবেচিত হত, তা মানবীয় ধারণা ও যুক্তির ওপর প্রাধান্য পেত। কিন্তু আমরা 'অলৌকিকতা' শব্দটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? 'অলৌকিকতা'র সাধারণ সংজ্ঞা হল, এটি এমন বিষয় যা জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহের বাইরে সংঘটিত হয় এবং সেজন্য মানুষের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা থাকে না। যাহোক, কোন কিছুকে 'অলৌকিক' হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত 'The Times of India'-এর ১৯৯৩ সালের একটি নিবন্ধে বলা হয়েছিল যে, 'বাবা পাইলট' নামে একজন সাধু একটানা তিন দিন তিন রাত ট্যাংকের ভেতরে পানির নিচে থাকার দাবি করে।

কিন্তু সংবাদিকরা যখন ঐ ট্যাংকটির তলদেশ পরীক্ষা করতে চাইল, যেখানে অবস্থান করে সে অলৌকিকত্ব দাবি করেছিল, সে তা তাদেরকে পরীক্ষা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যুক্তি দেখিয়েছে যে, যেই মা সন্তান প্রসব করে তার পেট পরীক্ষা করা যায় কীভাবে? ঐ 'বাবা' কোন কিছুকে

লুকিয়েছিল? এটা ছিল নিজেকে জনপ্রিয় করার জন্য এক ধরনের প্রতারণা। সামান্যতম যৌক্তিক বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন কোন আধুনিক ব্যক্তি এ ধরনের অলৌকিকতাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে না। এ ধরনের মিথ্যা অলৌকিকতা যদি ঐশী পরীক্ষা হয় তাহলে অতি সাধারণ যাদুকরী কৌশল ও মিথ্যাচারের রূপকার বিখ্যাত যাদুকর মিঃ পি. সি. সরকারকে সবচেয়ে আল্লাহভক্ত মানুষ হিসেবে আমাদের মানা উচিত নয় কি?

যদি কোন বইকে ঐশী বই বলে দাবি করা হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা অলৌকিক বলেও দাবি করা যাবে। এ জাতীয় দাবি যে কোন যুগে সহজভাবে পরীক্ষাযোগ্য হওয়া উচিত। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত গ্রন্থ, যা সকল অলৌকিকতার অলৌকিকতা। সুতরাং আমাদের এ বিশ্বাসের নির্ভুলতা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

১. কোরআনের চ্যালেঞ্জ

সকল সংস্কৃতিতে, সাহিত্য ও কবিতা মানুষের ভাবাবেগ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্ব এমন একটি যুগ অবলোকন করেছে যখন সাহিত্য ও কবিতা গর্বের মর্যাদা লাভ করেছিল, যেমন বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্জন করেছে।

মুসলমানরা তো বটেই এমনকি অমুসলিমরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, কোরআন হচ্ছে চমৎকার এক আরবি সাহিত্য– ভূপৃষ্ঠে এটা সর্বোৎকৃষ্ট আরবি সাহিত্য। আল্লাহর নিকট থেকে কোরআন মানবজাতিকে নিম্নোক্ত আয়াতে অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাহায্যকরীদেরও সাথে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার– অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। (সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

এখানে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত সূরাগুলোর ন্যায় যেকোন একটি সূরা (অধ্যায়) রচনা করার জন্য কোরআন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সৌন্দর্য, বাচনভঙ্গি, গভীরতা এবং মর্মার্থের দিক বিবেচনায়, কোরআনের সূরার সমপর্যায়ের হওয়ার মত অন্য একটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ অদ্যাবধি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে।

সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যিক ভাষায় পৃথিবীকে চ্যাপ্টা হিসেবে যে ধর্মগ্রন্থ বর্ণনা করে, তা বর্তমান যুগের আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কখনই গ্রহণ করবে না। কারণ, আমরা এমন এক যুগে বাস করি, যেখানে মানবিক কারণ, যুক্তি এবং বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কোরআনের অভূতপূর্ব চমৎকার ও সাবলীল ভাষার জন্য অনেকেই এটাকে আল্লাহর গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে চাইবে না। আল্লাহর গ্রন্থ হবার দাবিদার কোন গ্রন্থকে অবশ্যই তার নিজস্ব কারণ এবং যুক্তির ওপর গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' সুতরাং আমাদেরকে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যে, কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান কি সুসঙ্গত না অসঙ্গত?

কোরআন বিজ্ঞানের কোন বই নয় বরং এটি হচ্ছে নিদর্শনের বই, যেমন : আয়াত (যার অর্থ হচ্ছে- নিদর্শন) কোরআনে ছয় হাজারেরও বেশি নিদর্শন বা আয়াত রয়েছে– যার মধ্যে থেকে এক হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করেছে।

আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞান অধিকাংশ সময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এ বইতে আমি শুধু প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আলোচনা করেছি, যা কল্পনা বা ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা কোন তত্ত্ব বা কল্পনা নয় এবং যা প্রমাণিত হয় নি এমন কোন বিষয়ও নয়।

২. জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিশ্বের সৃষ্টি : বিগ ব্যাঙ (মহা বিস্ফোরণ)

বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়, যা 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্ব হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে নভোচারী এবং জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। 'বিগ ব্যাঙ' (মহা বিস্ফোরণ) তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব প্রাথমিক অবস্থায় একটি বিশাল নীহারিকা আকারে ছিল। এরপর সেখানে একটা মহা বিস্ফোরণ ঘটে (দ্বিতীয় পর্যায়ের বিচ্ছিন্নতা) ফলে ছায়াপর্ব তৈরি হয়।

পরবর্তীতে এগুলো তারকা, গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। বিশ্বের উৎপত্তি ছিল এক অনন্য ঘটনা এবং দৈবক্রমে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা শূন্য পর্যায়ে বা আদৌ নেই।

পবিত্র কোরআন মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নের আয়াতে বলেছে,

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا .

অর্থ : কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল। (সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে) অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

কোরআনের এ আয়াত এবং 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্যতা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। ১৪০০ বছর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া একটি গ্রন্থ কিভাবে এমন গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারণ করতে পারে?

ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে প্রাথমিক গ্যাস পিণ্ড

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মহাবিশ্বে ছায়াপথ গঠিত হওয়ার পূর্বে, আকাশ সম্পকীয় পদার্থগুলো প্রাথমিকভাবে গ্যাস জাতীয় পদার্থের আকারে ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ছায়াপথ তৈরির পূর্বে বিপুল পরিমাণ গ্যাস জাতীয় পদার্থ কিংবা মেঘ বিদ্যমান ছিল। আকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক পদার্থকে বর্ণনা করতে 'ধোঁয়া' শব্দটি গ্যাসের চেয়ে অধিকতর যথার্থ। কোরআনের নিচের আয়াতে ব্যবহৃত 'দুখা-ন' শব্দটি দ্বারা বিশ্বের এ অবস্থাটিকে বুঝায় যার অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া।

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا . قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ .

অর্থ : অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, এরপর তিনি তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, স্বেচ্ছায় আসলাম। (সূরা ফুচ্ছিলাত : ১১)

তাছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, 'বিগ ব্যাঙ'-এর স্বাভাবিক ফল হল এ ঘটনা এবং নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বে আরবের কারো কাছে এটি পরিচিত ছিল না। তাহলে, এ জ্ঞানের উৎস কি ছিল?

পৃথিবী গোলাকার

আদিকালে মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীর আকার হচ্ছে চ্যাপ্টা বা স্ফীত। শত শত বছর ধরে মানুষ পৃথিবীর কিনারা থেকে ছিটকে পড়ে যাবার ভয়ে বেশি দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করত না। ১৫৯৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ডেইকই প্রথম পৃথিবীর চারপাশে নৌভ্রমণের পর প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

দিবারাত্রির বিবর্তন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতটিকে বিবেচনা করা যাক–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ ـ

অর্থ : আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? (সূরা লোকমান - ২৯)

এখানে বলা হচ্ছে, রাত ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ দিনে রূপান্তরিত হয়, অনুরূপভাবে দিনও ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ রাতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনা কেবল পৃথিবী গোলাকার হলেই ঘটতে পারে। যদি পৃথিবী চ্যাপ্টা হত, তাহলে রাত্রি থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাত্রিতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যেত।

নিচের আয়াতটিও পৃথিবীর গোল আকৃতির ইঙ্গিত দেয়–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ ...... ـ

'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।' (সূরা যুমার : ৫)

এ আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হচ্ছে (يُكَوِّرُ) যার অর্থ 'আচ্ছাদিত করা' বা কোন জিনিসকে প্যাঁচানো'– যেভাবে মাথার চতুর্দিকে পাগড়ি প্যাঁচানো হয়। দিন ও রাতের 'আচ্ছাদিত করা' বা কুণ্ডলী পাকানো বিষয়টি শুধু তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী গোলাকার হয়।

পৃথিবী বলের মত পুরোপুরি গোলাকার নয় বরং ভূ-গোলকের মত। উদাহরণস্বরূপ এটি মেরুদণ্ডের ন্যায় চ্যাপ্টা। নিচের আয়াতে পৃথিবীর আকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ

অর্থ : আর আল্লাহ পৃথিবীকে উহার পর ডিম্বাকৃতি করে তৈরি করেছেন। (সূরা আন-নাযি'আত : ৩০)

এখানে ডিমের জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দ হচ্ছে (دَحَاهَا) (দাহাহা), যার অর্থ হচ্ছে একটি উট পাখির ডিম। একটি উট পাখির ডিমের আকৃতি হচ্ছে পৃথিবীর ভূ-গোলকীয় আকৃতির ন্যায়।

এভাবেই কোরআন পৃথিবীর আকৃতি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছে, যদিও কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ে পৃথিবী চ্যাপ্টা হবার ধারণাটাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো

পূর্বেকার সভ্যতাগুলো বিশ্বাস করতো যে, চাঁদ তার নিজস্ব আলো দেয় কিন্তু বিজ্ঞান এখন আমাদেরকে বলছে যে, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। যাহোক, কোরআন ১৪০০ বছর পূর্বে নিচের আয়াতের মাধ্যমে এ সত্যটি বলে দিয়েছিল–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ : কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলের রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (সূরা ফুরকান-৬১)

কোরআনে সূর্যকে বুঝাতে (শামস) شَمْسٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার سِرَاجٌ (সিরাজ– শব্দটি দ্বারাও সূর্যকে বুঝানো হয়ে থাকে, যার অর্থ হলো বাতি বা মশাল। অন্যত্র সূর্যকে বুঝাতে سِرَاجًا وَّهَّاجًا উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, 'প্রজ্বলিত বাতি'। আবার অন্য জায়গায়, একই অর্থ বুঝানোর জন্য ضِيَاءٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচেচ্ছ 'উজ্জ্বল জ্যোতি'। তিনটি বর্ণনার সবই সূর্যের জন্য উপযোগী। কারণ, সূর্য নিজ দহনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচণ্ড তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। চাঁদের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে قَمَرٌ কোরআন চাঁদকে বুঝাতে مُنِيْرٌ শব্দটি উল্লেখ করেছে, যার অর্থ হল' স্নিগ্ধ আলোদানকারী।' তাছাড়া চাঁদ হচ্ছে একটি নিষ্ক্রিয় জিনিস, যা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে, চাঁদের এ প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের সাথে কোরআনের বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। কোরআনে একটি বারের জন্যও চাঁদকে سِرَاجٌ (সিরাজ) وَّهَّاجًا (ওয়াহহাজ) বা ضِيَاءٌ (দিয়া) হিসেবে এবং সূর্যকে نُوْرٌ (নূর) বা مُنِيْرٌ (মুনীর) হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআন সূর্যের আলো এবং চন্দ্রের আলোর পার্থক্যকে স্বীকার করে।

নিচের আয়াতগুলো সূর্য এবং চাঁদের আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন। যেমন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا ـ

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চাঁদকে স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত করেছেন। (সূরা ইউনুস : ৫)

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ـ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

অর্থ : তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চাঁদকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? (সূরা নূহ : ১৫-১৬)

সূর্য আবর্তিত হয়

দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে এবং সূর্যসহ অন্য গ্রহগুলো এর চতুর্দিকে আবর্তন করছে। পাশ্চাত্যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগ থেকে মহাবিশ্বের এ ভূকেন্দ্রিক ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সত্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপারনিকাস তার 'সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহসংক্রান্ত গতিতত্ত্ব' দেন, যাতে বলা হয়- সূর্য তার চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর কেন্দ্রে গতিহীন।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ইউহান্নাস কেপলার 'Astronamia Nova' নামক বইটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, গ্রহগুলো শুধু সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথেই পরিভ্রমণ করে না, বরং সেগুলো নিজ নিজ অক্ষের ওপর অসম গতিতে আবর্তিত হয়। এ জ্ঞানের ফলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে দিন ও রাতের আবর্তনসহ সৌরজগতের বহু বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

এসব আবিষ্কারের পরেও বিশ্বাস করা হতো যে, সূর্য স্থির এবং পৃথিবীর মত স্বীয় অক্ষের ওপর আবর্তিত হয় না। আমি স্কুলে থাকাকালীন ভূগোলে এ ভুল ধারণাটি জেনেছি বলে মনে পড়ে।

পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতখানার প্রতি তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়-

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : তিনিই সৃষ্টি করেছেন, রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই স্বীয় কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

উপরে উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ হচ্ছে يَسْبَحُوْنَ (ইয়াছবাহুন)। শব্দটি سَبَحَا (সাবাহা) শব্দ থেকে এসেছে। এ শব্দটি যেকোন প্রবাহমান বস্তু থেকে উদ্ভূত গতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটিকে যদি আপনি মাটির ওপরে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তাহলে এর অর্থ এটা নয় যে, সে গড়াগড়ি দিচ্ছে বরং এর অর্থ হবে, সে হাঁটছে বা দৌড়াচ্ছে। আবার শব্দটিকে যদি আপনি পানিতে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেন, তখন এর অর্থ হবে না যে, সে ভাসছে বরং এর অর্থ হবে, সে সাঁতার কাটছে।

একইভাবে, আপনি যদি يَسْبَحُوْنَ (ইয়াছবাহুন) শব্দটি আকাশ সম্পর্কিত কোন জিনিস, যেমন- সূর্য সম্পর্কে ব্যবহার করেন, তাহলে এটা শুধু মহাশূন্যের মধ্যদিয়ে

উড়াকেই বুঝাবে না, বরং এটি মহাশূন্যে আবর্তিত হয়– এমন অর্থকেও বুঝাবে। অধিকাংশ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এ সত্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, সূর্য তার নিজের কক্ষপথে আবর্তন করে। সূর্যের নিজ কক্ষে আবর্তনকে বুঝার জন্য টেবিলের ওপরে সূর্যের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা যেতে পারে না। আর কেউ বিচার বুদ্ধিহীন না হলে সূর্যের প্রতিকৃতিটি পরীক্ষা করতে পারে। দেখা গেছে যে, সূর্যের নিজস্ব অবস্থানস্থল আছে যা প্রতি ২৫ দিনে একটি বৃত্তাকার গতি আবর্তন করে, অর্থাৎ স্বীয় কক্ষপথে আবর্তন করতে সূর্যের প্রায় ২৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ২৪০ কিলোমিটার গতিতে মহাশূন্যের মধ্যদিয়ে ভ্রমণ করে এবং আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর লাগে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী নিম্নরূপ–

لَا الشَّمْسُ يَنۢبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۔

অর্থ : সূর্য নাগাল পেতে পারে না চাঁদের এবং রাত আগে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসিন : ৪১)

এ আয়াতটি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র কর্তৃক আবিষ্কৃত কতিপয় বৈজ্ঞানিক সত্যকে উল্লেখ করেছে; যেমন– চাঁদ ও সূর্যের স্বতন্ত্র কক্ষপথের অস্তিত্ব এবং এগুলোর নিজস্ব গতিতে মহাশূন্যে ভ্রমণ।

সৌরজগৎকে নিয়ে সূর্য যে নির্দিষ্ট স্থানকে লক্ষ্য করে চলছে সে স্থানটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা যথার্থভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ জায়গাটির নাম দেয়া হয়েছে– 'সৌর শৃঙ্গ'। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগৎ মহাশূন্যে যে দিকে ধাবিত হয়, সে দিকটির অবস্থান বর্তমানে যথার্থ ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর সেটি হল বৃহদাকারের এক গ্রুপ তারকা (Alpha lyrae)।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ে তা নিজ কক্ষপথে একবার আবর্তন করে। একবার পরিপূর্ণভাবে ঘুরে আসতে তার ২৯½ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়।

কোরআনের আয়াতসমূহের বৈজ্ঞানিক নির্ভুল তথ্যে কেউ আশ্চর্য না হয়ে পারে না। আমাদের কি এ প্রশ্নটির ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত নয় যে, 'কোরআনের জ্ঞানের উৎস কি ছিল?'

নির্দিষ্ট সময় পরে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে

গত ৫ বিলিয়ন বছর ধরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূর্যের পৃষ্ঠে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। অনাগতকালের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে এর সমাপ্তি ঘটবে যখন সূর্য পৃথিবীর সকল প্রাণীর অস্তিত্বের বিলুপ্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সূর্যের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে কোরআন বলে–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا . ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

অর্থ : সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন : ৩৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ .

অর্থ : তিনি রাতকে দিবস দ্বারা এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার : ৫)

এখানে ব্যবহৃত আরবি হচ্ছে مُسْتَقَرٌّ (মুসতাকার) : যার অর্থ, 'একটি নির্দিষ্ট স্থান' বা 'একটি নির্দিষ্ট সময়'। এভাবে কোরআন বলছে যে, সূর্য একটি নির্ধারিত স্থানের দিকে আবর্তন করছে যা চলতে থাকবে পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। এর মর্মার্থ হল, একদিন সূর্যের অবসান ঘটবে। এ বিষয়টি অন্য আরেক জায়গায় আল্লাহ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন–

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

অর্থ : যখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। (সূরা তাকভীর : ১)

মহাশূন্যে বস্তুর অস্তিত্ব

প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতির সুসংগঠিত ধারার বাইরের স্থানকে শূন্য মনে করা হত। পরবর্তীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ আন্তর্জাতিক মহাশূন্যে বস্তুর সেতু আবিষ্কার করেন। বস্তুর এ সেতুগুলোকে প্লাজমা বলা হয়, যা সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নবিশিষ্ট সম্পূর্ণ আয়নিত গ্যাস দ্বারা তৈরি। অধিকাংশ সময়ে প্লাজমাকে বস্তুর চতুর্থ অবস্থা বলা হয় (অন্য পরিচিত তিনটি অবস্থা হল–

কঠিন, তরল এবং গ্যাসী)। কোরআন নিচের আয়াতে মহাশূন্যে এ বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে বলেছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে অবস্থিত সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ফোরকান : ৫৯)

তারপরও যদি কেউ বলে যে, মহাশূন্যে ছায়াপথবর্তী বস্তুর উপস্থিতি ১৪০০ বছর পূর্বে জানা গিয়েছিল, তাহলে তা সবার জন্য হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছুই হবে না।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ১৯২৫ সালে পর্যবেক্ষণমূলক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, সকল ছায়াপথ একে অপর থেকে অপসৃত হচ্ছে– যা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআনও ঐ একই কথা বলেছে–

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ

অর্থ : আমি স্বহস্তে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমিই এর সম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত : ৪৭)

আরবি শব্দ مُوْصِعُوْنَ (মুছিউন)-এর যথার্থ অনুবাদ হল, 'সম্প্রসারণকারী' এবং এটা মহাবিশ্বের ব্যাপক সম্প্রসারণশীলতার দিকেই ইঙ্গিত করে।

স্টিফেন হকিং তাঁর 'A Brief History of Time' (সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে– এ আবিষ্কারটি বিংশ শতাব্দীর মহান বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের অন্যতম।' কিন্তু কোরআন এমন সময় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলেছে, যখন মানুষ সামান্য টেলিফোনও আবিষ্কার করতে পারে নি।

কেউ বলতে পারে যে, যেহেতু আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর ছিল, সেহেতু কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সত্যের উপস্থিতি আশ্চর্যের বিষয় নয়। জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের অগ্রসরতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা সঠিক। তথাপি তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের অগ্রসরতার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

তাছাড়া আরবরা তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও 'বিগ ব্যাঙ'-এর কারণে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ছাড়াও ওপরে উল্লিখিত অনেক বৈজ্ঞানিক

সত্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রগতির কারণে কোরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহতে আরবদের কোন অবদান ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বিপরীতটাই সত্য। আর তা হল, কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানালোচনা বিদ্যমান রয়েছে বলেই আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতি অর্জন করেছিল।

৩. পদার্থবিজ্ঞান

অতি পারমাণবিক কণিকার অস্তিত্ব

প্রাচীন যুগে 'পরমাণুবাদ' নামে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। ২৩ শতাব্দীকাল পূর্বে, গ্রিকরা বিশেষত ডিমোক্রিটাস নামে এক গ্রিক দার্শনিক কর্তৃক এ তত্ত্বটি প্রস্তাবিত হয়েছিল। ডিমোক্রিটাস এবং তার পরবর্তী লোকেরা মনে করত যে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরমাণু। আরবরাও একই রকম বিশ্বাস করত। আরবি শব্দ ذَرَّةٌ (জাররাহ)-এর অতিসাধারণ অর্থ হচ্ছে পরমাণু। অতিসম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, পরমাণুকেও বিভক্ত করা যায়। পরমাণুকেও যে বিভক্ত করা যায় তা বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। এমনকি আরবদের কারও ১৪ শতাব্দীকাল পূর্বে এ বিষয়টি জানা ছিল না। কারণ, ذَرَّةٌ (জাররাহ) ছিল একটি সীমা যা কেউ অতিক্রম করতে পারত না। তথাপি কোরআনের নিচের আয়াতটি ذَرَّةٌ শব্দের এ সীমা স্বীকার করে না–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ـ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ـ عٰلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرُ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থ : কাফিরগণ বলে, কিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। হে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলুন, না, আমার রবের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী, তাঁর থেকে আসমান ও যমীনে লুক্কায়িত নেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু; না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড়। সবই আছে (লওহে মাহফুজ নামক) এক সুস্পষ্ট কিতাবে।' (সূরা সাবা : ৩)

এ আয়াতে মহান আল্লাহর সর্বজ্ঞান, তার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুর জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করে। তারপর এটি বলে যে, আল্লাহ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর সবকিছুর ব্যাপারেই সচেতন। এভাবে এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যে সত্যটি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

৪. ভূগোল

পানিচক্র

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে বার্নার্ড পলিসি সর্বপ্রথম পানিচক্রের বর্তমান ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাগর থেকে পানির বাষ্পাকারে উড়ে যাওয়া এবং পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেন। মেঘমালা সাগর থেকে দূরবর্তী ভূ-খণ্ডের ওপর ঘনীভূত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃষ্টি আকারে নিচে পতিত হয়। এ বৃষ্টির পানি খাল-বিল ও নদ-নদীতে জড়ো হয় এবং অব্যাহত নিয়মে পুনরায় সাগরে ফিরে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মিলেটুসের থেলেস এ মতবাদ পোষণ করতেন যে, সমুদ্রের উপরিভাগের ছিটানো পানি কণাকে বাতাস ধারণ করে ওপরে তুলে নেয় এবং সমুদ্র দূরবর্তী স্থানে নিয়ে তা বৃষ্টি আকারে বর্ষণ করে।

আদিকালের লোকেরা ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে জানত না। তারা ভাবত যে, বাতাসের তাড়নায় সাগরের পানি সজোরে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে এসে পতিত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, গোপন পথে কিংবা গভীর জলরাশি থেকে পানি পুনরায় ফিরে আসে যা সাগরের সাথে জড়িত। এটিকে প্লেটোর যুগে 'টারটারুস' বলা হত। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ডিসকার্টিজও এই একই মত পোষণ করতেন। উনবিংশ শতাব্দিতে এরিস্টোটলের তত্ত্ব সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। এ তত্ত্ব অনুসারে, পাহাড়ের ঠাণ্ডা গভীর গুহায় পানি ঘনীভূত হয় এবং মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত হ্রদ ঝর্ণাগুলোকে পানি সরবরাহ করে। বর্তমানে, আমরা জানি যে, বৃষ্টির পানি মাটির ফাটল দিয়ে ভেতরে চুইয়ে পড়ার কারণে ঐ পানি পাওয়া যায়।

নিচের আয়াতসমূহের মাধ্যমে পানিচক্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ـ

অর্থ : তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। (সূরা যুমার : ২১)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ـ

অর্থ : তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা মৃত্যুর পর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা রূম : ২৪)

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ـ

অর্থ : আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত, তারপর তাকে যমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। (সূরা মুমিনুন : ১৮)

১৪০০ বছর পূর্বে এমন অন্য কোন বই ছিল না যা পানিচক্রের এমন নির্ভুল বর্ণনা দেয়।

বাতাস মেঘকে পূর্ণ করে

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ـ

অর্থ : আমি বৃষ্টিগর্ভ বাতাস পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর তোমাদেরকে তা পান করাই। (সূরা হিজর : ২২)

এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দটিও হচ্ছে لَوَاقِحٌ (লাওয়াক্বিহ) যা لَقِحَ (নাকিহ) শব্দের বহুবচন এবং এর উৎপত্তি لَقِحَ (লাক্বাহ) শব্দ থেকে যার অর্থ পূর্ণ করা, গর্ভবতী করা বা উর্বর করা। এখানে পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে যে, বাতাস মেঘমালাকে একসাথে ধাক্কা দিয়ে ঘনীভূত করে। যার ফলে আকাশে বিজলী চমকায় এবং বৃষ্টি শুরু হয়। কোরআনে এ একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়–

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ـ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (সূরা রূম : ৪৮)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ -

অর্থ : তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। তারপর তুমি দেখ যে, তার মধ্যে থেকে বারিধারা নির্গত হয় তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তিকে যেন বিলীন করে দিতে চায়। (সূরা নূর : ৪৩)

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ : তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহি বাতাস প্রেরণ করেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পাঠিয়ে দিই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরা আ'রাফ : ৫৭)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ -

অর্থ : শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি। (সূরা ত্বারিক : ১১)

পানিবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বের সাথে কোরআনের বর্ণনাগুলো নিশ্চিতভাবে নির্ভুল এবং যথার্থভাবে একমত। মহিমান্বিত কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে পানিচক্রের বর্ণনা রয়েছে। যেমন–

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ـ

অর্থ : তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফিত ফেনারাশি ওপরে নিয়ে আসে এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, এইভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। (সূরা রা'দ : ১৭)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ـ لِّنُحْيِ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّ نُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ـ

অর্থ : তিনিই রহমতের সময়ে বাতাসকে সুসংবাদবাহিরূপে প্রেরণ করেন। আর আকাশ থেকে আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, তা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। (সূরা ফুরকান : ৪৮-৪৯)

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ـ

অর্থ : আর আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর সে বায়ু মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর আমি উহাকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। এরপর উহা দ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। একইভাবে হবে পুনরুত্থান। (সূরা ফাতির : ৯)

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ـ

অর্থ : উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ ....। (সূরা ইয়াসীন : ৩৪)

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এরপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন উহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা জাসিয়া : ৫)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ـ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ـ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ـ

অর্থ : আমি কল্যাণময় পানি বর্ষণ করি এবং উহার দ্বারা বাগান ও শস্য উৎপন্ন করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় এবং দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত্যু ভূ-খণ্ডকে জীবিত করি। আর এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে। (সূরা ক্বাফ : ৯-১১)

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ـ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ـ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? ইচ্ছা করলে আমি উহাকে লোনা করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (সূরা ওয়াক্বিয়া : ৬৮-৭০)

৫. ভূ-ত্বক বিজ্ঞান

পাহাড় পর্বতগুলো তাঁবুর পেরেক সদৃশ

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানে, 'ভাঁজ করার' বিষয়টি একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত সত্য। ভাঁজ করা বিষয়টি পাহাড়-পর্বতের বিন্যাসের জন্য দায়ী। পৃথিবীর যে কঠিন পৃষ্ঠের ওপর আমরা বাস করি, তা শক্ত খোসার ন্যায়, অথচ এর গভীরের স্তরগুলো উত্তপ্ত ও তরল, ফলে যে কোন প্রাণীর জন্য তা বসবাসের অনুপযোগী। এটাও জানা যায় যে, পাহাড়-পর্বতের স্থায়িত্ব ভাঁজ করার মত বিস্ময়কর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। কারণ অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের মাধ্যমে পাহাড়-পর্বতের ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল এ ভাঁজগুলোর উদ্দেশ্য।

ভূ-তত্ত্ববিদরা আমাদের বলেন যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল এবং ভূপৃষ্ঠের শক্ত যে উপরিভাগে আমরা বাস করি তা অত্যন্ত পাতলা– এর বিস্তার ১ মাইল থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত। যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের শক্ত আবরণটি পাতলা সেহেতু

এর আন্দোলিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। পাহাড়গুলো খুঁটি কিংবা তাঁবুর পেরেকের মত ভূ-পৃষ্ঠকে ধারণ করে এবং একে স্থিতি অবস্থা দান করে। কোরআন নিচের আয়াতে হুবহু এরূপ কথাই বলেছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি জমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক বানাইনি? (সূরা নাবা : ৬-৭)

এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দ اَوْتَادًا (অওতাদা)-এর অর্থ হচ্ছে পেরেক বা খুঁটি (যা তাঁবু স্থাপন করতে প্রয়োজন হয়)। এগুলো হলো ভূ-তাত্ত্বিক ভাঁজের ভিত্তি।

'Earth' নামক বইটি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক রেফারেন্স বই হিসেবে বিবেচিত। এ বইয়ের অন্যতম লেখক হলেন ড. ফ্রাঙ্ক প্রেস, যিনি ১২ বছর ধরে আমেরিকার বিজ্ঞান একাডেমির প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এ বইতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাহাড়-পর্বত হচ্ছে পেরেকাকৃতি বিশিষ্ট এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তুর এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র, যার মূল মাটির গভীরে প্রোথিত। ড. প্রেসের মতে, ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন আবরণকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়-পর্বতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোরআন পাহাড়-পর্বতের কার্যক্রম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলেছে, তা পৃথিবীকে কম্পন থেকে রক্ষা করে।

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ ـ

অর্থ : আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি– যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে। (সূরা আম্বিয়া : ৩১)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ـ

অর্থ : তিনি আসমানকে খুঁটিবিহীন তৈরি করেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।' (সূরা লুকমান : ১০)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আর তিনি পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন যাতে উহা তোমাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে এবং আরও সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (সূরা নাহল : ১৫)

কোরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাহাড়-পর্বত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ বহুসংখ্যক মজবুত প্লেটে বিভক্ত যেগুলোর ঘনত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। প্লেটগুলো আংশিক গলিত অঞ্চলে ভাসমান, যাকে Aestheno sphere (এসথেনাসফিয়ার) বলে।

পাহাড়-পর্বত গড়া শুরু হয় পাত বা প্লেটগুলোর প্রান্তসীমায়। পৃথিবীর কঠিন আবরণ সমুদ্রের ৫ কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃতপ্রায় ৩৫ কিলোমিটার মোটা সমতল মহাদেশীয় পৃষ্ঠগুলোর নিচ এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটার মোটা বিশাল পর্বতমালার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর পাহাড়-পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। কোরআনও নিম্নের আয়াতে পাহাড়-পর্বতের শক্তিশালী ভিত্তির কথা বলে :

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۔

অর্থ : আর তিনি পাহাড়-পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (সূরা নাযিয়াত : ৩২)

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۔

অর্থ : (তারা কি দেখে না) পাহাড়ের দিকে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে। (সূরা গাশিয়াহ : ১৯)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ۔

অর্থ : তিনি পৃথিবীতে পবর্তমালা স্থাপন করেছেন, যাতে এটি তোমাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে। (সূরা লুকমান : ১০)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ۔

অর্থ : আর তিনি পৃথিবীর ওপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনও যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলেদুলে না পড়ে। (সূরা নাহল : ১৫)

৬. সমুদ্র বিজ্ঞান

মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মধ্যেকার অন্তরায়

কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি লক্ষ্য করুন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ -

অর্থ : তিনি পাশাপাশি দুই প্রকার সাগর প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝখানে রয়েছে অন্তরায়, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (সূরা আর-রাহমান :১৯-২০)

আরবি ভাষায় بَرْزَخٌ (বারযাখ) শব্দটির অর্থ হচ্ছে আড়াল বা অন্তরায়। এ অন্তরায় কোন শরীরিক বিভাজন নয়। আরবি শব্দ مَرَجَ (মরজা)-এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'তারা উভয়েই একত্রে মিশে একাকার হয়ে যায়।' প্রাথমিক যুগের মুফাসসিরগণ পানির দুটো ধারার দুটো বিপরীতমুখি অর্থের ব্যাখ্যা করতে অপারগ ছিলেন। অর্থাৎ, কিভাবে তারা মিশে একাকার হয়ে যায়, অথচ উভয়ের মধ্যে রয়েছে আড়াল। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, যেখানে দুটি ভিন্ন সমুদ্র এসে একত্রে মিলিত হয়, সেখানে উভয়ের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় থাকে। এ অন্তরায় দুটি সমুদ্রকে বিভক্ত করে, ফলে প্রত্যেক সমুদ্রের নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ত এবং ঘনত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। সাগরবিদদের এ আয়াতের আরও উন্নততর ব্যাখ্যা দানের উত্তম সুযোগ রয়েছে। দুটি সাগরের মধ্যে প্রবাহমান ঢালু পানির অদৃশ্য আড়াল বা অন্তরায় আছে যার মধ্য দিয়ে এক সাগরের পানি অন্য সাগরে যায়।

কিন্তু যখন এক সমুদ্র থেকে পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সে সমুদ্রটি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং অন্য সমুদ্রের পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবে দুই ধরনের পানির মধ্যে পরিবর্তনমূলক একীভূতকারী বন্ধন হিসেবে এ অন্তরায় কাজ করে।

কোরআনে উল্লিখিত এ বৈজ্ঞানিক ধারণাটি ড. উইলিয়াম হে, যিনি বহুল পরিচিত সমুদ্র বিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সমর্থন করেছেন।

কোরআনের নিচের আয়াতেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে–

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا -

অর্থ : তিনি দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। (সূরা নামল : ৬১)

এ অন্তরায় জিব্রাল্টার ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনস্থলসহ আরও অনেক জায়গায় দেখা যায়।

কিন্তু কোরআন যখন মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভক্তকারী অন্তরায় সম্পর্কে বলে, তখন ঐ অন্তরায়ের সাথে নিষেধকারী প্রতিবন্ধকতার কথাই বলে। যেমন, আল্লাহর কথা–

هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ - وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

অর্থ : তিনিই সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়; একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (সূরা ফুরকান : ৫৩)

'আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, নদীর মোহনায় যেখানে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি মিলিত হয়, সেখানের অবস্থা ঐ স্থান থেকে ভিন্ন, যেখানে দু'লবণাক্ত পানি গিয়ে মিশে। নদীর মোহনায় লবণাক্ত ও মিষ্টি পানি মিলিত হলে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তার কারণ হলো সেখানে দুটো স্তরকে পৃথককারী চিহ্নিত ঘনত্বের ধারাবাহিকতাবিহীন Pycnocline zone রয়েছে। এ বিভাজন স্থানে এক প্রকার লবণাক্ততা রয়েছে যা মিঠা ও লবণাক্ত উভয় থেকেই ভিন্ন।

মিসরের নীলনদ যেখানে ভূ-মধ্যসাগরে গিয়ে মিলিত হয় সে স্থানসহ আরও কয়েক জায়গায় এ ধরনের বিভাজনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার

অধ্যাপক দুর্গা রাও একজন প্রখ্যাত সামুদ্রিক ভূ-তত্ত্ববিদ এবং জেদ্দার বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাকে নিচের আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল :

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ - ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ - اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا - وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ -

অর্থ : অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে ঘন কালো মেঘমালা আছে। একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন সে তাকে

একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই। (সূরা নূর : ৪০)

অধ্যাপক রাও বলেন, বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরের অন্ধকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছে। কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া মানুষ ২০-৩০ মিটারের অধিক পানির নিচে ডুব দিতে পারে না এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে ২০০ মিটারের অধিক পানির নিচে বাঁচতে পারে না। এ আয়াতটি সকল সমুদ্রের দিকে নির্দেশ করে না। কেননা, সকল সমুদ্রের নিচে অন্ধকারের স্তর নেই। আয়াতে শুধু গভীর সমুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন, 'এক বিশাল গভীর সমুদ্রের অন্ধকার।' দুটি কারণে গভীর মহাসাগরে স্তরবিশিষ্ট অন্ধকার দেখতে পাওয়া যায় :

১. রংধনু সাতটি রংয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এ সাতটি রং হলো– বেগুনি, নীল, আসমানি, হলুদ, কমলা, সবুজ ও লাল। আলোক রশ্মি পানিতে পড়লে তা ভেঙে যায়। পানির উপরিভাগের ১০ মিটার থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত পানি লাল রং শোষণ করে। সে কারণে কোন ডুবুরি পানির ২৫ মিটার নিচুতে আহত হলে সে তার রক্তের লাল রং দেখতে পাবে না, কেননা লাল রং ঐ গভীরতায় পৌঁছে না। এভাবে কমলা রং ৩০মিটার থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে, হলুদ রং ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে, সবুজ রং ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে এবং সবশেষে নীল রং ২০০ মিটারের অধিক আসমানি ও বেগুনি ২০০ মিটারের অধিক দূরত্ব অতিক্রমের পর শোষিত হয়। বিভিন্ন স্তরে রংগুলোর এভাবে ক্রমাগত অদৃশ্য হবার পরে সমুদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ আলোর স্তর অন্ধকারে পরিণত হয়। পানির ১০০০ মিটার নিচে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

২. মেঘ সূর্য রশ্মিকে ধারণ করে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। ফলে মেঘের নিচে অন্ধকারের একটি স্তর তৈরি হয়। এটাই অন্ধকারের প্রথম স্তর। সূর্যের আলো যখন সমুদ্রের উপরিভাগে পতিত হয় তখন তা পৃষ্ঠভাগের ঢেউয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে এটিকে উজ্জ্বলিত করে। সেহেতু ঢেউগুলোই আলোকে প্রতিফলিত করে এবং অন্ধকারের সৃষ্টি করে। অপ্রতিফলিত আলো সমুদ্রের গভীরতায় প্রবেশ করে। তাই সমুদ্রের দুটি অংশ রয়েছে। উপরের অংশে রয়েছে আলো এবং উষ্ণতা এবং গভীরের অংশে রয়েছে অন্ধকার। ওপরের অংশটি ঢেউয়ের কারণে গভীর সমুদ্র থেকে ভিন্ন ধরনের।

অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের মধ্যে সাগর ও মহাসাগরের গভীর পানিও অন্তর্ভুক্ত আছে। কারণ, তখন ওপরের পানি অপেক্ষা নিচের পানির ঘনত্ব বেশি থাকে।

অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের নিচে অন্ধকার শুরু হয়। এমনকি সমুদ্রের নিচে মাছও দেখতে পায় না। তাদের আলোর একমাত্র উৎস হল, নিজেদের শরীরের আলো।

কোরআন এ বিষয়টি যথার্থভাবে বর্ণনা করেছে–

'অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ।'

অন্যভাবে বলা যায়, এ সকল ঢেউয়ের ওপর আরও বিভিন্ন প্রকারের ঢেউ আছে যা মহাসাগরের উপরিভাগে দেখতে পাওয়া যায়। কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে 'যার ওপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের ওপর এক ঘন অন্ধকার।'

মেঘগুলো একের ওপর এক প্রতিবন্ধক যা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে রংয়ের শোষণের মাধ্যমে গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করে।

পরিশেষে, অধ্যাপক দুর্গা রাও এই বলে সমাপ্ত করেন যে, '১৪০০ বছর আগে একজন সাধারণ মানুষের দ্বারা এ বিষয়টি এত বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এসব তথ্য অবশ্যই কোন অলৌকিক উৎস থেকে এসেছে।

৭. জীববিজ্ঞান

প্রতিটি জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়

কোরআনের নিচের আয়াতটি বিবেচনা করা যায়–

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۔
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

অর্থ : কাফিররা কি দেখে না যে, আসমান ও জমিনের মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

কেবল বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরেই আমরা জানতে পেরেছি যে, জীব কোষের যে মৌলিক উপাদান, সাইটোপ্লাজম তা ৮০ ভাগ পানি দিয়ে তৈরি। আধুনিক গবেষণা আরও প্রকাশ করেছে যে, অধিকাংশ জীবেই শতকরা ৫০ ভাগ হতে শতকরা ৯০ ভাগ পানি আছে এবং প্রতিটি জীবন্ত সত্তারই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানি অপরিহার্য।

প্রত্যেক প্রাণীকে যে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ১৪ শতাব্দি পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে কি অনুমান করা সম্ভব ছিল? অধিকন্তু আরবের মরুভূমির কোলে মানুষের দ্বারা এ ধরনের অনুমান কি কল্পনাযোগ্য হতো, যেখানে সর্বদা পানির দুষ্প্রাপ্যতা ছিল।

নিচের আয়াতটি পানি দ্বারা প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করে–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূর : ৪৫)

নিচের আয়াতটিও পানি দ্বারা মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বলে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ

অর্থ : তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার প্রতিপালক সবকিছু করতে সক্ষম। (সূরা ফুরকান : ৫৪)

৮. উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও স্ত্রীরূপে

মানুষ আগে জানত না যে, উদ্ভিদেরও পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য রয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেক উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে। এমনকি সমলিঙ্গ বিশিষ্ট গাছেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে–

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ـ

অর্থ : আর আকাশ থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন লতাযুগল উদ্‌গত করি, যার প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে আলাদা। (সূরা ত্ব-হা : ৫৩)

ফলের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থ : আর প্রত্যেক ফলের মধ্যে তিনি দু'প্রকার বা জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রাদ : ৩)

ফল হল উন্নত জাতের গাছের উৎপাদন। ফল উৎপন্ন হওয়ার পূর্বের স্তর হল ফুল। ফুলের আছে পুরুষ অঙ্গ (পুং কেশর) এবং স্ত্রী অঙ্গ (ডিম্বক)। পরাগ রেণু বাহিত হয়ে ফুলে এসে পড়লে তাতে ফল ধরে। পালাক্রমে পরিপক্ক হয় এবং তার বীজ মুক্ত করে। সুতরাং সকল ফলই পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব সূচিত করে। এ সত্যই বর্ণিত হয়েছে আল কোরআনে।

বিশেষ কিছু প্রজাতি রয়েছে যেগুলোর ফল অনিষিক্ত ফুল থেকে আসে। এগুলোকে পার্থেনোকর্পিক ফল বলা হয়। যেমন : কলা, বিশেষ ধরনের আনারস। ডুমুর, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি এগুলোরও রয়েছে সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য।

সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ـ

অর্থ : আর আমি প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

এ আয়াতটি সকল কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মানুষ ছাড়াও প্রাণী, গাছপালা, ফল-ফলাদিতে এ জোড়া লক্ষণীয়। বিদ্যুতে যেমন আছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ, সেরকম প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুতে ঋণাত্মক (Negative) চার্জবাহী, ইলেকট্রন ও ঋণাত্মক (Positive) চার্জবাহী প্রোটন আছে।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না তার প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইয়াসিন : ৩৬)

কোরআন এখানে বলেছে যে, বর্তমানে মানুষ যা জানে না এবং পরবর্তী সময়ে যা আবিষ্কৃত হতে পারে সেগুলোসহ সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

৯. প্রাণীবিজ্ঞান

জ্ঞানী ও পাখি দল যা সম্প্রদায় হিসেবে বাস করে

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ـ

অর্থ : আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি সম্প্রদায় বা দল। (সূরা আনআম : ৩৮)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণী ও পাখি দল যা সম্প্রদায় হিসেবে বাস করে। অর্থাৎ তারা সুসংগঠিত হয় এবং একত্রে বসবাস ও কাজ করে।

পাখির উড্ডয়ন

পাখির উড্ডয়ন সম্পর্কে কোরআন বলেছে :

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : তারা কি উড়ন্ত পাখি দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা নাহল ঃ ৭৯)

একই ধরনের বক্তব্য নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ـ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ ـ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ ـ

অর্থ : তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার ওপর উড়ন্ত পাখিকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? মেহেরবান আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। (সূরা মূলক : ১৯-২০)

আরবি শব্দ اَمْسَكَ (আমছাকা) এর শাব্দিক অর্থ, 'কারো হাত ওপরে রাখা, পাকড়াও করা, ধরে রাখা, কাউকে পেছন থেকে ধরে রাখা, –এগুলো এ ধারণা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতায়নে পাখিকে আকাশে ধরে রাখে। এ আয়াতগুলো আল্লাহর নিয়ম মোতাবেক পাখির আচরণের চূড়ান্ত নির্ভরতার ওপর জোর দেয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট প্রজাতির এমন সব পাখি রয়েছে, যাদের চলাচলে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির উৎকর্ষের পরিচয় বর্তমান। শুধু পাখির gentic code (যে পদ্ধতি অনুসারে বংশানুগতির তথ্য বা সংকেতাবলি জীবকোষস্থিত Chromosome)-এ রক্ষিত থাকে) এ রক্ষিত গমনাগমন সম্পর্কিত কর্মসূচির কারণেই এ ধরনের পাখির বাচ্চারা পর্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথের উদ্দিষ্ট সফরে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম, যাদের ইতিপূর্বে দেশান্তরে গমনাগমনের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নেই, এমনকি কোন পথ নির্দেশনাও অনুপস্থিত। এরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রস্থান স্থানে পুনরায় ফিরেও আসতে পারে।

অধ্যাপক হামবার্গার তাঁর 'Power and Fragility' নামক বইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী Multon bird (মেষ পাখি) নামক এক প্রকার পাখির উদাহরণ দিয়েছেন, এ পাখিরা ইংরেজি সংখ্যা 8 (আট)-এর আকৃতিতে ১৫,০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ৬ মাসের বেশি সময়

নিয়ে এরা গন্তব্যস্থলে পৌছে এবং প্রস্থান স্থানে ফিরে আসতে বড়জোড় এক সপ্তাহ লাগে। এরূপ একটি ভ্রমণের জন্য পাখিদের স্নায়ুকোষে খুবই জটিল নির্দেশিকা বিদ্যমান আছে। এ জটিল সফর ও প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচি নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। আমাদের কি উচিত নয় সেই সুনির্ধারিত কর্মসূচির প্রণেতার স্বরূপ বা পরিচয় জানার চেষ্টা করা?

মৌমাছি

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً -

অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন : পাহাড়ের গায়ে গাছে এবং উঁচু চালে ঘর তৈরি কর। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর. এবং তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। (সূরা নাহল : ৬৮-৬৯)

১৯৭৩ সালে ভন-ফ্রিচ মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের ওপর গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পাওয়ার পর একটি মৌমাছি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং 'মৌমাছি নৃত্য' নামক আবরণের মাধ্যমে তার সহকর্মী মৌমাছিদেরেক সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র বলে দেয়। অন্যান্য শ্রমিক মৌমাছিকে তথ্য দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আচরণ আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোরআন উপরের আয়াতের সাহায্যে কিভাবে তার পালনকর্তার প্রশস্ত পথের সন্ধান পায় তা উল্লেখ করেছে।

শ্রমিক মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রী মৌমাছি। সূরা আন-নাহলের উপরিউক্ত ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে উল্লিখিত ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে (كُلِىْ এবং فَاسْلُكِىْ চল ও খাও)। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খাদ্যের অন্বেষণে বাসা ত্যাগকারী মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি। অন্য কথায়, সৈনিক কিংবা শ্রমিক মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি।

বস্তুত শেক্সয়িারের'Henry the forth' নাটকের কিছু সংলাপে মৌমাছি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৌমাছিরা হল সৈনিক এবং তাদের একটি রাজা রয়েছে। শেক্সপিয়রের যুগে মানুষ মৌমাছি সম্পর্কে এ রকমই ভাবত। তারা ভাবত যে, কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। যাহোক, এটা সত্য নয়। শ্রমিক মৌমাছিরা হল স্ত্রী এবং তারা রাজা মৌমাছির কাছে নয় বরং রানী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু

এ বিষয়টি ৩০০ বছর পূর্বে আধুনিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে (অথচ কোরআন তা ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছে)।

মাকড়সার জাল বা বাসস্থান ক্ষণভঙ্গুর দুর্বল

কোরআন সূরা আনকাবুতের ৪১ নং আয়াতে বলেছে–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۔ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۔ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উপমা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য একটি ঘর বানায়। নিশ্চয়ই সব ঘরের চেয়ে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল যদি তারা জানত। (সূরা আনকাবুত : ৪১)

কোরআন হালকা-পাতলা, সূক্ষ্ম, দুর্বল-ক্ষণভঙ্গুর হিসেবে মাকড়সার জালের বাহ্যিক বর্ণনা দেয়া ছাড়াও কোরআন মাকড়সার ঘরে আত্মীয়তার অসারতার ওপরেও জোর প্রদান করেছে। মাকড়সার ঘরেই স্ত্রী মাকড়সা কর্তৃক তার সহকর্মী পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করা হয়।

পিঁপড়ার জীবনধারা ও যোগাযোগ

কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি মনোযোগের সাথে ভাবা যাক–

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۔ حَتّٰى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۔ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۔

অর্থ : সোলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল। জ্বীন, মানুষ এবং পাখিদের থেকে আর তাদের কুচকাওয়াজ করানো হলো। তারপর যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর। অন্যথায় সোলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলবে। (সূরা আন নামল : ১৭-১৮)

অতীতে কেউ হয়তো এই বলে কোরআনের প্রতি উপহাস করে থাকতে পারে যে, কোরআন যাদুকরী বা রূপকথার কাহিনীর বই, যাতে পিঁপড়ার পরস্পরের কথা এবং উন্নত বার্তা বিনিময়ের বিষয়ে উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিককালে গবেষণায় পিঁপড়ার জীবনধারা সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা জানা গেছে, যেগুলো মানুষের পূর্বে জানা ছিল না।

গবেষণায় বলা হয়েছে মানুষের জীবনধারার সাথে যে সকল প্রাণী ও কীটপতঙ্গের অধিকতর মিল রয়েছে, তা হল পিঁপড়া। পিঁপড়া সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো থেকে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করা যায়।

ক. মানুষের মত পিঁপড়ারা তাদের মৃতদেহকে কবরস্থ করে।

খ. পিঁপড়াদের মধ্যে উন্নত পর্যায়ের শ্রম বিভাজন পদ্ধতি রয়েছে। পূর্ণমাত্রায় তাদের মধ্যে মহা ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, সর্দার, শ্রমিক ইত্যাদি রয়েছে।

গ. মাঝে মাঝে তারা খোশগল্প করতে একত্রিত হয়।

ঘ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তাদের রয়েছে উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি।

ঙ দ্রব্য বিনিময়ের জন্য তারা নিয়মিত বাজার বানায়।

চ. শীতকালে দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা খাদ্যশস্য জমা করে রাখে এবং খাদ্যশস্য যদি অঙ্কুরিত হয়, তাহলে তারা শিকড় কেটে দেয়; মনে হয়, তারা এটা বুঝতে পারে যে, খাদ্যশস্যকে অঙ্কুরিত অবস্থায় রেখে দিলে তা পচে যাবে। যদি তাদের মজুদকৃত শস্যদানা বৃষ্টিতে ভিজে যায়, তাহলে এগুলোকে রৌদ্রে শুকাতে বাইরে নিয়ে যায় এবং শুকানোর পর পুনরায় ভেতরে নিয়ে আসে। মনে হয় তারা এটাও জানে যে, আর্দ্রতার কারণে শস্যদানায় মুকুল বের হতে পারে, ফলে শস্যদানার পচন হতে পারে।

১০. চিকিৎসাবিজ্ঞান

মধু মানুষের জন্য আরোগ্যকারী

মৌমাছিরা বিভিন্ন প্রকারের ফুল এবং ফলের রস শোষণ করে এবং নিজের শরীরের মধ্যে মধু তৈরির পর তা মোম কোষে জমা করে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মানুষ জানতে পারে যে, মধু মৌমাছির পেট থেকে তৈরি হয়। অথচ বাস্তব সত্যটি ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে : 'অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, এরপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর।

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -

অর্থ : তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে একটি পানীয়, বিচিত্র যার বর্ণ, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি। (সূরা নাহল : ৬৯)

বর্তমানে আমরা জানি যে, মধুর রোগ নিরাময়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটা লঘু জীবাণুনাশক জাতীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ানরা তাদের ক্ষত শুকানোর জন্য মধু ব্যবহার করত। ক্ষতস্থানে আর্দ্রতা থাকলে সামান্য পরিমাণ ক্ষত স্থান নিরাময় হয়। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষতস্থানে কোন ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোন গাছের ফলের এলার্জি রোগে ভোগে, তাহলে তাকে ঐ গাছ থেকে আহরিত মধু পান করালে তার এলার্জি প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মধুতে ফল শর্করা বা ফ্রুকটোজ (Fructose) এবং ভিটামিন k (কে) রয়েছে।

মধুর উৎস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত জ্ঞান, কোরআন নাযিলের কয়েক শতাব্দী পরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

১১. শরীর তত্ত্ববিদ্যা

রক্ত সঞ্চালন এবং দুগ্ধের উৎপাদন

মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফীসের ৬০০ বছর পূর্বে এবং পশ্চিমা বিশ্বে উইলিয়াম হারওয়ে কর্তৃক রক্ত চলাচলের ধারণা দেয়ার ১০০০ বছর পূর্বে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে এটা জানা ছিল যে, অন্ত্রে কি ঘটে এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন করে। কোরআনের একটি আয়াত দুধের উপাদানের উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করে, যা এ মতবাদগুলোর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ওপরের মতগুলোর ব্যাপারে কোরআনের আয়াত বুঝাতে হলে, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্ত্রনালীতে কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে এবং সেখান থেকে অর্থাৎ খাদ্যের নির্যাস কি করে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবাহিত হয়। কখনো কখনো তা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে লিভারের মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্ত সেগুলোকে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরবরাহ করে, যার মধ্যে দুধ উৎপাদনকারী লালাগ্রন্থিও অন্তর্ভুক্ত।

সহজ কথায়, অন্ত্রনালীর কিছু বিশেষ ধরনের নির্যাস অন্ত্রের আবরণের মধ্যদিয়ে বেরিয়ে আসে এবং এ নির্যাসগুলো রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌছায়।

যদি আমরা কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটির মর্মার্থ বুঝতে চাই, তাহলে উল্লেখিত ধারণাটির যথার্থ মূল্যায়ন করা যায়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ ـ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরাস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুধ যা পানকারীদের জন্য উপকারী। (সূরা আন নাহল : ৬৬)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً - نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থ : আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটে যা আছে (দুধ) তা থেকে পান করাই। আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকার। তোমরা তা থেকে খাও। (সূরা মুমিনুন : ২১)

গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা আর আধুনিক শরীর তত্ত্ববিদ্যা যা আবিষ্কার করেছে তা বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

১২. ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যা

মানুষ 'আলাক্ব'- জোঁকের মত বস্তু হতে সৃষ্ট

কয়েক বছর আগে একদল আরব পণ্ডিত কোরআন হতে ভ্রূণ বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তারা কোরআনের এ উপদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে রেখেছেন–

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে। (সূরা আম্বিয়া : ৭)

কোরআন থেকে ভ্রূণসংক্রান্ত সকল তথ্যকে একত্রিত করে ইংরেজিতে অনুবাদ করার পর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণ অধ্যাপক এবং এনাটমি (জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান) বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কেইথ মূরের নিকট উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে তিনি ভ্রূণ তত্ত্ববিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

কোরআনে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করা হয়েছে সেই সম্পর্কে তার মতামত প্রদান করতে অনুরোধ করা হয়। তার নিকট উপস্থাপিত কোরআনের আয়াতের অনুবাদগুলো সতর্কতার সাথে যাচাই করার পর ড. মূর বলেন, যে

ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কোরআনের উল্লেখিত অধিকাংশ তথ্য ভ্রূণ তত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় এবং কোনোক্রমেই এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় না। তিনি আরও বলেন যে, কিছু আয়াত রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে পারেন না। সেগুলো সত্য না মিথ্যা তাও তিনি বলতে পারেন নি, কারণ ঐ আয়াতগুলোতে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে তিনি নিজেই জ্ঞাত নন। আধুনিক ভ্রূণ তত্ত্ব বিদ্যায় বা লেখায় সেগুলোর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ঐ ধরনের একটি আয়াত হল–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (সূরা আলাক্ব : ১-২)

আরবি শব্দ عَلَقٌ (আলাক্ব) এর অর্থ 'জমাট রক্ত'। এর অন্য অর্থ হল– দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এমন আঠালো জিনিস। যেমন, জোঁক কামড় দিয়ে আটকে থাকে।

ড. কেইথ মূর জানতেন না যে, প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ভ্রূণকে জোঁকের মত দেখায় কিনা। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা যাচাই করতে গবেষণা শুরু করেন এবং প্রাথমিক দশায় ভ্রূণের আকৃতির সাথে একটি জোঁকের আকৃতিকে তুলনা করেন। তিনি এ দুটোর মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখে অভিভূত হয়ে যান। একইভাবে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অজানা অনেক জ্ঞান তিনি কোরআনের থেকে লাভ করেন।

ড. কেইথ মূর কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আশিটির মত প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, ভ্রূণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে সর্বশেষ আবিষ্কৃত তথ্যের পূর্ণ মিল রয়েছে। প্রফেসর মূর বলেন, 'আমাকে যদি আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হত, তাহলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাবে আমি সেগুলোর অর্ধেকেরও উত্তর দিতে পারতাম না।'

ড. কেইথ মূর ইতিপূর্বে 'The Dveloping Human' নামক একটি বই লিখেছিলেন। কোরআন থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনের পর তিনি ১৯৮২ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণ লিখেন। বইটি একক লেখকের সর্বোত্তম চিকিৎসা বই হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। বইটি বিশ্বের বড় বড় অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রথম বর্ষের মেডিকেল কলেজের ভ্রূণতত্ত্বের পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে সপ্তম মেডিকেল কনফারেন্সে ডা. মূর বলেছেন, 'কোরআনে বর্ণিত মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে আনন্দিত। এটা আমার নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট এ সকল বর্ণনা অবশ্যই আল্লাহর নিকট হতেই

এসেছিল। কারণ, এগুলোর প্রায় সকল জ্ঞানই পরবর্তী বহু শতাব্দী পরেও আবিষ্কৃত হয় নি। এটা আমার কাছে প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ ﷺ অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।'

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে বেলর কলেজ অব মেডিসিনের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জো লিগ সিম্পসান ঘোষণা করেন যে, 'মুহাম্মদ ﷺ-এর বর্ণিত এসব হাদীস সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয় নি। তাই পরবর্তীতে দেখা গেল যে, ধর্মের সাথে বংশগতিবিষয়ক বিজ্ঞান বা প্রজননশাস্ত্রের কোন পার্থক্য নেই; উপরন্তু প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের সাথে ধর্ম তার বিস্ময়কর জ্ঞানকে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে পথ প্রদর্শন করতে পারে.... কোরআনের বর্ণিত বর্ণনাগুলো কয়েক শতাব্দী পরে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে; যাতে বুঝা যায় যে, কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত।'

মেরুদণ্ড ও পাজরের মধ্য থেকে নির্গত তরল পদার্থের ফোটা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ -

অর্থ : সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে। তা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝ থেকে। (সূরা তারিক্ব : ৫-৭)

জন্মপূর্ব অবস্থায় বিকাশের স্তরে, পুরুষ ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়গুলো যেমন, পুরুষের অণ্ডকোষ ও নারীর ডিম্বাশয়, কিডনীর কাছে মেরুদণ্ড স্তম্ভ এবং ১১শ ও ১২শ বক্ষ পাঁজরের হাড়ের মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। তারপর সেগুলো নিচে নেমে আসে। স্ত্রীর ডিম্বাশয় মেরুদণ্ডের নিচে ও নিতম্বের মধ্যেকার অস্থিকাঠামোর মধ্যে এসে থেমে যায়। কিন্তু জন্মের আগ পর্যন্ত পুরুষের অণ্ডকোষ উরুর গোড়ার নালী দিয়ে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জননেন্দ্রিয় নিচে নেমে আসার পরেও মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মাঝে অবস্থিত উদরসংক্রান্ত বড় ধমনি থেকে এ অঙ্গগুলো উদ্দীপনা ও রক্ত সরবরাহ গ্রহণ করে। এমনকি রসজাতীয় পদার্থ বহনকারী নালী এবং শিরাগুলো একই এলাকায় গিয়ে মিলিত হয়।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয় নুতফাহ (অতি সামান্য পরিমাণ তরল) থেকে

মহিমান্বিত কোরআন কমপক্ষে এগার বার উল্লেখ করেছে যে, মানুষ নুতফাহ থেকে সৃষ্ট। 'নুতফাহ'-এর অর্থ হল 'নগণ্য পরিমাণ তরল' বা 'এক ফোটা তরল'

যা পেয়ালাশূন্য করার পর পড়ে থাকে। এ বিষয়টি কোরআনের নিম্নলিখিত স্থানে উল্লিখিত হয়েছে–

১৬ : ৪; ১৮ : ৩৭, ২২ : ৫; ২৩ : ১৩ ; ৩৫ : ১১; ৩৬ : ৭৭; ৪০ : ৬৭; ৫৩ : ৪৬; ৭৬ : ৩৭; ৭৬ : ২ এবং ৮০ : ১৯।

সম্প্রতি বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে যে, একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে ৩০ লক্ষ শুক্রাণু হতে একটি মাত্র শুক্রাণুর প্রয়োজন অর্থাৎ, নিষিক্তকরণের জন্য শুধু নির্গত শুক্রকীটের ১/৩ মিলিয়ন ভাগ অথবা ০.০০০০৩% শুক্রাণুর প্রয়োজন।

মানুষ সৃষ্টি হয় ছুলালাহ্ (তরল পদার্থের নির্যাস) থেকে

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ -

অর্থ : অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন, তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (সূরা সাজদাহ্ : ৮)

আরবি শব্দ سُلٰلَةٌ (সুলালাহ্) মানে তরল পদার্থের নির্যাস বা অবিভক্ত কোন বস্তুর সর্বোত্তম অংশ। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, পুরুষের দেহে তৈরি কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আবশ্যক। কয়েক মিলিয়নের মধ্য থেকে এই একটি মাত্র শুক্রাণুকীটকে কোরআন 'সুলালাহ্' বলে উল্লেখ করেছে। বর্তমানে আমরা এটাও জেনেছি যে, স্ত্রী কর্তৃক উৎপাদিত হাজার হাজার ডিম্বাণুর মধ্য হতে মাত্র একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে থাকে। হাজার হাজার ডিম্বাণু থেকে কেবল একটি ডিম্বাণুকেও 'সুলালাহ্' নামে কোরআন উল্লেখ করেছে।

তরল পদার্থ থেকে সুষমভাবে বের করে আনার অর্থেও 'সুলালাহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থ দ্বারা জননকোষ ধারণকারী নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু সংক্রান্ত তরল পদার্থকে বোঝায়। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়কে নিষিক্তকরণের প্রক্রিয়ায় সুষমভাবে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বের করে আনা হয়।

মানুষকে নুতফাতুন আমশা-জ (মিশ্রিত তরল পদার্থ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিচের আয়াতটির দিকে লক্ষ করা যাক–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ -

অর্থ : আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে। (সূরা আদ-দাহ্‌র : ২)

আরবি শব্দ : نُّطْفَةٌ اَمْشَاجٌ (নুতফাতুন আমসা-জ)-এর অর্থ হচ্ছে, মিশ্রিত তরল পদার্থ। কোরআনের কতিপয় মুফাসসিরদের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ জাতীয় ধারক বা তরল পদার্থকে বুঝায়।

নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিশ্রিত হওয়ার পরেও ভ্রূণ নুতফা আকারে অবস্থান করে। মিশ্রিত তরল পদার্থ শুক্রাণুজাতীয় তরল পদার্থকেও বুঝানো হতে পারে যা বিভিন্ন লালাগ্রন্থির নিঃসরিত রস থেকে তৈরি হয়।

সুতরাং نُّطْفَةٌ اَمْشَاجٌ (নুতফাতুন আমসা-জ)-এর অর্থ দাঁড়ায়, নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু এবং এগুলোর চতুর্পাশের তরল পদার্থের কিছু অংশ।

লিঙ্গ নির্ধারণ

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় শুক্রাণুর প্রকৃতির দ্বারা ডিম্বাণুর প্রকৃতির দ্বারা নয়। একটি শিশু নারী বা নর তা নির্ভর করে ২৩তম ক্রোমোজোম (Chromosomes) যথাক্রমে XX না XY তার ওপর।

প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণ করার কাজটি হয়ে থাকে নিষিক্তকরণের সময় এবং এটা নির্ভর করে ডিম্বাণুকে শুক্রাণুর কোন প্রকার লিঙ্গ ক্রোমজোম নিষিক্ত করে তার ওপর। যদি এটা X বহনকারী শুক্রাণু হয় যা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তাহলে ভ্রূণ হবে স্ত্রীলিঙ্গ এবং যদি এটা Y বহনকারী শুক্রাণু হয় তাহলে ভ্রূণ হবে পুংলিঙ্গ।

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ـ

অর্থ : তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী একবিন্দু থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (সূরা আন-নাজম : ৪৫-৪৬)

আরবি শব্দ (নুতফা) نُطْفَةٌ অর্থ, সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ এবং تُمْنٰى (তুমনা) অর্থ স্খলিত বা নির্গত। সেহেতু নুতফা দ্বারা শুক্রাণুকেই বুঝানো হয়, কারণ শুক্রকীটই স্খলিত হয়।

কোরআন বলে–

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

অর্থ : সে কি স্খলিত এক ফোটা শুক্রকীট ছিল না? অতঃপর সে পরিণত হয় এমন কিছুতে যা লেগে থাকে, এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করলেন এবং যথার্থরূপে সুবিন্যস্ত করেন। তারপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। (সূরা ক্বিয়ামাহ : ৩৭-৩৯)

এখানে পুনরায় نُطْفَةٌ مِنْ مَّنِيٍّ শব্দ দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে পুরুষের নিকট থেকে আসা খুবই অল্প পরিমাণ শুক্রকীটকে বুঝানো হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের শাশুরিরা প্রায়ই নাতী (ছেলে সন্তান) কামনা করে এবং যদি নাতনী (মেয়ে সন্তান) হয় তাহলে তারা পুত্র বধূকে দোষারোপ করেন। যদি তারা জানত যে, নারীর ডিম্বাণুর প্রকৃতি নয় বরং পুরুষের শুক্রকীটের প্রকৃতিই লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। তাই কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য পুত্রবধূদের দোষারোপ করা উচিত নয়। গর্ভের সন্তান ছেলে শিশু না হয়ে মেয়ে শিশু হওয়ার জন্য একমাত্র পিতাই দায়ী। নারীর ডিম্বানুর ২৩ জোড়া ক্রোমোজমই নেগেটিভ কিন্তু পুরুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু নেগেটিভ, কিছু পজেটিভ। এ কারণেই কোরআন ও বিজ্ঞান উভয়ই পুরুষের শুক্রকীটকেই একমাত্র লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী হিসেবে উল্লেখ করে।

অন্ধকারের তিনটি পর্দার দ্বারা ভ্রূণ সংরক্ষিত

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ـ

অর্থ : তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় তিন তিনটি অন্ধকার পর্দার ভেতরে। (সূরা যুমার : ৬)

অধ্যাপক ড. কেইথ মূরের মতানুসারে কোরআনের এ তিনটি স্তরের অন্ধকার বলতে বুঝায়–

১. মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর;

২. জরায়ুর প্রাচীর;

৩. সেই ঝিল্লি যা শিশুকে ঢেকে রাখে।

ভ্রূণের পর্যায়সমূহ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ

অর্থ : আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে তৈরি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে

জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।' (সূরা মুমিনূন : ১২-১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, قَرَارٍ مَّكِيْنٍ (ক্বারাবীন কামীন) বা দৃঢ়ভাবে অটল এক বিশ্রামের স্থানে সুরক্ষিত অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পিছনের মাংসপেশী যে মেরুদণ্ডটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে সেই মেরুদণ্ডের দ্বারা জরায়ুর পশ্চাতে ভাগ হতে উত্তমরূপে সংরক্ষিত। তাছাড়াও গর্ভফুলের রস ধারণকৃত গর্ভস্থলী দ্বারা ভ্রূণ সংরক্ষিত। সুতরাং ভ্রূণের একটি সুরক্ষিত নিরাপদ বাসস্থান রয়েছে।

এ অল্প পরিমাণ তরল عَلَقٌ (আলাক্বে) এ পরিণত হয়। এর অর্থ হল, যা আটকে থাকে। এটার আরেক অর্থ হল, 'জোঁক' সদৃশ বস্তু।' উভয় বর্ণনাই বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণীয়। কেননা, প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ দেয়ালের সাথে লেগে থাকে এবং এটাকে আবার জোঁকের আকৃতির মত দেখায়। তাছাড়া এটি জোঁকের (রক্তচোষক) মতই আচরণ করে। এটা মায়ের গর্ভফুলের মধ্যদিয়ে রক্ত সরবরাহ করে।

عَلَقٌ (আলাক্ব) শব্দের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, 'রক্তপিণ্ড'। গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে রক্তপিণ্ডের স্তরে থাকাবস্থায় রক্তপিণ্ডটি তরল পদার্থ বেষ্টিত বন্ধ থলির মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং একই সময়ে রক্তের আকৃতির পাশাপাশি জোঁকের আকৃতিও ধারণ করে। নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য কোরআনের জ্ঞানকে মানুষের বৈজ্ঞানিক তথ্য অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টার সাথে তুলনা করুন।

১৬৭৭ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী হাম এবং লিউন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শুক্রকোষ পর্যবেক্ষণ করেন। তারা ভেবেছিলেন যে, অতি ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ জরায়ু কোষে থাকে যা জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে নবজাতকরূপে গড়ে ওঠার জন্য। এটি 'The perforation Theory' বা ছিদ্রকরণ তত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল। যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বাণু বড়, তখন ডিগ্রাফের মত বিজ্ঞানীসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন ডিম্বাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির ভ্রূণ বিকশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী মাওপারটুইস 'মাতা-পিতার দ্বৈত' উত্তরাধিকার তত্ত্ব' ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

عَلَقَةٌ (আলাক্বা) রূপান্তরিত হয় مُضْغَةٌ (মুদগাহ)-তে, যার অর্থ হচ্ছে, 'যা চিবানো হয় (দাঁত দিয়ে)' এবং এমন আঁঠালো এবং ছোট যা গামের মত মুখে দেয়া যেতে পারে। এ উভয় ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. কেইথ মূর একটি প্লাস্টার মিল নিয়ে এটিকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের মত তৈরি করে

দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মুদগায় পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রক্রিয়াকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের চিত্রের সাথে তুলনা করেন। তিনি দেখেন চিবানো প্লাস্টার সিলে দাঁতের দাগ Somites-এর মত সাদৃশ্যপূর্ণ আর এটাই হল মেরুদণ্ডের প্রাথমিক গঠন।

এ مُضْغَةٌ (মুদগাহ) পরিণত হয় عِظَامٌ (ইযাম) বা হাড়ে। হাড়গুলোকে এক খণ্ড মাংস বা মাংসপেশি لَحْمٌ (লাহ্‌ম) পরানো হয়। এরপর আল্লাহ একে তৈরি করেন ভিন্ন সৃষ্টিতে।

অধ্যাপক মার্শাল জনসন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় বিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার থমসন জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দানিয়েল ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক ও জীবদেহের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Anatomy) বিভাগের প্রধান। তার নিকট ভ্রূণসংক্রান্ত কোরআনের আয়াতের 'ভ্রূণ তাত্ত্বিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলো সমকালীন কোন মত হতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'সম্ভবত মুহাম্মদ ﷺ-এর একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হল যে, কোরআন ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছে, আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বহু শতাব্দী পর। তখন তিনি হাসেন এবং স্বীকার করেন যে, প্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোন ক্ষুদ্র জিনিসকে ১০ গুণের বেশি বড় করে দেখাতে পারত না এবং পরিষ্কার ছবিও দেখাতে পারত না। তারপর তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ ﷺ যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন তাঁর ওপর ঐশী বাণী নাযিল হওয়ার বিষয়ে কোন বিরোধ দেখি না।'

ড. কেইথ মূরের মতে, বিশ্বজুড়ে গৃহীত আধুনিক কালের ভ্রূণবিষয়ক উন্নয়ন স্তর সহজে বোধগম্য নয়। কারণ, এতে স্তরগুলোকে সংখ্যাগতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, ১ম স্তর, ২য় স্তর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে স্তরগুলো ভ্রূণ অতিক্রম করে তার শ্রেণীবিভাগ কোরআনের বর্ণনানুসারে পার্থক্যসূচক এবং সহজেই এগুলোর আকার-প্রকৃতি চিহ্নিত করা যায়। এগুলো জন্মপূর্ব বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তিশীল ও বোধগম্য এবং বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও সাবলীল বর্ণনার ধারণাকারী।

নিচের আয়াতগুলোতেও মানুষের ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে–

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

অর্থ : সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? এরপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। (সূরা কিয়ামাহ : ৩৭-৩৯)

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ - فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ -

অর্থ : যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (সূরা ইনফিতার :৭-৮)

ভ্রূণ আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত

مُضْغَةٌ (মুদগা) অবস্থায় যদি ভ্রূণকে ছেদন এবং এর অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গকে কর্তন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এর অধিকাংশই গঠিত, কিন্তু অন্যান্য কিছু অংশ পুরোপুরি গঠিত হয় নি।

অধ্যাপক জনসনের মতে, ভ্রূণকে যদি আমরা একটি পূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে আমরা ঐ অংশটিকে বর্ণনা করছি– যা ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর যদি আমরা একে অপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে যে অংশ এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয় নি ঐ অংশের বর্ণনা করছি। সুতরাং ভ্রূণ কি পূর্ণ সৃষ্টি না অপূর্ণ সৃষ্টি? এক্ষেত্রে কোরআনের বর্ণনা অপেক্ষা ভ্রূণের উৎপত্তির স্তর সম্পর্কে আর কোন উত্তম বর্ণনা নেই। যেমন, কোরআনের নিম্নের আয়াতে 'আংশিক গঠিত হয়েছে' এবং 'আংশিক গঠিত হয় নি' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ -

অর্থ : আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। (সূরা হাজ্জ : ৬)

বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা জানি যে, বিকাশের প্রাথমিক স্তরে কিছু পার্থক্যমূলক কোষ এবং কিছু অপদার্থমূলক কোষ থাকে। অর্থাৎ কিছু অঙ্গ গঠিত এবং কিছু অঙ্গ এখনও গঠিত হয় নি।

শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি

বিকাশমান মানব ভ্রূণের সর্বপ্রথম শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটে। ভ্রূণ ২৮তম সপ্তাহের পর হতে শব্দ শুনতে পায়। পরবর্তীতে দর্শন ইন্দ্রিয় বিকাশ লাভ করে এবং ২৮তম সপ্তাহ পরে রেটিনা বা অক্ষিপট আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়।

ভ্রূণে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্পর্কিত কোরআনের নিম্নের আয়াতটি লক্ষ করা যাক :

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ -

অর্থ : আর তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর প্রদান করেন। (সূরা সাজদাহ : ৯)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থ : আর তিনিই তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (সূরা মুমিনূন ঃ ৭৮)

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। (সূরা আদদাহার : ২)

এ সকল আয়াতে দৃষ্টিশক্তির পূর্বে শ্রবণশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আধুনিক ভ্রূণ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে কোরআনের বর্ণনা পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩ সাধারণ বিজ্ঞান

আঙ্গুলের ছাপ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ. بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ـ

অর্থ : মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়সমূহকে একত্রিত করব না? হ্যাঁ, সক্ষম, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম। (সূরা কুরআন : ৩-৪)

অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন করে যে, মানুষ মরে গেলে হাড়গুলো মাটির মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এগুলোর পুনরুত্থান এবং বিচারের দিন পৃথক পৃথক সকল মানুষকে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ জবাব প্রদান করে বলেন যে, তিনি শুষ্ক হাড়গুলোকে জমা করা নয় বরং আমাদের আঙ্গুলের ছাপও যথার্থভাবে পুনরায় তৈরি করতে সক্ষম।

ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণের ব্যাপারে কোরআন কেন আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে কথা বলেছে? ১৮৮০ সালে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ট-এর গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে এমন দুজন ব্যক্তিও নেই যাদের আঙ্গুলের ছাপ সম্পূর্ণ একই রকম। এ কারণে বিশ্বব্যাপী পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে।

১৪০০ বছর পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের অনন্যতা সম্পর্কে কে জানত? অবশ্যই স্বয়ং স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানত না।

ত্বকে ব্যথা অনুভবকারী গ্রন্থির উপস্থিতি

একদা ধারণা করা হত যে, অনুভূতি ও ব্যথার উপলব্ধি মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। ঐ উপাদান ছাড়া ব্যক্তি ব্যথা অনুভব করতে পারে না।

আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষত সৃষ্টি হলে ডাক্তার যখন তার চিকিৎসা করেন তখন একটি সরু পিন দ্বারা পোড়ার মাত্রা পরীক্ষা করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার খুশী হন। কেননা, এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, পোড়ার ক্ষতটি অগভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ অক্ষত রয়েছে। পক্ষান্তরে রোগী ব্যথা অনুভব না করলে বুঝা যায় যে, পোড়ার ক্ষতটি গভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী কোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

কোরআন নিম্নের আয়াতে ব্যথা উপলব্ধিকারী গ্রন্থি বা কোষের অস্তিত্বের স্থাপনই ইঙ্গিত প্রদান করে–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا -

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। আর যখনই তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আমি পাল্টে দেব, নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : ৫-৬)

থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি (জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ তথা গ্রন্থি বা কোষের ওপর দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। প্রথম দিকে তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, এ বৈজ্ঞানিক সত্যটি কোরআন ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি কোরআনের এ বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন। অধ্যাপক তেজাসেন কোরআনের এ আয়াতটির বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতায় এতটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'কোরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক দিকদর্শনাবলি' বিষয়ের ওপর ৮ম সৌদি মেডিকেল কনফারেন্স প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ -

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

১৪. উপসংহার

কোরআন বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর উপস্থিতিকে সমকালে সংঘটিত কোন ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা সাধারণ জ্ঞান ও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে কোরআনের আয়াতসমূহের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতাই কোরআনের উন্মুক্ত ঘোষণার নিশ্চয়তা প্রদান করে ঃ

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন। (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

কোরআনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, এটি আল্লাহর বাণী। ১৪০০ বছর পূর্বে কোন মানুষের দ্বারা এমন বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি সম্বলিত কোন বই লেখা সম্ভব ছিল না– যেসব সত্য মানুষের দ্বারা শতশত বছর পর আবিষ্কৃত হবে।

যাহোক, কোরআন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয় বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এ নিদর্শনাবলি মানুষকে পৃথিবীতে তার অবস্থানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে আহ্বান জানায়। কোরআন যথার্থভাবেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক আল্লাহর পয়গাম বা বাণী। এতে আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম রয়েছে যার প্রতি সকল নবী-রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আদম (আ), মুসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ ﷺ অন্যতম।

'কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' বিষয়ের ওপর বহু বৃহৎ গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা চলছে। ইনশাআল্লাহ এ গবেষণা মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ পুস্তিকায় কোরআনের অল্প কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি বিষয়টির ওপর পূর্ণ ইনসাফ করতে পেরেছি বলে দাবি করছি না।

অধ্যাপক তেজাসেন কোরআনে উল্লিখিত একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের শক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোরআন যে আসমানী গ্রন্থ তা নিশ্চিত হতে প্রমাণস্বরূপ কারো প্রয়োজন হতে পারে ১০টি নিদর্শন, আবার কেউ হয়তো ১০০টি নিদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে, আবার কেউ ১০০০টি নিদর্শন দেখেও সত্য (ইসলাম) গ্রহণ করবে না। কোরআনে নিচের আয়াতে এ ধরনের বদ্ধ

মানসিকতার নিন্দা করেছে–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ـ

অর্থ : এরা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং এরা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না। (সূরা বাকারাহ : ১৮)

ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কোরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত! স্রষ্টার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল পথনির্দেশ কে প্রদান করতে পারে?

আমি প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন। আমি তাঁর ক্ষমা ও হেদায়াত কামনা করি।

বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

CONCEPT OF GOD IN MAJOR RELIGIONS

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

এফ.এম, এম.কম.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক : শব্দে শব্দে আল-কুরআন

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মুখবন্ধ

আমাদের (বর্তমান) সভ্যতার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো বিরাট সংখ্যক ধর্ম এবং নৈতিক নিয়ম-পদ্ধতির উপস্থিতি। মানবজাতি সর্বযুগেই সৃষ্টির কার্যকারণ এবং বস্তু সৃষ্টির পরিকল্পনায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল।

স্যার আর্নল্ড টয়েনবি বিভিন্ন যুগের মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন এবং এর ফলাফল ১০ খণ্ডে বিভক্ত এক স্মরণীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর অধ্যয়নের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মই মানব ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে। The observer ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ পত্রিকায় তিনি লিখেন−

'আমি এ বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করেছি যে, মানব অস্তিত্বে রহস্যময় ভূমিকা পালন করে ধর্ম।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'ধর্ম' অর্থ 'অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিতে বিশ্বাস, বিশেষত ব্যক্তিগত দেব-দেবীতে বিশ্বাস, যাকে পূজা-উপাসনা করা ও আনুগত্য করা বলা যায়।'

একটি সর্বজনীন 'খোদায়' বিশ্বাস করা অথবা একটি অতি প্রাকৃতিক সর্বোচ্চ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তৃপক্ষে বিশ্বাস প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীরাও মনে করে যে, তারা যে খোদার পূজা করে সে একই খোদার পূজা অন্যেরাও করে। মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডিয় মতবাদ এবং অন্যান্য ধর্মহীন মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ সংগঠিত ধর্মসমূহের মূলোৎপাটনে আক্রমণ চালিয়েছেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কমিউনিজম যখন অনেক দেশেই বিস্তার লাভ করেছিল তখন তারাও ধর্মকে একই অভিধায় চিহ্নিত করে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে।

যা হোক, ধর্ম মূলত মানবীয় অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে−

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন, তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, যেন কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক সাব্যস্ত না করি। এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে; যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা অবশ্যই মুসলিম (আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পিত)। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

বিভিন্ন ধর্মের সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলে আমার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, এ অধ্যয়ন আমার বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানবাত্মাকে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এমন যে, সে স্রষ্টার অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়, নচেৎ সে স্রষ্টার বিপরীত সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। অন্য কথায় আল্লাহতে বিশ্বাস কোনো শর্ত সাপেক্ষ নয়, আল্লাহতে-বিশ্বাস বাতিলকরণ-ই শর্ত সাপেক্ষ।

২. বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর শ্রেণিবিন্যাস

বিশ্বের ধর্মসমূহকে প্রথমত দুটো শ্রেণিতে বিন্যাস করা যায়– সেমিটিক ও নন-সেমিটিক। নন-সেমিটিক ধর্মগুলোকে আবার আর্য এবং অনার্য এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

সেমিটিক ধর্মসমূহ

সেমিটিক ধর্মগুলো এমন ধর্ম যেগুলোর উদ্ভব ঘটেছে মূলত সেমিটীয় তথা হিব্রু, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে। বাইবেলের বর্ণনানুসারে নূহ (আ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'শাম'। শাম-এর বংশধরগণ 'সেমিটীয়' নামে পরিচিত। সুতরাং সেমিটিক ধর্মগুলোর উৎপত্তি হয়েছে ইহুদি, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয়দের মধ্যে। প্রধান প্রধান সেমিটিক ধর্মগুলো হলো– ইহুদি মতবাদ, খ্রিস্টীয় মতবাদ এবং ইসলাম। এ ধর্মগুলো পয়গাম্বরীয় ধর্ম যা আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক আনীত স্বর্গীয় নির্দেশনায় বিশ্বাসী।

নন-সেমিটিক ধর্মসমূহ

এটাকে আবার এরিয়াল বা আর্য এবং নন-এরিয়াল বা অনার্য এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

আর্য ধর্মসমূহ

আর্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি আর্য জাতির মধ্যেই, যারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। এরা খ্রিস্ট পূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ইরান এবং উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

আর্য ধর্মগুলো আবার বৈদিক ও অবৈদিক এ দু'ভাগে বিভক্ত। বৈদিক ধর্মকে 'হিন্দুবাদ' বা 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। আর অবৈদিক ধর্মগুলো হলো– শিখবাদ, বুদ্ধবাদ, জৈনবাদ ইত্যাদি। সবকটি আর্য ধর্মই অপয়গাম্বরীয় ধর্ম অর্থাৎ কোনো নবী-রাসূল কর্তৃক এসব ধর্ম প্রবর্তিত হয় নি।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মও একটি আর্য ও অবৈদিক ধর্ম যা হিন্দুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ ধর্মের দাবী হলো যে, এটা পয়গাম্বরীয় ধর্ম।

অনার্য ধর্মসমূহ

অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকারে হয়েছে। 'কনফুসীয়' ও 'তাও'বাদের উৎপত্তি হয়েছে চিনে। কিন্তু শিন্টো ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে জাপানে। এসব অনার্য ধর্মসমূহে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। এসব ধর্মকে মূলত কিছু কিছু নৈতিক নিয়মাবলির সমাহার বলাই ভালো।

কোন ধর্মে আল্লাহ'র যথার্থ সংজ্ঞা

কোনো ধর্মের অনুসারীদের 'আল্লাহ' সম্পর্কিত ধারণা কি, তা তাদের ব্যবহারিক জীবনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিচার করা যায় না। এটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার যে, অনেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কী বর্ণনা আছে তা জানে না। অতএব কোনো ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কী ধারণা দেয়া আছে সেটাই বিশ্লেষণ করা উত্তম।

তা হলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত যে ধারণা দেয়া সেটাই এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

৩. হিন্দুধর্মে 'আল্লাহ' সম্পর্কে ধারণা

আর্য ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। 'হিন্দু' শব্দটি মূলত একটি ফারসি শব্দ। সিন্দু উপত্যকার আশে-পাশে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়। সে যাই হোক হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদে বিশ্বাস সম্বলিত

একটি সাধারণ ধর্ম। যার অধিকাংশ 'বেদ, 'উপনিষদ', এবং শ্রীমৎ 'ভগবতগীতা' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল।

হিন্দুধর্মে 'আল্লাহ' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। বস্তুত অধিকাংশ হিন্দুই এ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কতেক হিন্দু তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কিছু হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও বিশ্বাসী অর্থাৎ ৩ শত ৩০ মিলিয়ন দেবতা। তবে শিক্ষিত হিন্দুরা যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তারা বলে যে, একজন হিন্দুর উচিত এক ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এক ঈশ্বরের পূজা করা।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধিতে। সাধারণভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ তথা সর্বভূতে ঈশ্বর অর্থাৎ সবকিছুতে ঈশ্বর আছেন– এ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সর্বেশ্বরবাদের মূলকথা হলো জৈব অজৈব সব কিছুই ঐশ্বরিক এবং পবিত্র। তাই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীবজন্তু এমনকি মানব প্রজাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করে এবং সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর।

অপরদিকে ইসলাম মানুষকে ধারণা প্রদান করে যে, মানুষ নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টির নমুনা মাত্র– এসব কিছু আল্লাহ নয়। অন্য কথায় আমরা বিশ্বাস করি সবকিছুর মালিক আল্লাহ। গাছপালা, সূর্য-চন্দ্র এবং এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো apostrophe 's' অর্থাৎ হিন্দুরা বলে, 'সবকিছুই ঈশ্বর' আর মুসলিমরা বলে, 'সবকিছুই আল্লাহ'র।

পবিত্র কুরআন বলে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ ـ

অর্থ : এসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যেকার একটি সাধারণ বিষয়ে। প্রথম সাধারণ বিষয় হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

অতএব আসুন আমরা হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে তা থেকে উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যগুলো বের করার চেষ্টা করি।

শ্রীমৎ ভগবতগীতা

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো 'শ্রীমৎ ভগবতগীতা'। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক দেখুন–

"ঐ সব লোক যাদের বুদ্ধি মেধা বস্তুতান্ত্রিক ইচ্ছে কর্তৃক আচ্ছন্ন, তারা সাকার ঈশ্বরের অনুগত এবং তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে।" (ভগবতগীতা অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০)

গীতা সিদ্ধান্ত দেয় যে, যারা বস্তুবাদী তারা সাকার ঈশ্বরের পূজা করে অর্থাৎ সত্যিকার নিরাকার ঈশ্বরের পাশাপাশি সাকার ঈশ্বরের পূজা করে।

উপনিষদ

হিন্দুরা উপনিষদকেও পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো দেখুন :

১. "একম ইভাদ্বিতীয়ম" অর্থাৎ 'তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া'। (Chandgya উপনিষদ ৬ : ২ : ১)

২. "তার কোনো মাতা-পিতা নেই, কোনো প্রভুও নেই।"
(Svetasa vatara উপনিষদ) দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৬৩)

৩. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোও লক্ষ করুন :
"তাঁর মতো কিছুই নেই।"
(Svetasa vatara উপনিষদ অধ্যায় ৪ : ১৯)
"তাঁর মতো কিছু নেই যার নাম মহিমাময় উজ্জ্বল।"
(The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ. ৭৩৬ ও ৭৩৭)
(প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলি ভলিউম ১৫, উপনিষদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)
উপর্যুক্ত শ্লোকগুলোর সাথে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তুলনা করুন−

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : তাঁর সদৃশ কিছু নেই [কেউ নেই]।(সূরা ইখলাস : ৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থ : কোনো কিছুই এমন নেই যা তাঁর মত হতে পারে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা : ১১)

৪. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো আল্লাহর প্রকৃত রূপ ধারণ করতে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে−
"তাঁর রূপ দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখে দেখে নি ; যারা হৃদয় ও আত্মা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করে, তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারাই অমরত্ব লাভ করে।"(Svetas vatara উপনিষদ, ৪ : ২০)

পবিত্র কুরআন উপর্যুক্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশ করে−

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুবিজ্ঞ। (সূরা আন্'আম : ১০৩)

বেদ

হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বেদ' সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। তাদের প্রধান 'বেদ' ৪টি− ঋগবেদ, আয়ুর্বেদ, শ্যামবেদ ও অথর্ববেদ।

১. আয়ুর্বেদ

ক. আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন : 'তার কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই।' (আয়ুর্বেদ ৩২ : ৩)

এতে আরো উল্লিখিত হয়েছে−

"যেহেতু তিনি কিছু থেকে, কারো থেকে জন্ম নেন নি, তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।"

"তাঁর কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, তাঁর মহিমা অত্যন্ত মহান। তিনি তাঁর মধ্যে সকল উজ্জ্বল বস্তু ধারণ করেন। যেমন সূর্য। তিনি যেন আমার অকল্যাণ না ঘটান− এটাই আমার প্রার্থনা। যেহেতু তিনি কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেন নি। তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।" (আয়ুর্বেদ : দেবীচাঁদ এম. এ. পৃ. ৩৭৭)

খ. "তিনি নিরাকার এবং পবিত্র।" (আয়ুর্বেদ ৪০ : ৮)

"তিনি আলোময়, নিরাকার, নিস্পৃশ্য, পবিত্র, যাকে শয়তান বিদ্ধ করতে পারে না; তিনি অদৃশ্য, প্রাজ্ঞ, পরিবেষ্টনকারী; তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি যখন যা ইচ্ছে তা-ই করেন, তিনি চিরঞ্জীব।' (আয়ুর্বেদ ৪০ : ৮) (আয়ুর্বেদ সংহিতা : আই. এইচ গ্রীফিথ পৃ. ৫৩৮)

গ. আয়ুর্বেদে আরো উল্লিখিত আছে− "তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে; যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি। তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়− যারা 'শম্ভূতি'র উপাসনা করে। 'শম্ভূতি' হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা ইত্যাদি। (আয়ুর্বেদ ৪০ : ৯)

ঘ. আয়ুর্বেদে এ প্রার্থনা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

"আমাদের ভালো পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের পাপরাশি মুছে ফেলুন যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে।" (আয়ুর্বেদ ৪০ : ১৬)

২. অথর্ববেদ

অথর্ববেদের এ শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন : "দেব মহা অসি" অর্থাৎ ঈশ্বর অত্যন্ত মহান। (অথর্ববেদ ৩০ : ৫৮ : ৩)

"যথার্থই তুমি আলোময়, তোমার প্রকাশ মহান : তুমিই সত্য, অদ্বিতীয়, তোমার প্রকাশ মহান, যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত, সত্যই মহান তোমার প্রকাশ, হে ঈশ্বর!"

(অথর্ববেদ সংহিতা ভলিউম ২ উইলিয়াম সাইট হুইটনি, পৃ. ৯১০)

কুরআন মাজীদের সূরা রা'দ-এ একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে–

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ـ

অর্থ : তিনিই একমাত্র মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ : ৯)

ঋগবেদ

ক. সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো ঋগবেদ। হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ঋগবেদে বর্ণিত আছে যে, 'জ্ঞানী ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে।' (ঋগবেদ ১ : ১৬৪ : ৪৬)

খ. ঋগবেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কমপক্ষে ৩৩টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগ উল্লিখিত হয়েছে ঋগবেদ ২য় পুস্তকে ১ম শ্লোকে।

ঋগবেদে উল্লিখিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ 'স্রষ্টা'। এ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'খালিক'।

'ব্রহ্মা'দ্বারা Creator বা 'স্রষ্টা' নেয়া হলে এবং এর দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বুঝালে মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মুসলমানরা কখনো এমত সমর্থন করে না যে, 'ব্রহ্মা'-ই স্রষ্টা বা খালিক যার মাথা ৪টি। (আমরা এ বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।) মুসলমানরা এর চরম ব্যতিক্রমী মত পোষণ করে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 'নরবিজ্ঞান' শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রকাশ করা স্বয়ং আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত বক্তব্যেরও পরিপন্থী–

'ন তস্যৎ প্রতিমা অস্তি' অর্থাৎ 'তার কোনো সদৃশ বা প্রতিমা নেই।' (আয়ুর্বেদ ৩২ : ৩)

ঋগবেদ দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম চরণ শ্লোক ৩ (আর বি ২ : ১ : ৩)-এ উল্লিখিত হয়েছে 'বিষ্ণু' অর্থাৎ 'প্রতিপালক' যার আরবি প্রতিশব্দ 'রব' এতেও মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 'রব' 'সাসটেইনার' বা 'বিষ্ণু' নামে ডাকা হবে। কিন্তু হিন্দুদের সর্বজনীন ধারণা বিষ্ণুর হাত চারটি। তিনি ডান দিকের এক হাতে 'চক্র' (ভারী চাকা), আর বাম দিকের এক হাতে 'কঞ্চ (শামুক) ধারণ করে আছেন। তিনি একটি পাখির উপর অথবা সর্পাসনে উপবেশন করে আছেন। মুসলমানরা কখনো ঈশ্বরের এমন ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। উপরোল্লিখিত বিশ্বাসও আয়ুর্বেদের অধ্যায় ৪০ শ্লোক ১৯-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

গ. ঋগবেদের নিম্নোক্ত শ্লোক লক্ষণীয়–

"বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর।" (ঋগবেদ ৮ : ১ : ১)

[ঋগবেদ সংহিতি Vol-9) পৃ. ১ ও ২ স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার]

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মস্তত্র

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মস্তত্র হলো– 'একম ব্রহ্মা, দ্বিতীয়া ন্যস্ত নেহন ন্যস্ত কিঞ্চন।' অর্থাৎ 'ঈশ্বর এক–দ্বিতীয় নেই। মোটেই নেই মোটেই নেই, একেবারেই নেই।' যা হোক হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত বিষয়ের মাধ্যমে আমরা হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম।

৪. শিখ ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

শিখ ধর্ম একটি অসেমিটিক, আর্য ও অবৈদিক ধর্ম। এটা যদিও প্রধান ধর্মসমূহের তালিকাভুক্ত নয়; কিন্তু এটা হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত। এটা সংগঠিত হয়েছে পাকিস্তানের এলাকায় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে, যা পঞ্চনদের অববাহিকা। গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্রে) হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি গভীরভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

'শিখ' এবং 'শিখবাদ'-এর সংজ্ঞা

'শিখ' শব্দটি 'শিষ্য' শব্দটি থেকে উদ্ভূত। শিষ্য অর্থ ভক্ত বা অনুসারী। 'শিখ' ধর্ম দশজন গুরুর ধর্ম। প্রথম গুরু হলেন গুরু নানক এবং ১০ম ও শেষ গুরু হলেন গুরু গোবিন্দ শিং। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ শ্রী গুরুগ্রন্থ যাকে 'আদি গ্রন্থসাহেব'ও বলা হয়ে থাকে।

পাঁচ 'ক'

প্রত্যেক 'শিখ'-কে পাঁচ 'ক' ধারণ করতে হয়, যা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি বহন করে।

১. 'কেশ'– অকর্তিত কেশ বা চুল, যা সকল গুরুই রাখে।
২. 'কঙ্গ'– চিরুনী যা চুলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবহার করা হয়।
৩. 'কাদা'– লোহা বা অন্য ধাতুর তৈরি বালা বা কঙ্কন, যা শক্তি-ক্ষমতা বা আত্মসংযমের প্রতীক।
৪. 'কৃপাণ' – ত্রিফলা খঞ্জর যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।
৫. 'কাচ্চা' – জানু পর্যন্ত লম্বা অন্তর্বাস বিশেষ যা কর্মতৎপরতার পক্ষে সুবিধাজনক।

মূলমন্ত্র : শিখ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের শুরুতে 'মূলমন্ত্র' উদ্ধৃত করে থাকে– এটা তাদের মৌলিক বিশ্বাস, যা গুরু গ্রন্থ সাহেব-এর শুরুতে উল্লিখিত আছে।

গুরুগ্রন্থ সাহেব–ভলিউম-১, জাপূজী-এর প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে–

"ঈশ্বর মাত্র একজন যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে ঊর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়।"

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। এ ধর্ম এই সার্বভৌম বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যাকে 'এক ওমকারা' বলে।

'ওমকারা' পরিচয় প্রকাশে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে–

'করতার'– স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

'সাহিব' – প্রভু।

'অকাল'– আদি-অন্তহীন।

'সত্যনামা'– পবিত্র নাম।

'পরওয়ারদিগার'– প্রতিপালক।

'রহীম' – দয়াময়।

'করিম'– সদাশয়।

তাঁকে 'ওয়াহি গুরু' অর্থাৎ একক সত্য ঈশ্বরও বলা হয়। শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একত্ববাদ হলেও তা 'অবতারবাদ'-এ বিশ্বাস করে না। 'অবতারবাদ' হলো ঈশ্বরের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন সংক্রান্ত মতবাদ। তাদের মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো 'অবতার রূপে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন না। তারা মূর্তি পূজারও ঘোর বিরোধী।

গুরু নানক কবীর কর্তৃক প্রভাবিত

গুরু নানক 'কবীর' নামক এক মুসলিম সাধক-এর শিক্ষায় প্রভাবিত হন। 'শ্রী গুরু নানক সাহেব'-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে সাধক কবীর রচিত চরণগুলো উল্লিখিত আছে। কয়েকটি চরণ নিচে উল্লিখিত হলো–

"দুঃখ মেঁ সুমিরানা সব করেঁ সুখ মেঁ করেঁ

না কয়া জু সুখ মেঁ সুমিরানা করেঁ তু দুখ কায়ে হুয়ে"।

অর্থাৎ, বিপদে পড়লে সবাই স্রষ্টাকে স্মরণ করে, কিন্তু শান্তি ও সুখের সময় কেউ তাঁর স্মরণ করে না। যে শান্তি ও সুখের সময় তাঁকে স্মরণ করবে তার কেন বিপদ হবে?"

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াত উপরোক্ত চরণের সাথে তুলনা করুন–

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ
نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوْآ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۔

অর্থ : আর যখন মানুষের ওপর কোন দুঃখ-দৈন্য এসে পড়ে তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে একনিষ্ঠভাবে তার অভিমুখী হয়ে; অতঃপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ভুলে যায় সে কথা, যার জন্য পূর্বে তাকে ডাকছিল এবং আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে, যাতে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে। (আল কুরআন–৩৯ : ৮)

৫. জরথুস্ত্রীয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

জরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রাচীন আর্য ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধর্মমতের অনুসারীর সংখ্যা কম হলেও সারা বিশ্বে এর অনুসারির সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কম নয়। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি। ইরানি নবী জরস্টারকে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়। এ ধর্ম 'পারসি ধর্ম' হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো 'দসতির' ও 'আবেস্তা'। জরথুস্ত্রীর ধর্মে 'ঈশ্বর' 'আহুরা মাজদা' নামে পরিচিত। 'আহুরা' অর্থ প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ প্রাজ্ঞ। আর তাই 'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু'। 'আহুরা মাজদা' দ্বারা এক অদ্বিতীয় প্রভুকে বুঝানো হয়ে থাকে।

দসতীর অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

দসতীর অনুসারে 'আহুরা মাজদার' নিম্নের গুণাবলি রয়েছে–

১. তিনি একক।
২. কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।
৩. তিনি আদি অন্তহীন।
৪. তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই।
৫. তাঁর কোনো আকার-আকৃতি নেই।
৬. দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না এবং কল্পনা শক্তিও তাঁকে আয়ত্ত করতে অক্ষম।
৭. তিনি মানবীয় ধারণা-কল্পনার বহু উর্ধ্বে।
৮. তিনি মানুষের নিজের চেয়েও নিকটতর।

'আবেস্তা' অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

'আবেস্তা'-তে 'গাথা' ও 'ইয়াসনা' আহুরা মাজদা'র যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা হলো–

১. সৃষ্টিকর্তা
(ইয়াসনা ৩১ : ৭ ও ১১) (ইয়াসনা ৪৪ : ৭) (ইয়াসনা ৫০ : ১১)
(ইয়াসনা ৫১ : ৭)
২. সর্বশক্তিমান– শ্রেষ্ঠ
(ইয়াসনা ৩৩ : ১১), (ইয়াসনা ৪৫ : ৬)
৩. করুণাময়– 'হুদাই'
(ইয়াসনা ৩৩ : ১১ (ইয়ানা ৪৮ : ৩)
৪. দানশীল – 'স্পেন্তা'
(ইয়াসনা ৪৩ : ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) (ইয়াসনা ৪৪ : ২)
(ইয়াসনা ৪৫: ৫) (ইয়াসনা ৪৬ : ৯) (ইয়াসনা ৪৮ : ৩)

৬. ইয়াহূদি ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইয়াহূদি ধর্ম প্রধান সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এর অনুসারীদেরকে 'ইয়াহূদি' নামে অভিহিত করা হয়। তারা নিজেদেরকে মূসা (আ) প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে।

১. নিম্নোক্ত শ্লোকটি বাইবেল 'পুরাতন নিয়ম' -এর 'ডিওটারেনমি' অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা (আ)-এর উপদেশনামা থেকে গৃহীত।

"শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইশাদ।"

এটা একটা হিব্রু ভাষার বাইবেল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত শ্লোক। এর অর্থ– "ইসরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক।" (বাইবেল, ডিওটারেনমি ৬ : ৪)

২. বাইবেলের 'ঈসাইয়্যাহ' অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন–

"আমি, আমিই একমাত্র প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোনো ত্রাণকর্তা নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩ : ১১)

৩. "আমি-ই প্রভু, এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৫ : ৫)

৪. "আমি-ই ঈশ্বর এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই; আমি-ই ঈশ্বর এবং আমার সদৃশ কেউ নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৬ : ৯)

৫. ইয়াহূদি ধর্মে প্রতিমা পূজাকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে–

"আমার পাশাপাশি তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূগর্ভে জলে আছে এমন কোন কিছুর সদৃশ স্থির করবে না; তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না, আর না তাদের দর্শন করবে; কেননা আমি-ই একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর....।" (বাইবেল, এক্সোডাস ২০ : ৩-৫)

৬. বাইবেলের ডিওটারোনমিতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে–

"আমার পাশাপাশি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি কোনো কিছুর প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে, পৃথিবীতে অথবা ভূগর্ভে জলে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুর সদৃশ তৈরি করবে না; এসবের সামনে তুমি কখনো বিনীত হবে না, আর তাদের উপাসনাও করবে না; কেননা, আমি একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর....।" (বাইবেল, ডিওটারোনমি ৫ : ৭ - ৯)

৭. খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

খ্রিস্টধর্মও একটি সেমিটিক ধর্ম। খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে সারা বিশ্বে দুই শত কোটি অনুসারী রয়েছে। যীশু খ্রিস্ট তথা ঈসা (আ)-এর নামানুসারে খ্রিস্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্ট

ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ইসলামে ঈসা (আ)-এর মর্যাদা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১. অ-খ্রিস্টান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যাতে ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস পোষণ ঈমান তথা বিশ্বাসের মৌলিক নীতি হিসেবে মনে করা হয়। ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোনো মুসলিম-ই পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না।

২. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহ তাআলার একজন মর্যাদাশালী নবী ছিলেন।

৩. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কোনো পুরুষের সংস্রব ছাড়া অলৌকিকভাবে পিতৃবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন, যা আধুনিকালের অনেক খ্রিস্টান মানতে চান না।

৪. আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন।

৫. আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে সক্ষম ছিলেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ই যদি ঈসা (আ)-কে ভালোবাসে ও সম্মান করে, তাহলে উভঁয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ)-কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম স্বীকার করে না। খ্রিস্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, ঈসা (আ) কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সম্বলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন 'আমি ঈশ্বর' অথবা 'আমাকে উপাসনা করো।' বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাক বাইবেলে উদ্ধৃত তার বাক্যগুলোতে কী আছে–

"My Father is Greater than I."

"আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।" (যোহন ১৪ : ২৮)

"My Father is Greater than all."

"আমার পিতা সকলের চেয়ে মহান।" (যোহন ১০ : ২৯)

"...I cast out devils by the spirit of God..."

"...আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে...।"(মথি ১২ : ২৮)

"...with the finger of God cast out devils..."

"...ঈশ্বরের সাহায্যেই আমি মন্দ দূর করি।" (লূক ১১ : ২০)

'আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি তেমন-ই বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কেননা আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে চাই না, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার ইচ্ছে অনুসারেই আমি কাজ করতে চাই।'

যীশু খ্রিস্টের মিশন – তিনি এসেছিলেন আইনকে পূর্ণ করতে

যীশু কখনো নিজের ঐশ্বরিকতার দাবি করেন নি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে 'ঈশ্বর' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে দাবি করেন নি। তিনি তাঁর মিশনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন। ইতিপূর্বেকার কিতাব তাওরাতকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন, যা ইয়াহূদিদের হাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মথি লিখিত সুসমাচারের (Gospel) নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

"তোমরা মনে করো না যে, আমি আইন তথা মূসা (আ)-এর তাওরাতের বিধান অথবা নবীদের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি। আমি ধ্বংস করতে আসি নি, বরং সেসব পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি – আকাশ ও পৃথিবী যতদিন চলতে থাকবে ততদিন সেই বিধানের কোনো একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়।"

"অতঃপর যে কেউ এ সব বিধানের ছোট একটি বিধানও অমান্য করবে এবং মানুষকে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে ছোট মনে করা হবে। অপরদিকে যে কেউ বিধানসমূহ পালন করবে এবং মানুষকে তা পালন করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান মনে করা হবে।" (বাইবেল মথি ৫ : ১৭-২০)

যিশু ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ

বাইবেল নিচের শ্লোকগুলোতে যিশুর মিশনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে–

"...and the word which ye hear is not mine, but the Father's which has sent me."

অর্থ : "...এবং তোমরা যা আমার থেকে শোনো, তা-তো আমার কথা নয়, বরং সেসব কথা পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (বাইবেল যোহন ১৪ : ২৪)

"And this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Christ, whom thou has sent."

অর্থ : "এবং এটাই শাশ্বত জীবন যে, তারা তোমাকে তথা সত্য ঈশ্বরকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রিস্টকে জানবে।" (বাইবেল যোহন ১৭ : ৩)

যিশু তার ওপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লিখিত নিচের ঘটনার প্রতি লক্ষ করুন–

"And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"

And he said unto him–

"Why callest thou me good? There is none good but one, that is God; but if thou will enters into life, keeps the commandments."

অর্থ : 'এবং, দেখো, একজন লোক আসলো এবং যিশুকে বললো– ওহে ভালো প্রভু! আমাকে এমন ভালো কাজ সম্পর্কে বলুন, যা করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো।'

যিশু তাকে বললেন,

'আমাকে ভালো বলছো কেন, এক ছাড়া কেউ ভালো নেই, আর তিনি হলেন 'ঈশ্বর'; তুমি যদি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও, তবে তাঁর সব আদেশ পালন করো।'

এ বিবরণ দ্বারা যিশুর 'ঈশ্বর' হওয়া সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের মতবাদ এবং যিশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে।

যিশু মানবজাতির চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। (বাইবেল মথি ৫ : ১৭-২০)

নাজারাথবাসী যিশু – ঈশ্বরের মনোনীত এক মানুষ

বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ ইসলামি এ বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে, যিশু আল্লাহ্র নবী ছিলেন–

"Ye men of Israel, hear these words : Jesus of Nazareth, man approaved of God among you by miracles and wonders and sings, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know."

অর্থ : 'হে ইসরাঈলীরা এ কথাগুলো শোনো : নাজারাথবাসী যিশু ঈশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের অলৌকিক, আশ্চর্যজনক নিদর্শন। ঈশ্বর তার দ্বারা যা করেছেন তা তোমাদের মধ্য থেকেই করেছেন যা তোমরা নিজেরাই জানো।'

সর্বপ্রথম নির্দেশ– ঈশ্বর এক-অদ্বিতীয়

বাইবেল খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ কখনো সমর্থন করে না। একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যিশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোন্‌টি? এর

উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা (আ) বলেছিলেন–

'শামা ইসরাঈলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত'

এটা একটা হিব্রু উদ্ধৃতি যার অর্থ হলো–

'হে ইসরাঈলীরা শোনো! আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু।' (মার্ক ১২ : ২৯)

৮. ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইসলাম একটি সেমিটিক ধর্ম। সারা বিশ্বে ইসলামের একশত বিশ কোটি অনুসারী রয়েছে। 'ইসলাম' অর্থ আল্লাহর ইচ্ছেতে আত্মসমর্পণ। মুসলমান কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করে, যা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর নাযিল করা হয়েছিল। ইসলাম বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে একত্ববাদের দাওয়াত এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জবাবদিহিতার বার্তা নিয়ে তাঁর দূত এবং নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম অতীতকালের সকল নবী-রাসূল তথা আদম (আ) থেকে নিয়ে যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের সকলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে তার বিশ্বাসের মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), মূসা (আ), দাউদ (আ), ইয়াহ্ইয়া (আ) ও ঈসা (আ) এবং অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)।

আল্লাহর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঈশ্বর তথা আল্লাহর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে কুরআন মাজীদের ১১২ নং সূরা ইখলাসের চারটি আয়াতের মাধ্যমে–

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - বলুন, তিনি আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)।

২. اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - তিনি কাউকে জন্মদান করেন নি, কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি।

৪. لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস : ১-৪)

এ সূরায় উল্লিখিত 'আস-সামাদ' আরবি শব্দটির যথার্থ অনুবাদ একটু কঠিন। তবে এর মূল অর্থের কাছাকাছি অর্থ হলো Absolute existence অর্থাৎ পরম অস্তিত্ব।

এটা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্থায়ী ও শর্তসাপেক্ষ। এ শব্দ দ্বারা এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং সকল ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর ওপরই নির্ভরশীল এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সূরা ইখলাস–ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরা ইখলাসকে (সূরা : ১১২) কুরআন মাজীদের কষ্টিপাথর বলা যায়। গ্রিক ভাষার 'থিও' অর্থ ঈশ্বর আর 'লজি' অর্থ জ্ঞানার্জন। 'থিওলজি' অর্থ ঈশ্বর তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত বিদ্যা। সূরা ইখলাসের এ চারটি লাইন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক উপাস্যের দাবিদারকে অবশ্যই এ সূরার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হবে। আল্লাহর যে পরিচয় এ সূরায় দেয়া হয়েছে, তার আলোকে মিথ্যা দেব-দেবী এবং ঐশ্বরিকতার দাবিদারদের মিথ্যা দাবি অত্যন্ত সহজেই নাকচ হয়ে যায়।

মানুষের ঈশ্বর হওয়ার দাবি সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

ভারতীয় উপমহাদেশ হলো মানব-ঈশ্বরের দেশ। এটা এজন্য যে, এখানে তথাকথিত আধ্যাত্মিক গুরুর সংখ্যা অগণিত। এ সমস্ত 'বাবা' এবং 'গুরু'র অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করাকে ইসলাম নিন্দা করে।

মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান বুঝার জন্য এরূপ এক মানব-ঈশ্বর 'ভগবান রজনীশ' সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। রজনীশ হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু। ১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে 'রজনীশপূরম' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষানলে পড়েন ও গ্রেফতার হন। অবশেষে তিনি সে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তার জন্মভূমি 'পুনা'-তে 'ওশো' নামে আরেকটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওশোতে রজনীশের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানবরূপ তথা অবতার। একজন পর্যটক 'ওশো' জনপদে ভ্রমণ করলে দেখতে পাবে যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর সমাধি-ফলকে পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে যে,

'ওশো রজনীশ কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি কেবল পৃথিবী গ্রহটি পরিদর্শন করে গেছেন– ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।'

তারা সম্ভবত এটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর ২১টি বিভিন্ন দেশের ভিসা দেয়া হয় নি। রজনীশের অনুসারীরা এটাকে কোনো সমস্যা হিসেবে

মনে করে নি যে, 'পৃথিবী ভ্রমণকারী অবতার' বলে বিশ্বাস করে তাকে কোন দেশে প্রবেশ করার জন্য সে দেশের অনুমতি তথা ভিসার প্রয়োজন হয়।

চলুন, ভগবান রজনীশের 'অবতার' হওয়ার দাবিকে সূরা ইখলাসের কষ্টিপাথরে ফেলে পরীক্ষা করা যাক।

১. প্রথম মানদণ্ড হলো– "বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।" রজনীশ কি এক ও অদ্বিতীয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, 'না'। রজনীশের মতো অনেকেই ঈশ্বরের অবতার হওয়ার দাবি করেছে। রজনীশের কয়েকজন শিষ্য এখনো এ দাবির উপর অটল রয়েছে যে, রজনীশ এক ও অদ্বিতীয়।

২. দ্বিতীয় মানদণ্ড হলো– 'আল্লাহ পরম অস্তিত্বশীল ও মুখাপেক্ষীহীন।' নিশ্চয়ই রজনীশ পরম অস্তিত্বশীল ছিলেন না, কেননা তিনি ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। রজনীশের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও পুরাতন শিরদাঁড়ার ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আমেরিকান সরকার তাঁকে কারাগারে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করেছেন এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবে দেখুন সর্বশক্তিমান ভগবানকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে! সুতরাং রজনীশ যেমন চিরঞ্জীব ছিলেন না, তেমনি তিনি মুখাপেক্ষীহীনও ছিলেন না।

৩. তৃতীয় মানদণ্ড হলো– 'আল্লাহ্ কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেন নি।' আমরা জানি যে, রজনীশ ভারতের জবলপুরে এক পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে তাঁরা উভয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি 'রজনীশপূরম' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষানলে পড়েন এবং অবশেষে গ্রেফতার হয়ে সে দেশত্যাগে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন এবং পুনাতে তাঁর অনুসারীদের জন্য 'ওশো' নামে একটি জনপদ গড়ে তোলেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনুসারীরা তাকে 'সর্বশক্তিমান ভগবান' বলে বিশ্বাস করে। কোনো ভ্রমণকারী 'ওশো' জনপদে গেলে সেখানে রজনীশের সমাধিতে পাথরে খোদাই করে এ কথাগুলো লেখা দেখতে পাবে– "ওশো – তিনি কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি এবং কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি 'পৃথিবী' নামক গ্রহটি শুধু পরিদর্শনে এসেছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত।'

তারা এটা উল্লেখ করতে সম্ভবত ভুলে গেছে যে, রজনীশকে বিশ্বের ২১টি দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা দেয়া হয় নি। কেউ কি এটা ভেবে দেখেছে যে, 'ভগবান'-কে পৃথিবী পরিদর্শনে এসে কোনো দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা চাইতে হবে! গ্রিসের

আর্চ বিশপ বলেছেন যে, রজনীশ যদি সে দেশ থেকে বের হয়ে না যায় তাহলে তারা তার শিষ্য-সাগরেদসহ তার বাসস্থান জ্বালিয়ে দেবে।

৪. চতুর্থ মানদণ্ড যা অত্যন্ত কঠোর তা হলো– 'আল্লাহর সদৃশ সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।' ঈশ্বরত্বে দাবিদার কাউকে যদি কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার ঈশ্বরত্ব তাৎক্ষণিক বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। সত্যিকার একক আল্লাহর কোনো কাল্পনিক আকার-আকৃতি কল্পনা করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, রজনীশ রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। যার ছিল শুভ্র লম্বা দাড়ি। তার ছিল দুটো চোখ, দুটো কান, একটা নাক, একটি মুখ। রজনীশের ছবি সম্বলিত পোস্টার প্রচুর পাওয়া যায়। এতে করে এটা সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' হতে পারে না।

একইভাবে যে ব্যক্তিটি শারীরিক শক্তিমত্তা হেতু 'মিস্টার ইউনিভার্স' উপাধিপ্রাপ্ত তাকেও কেউ 'ঈশ্বর' হিসেবে কল্পনা করতে পারে বটে, কিন্তু সূরা ইখলাসে বর্ণিত ৪টি মানদণ্ডের আলোকে একমাত্র একক অদ্বিতীয় 'আল্লাহ' ছাড়া কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না।

আমরা যে নামে ঈশ্বরকে ডাকি

মুসলমানরা ইংরেজি শব্দ 'গড'-এর পরিবর্তে একক সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। 'গড'-এর চেয়ে আরবি শব্দ 'আল্লাহ'-ই সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও যথার্থ। 'গড' শব্দের সাথে 'এস' ইংরেজি বর্ণ যুক্ত করে তাকে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা যায় ; কিন্তু 'আল্লাহ' একক সত্তা। এ শব্দের কোনো বহুবচন হয় না। আবার 'গড'-এর সাথে 'des' যোগ করলে তা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। 'আল্লাহ' শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না। 'গড' শব্দের আগে Tin শব্দাংশ যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'মিথ্যা উপাস্য'। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শব্দ যা সম্পর্কে কল্পনা করে কোনো আকৃতি বা আকার ধারণা করা বা তা নিয়ে কোনো প্রকার যথেচ্ছাচার করা যায় না। এসব কারণে মুসলমান এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। তবে যেহেতু এই বইয়ের পাঠক বা সম্বোধিত মানুষ সাধারণভাবে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় প্রকার রয়েছে, তাই আমি এতে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'গড' শব্দটি-ই অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছি।

'গড' কখনো মানুষ হতে পারে না

কিছু লোক যুক্তি পেশ করে যে, ঈশ্বর যদি সবকিছু করতে সক্ষম, তবে তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারবেন না কেন? তিনি যদি ইচ্ছে করেন তবে তিনি

মানব-আকৃতি ধারণ করতে পারেন ; কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলে 'ঈশ্বর' আর ঈশ্বর থাকতে পারেন না। কেননা 'ঈশ্বর' আর মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী। একই সত্তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হতে পারে না। 'অবতারবাদ' বা ঈশ্বরের মানবাকৃতি ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ কোনো কোনো ধর্মে থাকলেও তা যে অবাস্তব এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

'ঈশ্বর' অবিনশ্বর অথচ মানুষ নশ্বর। মানব-ঈশ্বর তথা এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সত্তা নশ্বর মানবদেহ ধারণ করবে। এ জাতীয় ধারণা অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

ঈশ্বর-এর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অনাদি ও চিরন্তন। অপরদিকে মানুষের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। এমন কোনো সত্তা মানুষের মধ্যে নেই যার মধ্যে শুরু না থাকা এবং শুরু থাকা উভয়ই বিদ্যমান আছে। মানুষের শেষ আছে কারণ মানুষ মরণশীল। এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে অবিনশ্বরতা ও নশ্বরতা উভয় গুণের সমাবেশ পাওয়া যাবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষকে তার জীবনকে কর্মচঞ্চল রাখার জন্য পানাহার করতে হয়। অতএব স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা আল্লাহর মানবরূপ ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ـ

"And He it is that Feeds but is not fed."

অর্থ : তিনি খাদ্য দান করেন, কিন্তু তিনি খাদ্যগ্রহণ করেন না। (সূরা আনআম : ১৪)

আল্লাহর কখনো বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রয়োজন হয় না; অথচ মানুষ বিশ্রাম ও নিদ্রা ছাড়া চলতে পারে না।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ

"Allah, there is no 'Ilah' but He – The living, The Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on the earth."

অর্থ : আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের উপাসনা নিষ্ফল

যেহেতু 'ঈশ্বরে'র মানবরূপ ধারণ তথা অবতারবাদ গ্রহণীয় নয়, তাই আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে একমত হবো যে, কোনো মানুষের উপাসনা করা নিষ্ফল ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর যদি মানব-আকৃতি ধারণ করে, তা হলে তিনি অবশ্যই ঐশ্বরিক গুণাবলি ত্যাগ করেই মানবরূপ ধারণ করবেন এবং তিনি মানুষের মধ্যকার সমস্ত গুণের অধিকারী হবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, একজন মেধাবী অধ্যাপক যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে এ অবস্থায় তার ছাত্রদের পক্ষে তাঁর নিকট তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না অবশ্যই।

অতঃপর বলা যায় যে, ঈশ্বর যদি মানবরূপ ধারণ করেন, এ মানুষটি আর কখনো তার পূর্বরূপ ঈশ্বরত্বে ফিরে যেতে পারবে না। কেননা মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মানব-ঈশ্বর এর উপাসনা করা অযৌক্তিক এবং এ অবতারবাদের সর্বপ্রকার-এর বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

আর এজন্যই কুরআন মাজীদে সর্বপ্রকার মানব-ঈশ্বর বা অবতারবাদের অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিরূপ নির্ধারণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ـ

অর্থ : কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। (সূরা শুরা : ১১)

"There is nothing whatever like create him."

'ঈশ্বর' কখনো অন্যায় ও তাঁর পক্ষে অশোভন কাজ করতে পারেন না

সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর' যিনি ন্যায়বিচার, করুণা, সত্য ও অনন্ত-অনিন্দ্যনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি কখনো এমন সৃষ্টিসুলভ কাজ করতে পারেন না, যা তাঁর সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। তদ্রূপ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার মিথ্যা কথা বলার ধারণাও করা যায় না। একইভাবে অন্যায়, ভুল, কোনো বিষয় স্মৃতিভ্রম ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়ার কথাও কল্পনা করা যায় না। তবে 'ঈশ্বর' যদি ইচ্ছে করেন তাহলে অন্যায় করতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনো তা করেন না, করবেনও না, যেহেতু এটা অন্যায়, আর এমন অন্যায় কাজ তাঁর জন্য অশোভন।

কুরআন মাজীদ বলে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

"Allah is never unjust in the least degree."

অর্থ : আল্লাহ্ কখনো এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। (সূরা নিসা : ৪০)

ঈশ্বর যদি চান অত্যাচারী হতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর যখনই অন্যায়কারী হবেন সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর ঐশ্বরিকতা হারাবেন।

ঈশ্বর ভুলে যেতে পারেন না, আর না তিনি ভুল করতে পারেন

ঈশ্বর কখনো ভুলে যেতে পারেন না, কেননা ভুলে যাওয়া ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার উদাহরণ। একইরূপে ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না, কেননা ভুল করা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

পবিত্র কুরআন বলে–

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ـ

...... "my lord never errs, nor forgets."

অর্থ : .... আমার প্রভু বিভ্রান্তও হননা, ভুলেও যান না। (সূরা তা-হা : ৫২)

ঈশ্বর ঈশ্বরসুলভ কাজই করেন

তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হলো– 'ঈশ্বরের ক্ষমতা সবকিছুর ওপর বিরাজমান।'

পবিত্র কুরআন বলে–

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"For verily Allah has power over all things."

অর্থ : আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(আল-কুরআন– ২ : ১০৬, ২ : ১০৯, ২ : ২৮৪, ৩ : ২৯, ১৬ : ৭৭, ৩৫ : ১)

কুরআন মাজীদ আরো বলে–

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ـ

"Allah is the deer of all he intends."

অর্থ : তিনি যা চান তা-ই করেন। (সূরা বুরূজ : ১৬)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজেরই ইচ্ছে করেন এবং তা সম্পাদন করেন। অন্যায় এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলির বিপরীত কাজ তিনি করেন না।

অনেক ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো পর্যায়ে অবতারবাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব আকৃতি ধারণ করে। তাদের যুক্তি হলো– সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর' অত্যন্ত পবিত্র, সত্য, পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ। তাই তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা ও অনুভূতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অতএব, মানুষের জন্য নীতি-নিয়ম প্রণয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হন। যুগে যুগে এ প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। চলুন এ যুক্তিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এটা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ।

সৃষ্টিকর্তা দিক-নির্দেশনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করেন

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে নিয়েছি। টেপরেকর্ডার এমনই একটি যন্ত্র যা শিল্প-কারখানায় বহুল পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কি কখনো পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, টেপরেকর্ডারের কী ভালো, আর কী মন্দ, তা জানার জন্য প্রস্তুতকারককে টেপরেকর্ডারের রূপ ধারণ করতে হবে? বরং এটাই স্বাভাবিক যে, প্রস্তুতকারক তার এ যন্ত্রের উৎপাদন ও চালানোর নিয়ম-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিমালা সম্বলিত একটি পুস্তক বা ক্যাটালগ (manual) তৈরি করবেন। যার মাধ্যমে এ যন্ত্রের ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়মাবলি পেতে পারে। এ পুস্তকের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া থাকবে যে, এ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করা যাবে আর কীভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আপনি যদি মানুষকে তেমনি একটি যন্ত্র ধরে নেন, তবে এটা নিশ্চিত যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার এক জটিল ও সুনিপুণ সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই দুনিয়াতে এসে মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ তা জানার। তিনি মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা সম্বলিত গ্রন্থ (Instruction manual) দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন-ই মানব জাতির জন্য সেই গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা শেষ বিচারের দিন তাঁর এ সুনিপুণ সৃষ্টির কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তিনি যে বিষয়ে হিসাব নেবেন, সে বিষয়ে পূর্ণ নির্দেশিকা আগেই পাঠিয়ে দেবেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআন নাযিল করে দুনিয়ার জীবনে মানুষের কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর দূত তথা রাসূল মনোনীত করেন

মানব জাতিকে তাঁর বিধি-বিধান জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার স্বয়ং দুনিয়াতে আসার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠির মধ্য থেকে

বাছাই করা মানুষদের মাধ্যমে তাঁর ঐশী বিধি-বিধান দুনিয়াতে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এসব বাছাই করা মানুষদেরকে 'বার্তাবাহক' বা 'নবী-রাসূল' বলা হয়।

কিছু লোক 'অন্ধ' ও 'বধির'

অবতারবাদী দর্শনের অসম্ভাব্যতা ও অযৌক্তিতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ধর্মের অনুসারীরা নিজেরাও এ অবতারবাদে বিশ্বাস করে এবং অন্যদেরকেও এটা শিক্ষা দেয়। এটা কি মানুষের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) এবং যিনি মানুষকে এ বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন তাঁর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন নয় ? এ সমস্ত লোকই প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ' ও 'বধির', যদিও আল্লাহ তাদেরকে শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

"Deaf, dumb and blind, they will not return (to the path)."

অর্থ : তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না। (সূরা বাকারা : ১৮)

বাইবেল মথির লিখিত সুসমাচারে একই কথা বলেছে–

"Seeing they see not and hearing they hear not, neither do they understand."

অর্থ : তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শোনে না, তারা বুঝতেও সক্ষম নয়। (মথি ১৩ : ১৩)

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'ঋগবেদে'ও একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে–

"There may be someone who sees the words and yet indeed do not see them, may be another one who hears those words but indeed does not hear them."

অর্থ : এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাণীসমূহ দেখে, প্রকৃতপক্ষে তারা দেখে না; এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বাণীসমূহ শোনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনেনা। (ঋগবেদ ১০ : ৭১ : ৪)

এসব পবিত্র গ্রন্থের বাণী তাদের পাঠকদেরকে বলে যে, যদিও ঈশ্বরের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তবুও এরা সত্য থেকে বিচ্যুত-ই হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের গুণাবলি

আল্লাহর জন্যই রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

"Say, call upon Allah, or call upon Rahman; By whatever name you call Upon Him, (it is well) : For to Him belong The Most Beautiful Name."

অর্থ : বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাক কিংবা 'রাহমান' বলে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। (বনী ইস্‌রাঈল : ১১০)

একই ধরনের কথা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরাতে উল্লিখিত হয়েছে।

[সুরা আ'রাফ (৭ : ১৮) ; সূরা ত্বা-হা (২০ : ৮) এবং আল-হাশ্‌র (৫৯ : ২৩-৪)]

আল-কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো 'আল্লাহ'। কুরআন 'আল্লাহ'র পরিচয় প্রকাশে অনেক নামের মধ্যে 'আর-রাহমান' (সবচেয়ে দয়ালু), 'আর-রাহীম' (সবিশেষ দয়াবান), এবং 'আল-হাকীম' প্রভৃতি নাম উল্লেখ করেছে। আপনি যে কোনো নামেই আল্লাহকে ডাকতে পারেন ; কিন্তু সেই নামগুলো হতে হবে সুন্দর। তবে সেই নামগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে মানসপটে কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো চিত্র যেন ফুটে না ওঠে।

আল্লাহর সব গুণবাচক নামই সুন্দর এবং এসব গুণের মালিক একমাত্র আল্লাহ নিজেই

আল্লাহ তাআলা এসব সুন্দর নামসমূহের অধিকারী শুধু নন, প্রত্যেকটি নামের মাধ্যমেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ পেশ করা যাক। ধরুন নভোচারি নেইল আর্মস্ট্রং। কেউ যদি বলে যে, 'নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান'। উক্তিটি যথার্থ ; কিন্তু তার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। 'নীল আর্মস্ট্রং একজন নভোচারী'– এ পরিচয়ও তার জন্য অনন্য পরিচয় নয়, কেননা এ পরিচয় অন্যদেরও আছে। যদি বলা হয় যে, 'নীল আর্মস্ট্রং প্রথম ব্যক্তি যিনি চাঁদে পা রেখেছেন'। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, চাঁদে প্রথম পদার্পণ করেছেন কে? উত্তরে কেবল বলা হবে 'নীল আর্মস্ট্রং'। এ কৃতিত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণাবলিও হতে হবে অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আমি যদি বলি– 'তিনি ইমারতের নির্মাণকারী' তাহলে তাঁর

পরিচয় হিসেবে অনন্য নয়, কেননা অনেক মানুষ ইমারতের নির্মাতা হতে পারে। অতএব 'নির্মাতা' গুণ দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে না। আল্লাহর গুণসমূহ এমন হবে যদ্বারা তাঁকেই নির্দেশ করবে অন্য কাউকে নয়।

উদাহরণস্বরূপ

Ar-Raheem اَلرَّحْمٰنُ (সবিশেষ দয়াবান)

Ar-Rahman اَلرَّحِيْمُ (সবচেয়ে দয়ালু)

Al-Hakeem اَلْحَكِيْمُ (প্রজ্ঞাময়)

সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে– Ar-Raheem **বা সবিশেষ দয়াবান কে? এর উত্তরে** একটি মাত্র কথাই বলা যেতে পারে – 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'।

ঈশ্বর-এর একটি গুণ অন্য গুণের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না

আগের উদাহরণটিকে ধরা যাক, কেউ যদি বলে, "নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান নভোচারী যিনি মাত্র চার ফুট লম্বা' তবে এ পরিচয় (আমেরিকান নভোচারী) যথার্থ, কিন্তু সহায়ক গুণটি (চার ফুট লম্বা) মিথ্যা। একইভাবে কেউ যদি বলে যে, ঈশ্বর বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর একটি মাথা, দুটো হাত, দুটো পা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য তথা 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা' বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ; কিন্তু সহায়ক বৈশিষ্ট্য (মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া) ভুল এবং মিথ্যা।

ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই নির্দেশ করে

যেহেতু ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাই তাঁর সব গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা একমাত্র তাকেই নির্দেশ করাটাই স্বাভাবিক। যদি বলা হয়, 'নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন নভোচারী যিনি চাঁদের বুকে প্রথম পদার্পণ করেন; কিন্তু পরে দ্বিতীয় জন এডউইন অলড্রিন – একথাটা সঠিক নয়। কেননা প্রথম পদার্পণকারী একজনই হতে পারে। প্রথম পদার্পণকারী দ্বিতীয় হতে পারে না। সুতরাং স্রষ্টা একক ঈশ্বর এবং প্রতিপালক অন্য ঈশ্বর– এ বক্তব্য অবাস্তব; কেননা বিশ্বজগতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। যাবতীয় মহৎ গুণ স্রষ্টার একক সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

ঈশ্বরের এককত্ব

বহু ঈশ্বরবাদীরা একথা বলে যুক্তি পেশ করে যে, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক নয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি পেশ করা যায় যে, বিশ্ব-জগতের যদি একাধিক ঈশ্বর থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো। প্রত্যেক ঈশ্বরই অন্য ঈশ্বরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেকে কার্যকর করতে

চাইতো। এরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বহু ঈশ্বরবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় উপাখ্যানগুলোতে। যদি এক ঈশ্বর অন্য ঈশ্বরের নিকট পরাজিত হন এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি 'ঈশ্বর' হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। ফলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও হতে পারেন না। বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে বহু ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেননা সেখানে বিভিন্ন ঈশ্বরের বিভিন্ন দায়িত্ব। যেমন– সূর্যদেবতা, বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি। তাদের প্রত্যেকে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন ঈশ্বর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ বর্ণনা একথার ইঙ্গিত দেয় যে, এসব ঈশ্বরের কেউ-ই সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের এককভাবে যোগ্য নয়। অধিকন্তু এক ঈশ্বরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। একটি অজ্ঞ ও অক্ষম সত্তা 'ঈশ্বর' হতে পারেন না। যদি ঈশ্বর একাধিক হতো, তাহলে মহাবিশ্বে অবশ্যই সংশয়, বিশৃঙ্খলা, গোলমাল ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতো; অধিকন্তু মহাবিশ্বের সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ

"If there were, in the heavens and the earth other gods Besides Allah, there would have been confusion in both ! But glory to Allah the Lord of the Throne : (High is He) above what they attribute to Him!"

অর্থ : যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য 'ইলাহ' থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব আরশের অধিপতি আল্লাহ্ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা বলে থাকে। (সূরা আম্বিয়া : ২২)

একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে তারা তাদের সৃষ্ট ও আয়ত্তাধীন রাজত্ব নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেতো। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ

"No son did Allah beget, nor is there any god along with Him (if there were Many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others!

Glory to Allah! (He is free) From the (sort of) things they attribute to Him."

অর্থ : আল্লাহ কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো 'ইলাহ'-ও নেই; (যদি অন্য ইলাহ থাকতো) তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। আল্লাহ পবিত্র মহান (তিনি মুক্ত) তা থেকে যা তারা বলে। (সূরা মুমিনুন : ৯১)

অতএব, এক ও অদ্বিতীয় সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব থাকাটাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি।

কিছু ধর্ম রয়েছে অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী, যেমন বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় ধর্ম। অজ্ঞেয়বাদ (agnostic)-এর মূলকথা হলো- 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো কিছু আমাদের জানা নেই। সুতরাং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না- এটা হলো অজ্ঞেয়বাদের ধারণা। তারা 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব স্বীকারও করে না আবার অস্বীকারও করে না। অপর কিছু ধর্ম আছে যেমন জৈন ধর্ম- এগুলো নাস্তিক্যবাদী ধর্ম। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

[ইনশাআল্লাহ, 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী'? নামে আমার লেখা পুস্তকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়া হয়েছে। সেখানে নাস্তিক্যবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদেরকে কুরআন থেকে গৃহীত যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরিখে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।]

৯. মূলত সব ধর্ম-ই একত্ববাদে বিশ্বাসী

সকল প্রধান প্রধান ধর্মই মূলত এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সকল ধর্মগ্রন্থই একত্ববাদের কথাই বলে অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় সত্য-ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথাই বলে।

মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে

কালের প্রবাহে প্রায় সব ধর্মগ্রন্থই তাদের অনুসারীদের কর্তৃক নিজেদের স্বার্থে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সকল ধর্মের মূল কথা বিকৃত হয়ে একত্ববাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদে অথবা বহু ঈশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ .

"Then woe to those who write the book with their own hands, and then say : 'This is from Allah.' To traffic with it for a miserable price! woe to them for what their hands do write and for the gain they make thereby."

অর্থ : সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ', যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য পেতে পারে। কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্যও আক্ষেপ। (সূরা বাকারা : ৭৯)

১০. তাওহীদ

ইসলাম তাওহীদে বিশ্বাস করে, যার অর্থ কেবল 'একেশ্বরবাদ' তথা কেবল এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাই নয়। 'তাওহীদ' আক্ষরিক অর্থে সংযোগ সাধন করাকে বলা হয়। আরবি 'ওয়াহ্হাদা' ক্রিয়ার মূল শব্দ 'তাওহীদ' অর্থ একত্বের সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করা। তাওহীদ তিনটি শাখায় বিভক্ত–

১. তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহ,

২. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত এবং

৩. তাওহীদ আল-ইবাদাহ।

১. তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহ (আল্লাহর প্রভুত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন)

তাওহীদের প্রথম শ্রেণী হলো তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহ। মূল শব্দ 'রাব্বুন' থেকে 'রবূবীয়্যাহ' উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 'প্রভু' রক্ষাকারী ও প্রতিপালনকারী।

সুতরাং 'তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহ্' অর্থ প্রভুত্বের একত্ব-কে দৃঢ়তার সাথে মেনে নেয়া। এটা এ মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহই সকল বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল সব কিছুরই স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। বিশ্বে যা কিছু আছে এবং পুরো বিশ্বজগতের তিনি একক স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং রক্ষাকারী। তবে এসব সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই।

২. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর মূলসত্তা ও গুণাবলির একত্বে বিশ্বাস স্থাপন)

তাওহীদের দ্বিতীয় শ্রেণী হলো– তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত। এর অর্থ হলো– আল্লাহর মূল নাম ও গুণবাচক নামসমূহের একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। এ শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি দিক রয়েছে–

ক. আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূল যেসব নামে তাঁকে ডেকেছেন সে নামেই তাঁকে ডাকতে হবে। এসব নামসমূহের যে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নায় দেয়া হয়েছে, তার বিপরীত বা অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. আল্লাহকে সেই নামেই ডাকতে হবে, যে নাম তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে কোনো নব উদ্ভাবিত মূল বা গুণবাচক নামে কখনো ডাকা যাবে না। যেমন তাঁকে 'আল-গাদিব' (ক্রোধান্বিত) নামে ডাকা যাবে না, যদিও তাঁর ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। কেননা তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর রাসূল তাঁকে এ নামে নামাঙ্কিত করেন নি।

গ. আল্লাহর গুণকে তাঁর সৃষ্টির গুণের সদৃশ মনে করা যাবে না। আমাদেরকে অবশ্য-অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির গুণকে তাঁর গুণের সদৃশ বলে মনে করা থেকে সচেতনতার সাথে বিরত থাকতে হবে। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা তার মন্দ চিন্তার জন্য অনুশোচনা করেছেন, যেমন মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে', এটা তাওহীদের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ যেহেতু কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি করতে পারেন না। তাই তাঁর অনুশোচনার প্রশ্নই আসে না।

ঘ. আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

"There is nothing whatever likes unto Him, and He is the one that hears and sees (all things)."

অর্থ : কোনো বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। (সূরা শূরা : ১১)

যদিও শোনা এবং দেখার ব্যাপার মানুষের সাথেও সংশ্লিষ্ট কিন্তু যখন তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন তার প্রকৃত রূপ কি হবে তা মানুষের জ্ঞানের আওতাধীন নয়। মানুষের শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ

ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে, এসব অঙ্গ ছাড়া তার শোনা ও দেখার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর সত্তা সেসব সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র।

ঙ. আল্লাহর কোনো গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা যাবে না। আল্লাহর কোনো অনুপম ও অতুলনীয় গুণকে মানুষের সাথে সংযুক্ত করা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন কোনো মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে আদি ও অন্ত (চিরঞ্জীব) বলে বিশেষিত করা।

চ. আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো নামে তাঁর সৃষ্টির নামকরণ করা যাবে না। আল্লাহর কোনো কোনো গুণবাচক নামকে অনির্দিষ্টভাবে 'আল' (ال) যোগ না করে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– 'রাউফ' 'রাহীম'। আল্লাহ স্বয়ং কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ শব্দগুলোর সাথে আলিফ-লাম যুক্ত করে আর-রউফ, আর-রাহীম' মানুষের নামে যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তার আগে 'আব্‌দ' শব্দটি যুক্ত করে নিতে হবে। তখন তার অর্থ হবে– আবদুর রাউফ (রাউফের বান্দা বা দাস), আবদুর রাহীম (রাহীমের বান্দাহ বা দাস), অন্য কথায় আল্লাহর বান্দাহ বা আল্লাহর দাস।

৩. তাওহীদ আল-ইবাদাহ (ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর একত্ব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা)

ক. ইবাদতের অর্থ ও সংজ্ঞা 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' এর অর্থ ইবাদত–উপাসনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর একত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। 'ইবাদাহ' আরবি 'আব্‌দ' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ দাস বা চাকর। আর 'ইবাদাহ' অর্থ দাসত্ব বা উপাসনা। 'সালাত' বা নামায হলো দাসত্বের একটি আনুষ্ঠানিক রূপ; কিন্তু এটাই একমাত্র রূপ নয়। মানুষের একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত; কিন্তু ইসলামে ইবাদত বা উপাসনার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামে 'ইবাদত' হলো– আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। আর এ ইবাদতও কেবল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

খ. তাওহীদের উপরোল্লিখিত তিনটি শাখাই যুগপৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাওহীদের প্রথমোক্ত দুটো শাখায় বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি তৃতীয় শাখাকে তথা ইবাদতকে কার্যকর করা না হয়। কুরআন নবী -এর সমকালীন মুশরিক তথা পৌত্তলিকদের উদাহরণ পেশ করেছেন, যারা তাওহীদের প্রথম দুটো শাখায় বিশ্বাসী ছিল।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

"Say : 'who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? Or, who is it that has power over hearing and sight? And who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? And who is it that rules and regulates all affairs? They will soon say, 'Allah'. Say, will you not then show piety (to Him)?"

অর্থ : আপনি বলুন 'কে তোমাদেরকে রিয্‌ক দান করেন আসমান ও জমিন থেকে? অথবা, তিনি কে যার কর্তৃত্বের অধীন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি এবং কে বের করে জীবিতকে মৃত থেকে, আর কে বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে বলে দেবে– 'আল্লাহ'; তাহলে আপনি বলে দিন– 'তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না'? (সূরা ইউনুস : ৩১)

একই উদাহরণ পুনরুক্ত হয়েছে সূরা যুখরুফ-এ–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

"If thou ask them, who created them, they will certainly say, Allah : how then are they deluded away (from the truth)."

অর্থ : আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে : 'আল্লাহ', তবুও তারা উল্টো কোন্ দিকে চলছে? (সূরা যুখরুফ : ৮৭)

মক্কার বিধর্মীরা জানতো যে, আল্লাহ-ই তাদের সৃষ্টিকর্তা , প্রতিপালক, জীবিকাদাতা ও মালিক। তথাপি তারা মুসলিম ছিল না। কেননা তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য দেব-দেবীর পূজা করতো। আল্লাহ্ তাদেরকে 'কুফ্‌ফার' তথা অবিশ্বাসীদের এবং 'মুশরিকীন' তথা আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের তালিকাভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ـ

"And most of them believe not in Allah without associating (others as partners) with Him!"

অর্থ : তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত না করে। (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

অতএব 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' তথা ইবাদতের ব্যাপারে এক আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণ করা তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি একাই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী এবং তিনিই মানুষকে ইবাদতের কল্যাণকর প্রতিদান দিতে পারেন।

১১. শিরক (অংশীবাদ)

ক. সংজ্ঞা

তাওহীদের উপরোল্লিখিত কোনো দিক বাদ পড়া অথবা সেগুলোর কোনো নীতির পরিপূর্ণতার ত্রুটি করাকে 'শিরক' বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে 'শিরক' হলো অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং এটা প্রতিমাপূজার সমতুল্য।

খ. শিরক সর্ববৃহৎ পাপ, যা আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না

কুরআন মাজীদে সূরা নিসায় সবচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا ۔

"Allah forgives not that partners should be set up with Him; but He forgives anything else, to whom He pleases; to set up partners with Allah is to devise a sin most heinous indeed."

অর্থ : আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ। তবে তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করে, সে এক মহাপাপে লিপ্ত হয়। (সূরা নিসা : ৪৮)

সূরা নিসায় একই কথা পুনরুক্ত হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢبَعِيْدًا ۔

"Allah forgives not (the sin of) joining other gods with Him ; but He forgives whom He pleases other sins that this : one, who joins other gods with Allah, has strayed far away (from the right)."

অর্থ : আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করাকে ; আর তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছে করেন; যে আল্লাহ্র সাথে শরিক করে, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় (সঠিক পথ থেকে)। (সূরা নিসা : ১১৬)

গ. শিরক জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়

কুরআন মাজীদে সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

"They do blaspheme who say : 'Allah is christ the son of Mary'. But said Christ : 'O children of Israeel! worship Allah, my Lord and your Lord.' Whoever joins other gods with Allah—Allah will forbid him the Garden, and the Fire will he his abode. There will for the wrongdoers be no one to help."

অর্থ : নিঃসন্দেহে তারা কাফির, যারা বলে, 'মসীহ্ ইবনে মারইয়াম-ই আল্লাহ্', অথচ মসীহ্ বলেছিল–'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত করো আল্লাহ্র, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহ্র শরিক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

ঘ. ইবাদত ও আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র

কুরআন মাজীদের সূরা আলে ইমরানে উল্লিখিত হয়েছে–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

"Say : O people of the Book! Come to common terms as between us and you : that we worship none but Allah; that we associate no partners with Him; that we erect not, From among ourselves, Lords and patrons other than Allah."

"if then they turn back, Say ye : 'year witness that we (at least) are Muslims' (Bowing to Allah's will)."

অর্থ : আপনি বলে দিন : 'হে আহলি কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন, তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, কোনো কিছুতেই যেন তার শরিক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে আল্লাহকে ত্যাগ করে ; যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম। (সূরা আলে-ইমরান : ৬৪)

১২. উপসংহার

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

"Revile not ye those whom they call upon besides Allah, lest they out of spite revile Allah in their ignorance."

অর্থ : আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে। (সূরা আনআম : ১০৮)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"And if all the trees on earth were pens and the ocean (were ink), with seven oceans behind it to add to its (supply), yet would not words of Allah be exhausted (in the writing) : for Allah is Exalted in Power, full of wisdom."

অর্থ : আর সমগ্র পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, তা সবই যদি কলম হয় এবং যত সমুদ্র আছে, তার সাথে যদি আরো সাতটি সমুদ্র শামিল হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান : ২৭)

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ

"O men! Here is a parable set forth! Listen to it! Those on whom, besides Allah, you call cannot creat (even) a fly, if they all met together for the purpose! And if the fly should snach away anything from them, they would have no power to release it from the fly. Feeble are those who petition!"

অর্থ : হে মানুষ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো– মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করো : তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা কর, তারাতো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে কখনো পারবে না, যদিও এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হয় ; আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তা-ও তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না, পূজারী ও দেবতা উভয়ই কত অক্ষম। (সূরা হাজ্জ :৭৩)

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রভু, স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিশ্বজগতের সংরক্ষক।

ইসলামের উপর ৪০টি অভিযোগ এবং তার প্রমাণ ভিত্তিক জবাব

40 QUESTIONS ON ISLAM & THEIR DOCUMENTARY ANSWERE

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদক

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

সূচিপত্র

ছিল। এভাবে একথা কি সত্য নয় যে, বর্তমান কুরআন ঐ কপি যার ক্রমধারা ও সংকলন হযরত উসমান (রা)-এর এবং প্রকৃতপক্ষে তা ঐ কুরআন ছিল না, যা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন?

প্রশ্ন-২০. কুরআনে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কথা বলেন তখন نحن অর্থাৎ 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। এতে কি একথা বুঝা যায় না যে, ইসলামে অনেক খোদার ওপর ঈমান রাখা যায়?

প্রশ্ন-২১. মুসলমানগণ আয়াতের মানসুখ হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে. অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস এই যে, কুরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত পরবর্তীতে অবতীর্ণ হওয়া আয়াতের দ্বারা মানসুখ (রহিত) করা হয়েছিল। এর দ্বারা কি এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) তাআলা ভুল করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটা শুধরে নিয়েছেন?

প্রশ্ন-২২. কুরআনের কিছু সূরা الم। حم . يس . ইত্যাদি দ্বারা কেন আরম্ভ করা হয়েছে? এর গুরুত্ব কী?

প্রশ্ন-২৩. কুরআনে এসেছে যে, জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বানানো হয়েছে। এ থেকে একথা বুঝা যায় যে, জমিন (ভূমি) চ্যাপ্টা এবং সমতল। একথা কি গ্রহণীয় আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সত্তার সাথে বৈপরীত্য করে না?

প্রশ্ন-২৪. একথা কি ঠিক নয় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন?

প্রশ্ন-২৫. কুরআন আল্লাহর কালাম নয় বরং এটা শয়তানের কাজের বিবরণ।

প্রশ্ন-২৬. কুরআনের কয়েক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। আবার এর সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। আসলে তিনি কি ক্ষমাশীল নাকি শাস্তিদাতা?

প্রশ্ন-২৭. আল কুরআনে বলা হয়েছে মায়ের গর্ভে যে বাচ্চা তার সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানতে পারেন। কিন্তু আজ বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং আমরা সহজেই আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে বাচ্চার ছেলে-মেয়ে হওয়া সম্পর্কে জেনে ফেলছি। কুরআনের আয়াত কি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়?

প্রশ্ন-২৮. কুরআনে আছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কুরআনের এ সকল বক্তব্য কি পরস্পর বিরোধীর দিকে ইঙ্গিত করে না?

প্রশ্ন-২৯. কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে মানুষকে বীর্য نطفة থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করবেন যে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

প্রশ্ন-৩০. কুরআনে কয়েক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, জমিন এবং আসমান ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সূরা ফুসসিলাত বা হামীম আসসিজদায় বলা হয়েছে জমিন এবং আসমান ৮ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কি কুরআনের বিপরীত নয়?

এ আয়াতে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জমিন ছয় দিনে তৈরি হয়েছে পুনরায় আসমান দু দিনে তৈরি করা হয়েছে। এরূপ বলা Big Bang-এর বিপরীত। যার কথা হলো আসমান জমিন এক সময়ে অস্তিত্বে এসেছিল।

প্রশ্ন-৩১. আল কুরআনে একটি আয়াত রয়েছে যাতে একথা এসেছে যে, আল্লাহ মাশরিক ও দুই মাগরিব-এর মালিক। আপনি এ কুরআনের আয়াতের কী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করবেন?

প্রশ্ন-৩২. ইসলামে কি কাঠিন্য, খুন-খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়? আল-কুরআন মুসলমানদের বলে যে, যেখানে কাফিরদের পাও– হত্যা কর।

প্রশ্ন-৩৩. হিন্দু পণ্ডিত অ্যারুণ শৌরী এ দাবি করেছে যে, আল-কুরআনে হিসাবের একটি ভুল রয়েছে। তার বক্তব্যে সূরা নিসার ১১ নং ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের অংশগুলো যদি যোগ দেয়া হয় তাহলে সংখ্যা একের অধিক হয়। এজন্য কুরআনের রচয়িতা গণিত জানেন না।

প্রশ্ন-৩৪. যদি আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে থাকেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাকে অপরাধী কীভাবে মেনে নেয়া যায়?

প্রশ্ন-৩৫. আল-কুরআনে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন। সে কখনো ঈমান আনবে না। অথচ বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, জ্ঞান ও বুঝ এবং ঈমান কবুল করার কাজ দেমাগের (মস্তিষ্কের)। তাহলে কুরআনের এ দাবি কি বিজ্ঞানের বিপরীত নয়?

প্রশ্ন-৩৬. আল-কুরআন একথা বলে যে, যখন কোনো পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হুর অর্থাৎ সুশ্রী সঙ্গিনী পাবে। কোনো নারী জান্নাতে গেলে সে কী পাবে?

প্রশ্ন-৩৭. কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে যে ইবলিস একজন ফেরেশতা ছিল, কিন্তু সূরা কাহফে এটা বলা হয়েছে যে, ইবলিস জ্বিন ছিল। এ দ্বারা কুরআনের বৈপরীত্য কি প্রমাণিত হয় না?

প্রশ্ন-৩৮. কুরআনে একথা বলা হয়েছে যে, মারইয়াম (আ), হারুন (আ)-এর বোন ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যাদের দিয়ে কুরআন লিখিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) একথা জানতো না যে, হারুন (আ)-এর বোন মারইয়াম (আ) ঈসা মসীহ-এর মাতা Mary থেকে ভিন্ন মহিলা ছিলেন। এবং এ দুজনের মধ্যে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান ছিল।

প্রশ্ন-৩৯. কুরআনে কি একথা বলা হয় নি যে, ঈসা মসীহ আল্লাহর কালিমা ও আল্লাহর রূহ। এতে কি খোদায়িত্বের শান প্রকাশ পায় না?

প্রশ্ন-৪০. একথা কি সঠিক নয় যে, কুরআনের সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ ইন্তেকাল করলেন, অতঃপর জীবিত করলেন এবং উঠিয়ে নিলেন?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ইসলামের উপর ৪০টি অভিযোগ এবং তার প্রমাণ ভিত্তিক জবাব

প্রশ্ন-১. সব মানবধর্মই ভালো জিনিসের শিক্ষা দেয়, তারপরেও কোনো ব্যক্তির ইসলামের অনুসরণ করতে হবে কেন? কেন তিনি অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করতে পারবেন না?

উত্তর : মূল ভিত্তির দিক দিয়ে সকল ধর্মই মানুষ সঠিক পথে চলার এবং খারাপ পথ থেকে বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম এসব থেকে বড় কিছু করে। ইসলাম আমাদের সোজা রাস্তার ওপর চলতে এবং নিজ একক ও সমষ্টিগত জীবনকে যাবতীয় খারাবি থেকে বাঁচার জন্য কর্মের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও সামাজিক সমস্যাকে সামনে রাখে। ইসলাম মূলত স্রষ্টার সৃষ্টির পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা। এজন্য ইসলামকে 'প্রাকৃতিক ধর্ম' বলা হয়।

ইসলাম এবং অন্য ধর্মের যে মৌলিক পার্থক্যগুলো, তা কয়েকটি বিষয় দ্বারা স্পষ্ট হবে। সকল ধর্মই এ শিক্ষা দেয় যে– চুরি, লুণ্ঠন এবং মারামারি খারাপ কাজ। ইসলামও এ কথাগুলো বলে, তাহলে ইসলামের সাথে অন্য ধর্মগুলোর পার্থক্য কী? পার্থক্য এই যে, ইসলাম চুরি ও লুঠতরাজ খারাপ কাজ, এটা বলার সাথে সাথে এ বিধানও দেয় যাতে লোকেরা লুঠতরাজ না করে। ইসলাম এজন্য নিম্নরূপ বিধান জারি করে :

১. ইসলাম মানবকল্যাণের জন্য যাকাতের বিধান প্রদান করে। ইসলাম বলে যে, যার সম্পদ পঁচিশ গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ পৌঁছাবে সে প্রত্যেক বছর শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তায় (নির্ধারিত ৮টি খাতে) বণ্টন করবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারির সাথে যাকাত আদায় করতে থাকে, তাহলে দুনিয়া থেকে দারিদ্র দূর হতে বাধ্য, যা চুরি ও লুঠতরাজের মূল কারণ।

২. ইসলাম চোরের হাত কাটার শাস্তি প্রদান করে, যা কুরআনের ৫ নং সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ : চোর নারী হোক কি পুরুষ হোক তাদের কৃত কর্মের ফল স্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি।

এ শাস্তির ওপর অমুসলিমরা একথা বলে যে, বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটার শাস্তি! ইসলাম তো একটি জুলুম ও পশুত্বের ধর্ম। কিন্তু এরূপ বলা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। আমেরিকাকে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ মনে করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে এ অপরাধ সবচেয়ে বেশি। আবশ্যকীয়ভাবে যদি আমেরিকাতে ইসলামি আইন করে দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী যদি আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, প্রত্যেক চুরির শাস্তি যদি হাত কাটা হয়, তাহলে আমেরিকায় চুরি-ডাকাতির অপরাধ কি বাড়বে, নাকি কমবে, নাকি এরূপই থাকবে? অবশ্যই কমবে এবং এ আইন দ্বারা চোরের চুরি করার প্রবণতা কমতে বাধ্য। আমি এ কথার সাথে একমত যে বর্তমানে চোরের সংখ্যা দুনিয়াতে অনেক এবং যদি হাত কাটার আইন কার্যকর হয়, তাহলে লাখ লাখ চোরের হাত কাটা পড়বে। কিন্তু এ দিকটা মনে রাখতে হবে যে, যখনই এ বিধান কার্যকর হবে তখনই চোরের সংখ্যা কমে যাবে, তবে অবশ্যই তার পূর্বে যাকাতের বিধান কার্যকর করতে হবে। সমাজে সদকা, খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার প্রবণতা বাড়াতে হবে, দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রবণতা বাড়াতে হবে। এরপর এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে, তারপর চুরি করতে হলে চোর শত শত বার চিন্তা-ভাবনা করেই চুরি করবে। এরপরও যদি কেউ চুরি করে সে হবে স্বভাব চোর। কঠিন শাস্তির ভয় যা অন্যের শিক্ষা গ্রহণের বিষয় হবে, যা লুঠতরাজ থেকে বিরত রাখবে। এরপর এ অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে যাবে এবং একান্ত স্বভাব চোরদের হাত কাটা পড়ে যাবে। ফলে লুঠতরাজের হাত থেকে দুচিন্তামুক্ত হয়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

৩. সকল বড় বড় ধর্মে নারীদের সম্মান দেয় এবং তাদের ইজ্জত হরণকারীদের গুরুতর অপরাধী হিসেবে গণ্য করে। এ ব্যাপারে ইসলামে অন্য ধর্ম থেকে পার্থক্য কী? পার্থক্য এই যে, ইসলাম শুধু মহিলাদের সম্মান দেখানোর নির্দেশই দেয় না এবং তাদের ইজ্জত হরণকারীর অপরাধকে গুরুতরই গণ্য করে নি বরং এ সংক্রান্ত জঘন্য ঘটনার পূর্ণ তদারকি করে, সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ কীভাবে নির্মূল হবে ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে পর্দার মতো একটি উত্তম বিধান চালু রয়েছে। আল কুরআন প্রথমে পুরুষকে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছে। ২৪ নং সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! মুমিনদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতর উত্তম পন্থা। কারণ তারা যা কিছু করে তা সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।

ইসলাম বলে যে, কেনো ব্যক্তি অ-মুহরিম কোনো নারীকে দেখে ফেললে তার তৎক্ষণাৎ চোখ নিচু করা কর্তব্য। এরূপভাবে নারীদের জন্যও পর্দার হুকুম আছে। ২৪ নং সূরা আন নূর-এর ৩১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَاتِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخْوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۔ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন নারীদেরও বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে। তবে শরীরের যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে তা ছাড়া, তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় বা চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের নিজস্ব মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসী, নিজেদের অধীনস্ত পুরুষ যাদের কাছ থেকে নারীদের জন্য কামনার কিছু নেই, অথবা এমন শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাদের ছাড়া অন্য কারোর সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। চলার সময় তারা জমিনের বুকে এমনভাবে পা না মারে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হে ঈমানদার লোকেরা! ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।

পর্দা হলো (নারীর জন্য) সারা শরীর আবৃত থাকবে এবং কেবল চেহারা ও হাত খালি রাখা যাবে এবং মহিলারা যদি চায় তাহলে এগুলোকেও ঢেকে রাখতে পারবেন। অনেক আলেম (পণ্ডিত) গণের মতে, চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম কেন দিলেন? এ সম্পর্কে আল কুরআনের ৩৩ নং নম্বর সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে ঘোষণা করেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ـ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন স্ত্রীদের বলে দিন তাদের চাদরের কিছু অংশ যেন তারা তাদের মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দেয়। এতে (সম্মানিত মহিলা হিসেবে) তাদের চিনতে সুবিধা হবে। এতে তাদের কষ্টও দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপন দুই বোন, দুজনই সুন্দরী, সুশ্রী এবং তারা এক গলি দিয়ে হেটে যাচ্ছে। একজন ইসলামি হিজাব পরিহিতা এবং দ্বিতীয় জন পাশ্চাত্য আধুনিক স্টাইলে মিনি স্কার্ট পরিহিতা। গলির মুখে এক বখাটে দাঁড়ানো আছে। এদের দুজনের মধ্যে কোন মেয়েকে বিরক্ত করার সম্ভাবনা, সে কার সঙ্গে এদিক ওদিক করবে? হিজাব পরিহিতা মেয়ে, নাকি মিনি স্কার্ট পরিহিতা, কার সঙ্গে? উত্তর হবে মিনি স্কাট পরা মেয়ের সঙ্গে। আর ঐ পোশাক যা শরীর ঢেকে রাখে তা তাকে বাঁচিয়েছে এবং এর বিপরীতকে বিরক্ত ও কুকর্মের আহ্বান জানাবে। এজন্য আল-কুরআন সঠিক বলেছে যে, হিজাব (পর্দা) নারীকে এ সকল থেকে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে ধর্ষণকারীর সাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। (জেনার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর মারা এবং বেত্রাঘাত করা।) অমুসলিমরা বলে থাকে যে, এটা একটা বড় শাস্তি। অনেক লোক ইসলামকে জালিম ও পাশবিক ধর্ম বলে থাকে। আসলে এটা ঠিক নয়। আমি অনেক অমুসলিমের নিকট এ প্রশ্ন করেছি যে, আল্লাহ না করুন কেউ আপনার স্ত্রী, মা অথবা আপনার বোনের সাথে বাড়াবাড়ি করল, এদের ইজ্জত হরণ বা শ্লীলতাহানী করল এবং এর বিচারের জন্য আপনাকে জজ বা বিচারক বানানো হলো এবং অপরাধীকে আপনার সামনে উপস্থিত করা হলো। এক্ষেত্রে আপনি কোন্ শাস্তি প্রদান করবেন? সবাই উত্তর দিয়েছে, আমি একে হত্যা করব এবং কেউ কেউ এ পর্যন্ত বলেছে যে, আমি তার ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার চালাব যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনপাত না ঘটে। যদি কেউ আপনার নিজ স্ত্রী, কন্যা, বোন অথবা মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে তাহলে আপনি তাকে হত্যা করতে চান, অথচ

অন্য কারো স্ত্রী, বোন, মায়ের সঙ্গে একই অপরাধ করলে একই ধরনের শাস্তি দিলে তাকে জুলুম এবং পাশবিক কাজ কীভাবে বলা যায়? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমেরিকা, যাকে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র ধারণা করা হয়। এ দেশের ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ১,০২,৫৫৫টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। এ সকল মামলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো অভিযোগের শতকরা ২১ ভাগ মামলা যা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের মামলার সঠিক সংখ্যা জানতে উপর্যুক্ত সংখ্যাকে ৬.২৫ দিয়ে পূরণ করুন দেখবেন সংখ্যাটি ৬,৪০,৯৬৮ হবে। যদি এ সংখ্যাকে বছর থেকে দিনে পরিণত করতে চান, তাহলে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ দিলে দৈনিক ১,৭৫৬ হবে। পরবর্তীতে আরেকটি রিপোর্ট এলো যাতে এ বছরের প্রতিদিনের ধর্ষণের ঘটনা ১৯০০-তে পৌঁছেছে। আমেরিকার বিচার ইনসাফের 'ন্যাশনাল ক্রাইম সার্ভে ব্যুরো' (N.C.S.B)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯২ সালে ধর্ষণের ৩,০৭,০০০টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে যা মূল রিপোর্টের শতকরা ৩১ ভাগ ছিল। ধর্ষণের মূল ঘটনা ছিল ৯,৯০,৩৩২টি যা দশ লাখের কাছাকাছি। অর্থাৎ এ বছর আমেরিকায় প্রতি ৩২ সেকেন্ডে ধর্ষণের মত অপরাধের একটি ঘটনা ঘটেছে। আর আমেরিকা অপরাধের এক বড় ক্ষেত্র হয়েছে। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. রিপোর্ট মোতাবেক ওখানে ধর্ষণের যে ঘটনাবলির রিপোর্ট করা হয়েছে তাদের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে যা মোট সংখ্যার মাত্র শতকরা ১.২ ভাগ ছিল। এ ধরনের অপরাধে গ্রেফতারকৃত লোকদের শতকরা ৫০ ভাগকে মামলা রেকর্ডভুক্ত হবার পূর্বেই ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৮০ ভাগ লোককে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখন বুঝুন যদি কোনো ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের অপরাধ করে, তাহলে তাকে মাত্র ১ বার শাস্তি লাভ করতে হতে পারে। অন্য আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ৫০ ভাগ লোক যাদেরকে এ ধরণের মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের এক বছরেরও কম সময়ের জন্য জেল খাটার শাস্তি হয়েছে। আমেরিকাতে এ ধরনের অপরাধের সর্বচ্চ শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। কিন্তু প্রথম বারের মতো জজ (বিচারক) অপরাধীর সাথে নম্র আচরণ করে লঘু শাস্তি দিয়ে থাকেন। একটু বুঝুন যে, এক ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের মত অপরাধ করল, যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা শতকরা ১ ভাগ, যার সঙ্গে শতকরা ৫০ জন জজ নরম ব্যবহার করবে এবং এক বছরের কম সময়ের জেল দেবে।

ধরুন, আমেরিকায় যদি ইসলামি শরিয়াতের বিধান বাস্তবায়ন করা হয়, যে আইনে কোনো লোক যদি কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে সে দৃষ্টি নিচু করে নিবে, প্রত্যেক নারী পর্দার মধ্যে থাকবে, যার সারা শরীর (হাত ও চেহারা ব্যতীত) আবৃত থাকবে। এ অবস্থায় যদি কেউ ধর্ষণের মত অপরাধ করে এবং অপরাধীকে শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়, এখানে প্রশ্ন হলো এ অবস্থায় কি অপরাধ

বৃদ্ধি পাবে, নাকি ঐরূপই থাকবে, নাকি কমতে থাকবে? অবশ্যই এ ধরণের অপরাধ কমতে থাকবে এবং এটা ইসলামি শরিয়াত বাস্তবায়নের ফলেই হবে। ইসলাম এক সর্বোত্তম জীবন বিধান। কেননা এর শিক্ষা কেবল তত্ত্বগত নয় বরং এটা মানবসভ্যতার বাস্তব সমস্যার সঠিক সমাধানও পেশ করে। এ কারণে ইসলাম ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে সর্বোত্তম ফলাফল লাভ করে। ইসলাম বিশ্বজনীন কর্মোপযোগী এক ধর্ম যা, কোনো এক সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এজন্য অন্য কোনো ধর্মমতের মোকাবেলায় ইসলাম একমাত্র এমন ধর্ম যাকে অবলম্বন করে মানুষ নিজ জিন্দেগীর রাস্তা সোজা করে নিবে এবং নিজের আখিরাতের জিন্দেগীতে সফলতা অর্জন করবে। আর আখিরাতের জিন্দেগীর সফলতাই আসল সফলতা।

প্রশ্ন-২. ইসলাম মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ করে, তবে মুসলমানগণ নিজেদের ইবাদতের ক্ষেত্রে কা'বাকে সামনে রাখে কেন এবং কা'বার পূজা কেন করে?

উত্তর : কা'বা মুসলমানদের কিবলা বা নির্দিষ্ট স্থান। অর্থাৎ তা এমন স্থান যার দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়। মূলকথা এই যে, মুসলমান যদি নামাযে কাবার দিকে মুখ করে, সে কা'বার পূজা করে না, তার ইবাদতও করে না। মুসলমান কেবল আল্লাহকে সামনে রাখে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। আল-কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۔

অর্থ : আমি দেখতে পেয়েছি আপনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য আকাশের দিকে বারবার তাকাতেন সুতরাং আমি আপনার পছন্দমতো কিবলা বানিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে মসজিদে হারামের দিকে কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায় করুন।

ইসলাম একতার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে একতা ও একমত সৃষ্টির জন্য একটি কিবলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং এ নির্দেশ দিয়েছে যে, যেখানে থাকুন না কেন নামাযের সময় কিবলার দিকে মুখ রাখতে হবে। যে কা'বার পশ্চিমে থাকবে সে পূর্বদিকে এবং যে কা'বার পূর্ব দিকে থাকবে সে পশ্চিম দিকে মুখ করবে। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম দুনিয়ার মানচিত্র তৈরি করেন এবং তাদের মানচিত্রে দক্ষিণ ওপরের দিকে এবং উত্তর নিচের দিকে ছিল এবং এর ফলে কা'বা মধ্যখানে পড়েছিল। এরপর যখন পশ্চিমারা মানচিত্র তৈরি করল তারা উত্তরকে ওপরে এবং দক্ষিণকে নিচের দিকে দেখালো, যেরূপ মানচিত্র আজ দেখা যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। কা'বা শরীফ প্রায় সেই মধ্যখানেই পড়েছে। যখন মুসলমানগণ

মসজিদে হারামে যায় সে তার তাওয়াফ করে এবং এ আমল এক এবং সত্য মাবুদের ইবাদতের এবং ঈমানের প্রতিরূপ বা ছায়া। যার প্রত্যেক চক্করের একই কেন্দ্র থাকে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলাও একজন। যিনি মাবুদ। যার সাথে হাজরে আসওয়াদের সম্পর্ক, যার সম্পর্কে, ওমর (রা)-এর একটি হাদীস আছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)-কে চুম্বন খেলেন এবং বললেন, 'আমি জানি যে, তুমি শুধুই এক খণ্ড পাথর, তুমি কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখো না, যদি আমি নবী করীম ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'

নবী করীম ﷺ এর সময়ে সাহাবিগণ কা'বার ওপর চড়ে আযান দিতেন। যে ব্যক্তি এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানগণ কা'বা শরীফের পূজা করে। এর নিকট প্রশ্ন, এমন কোনো পূজারী আছে কী, যে কিনা কোনো মূর্তির পূজা করে, আবার তার ওপর আরোহণ করে, খাড়া হয় তার ওপর যার সে পূজা করে?

প্রশ্ন-৩. মুসলমানগণ কীভাবে ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম বলে অথচ ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে?

উত্তর : কিছু অ-মুসলিম এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশি হতো না যদি মুসলমানরা তরবারির দ্বারা বিজয়ী না হতো।

নিচের কয়েকটি বিষয় উক্ত কথাটিকে খণ্ডন করে স্পষ্ট করে দেবে যে, ইসলাম তরবারি বা শক্তির জোরে প্রসারিত হয়নি বরং এটা নিজস্ব বিশ্বজনীন সত্য এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রমাণের কারণে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ইসলাম' শব্দটি سَلَامٌ (সালাম) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, যার অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। এই রকম অর্থও আছে যে, নিজেকে আল্লাহর সামনে পেশ করবে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করবে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম যা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ মস্তক অবনতির মাধ্যমে পালন করা হয়। দুনিয়ার সকল লোক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হতে পারে না। কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা নিজ জাতির স্বার্থের জন্য কাজ করে এবং শান্তি নষ্ট করে। এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কারণে অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হয়, যারা অপরাধী এবং এ ধরনের লোকদের দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলাম সব সময় নিরাপত্তার প্রত্যাশী এবং শান্তির পক্ষে কাজ করে, তবে অনুসারীদের ওপর জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতিও প্রদান করে। কোনো কোনো স্থানে জুলুমকে শেষ করার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জুলুম উৎখাত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। এ

ধরনের দৃষ্টান্ত নবী করীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে আমরা নিতে পারি।

উক্ত অভিযোগের জবাব এই যে, ইসলাম তলোয়ার অর্থাৎ শক্তির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে এটি সঠিক নয়। এক ইংরেজ ঐতিহাসিক ডি. লিসী নিজ কিতাব 'Islam at the Cross Road' এ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। পৃষ্ঠা-৮-এ তিনি বলেন,

পৃথিবীর ইতিহাসে এ সত্য প্রকাশ্য, ইসলাম সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে– কারণ, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ছিলেন বিধর্মী, তাই এ ধরনের অভিযোগ কম বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য।

মুসলিমগণ স্পেনে প্রায় আটশো বছর রাজত্ব করেছেন এবং সেখানকার লোকদের মুসলমান করতে কখনও তরবারির ব্যবহার করেন নি। এরপর যখন খ্রিস্টানগণ শক্তিশালী হয়েছে ও ক্ষমতা দখল করেছে তখন মুসলমানদেরকে তরবারি দ্বারা এমনভাবে খতম করা হয়েছে যে, স্বাধীনভাবে আযান দেবার জন্য একজন মুসলমানও সেখানে বাকি ছিল না। পুরো আরব দেশ মুসলমানগণ ১৪০০ বছর যাবত শাসন কার্য পরিচালনা করে আসছেন। এ আরবে এখনো ১৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কেপটিক খ্রিস্টান এমন রয়েছে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খৃস্টানই রয়েছে। যেমন মিসরের কুতবী খ্রিস্টান এবং অন্যরা। যদি ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করতো তাহলে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত না। ভারত বর্ষে মুসলমানগণ এক হাজার বছর পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেছে। যদি তারা চাইত তাহলে তারা তলোয়ার দ্বারা প্রত্যেক অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পারতো। অথচ আজকের ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায় অমুসিলম জনসংখ্যার হার সেখানে কত বেশি। এ সকল জনসংখ্যা কি এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করে নি।

সারা দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মালয়েশিয়ায়ও ইসলামের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন্ মুসলিম সৈন্য বাহিনী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল? বরং ইসলামের বিধি-বিধান ও ন্যায় নীতিইএরূপভাবে বড়ই গতির সাথে আফ্রিকা পূর্ব উপকূলে প্রসার লাভ করেছিল। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ বলবেন কি কোন্ ইসলামি সৈন্য বাহিনী আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? এর সঠিক কোন জবাব নেই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থামাস কার্লাইল নিজ পুস্তক 'Hero and Hero Warship'-এ ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে লিখেছেন–

ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার এটা কোন্ ধরনের তরবারি। এই তরবারি এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা অন্যান্য সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন, যা একজনের মগজে জন্ম লাভ করেছে এবং সেখানেই তা প্রতিপালিত হয় এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর মাত্র একজন বিশ্বাস রাখতেন। যার সাথে সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য। যদি ঐ ব্যক্তি তার হাতে তরবারি নিয়ে এ মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এ তরবারির ধারকের নিজস্ব শক্তির পতন নিজে নিজেই ঘটে যাবে।

এ কথা ভুল যে, ইসলাম তরবারির শক্তির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে। যদি মুসলমানরা এটা করতে চাইতেনও তবু করতে পারতেন না। কারণ আল-কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে নির্দেশ রয়েছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ : দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই, ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ পৃথক হয়েছে।

ইসলাম মূলত জ্ঞান বা হিকমতের তরবারি দ্বারা প্রসার লাভ করেছে এবং এটা এমন এক তরবারি যা হৃদয় ও মনকে জয় করে। যা আল-কুরআনের ১৬ নং সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : ডাকো তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম নসিহত দিয়ে ও তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।

১৯৮৬ সালে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের অনুসারীদের গণনা করে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে ধর্ম বর্ধনশীলদের গণনাও লেখা হয়েছে। এ প্রবন্ধ 'The plain truth' নামে প্রচারিত হয়। এর মূল সূচিতে ছিল ইসলাম। যার অনুসারীদের তালিকায় শতকরা ২৩৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং খ্রিস্টধর্মে মাত্র ৪৭%। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এ পাঁচ দশকে কোন ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যার কারণে লাখ লাখ মানুষ মুসলমান হয়েছে? আজকের ইতিহাসে আমেরিকাতে সবচেয়ে বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। এটা কোন্ তলোয়ারের মাধ্যমে ঘটছে? যার কারণে বেশির ভাগ লোক মুসলমান হতে বাধ্য হচ্ছে? এ তরবারি ইসলামের সত্য শিক্ষার তরবারি। ডা. জোসেফ অ্যাডাম পিটার্সন ঠিকই বলেছেন যে, যে লোক এ বিষয়ে চিন্তিত যে আণবিক অস্ত্র একদিন আরবের লোকদের হাতে পড়বে। সে একথা জানে না যে,

ইসলামি বোমা তো বহু পূর্বেই পতিত হয়েছে এবং তা তখনই পতিত হয়েছে যখনই মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪. মুসলমানদের অধিক হারে মৌলবাদী ও একমুখী দেখা যায় কেন?

উত্তর : এই প্রশ্ন বেশিরভাগ ধর্মমতের বিতর্ক ও বিশ্ব বিষয়াবলির বিষয়ে ওঠানো হয়। কঠিন ধর্ম বিশ্বাস ও মৌলবাদের সাথে মুসলমানদের উল্লেখ বিশ্বব্যাপী বারবার করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ করে দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগান্ডার চূড়ান্ত করা হচ্ছে যা তাদেরকে বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের প্রবক্তা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কোথাও বোমা ফাটানো হলে আমেরিকার মিডিয়াগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের এ কাজের জন্য উৎসাহদাতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অথচ যেখানকার অপরাধী ছিল এক আমেরিকার সৈন্য। এখন আমরা এ সকল অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করব।

মৌলবাদী ঐ লোককে বলা হয়, যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মূল কথাগুলোকে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং তার ওপরে আমল করে। যদি কোনো ব্যক্তি উত্তম ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে মেডিকেলের মৌলিক কথাগুলোর জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তার উপর আমলের নিষ্ঠাও থাকতে হবে। যদি কেউ উত্তম ব্যায়ামবীর হতে চায় তাকেও ব্যায়ামের মৌলিক কথা-বার্তা জানতে হবে। দ্বিতীয় কথায়, একজন ডাক্তারকে অনুরূপভাবে এবং একজন ব্যায়ামবীরকে নিজস্ব বিষয়ে মৌলবাদী (Fundamentalist) হতে হবে। ঠিক এরূপভাবে একজন বৈজ্ঞানিক প্রথমত বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ জানতে হবে এবং দ্বিতীয় যুক্তিতে তাকে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলিতে মৌলবাদী হতে হবে। এরূপভাবে একজনকে দ্বীনি বিষয়েও মৌলবাদী হতে হবে।

মূলত সকল মৌলবাদী এক রূপ নয় এবং সকল মৌলবাদীকে এক রকম সংজ্ঞায় ফেলে বিচার করা যাবে না। মৌলিকভাবে মৌলবাদকে খারাপ বা ভালো এরূপ গ্রুপে ভাগ করা যাবে না। কারো মৌলবাদী হওয়া এ কথার ওপর সীমাবদ্ধ যে সে কোন ধরনের বিষয়ের মৌলবাদী। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা চোর নিজ পেশায় মৌলবাদী হয়, যে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়। এ কারণে তাকে অপছন্দ করা হয়। এর বিপরীত একজন (মৌলবাদী) ডাক্তার মানুষের জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর এবং সম্মানেরই হয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি জানি এবং তার ওপরে আমল করার চেষ্টারত আছি। কোনো মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া লজ্জার কোনো বিষয় নয়। আমি মৌলবাদী মুসলমান। এ জন্য গৌরববোধ করি। কেননা আমি জানি ইসলামের মৌলিক নীতিমালা শুধু মানবতার জন্যই নয়, সারা বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের এমন

কোনো মৌলিক নীতি নেই যা মানবতার কল্যাণ করে না বা তার ভেতরে কোনো ক্ষতি আছে। অনেক লোক ইসলাম সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের অনেক জ্ঞান সঠিক নয় এবং তা ইসলামের ভিত্তির ওপরেও নেই। এ ধরনের বুঝ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে হয়। যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মন-মগজ থেকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানে, তাহলে এ সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সামাজিক দিক দিয়ে উপকারী।

ওয়েবস্টার-এর ইংরেজি ডিকশনারি অনুযায়ী Fundamentalism ছিল এমন এক আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টরা আরম্ভ করে। এ আন্দোলনে নতুনত্বের প্রতিবাদ ছিল এবং এ সকল লোকেরা আকিদা ও আখলাকের ভিত্তিতে নয় বরং ঐতিহাসিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বাইবেলের ভুল থেকে পবিত্র করার ওপর জোর দান করতে থাকেন। তারা এও বলতে থাকেন যে, বাইবেলের মূলে বহু খোদার বাক্য আছে।

'মৌলবাদ' এমন এক পরিভাষা যা প্রথমে খ্রিস্টানদের এক দল সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় যারা বিশ্বাস করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহর বাণী এবং এর মধ্যে কোনো কম বেশি বা ভুল নেই। কিন্তু আজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী মৌলবাদ হলো কোনো বিশেষ ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের মূল বা ভিত্তির ওপরে আমল করা। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এবং তাদের মিডিয়াগুলো মৌলবাদের অভিযোগ থেকে খ্রিস্টানদের অব্যাহতি দিয়ে মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে এ অভিযোগ চাপাচ্ছে। আজ 'মৌলবাদ' পরিভাষা যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই ব্যবহারকারীর মগজে তৎক্ষণাৎ এমন এক মুসলমানের চিত্র ভেসে ওঠে, যে এদের দৃষ্টিতে নিষ্ঠাবান। সকল মুসলমানেরই নিষ্ঠাবান হওয়া জরুরি। নিষ্ঠাবান এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তার আকিদাকে প্রচার করে।

যদি কোনো ডাকাত কোনো পুলিশ দেখে তাহলে তার দ্বারা সে ভীত হয়। দ্বিতীয় ভাষায় পুলিশ ডাকাতের জন্য ভীতি উদ্রেককারী। এভাবে সকল মুসলমান চোর-ডাকাত এবং ব্যভিচারী এবং সাধারণের শত্রুদের জন্য ভীতি উদ্রেককারী হতে হবে এবং এ ধরনের লোক যখন কোনো মুসলমানকে দেখবে তখন তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে। এটা বৈধ যে, এ শব্দ সাধারণভাবে এ ধরনের লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে যে ব্যক্তি সাধারণ লোকদের জন্য ভীতিপ্রদ। কিন্তু একজন ভালো মুসলমান যিনি বিশেষ কিছু লোক যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য ভীতির কারণ হবে, বরং সাধারণ লোকদের জন্য নয়। মূলকথা হলো একজন মুসলমান নিরপরাধ জনসাধারণের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতীক হবেন।

হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ শাসনামলে কিছু কিছু মুজাহিদ যারা নম্রতার সাহায্যকারী ছিলেন না, যাদেরকে ইংরেজরা রাষ্ট্রসন্ত্রাসী বলতো। কিন্তু সাধারণ লোকজনের নিকট তারা জনগণ ও দেশের বন্ধু ছিল। এ সকল লোকদের দু'রকমের নাম ছিল। যারা মনে করতো ইংরেজদের হিন্দুস্তান শাসন করার অধিকার ছিল, তাদের নিকট তারা ছিল সন্ত্রাসী। যারা মনে করতো ইংরেজদের হিন্দুস্তান শাসন করার কোনো অধিকার নেই তারা তাদেরকে দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধা বলতো। এজন্য এটা খুবই জরুরি যে, কোনো ব্যক্তির কোন কর্মের ব্যাপারে ফায়সালা করার পূর্বে তার অবস্থান শুনতে হবে। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি শোনার পর সুরতহাল নিয়ে এ ব্যক্তির দলিল ও উদ্দেশ্য দেখে তার সম্পর্কে রায় দেয়া যাবে।

'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ শান্তি। এটা শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। যা অনুসারীদের দুনিয়ায় শান্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা প্রদান করে। এজন্য সকল মুসলিমের মৌলবাদী হবার দরকার। এই দ্বীন, যা নিরাপত্তার ধর্ম তার মূল ভিত্তির ওপর আমল করা দরকার এবং সে সমাজের দুশমনদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকারী হওয়াও দরকার। এ জন্য যে, সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় ও ইনসাফের জয়-জয়কার থাকে।

প্রশ্ন-৫। ইসলাম এক ব্যক্তিকে একের অধিক বিবাহ অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দিয়েছে?

উত্তর : Polygamy অর্থাৎ অনেক বিবাহের অর্থ এমন বৈবাহিক নিয়ম যেখানে এক ব্যক্তি অনেকের সাথে অংশীদার ভিত্তিতে জীবনযাপন করবে? এটা দু প্রকার। ১. যেখানে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে। ২. যেখানে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করবে।

ইসলাম সীমিত সংখ্যক স্ত্রী রাখার পক্ষে অনুমতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এক স্ত্রীকে একই সময়ে একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি প্রদান করা হয় নি। মূল প্রশ্ন এখানেই যে, ইসলাম একজন স্বামীকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দিল?

একমাত্র আল-কুরআনই হলো এমন একখানা ধর্মীয় কিতাব যাতে বলা হয়েছে, এক স্ত্রী বিয়ে কর। দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্মীয় কিতাবে একথা বলা হয় নি যে শুধু এক স্ত্রী রাখতে হবে। তা সে হিন্দুদের বেদ, মহাভারত বা গীতাই হোক, অথবা ইহুদিদের তালমুদ অথবা খ্রিস্টানদের বাইবেলই হোক না কেন। এ সকল ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে এবং এ প্রথাই চলে আসছিল কিন্তু বহু শতাব্দী পরে হিন্দু পুরোহিত পণ্ডিতগণ এবং খ্রিস্টান পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা একের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। বহু হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের যাদের উল্লেখ হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে আছে তাদের একের অধিক স্ত্রী ছিল। রামের

পিতা রাজা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল। এভাবে কৃষ্ণেরও বহু স্ত্রী ছিল। প্রথম প্রথম খ্রিস্টানদেরও এ অনুমতি ছিল যে, যত ইচ্ছে স্ত্রী রাখতে পারে। এ জন্য বাইবেলে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল না। মাত্র কয়েক শ' বছর পূর্বে পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা এক এ সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইহুদি ধর্মেও একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ তালমূদের বন্দনা মতে ইবরাহীম (আ) এর তিন স্ত্রী এবং সুলাইমান (আ)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন। একের অধিক স্ত্রীর অনুমতি গরশুম বিন ইহুদা যার রাজত্ব ৯৬০ থেকে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তার এক আদেশের ভিত্তিতে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী সিফার্দী ইহুদি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাধিক স্ত্রীর ওপর অটল থাকেন। এমনকি ইহুদিদের প্রধান রাববীনেই (Chief Rablonate) একাধিক স্ত্রীর ওপরও অটল থাকেন।

পরিষ্কার কথা এই যে, ১৯৭৫ সালে ভারতে এক পরিসংখ্যানের ফল এই দাঁড়ায় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক বিবাহ করে। ইসলামের নারীদের মুকাম কমিটির রিপোর্ট যা ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় পৃষ্ঠা নম্বর ৬৬, ৬৭-তে বলা হয়েছে যে, ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ এর পরিধিতে হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিয়ের শতকরা হার ৫.০৬% যেখানে মুসলমানদের একাধিক বিয়ের শতকরা হার ৪.৩১ ছিল। ভারতের আইন মোতাবেক মুসলমানদের একাধিক বিয়ে করা বৈধ। পক্ষান্তরে হিন্দুদের একাধিক বিয়ে সিদ্ধ নয়। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের একাধিক বিবাহ মুসলমানদের চেয়ে বেশি। প্রথমে ভারত বর্ষে একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে কোনো আইন ছিল না। ১৯৪৫ সালে যখন ভারতে ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হয় তখন হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি করা হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, একথা আইনি বিধানে আছে, হিন্দুদের ধর্মীয় গল্পে নয়। আসুন আমরা দেখি ইসলাম কেন একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে?

যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় কিতাব যাতে এক স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা নিসার ৪নং এবং ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের পছন্দমতো বিয়ে কর দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার জন।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ : যদি তোমরা ভয় পাও যে, সুবিচার করতে পারবে না তাহলে মাত্র একজন।

কুরআন নাযিলের পূর্বে বিয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না এবং বহু পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করত, এমনকি কারো কারো শত স্ত্রীও থাকত। কিন্তু ইসলাম স্ত্রীদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই দুই, তিন তিন, অথবা চার চার স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হলো ন্যায়বিচার করতে হবে। এ সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ ـ

অর্থ : তোমরা কখনো একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদি তোমরা তা করতে চাও-ও।

এজন্য একাধিক বিয়ে কোনো নিয়ম নয়। বরং এটা ভিন্ন এক কথা। অনেক লোক একথা বুঝে নিয়েছে যে, এটা আবশ্যকীয় যে এক মুসলমান একাধিক বিয়ে করবে। (এ ব্যাপারে বুঝতে হলে নিচের বিষয়গুলো বুঝতে হবে।) হালাল হারামের দিক দিয়ে ইসলামের বিধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. **ফরজ :** এটা আবশ্যকীয় এবং পালনীয়। এর ওপর আমল না করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে।

২. **মুস্তাহাব :** এর নির্দেশ আছে এবং এর ওপর আমল করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. **মুবাহ :** বৈধ, এটা করার অনুমতি আছে। তবে করা না করা সমান।

৪. **মাকরূহ :** এটা বৈধ নয়, এর ওপর আমল করা অপছন্দনীয়।

৫. **হারাম :** এটাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ওপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং এ কাজ পরিত্যাগ করা সওয়াবের কাজ।

একের অধিক বিয়ে করা এ সকল বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ করার অনুমতি আছে, তবে একথা বলা যাবে না যে, যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী আছে, সে তার চেয়ে উত্তম যার স্ত্রী মাত্র একজন। এটা আল্লাহর কুদরতি নিয়ম যে, নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। তবে একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক শক্তি রাখে। একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। এজন্য জন্মের শুরুতে মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশুর মৃত্যু হার বেশি। এভাবে যুদ্ধে নারীর চেয়ে পুরুষ অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে। দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধির কারণে নারীর চেয়ে অধিক হারে পুরুষ মৃত্যুবরণ করে। নারীদের মধ্যে বেঁচে থাকার বয়স গড় পুরুষের চেয়ে বেশি আবার বিপত্নীক স্বামীদের চেয়ে বিধবা স্ত্রীদের সংখ্যা অধিক। ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ সে সকল রাষ্ট্রের

অন্তর্ভুক্ত, যাদের নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এর কারণ হলো অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা। ভারতে নারী শিশুদের অনেককে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মূলত এখানে লাখ লাখ নারী গর্ভবতী অবস্থায় ডাক্তারি পরীক্ষায় কন্যা শিশুর ভ্রূণকে চিহ্নিত করে হত্যা করে। এজন্য প্রতি বছর দশ লাখের অধিক কন্যা শিশুকে মৃত্যুর দরজায় পাঠানো হয়। যদি এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ করা হতো, তাহলে ভারতেও নারীদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে যেত।

আমেরিকায় পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা ৫৮ লাখের মতো বেশি। শুধু নিউইয়র্কে নারীদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ১০ লাখ বেশি এবং এ তথ্য ওখানকার এক পরিসংখ্যান Gender ভিত্তিক ছিল। আমেরিকায় নপুংসক ভিত্তিক সামগ্রিক সংখ্যা আড়াই কোটি। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে, এ সব লোকের নারীদের বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই নেই। এরূপ অবস্থা বৃটেনেও। সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা ৪০ লাখ বেশি।

– জার্মানিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫০ লাখ বেশি।

– রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯০ লাখ বেশি। আদম শুমারি অনুপাতে, বর্তমানে বাংলাদেশেরও নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় সাত ভাগ বেশি।

আসল সংখ্যা তো আল্লাহই ভালো জানেন যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি। যদি একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করে, তাহলে আমেরিকাতে ৩ কোটি নারী স্বামীবিহীন থাকবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, আড়াই কোটি লোক আমেরিকাতে নপুংসক (হিজড়া)। এরূপভাবে বৃটেনে ৪০ লাখ, জার্মানিতে ৫০ লাখ, রাশিয়াতে ৯০ লাখ নারীর জন্য কোনো স্বামী মিলবে না। ধরুন, আমার বোন আমেরিকায় থাকে এবং সে অবিবাহিত নারীদের একজন। আবশ্যকীয়ভাবে আপনার বোনও ওখানে থাকতে পারে। এদের জন্য দুটি অবস্থার মধ্যে একটি সমাধান বেছে নিতে হবে–

১. হয়তো সে এমন এক লোকের সঙ্গে বিয়ে বসবে যার পূর্বে থেকে স্ত্রী আছে, অথবা ২. তাকে পাবলিক প্রপার্টি বা বেশ্যা হয়ে যেতে হবে। এ দু'পথের বাইরে কোনো পথ নেই। যে নারীর কল্যাণময় গুণ আছে সে অবশ্যই প্রথম পথ অবলম্বন করবে। অনেক নারী নিজ স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর সঙ্গ বরদাশ্‌ত করে না। কিন্তু যখন ইসলামি সমাজে অবস্থা এতোদূর নাজুক ও সঙ্কটময় হয় তখন একজন ঈমানদার নারী এধরনের ক্ষতি স্বীকার করে নেবেন এবং তিনি চাইবেন না যে তারই বোনেরা পাবলিক প্রপার্টি বা বেশ্যা হয়ে থেকে যাবে।

প্রশ্ন-৬. যদি ইসলামে পুরুষকে একের অধিক বিবাহ (স্ত্রী রাখার) করার অনুমতি দেয়, তবে কেন একজন স্ত্রী একাধিক স্বামী (একত্রে) গ্রহণ করতে পারবে না?

উত্তর : প্রথম কথা এই যে, আপনাকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে, নারীর তুলনায় পুরুষের সেক্স পাওয়ার (যৌন সক্ষমতা) বেশি। দ্বিতীয় বিষয় হলো পুরুষ জৈবিকভাবে (Biologicaly) একাধিক নারীর সাথে শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। অপর দিকে একজন নারী শৃঙ্খলার সঙ্গে একাধিক স্বামী ম্যানেজ করতে সক্ষম হবে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, Ministration Period এ (মাসিক চলাকালীন) একজন নারী শারীরিক ও মেধাগত পরিবর্তনের মাঝে কাটায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশিরভাগ লড়াই ঝগড়া এই বিশেষ সময়ে ঘটে থাকে। আমেরিকার ক্রাইম রেকর্ড (অপরাধ তথ্য) অনুযায়ী আমেরিকার নারীরা যে অপরাধ করে তার বেশিরভাগ মাসিক চলাকালীন সময়ে করে থাকে। যদি নারীদের একাধিক স্বামী থাকত তাহলে মেধার ওপর অধিক চাপ পড়ত এবং খাপ-খাওয়াতে সমস্যা হতো।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের এটাও বলে যে, যদি একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে তাহলে জীবের মধ্যে ক্ষতিকারী স্থানান্তরকারী ভাইরাস বেশিরভাগ জন্ম লাভ করে এবং সাথে সাথে এ জীবাণুগুলো অন্য স্বামীর মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। (যেমন এইড্স এর জীবাণু) যেটা এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঘটে না।

ধরুন, একজনের একাধিক স্ত্রী আছে এবং তাদের সন্তানাদি থাকে তাহলে মায়েদের সনাক্ত করা এক্ষেত্রে সম্ভব। পিতা ও মাতাকে সনাক্ত করা যায়। দ্বিতীয় ঘটনায় যদি স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকত তাহলে সন্তানদের মাতাকে সনাক্ত করা যেত পিতাকে নয়। ইসলাম হসব-নসব (বংশধারা)-এর সনাক্ত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, যদি সন্তানেরা পিতার পরিচয় না পায় তাহলে তারা মানসিক সমস্যাতে ভোগে। একথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের বাচ্চারা খুবই দো-টানার মধ্যে জীবনযাপন করে। বাচ্চাকে যদি স্কুলে ভর্তি করার প্রয়োজন হয় এবং এর পিতার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাকে একাধিক নাম দিতে হবে এবং আপনি জানেন এদেরকে কী বলা হয়।

এরূপ বহু কারণ আছে যার ভিত্তিতে বহু স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় নি। এর বিপরীতে যে সমস্ত কারণে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

উদাহরণস্বরূপ, স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা কোনো ডাক্তার এ বিষয়ে ১০০% গ্যারান্টি দিতে পারে না যে স্বামী ১০০% বন্ধ্যা, এমনকি কেস বন্ধী করানোর পরও কোনো ডাক্তার আপনাকে একথা বলতে পারবে না যে, ঐ ব্যক্তি কখনো পিতা হতে পারবে না। এ কারণে এ অবস্থায়ও বাচ্চাকে সনাক্ত করার মধ্যে সন্দেহ এসে যায়।

দ্বিতীয় কেস এরূপ যে, যদি স্বামী কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয় অথবা তার কঠিন পীড়া হয়, তাতেও কি স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না? একথার বিশ্লেষণ করা যাক। যদি স্বামী অসুস্থ থাকে সে প্রয়োজনীয় কাজ সরঞ্জাম দিতে না পারে এবং নিজ বংশ রক্ষার দায়িত্বও পালন করতে অক্ষম হয় এবং স্ত্রীকে পরিতুষ্টি দিতে অক্ষম হয়।

প্রথম অবস্থায় যদি বাচ্চা এবং বিবির প্রয়োজন পূরণ করতে না পারে, সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাকে বলে যে, স্ত্রীর শারীরিক বিষয়ে স্বামীর প্রয়োজন ততটা নয়। এরপরও যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে খুলা তালাক গ্রহণ করতে পারে। এখানে স্ত্রীর জন্য খুলা তালাক গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা যখন স্ত্রী তালাক নেয় তখন সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় যদি সে মাযুর বা রোগী হয় এ অবস্থায় সে যদি তালাকও নেয় তাহলে কে তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্ন-৭. ইসলাম নারীদের পর্দায় রেখে এদেরকে কি খাটো করে নি?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াগুলোতে ইসলামে নারীদের মর্যাদাকে বেশিরভাগ খাটো করার টার্গেট বানায়। পর্দা অর্থাৎ ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে বলা হয় যে, নারীরা ইসলামি শরিআতের দ্বারা নির্যাতিত এবং তাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা ইসলামে পর্দার বিষয়টা পরে বিশ্লেষণ করি। আমরা ইসলাম পূর্ব যুগের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিই। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য যে, ইসলাম পূর্ব সংস্কৃতিগুলোতে নারীর কোনো অবস্থান ছিল না। এদেরকে শুধুই যৌন তৃপ্তির মাধ্যম মনে করা হতো। এমনকি এদেরকে মানবতার মূল ভিত্তির সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হতো না। বাবেলের সংস্কৃতিতে নারীদের খুঁটি মনে করা হতো এবং তাদের আইনে সে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যদি কোন পুং কাউকে হত্যা করতো তাহলে তার শাস্তির সাথে সাথে স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

গ্রিক সংস্কৃতি যাকে পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ও মর্যাদাবান মনে করা হয়। এতেও নারীদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে তুচ্ছ মনে করা হতো। গ্রিক দেউ মালায় এক খেয়ালি নারী ছিল যাকে 'পান্ডুরা' বলা হয়, যাকে মানুষের দুর্ভাগ্যের মূল মনে করা হয়। এ লোকেরা নারীদের পুরুষের

চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতো। একথা ঠিক যে, দেশীজোগী মতে নারীদের অনেক মর্যাদাবান মনে করা হতো এবং এ ব্যাপারে তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করতো। পরবর্তীতে এ সংস্কৃতিতেও আমিত্ব ও জাতিভেদ শুরু হয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

রোমের সংস্কৃতি যখন উচ্চ মার্গে আরোহণ করছিল তখন একজন পুরুষের তার স্ত্রীর জীবন হরণের অধিকার ছিল। বৈষম্য ও উলঙ্গপনা এ সভ্যতায় সাধারণ ব্যাপার ছিল। মিসরীয় সভ্যতায় নারী দেহকে খারাপ মনে করা হতো এবং তাদেরকে শয়তানের আলামত মনে করা হতো। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের খুবই তুচ্ছ করা হতো এবং সাধারণভাবে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ পিতা ও বংশের জন্য এতোই অমর্যাদাকর মনে করা হতো যে, তাদেরকে জীবন্ত দাফন করা হতো।

ইসলাম নারীদের সম মর্যাদা দান করেছে এবং ১৪০০ বছর পূর্বে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম এতো গুরুত্ব দিয়েছে যে, নারীকে তার মর্যাদায় রেখেছে। সাধারণভাবে পর্দা শুধু নারীদের জন্য, এরূপ ভাবা হয় অথচ কুরআন মাজীদে পর্দার প্রথম নির্দেশ পুরুষের জন্যই দিয়েছে। যেমন ২৪ নং সূরা নিসা'র ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন (পুরুষদের) বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এ আয়াতের আলোকে যখন কোনো পুরুষ কোনো গায়রে মুহরিম নারীর ওপর দৃষ্টি দিবে তখনই দৃষ্টিকে নামিয়ে নিবে। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে। ২৪ নং সূরা নিসা'র আয়াত ৩১-এ–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا

مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করে না বেড়ায়। তবে শরীরের যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে সেগুলোর কথা আলাদা। তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় (ওড়না) বা চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর আগের ঘরের ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইপো, তাদের বোনপো, তাদের নিজেদের মহিলা, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী নিজেদের অধিকারভুক্ত এমন পুরুষ যাদের মহিলাদের নিকট থেকে কোনো কিছুই কামনার নেই। কিংবা এমন শিশু যারা মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না এদের ছাড়া।

এ ধারাবাহিকতায় ছয়টি শর্ত রয়েছে। তাহলো–

১. পুরুষ নিজ নাভী থেকে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখার পোশাক পরবে। নারীদের শরীর ঢেকে রাখবে। যদি হাত ও চেহারা ঢেকে রাখতে পারে তাহলে আরো ভালো। তবে এটা তার জন্য আবশ্যকীয় নয়। সারা শরীর আবৃত রাখা দরকার। শুধু হাতের কব্জি পর্যন্ত ও চেহারা দেখা যায় তবে দেখার শর্ত পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন।

২. সে এমন পোশাক পরতে পারবে না যাতে ভেতরের দৃশ্য চোখে পড়ে।

৩. এমন আঁটসাঁট পোশাক পরতে পারবে না যা দ্বারা অঙ্গের ভাঁজগুলো দেখা যায়।

৪. সে এমন কাপড় পরতে পারবে না যা দ্বারা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করা হয়।

৫. এমন পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট এবং তাদের সাদৃশ্য রাখে। যেমন পুরুষের জন্য ছায়া, ব্লাউজ অথবা শাড়ি পরা।

৬. এমন পোশাক পরা যাবে না যাতে আপনাকে বিধর্মী বা কাফির ধারণা করা হয়। (যেমন : পৈতা পরা, সিঁদুর লাগানো ইত্যাদি।)

আসুন! দ্বিতীয়বার প্রশ্নের সুযোগ হতে পারে যে, ইসলাম পর্দার এবং বিপরীত জাতির পার্থক্যের মধ্যে বিশ্বাস করে কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম সমাজ যে পর্দার সহযোগী আবার কোনো সমাজে পর্দার বিপরীতও আছে।

আমেরিকা এমন এক রাষ্ট্র যেখানে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয়। এফ. বি. আই. এর ১৯৯০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ হাজার ২৫৫ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা

হয়েছে। এ হলো ঐ সকল মামলা যেগুলো দায়ের করা হয়েছে। অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এ হলো সকল অপরাধ ঘটনার শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র। যদি আপনি সঠিক চিত্র পেতে চান তাহলে ১০,২৫৫-কে ৬.২৫ দিয়ে পূরণ করুন, দেখবেন শুধু ১৯৯০ সালে ৬,৪০,০০০ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে। যদি আপনি বছরের দিনগুলো দিয়ে এ সংখ্যাকে ভাগ করুন তাহলে দৈনিক ব্যভিচারের সংখ্যা পাবেন ১,৭৫৬। অর্থাৎ তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন ১,৭৫৬ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে প্রতিদিন ১৯০০ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে এবং ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ১.৩ মিনিটে একটি ব্যভিচারের কেস রেকর্ড করা হয়েছে। আপনি কি জানেন, কেন আমেরিকাতে নারীদের অধিকার বেশি প্রদান করা হয়েছে এবং সেখানে নারীদের ধর্ষণও বেশি হয় এবং এ সকল কেসের শতকরা ১৬ ভাগের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ এর শাস্তি হয়। অর্থাৎ মাত্র ১.৬% এর কিছুটা শাস্তি হয়। (কাস্টডিতে যায়)। সকল অভিযোগের মাত্র ০.৮%-এর মোকদ্দমা তৈরি হয়। অর্থাৎ কোনো লোক যদি ১২৫ বার ব্যভিচার করে তাহলে তার একবার মাত্র কাস্টডিতে যেতে হয়। ব্যভিচারের শাস্তি হলো বন্দি করা যেটা আমেরিকার আইনে রয়েছে, অথচ সে বলে যে, সে মাত্র এই প্রথম বার ব্যভিচার করেছে এবং পাকড়াও হয়েছে। একে একবার সুযোগ দেয়া হয় এবং এক বছরের কম শাস্তি দেয়া হয়।

এমনকি ভারতেও National Crime Bureo (N.C.B)-এর রিপোর্ট মোতাবেক যা ১৯৯২ সালের ১ ডিসেম্বরের এক খবরে প্রকাশিত হয় যে, প্রতি ৫৪ মিনিটে ভারতে একটা মামলা দায়ের হয়। প্রত্যেক ২৬ মিনিটে উত্যক্ত করার মামলা, ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যদি আপনি এ দেশের সকল ঘটনা একত্র করেন তাহলে প্রতি ২ মিনিটে একটা ব্যভিচারের মামলা পাওয়া যেত। যদি আপনি আমেরিকার সকল নারীকে হিজাব পরতে বলেন, তাহলে এ সকল ঘটনা বাড়বে না বরং কমবে?

প্রশ্ন-৮. ইসলামে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : ইসলামে সর্বদা দু'নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নয় এটার ব্যতীক্রম আছে। কুরআন মাজীদে তিন স্থানে নারী-পুরুষের পার্থক্য ব্যতীত সাক্ষীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তরাধিকার প্রশ্নে ওয়ারিশ-এর ব্যাপারে ওসিয়তের সময় দু'জন ন্যায়বিচারক লোকের সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন। যেমন ৫ নং সূরা মায়িদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় এসে উপনীত হয়, ওসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময়ে তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তাহলে বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।

তালাকের ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানোর নির্দেশ আছে। ৬৫ নং সূরা তালাকের ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে। তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যই এ সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এরূপভাবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ব্যাপারে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। যেমন ২৪ নং সূরা নূর -এর ৪ নং আয়াতে মহান রব ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

অর্থ : যারা (খামাখা) সতী-সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর চারজন সাক্ষী আনতে পারে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো, আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, এরাই অপকর্মকারী।

একথা সমীচীন নয় যে, দু'মহিলার সাক্ষ্য সব সময় এক পুরুষের সমান। এ শুধু বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কুরআন শরীফে পাঁচটি আয়াত এরূপ আছে যাতে নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। আর একটি আয়াত এমন আছে যাতে বলা হয়েছে দু'নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এটা ২ নং সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। যে আয়াত সম্পদের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় আয়াত। যেমন– মহিয়াসের নিম্নোক্ত বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ـ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ـ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ـ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ـ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি কর তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যেকোন একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দিবে যাকে আল্লাহ তাআলা লেখা শিখিয়েছেন, তাদের কখনো লেখার কাছে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। ঋণ গ্রহীতা লেখককে বলে দিবে কী শর্ত সেখানে লিখতে হবে। এ বিষয়ে লেখককে তার আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত। কিছুই যেন সে বাদ না দেয়। যদি ঋণ গৃহীতা অজ্ঞ ও মূর্খ হয় এবং সব দিক থেকে দুর্বল অথবা (শর্তাবলি) বলে দেবার ক্ষমতাই সে না রাখে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো ওলী ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে কী কথা লিখতে হবে। আরো দু'জন পুরুষকে এ চুক্তিনামায় সাক্ষী বানিয়ে নিও। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন মনে করিয়ে দিতে পারে।

কুরআনে কারীমে এ আয়াত শুধু মালের লেনদেনের জন্য, আর ঐ প্রকারের লেনদেনের মধ্যে একথা বলা হয়েছে যে, এ চুক্তিনামা দুই দলের মধ্যে লিখে নিতে হবে। এজন্য দু'জন সাক্ষী বানিয়ে নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন শুধু পুরুষই হয়, যদি পুরুষ না পাওয়া যায়, এ অবস্থায় একজন পুরুষ ও দু'জন নারী যথেষ্ট। ইসলামে সম্পদের লেনদেনে দু'জন পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম পুরুষের ওপর এ আস্থা রাখে যে, সে বংশীয় দায়িত্ব রক্ষা করবে। যেহেতু অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের ওপর, এজন্য এটা বুঝা যায় যে, সে সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় অধিক সম্পর্ক রাখে। দ্বিতীয় অবস্থায় একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং যদি একজন নারী ভুলে যায়, অথবা ভুল করে তাহলে দ্বিতীয় জন মনে করিয়ে দেবে। কুরআনে ব্যবহৃত تَضِلَّ

শব্দের অর্থ ইচ্ছেকৃত ভুল করা অথবা অনিচ্ছেকৃত ভুলে যাওয়া। শুধু সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিপরীতে কিছু লোক একথা বলে যে, হত্যার ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য দ্বিগুণ করতে হবে অর্থাৎ দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হবে। এ ধরনের কাজ-কর্মে একজন নারী পুরুষের তুলনায় বেশি ভীতু হয় এবং সে নিজের আবেগী অবস্থার কারণে অস্থির হয়। এজন্য অনেক (পণ্ডিত) লোকের মতে হত্যার মতো কাজে দু জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু কিছু আলেমের মতে, সকল ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এ ব্যাপারে সকলে একমত হতে পারেন নি। কারণ ২৪ নং সূরা আন-নূরের ৬ থেকে ৯ নং আয়াতে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। যেমন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : যারা নিজেদের স্ত্রী (কিংবা স্বামী)-র ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে। তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, অবশ্যই সে নিজে সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার ওপর যেন আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়। স্ত্রীর ওপর থেকে এ ধরনের আনিত অভিযোগের শাস্তি রহিত করা হবে যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, এই পুরুষ লোকই আসলেই মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার বলবে, পুরুষটি সত্যবাদী হলে আল্লাহর গযব যেন তার ওপর নেমে আসে।

আয়েশা (রা) যিনি আমাদের নবী করীম ﷺ এর স্ত্রী ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে কম বেশি ২ হাজার ২১০টির কাছাকাছি হাদীস বর্ণিত আছে। যা তার একার সাক্ষ্যের ওপরে ভিত্তি করে সনদভুক্ত হয়েছে। এটা এ কথার সাক্ষী যে, একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অনেক আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আপনি আন্দাজ করতে পারেন যে, রোযা যেটা ইসলামের মৌলিক ইবাদতের একটি, এ ব্যাপারেও একজন নারীর সাক্ষ্য

গ্রহণযোগ্য এবং তার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে গোটা মুসলিম সমাজ রোযা রাখবে। আলেমদের মতে রোযা শুরু করার জন্য এক এবং শেষ করার জন্য দু'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন এবং এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে, সে সাক্ষী পুরুষ হোক কিংবা নারী। কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যাতে শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই জরুরি যেমন নারীদের মাসআলার ব্যাপারে, মহিলাদের দাফনের জন্য গোসল দেয়া, এ ধরনের বিষয়ে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যে পার্থক্য করা হয়েছে যা অসমতার ভিত্তিতে নয় বরং সমাজে তাদের দায়িত্বের পার্থক্যের কারণে করা হয়েছে। যে দায়িত্ব ইসলাম উভয়কে (ভাগ করে) দিয়েছে।

প্রশ্ন-৯. ইসলামে উত্তরাধিকারে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর : কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যাতে উত্তরাধিকার বণ্টনের ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

২ নং সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮০ ও ২৪০

৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ৭, ৯, ১৯ ও ৩৩

৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং ১০৬ থেকে ১০৮

কুরআন মাজীদের তিন আয়াতে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারে অংশ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে দু'আয়াত এরূপ ৪ নং সূরা নিসা আয়াত নং ১১ ও ১২–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۔ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۔ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۔
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۔ فَاِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۔ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۔ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ
اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۔ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۔ وَلَهُنَّ

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ ـ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকারে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের জন্য বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো। কিন্তু কন্যারা যদি দুয়ের অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য সম্পত্তির দুই -তৃতীয়াংশ আর কন্যা যদি একজন হয় তাহলে তার অংশ হবে অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্য থাকবে ছয় ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতা থাকে তাহলে মায়ের অংশ হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই-বোন বেঁচে থাকে তাহলে তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, তার ওসিয়ত পূরণ ও ঋণ আদায়ের পরই এসকল ভাগ হবে। তোমরা জানো না তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্তুতির মধ্য থেকে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনিই হচ্ছেন মঙ্গলময়।

তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের একভাগ। তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ, অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা-মাতাও নেই, তার শুধু এক ভাই এক বোন আছে, তাহলে তাদের সবার জন্য থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, তারা যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সকলে মিলে পাবে এক-তৃতীয়াংশ, মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়াই। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

৪ নং সূরা নিসা'র ১৭৬ নং আয়াতে মহান রব আরো বলেন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۔ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۔ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۔ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۔ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۔ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۔

অর্থ : (হে নবী!) তারা আপনার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে তোমাদের তার সিদ্ধান্ত অবহিত করছেন। যার পিতা-মাতা কেউ-ই নেই আবার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, এ ধরনের কোনো সন্তানহীন ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে বোনটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হবে। অপরদিকে সে যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে সে তার বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তারা দু'জন হয় তাহলে তারা দুই বোন সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগের মালিক হবে। যদি ভাই-বোনেরা কয়েকজন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষের দুই ভাগ (১:২)। আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকারের এ আইন-কানুনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য বলে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা (কোনোরূপ) বিভ্রান্ত হয়ে না পড়, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

বেশিরভাগ নারীদের অংশ পুরুষের অর্ধেক তবে সর্বদা এমন নয়। যদি মৃতের মাতা-পিতা এবং ছেলে-মেয়ে না থাকে কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে ভাই-বোন থাকে তা হলে উভয়ে ১/৬ অংশ করে পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়ে ১/৬ অংশ করে লাভ করবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃতা স্ত্রী হয় এবং তার সন্তান এবং ভাই-বোন না থাকে এবং তার স্বামী এবং মা-বাপ থাকে তাহেল স্বামীকে অর্ধেক এবং মাকে ১/৪ অংশ এবং পিতাকে ১/৬ অংশ দিতে হবে। এ অবস্থায় মায়ের অংশ পিতার দ্বিগুণ ঐ কথা ঠিক যে, সাধারণভাবে নারীদের পুরুষের তুলনায় অর্ধেক অংশ মিলে। যেমন কন্যার অংশ অর্ধেক। স্ত্রীদের ১/৮ অংশ যেখানে স্বামীদের ১/৪ অংশ। মৃতের সন্তান না থাকলে তাহলে স্ত্রীর ১/৪ অংশ এবং স্বামীর ১/২ (অর্ধেক) অংশ। মৃতার সন্তান না থাকে এবং মৃতের মা-বাপ বা সন্তান না থাকে এবং মৃতের মা-বাপ বা সন্তান না থাকে, তাহলে বোন ভাইয়ের অর্ধেক অংশ লাভ করবে। বেশিরভাগ স্থানে নারীর

অংশ পুরুষের তুলনায় অর্ধেকই। যখন স্ত্রী এবং কন্যার কথা বলা হবে। কিন্তু এর উত্তর এই যে, যেহেতু পুরুষের ওপর বংশ রক্ষার বোঝা চাপানো হয়েছে। এজন্য পুরুষের ওপর অবিচার না হয়, আল্লাহ নারীর তুলনায় পুরুষকে বড় অংশ প্রদান করেছেন।

আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতে চাই। এক লোকের মরণোত্তর তার সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে। তার দু'সন্তান ছিল। এক ছেলে ও এক মেয়ে। দু'জনের দেড় লাখ রুপি। ছেলে এক লাখ এবং মেয়ে ৫০ হাজার রুপি পেল ইসলামি আইন মোতাবেক। কিন্তু যে ছেলের এক লাখ রুপী মিলল তার অধিকতর অংশ নিজের পরিবারের দায়ভারের পেছনে খরচ করতে হলো। সম্ভবত ৮০ হাজার ৮৫ হাজার অথবা এক লাখ রুপি। এর বংশীয় দায় দায়িত্বের জন্য খরচ করতে হয়। কিন্তু সেই বোন যে, ৫০ হাজার রুপি পেল তার বংশীয় বা পারিবারিক ব্যয় বাবদ এক পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন হয় না। যে এক লাখ রুপি নিল তার পরিবারের (অপরের) জন্য ৮০ হাজার বা তার চেয়ে অধিক খরচ হয়ে গেল। এদিকে যিনি ৫০ হাজার পেলেন তার নিকট সারা জীবন তা থেকে যাবে।

প্রশ্ন-১০. ইসলামে মদকে কেন হারাম করা হয়েছে?

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকে মদ মানব সমাজের জন্য বিপদ ও হয়রানির কারণ হয়ে আছে। আজো সারা দুনিয়ায় বহুলোক এ পাপের মূল (মদ) এর কবলে পড়ে এবং লাখ লাখ লোক এর কারণে নানা ধরনের সমস্যার শিকার হচ্ছেন। সমাজের বহু সমস্যার মূল এ জিনিস। এর দ্বারা অপরাধ বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে রোগ এবং মদের ধ্বংসের শিকারে বহু পরিবার ভেঙ্গে যায়। আল-কুরআনে এর নিষিদ্ধকারী আয়াত হলো ৫ নং সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত, এরূপ এসেছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে রাখো মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর তাহলে তোমরা সফল হবে।

বাইবেলেও মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আহাদ নামা আতীকের দৃষ্টান্ত ধর্ম গ্রন্থে আছে, মদ হলো একটি ধোকাবাজ পানীয়। যে এর নিকট দিয়ে গমন করে, তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

আহাদনামা আতীকে আছে– এবং মদের নেশায় নিমগ্ন হয়ো না।

মানুষের মস্তিষ্কে খারাপ থেকে ফেরানোর একটি পদ্ধতি আছে যাকে 'নফসে লাওয়ামাহ' বলা হয়। এটা মানুষকে ভুল (নিষিদ্ধ কাজ) থেকে বিরত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণভাবে একজন মানুষ মাতা-পিতা এবং বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় ভুল বা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে না। এভাবে যখন তার পায়খানা পেশাবের চাপ আসে তখন সাধারণত তা চাপিয়ে রাখে এবং মানুষ টয়লেটে চলে যায় এবং সেখান থেকে পৃথক হয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করে পবিত্র হয়। যদি মদ পান করে তখন মানুষের স্বভাবগত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং সে এমন আচরণ করে যে, যা সাধারণত তার স্বভাবের বাইরে। সে মদের নেশায় ভুল এবং বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু এতে তার অনুভূতি হচ্ছে না যে, সে তার পিতা-মাতাকেও সম্বোধন করছে। বেশিরভাগ মদ্যপ নিজ পোশাকেই পেশাব করে দেয়। সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। স্বাভাবিকভাবে চলতেও পারে না। কথাও বলতে পারে না। এমনকি মার-পিটের দ্বারাও স্বাভাবিক হয় না।

আমেরিকার বিচার বিভাগের এফ জেস্ট-এর এক ব্যুরো রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে আমেরিকায় ২ হাজার ৭১৩টি ধর্ষণ দৈনিক সংঘটিত হয়েছে। গণনায় ধরা পড়েছে যে, এ ধর্ষকদের অধিকাংশই নেশাগ্রস্ত ছিল। পরিসংখ্যানে এ তথ্যও পাওয়া গেছে যে, ৮% আমেরিকান মুহরিমাদের সাথে যৌন আচরণ করে। অন্য কথায়, প্রত্যেক ১২ জনের মধ্যে একজন এ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত। এ সকল ঘটনার সিংহভাগ একজন অথবা উভয়ের নেশাগ্রস্ততার মধ্যে ঘটে। মরণব্যাধি এইড্‌স-এর ছড়িয়ে পড়ার এক বড় কারণ হলো নেশা।

বহুলোক একথা বলে যে, সে অস্থায়ী নেশাকারী অর্থাৎ কখনো কখনো সুযোগ পেলে মদ পান করে। সে আরো বলে, সে নেশায় বুদ হয়ে যায় না, ২/১ কাপ পান করে মাত্র এবং তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং তার নেশা হয় না। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শুরুতে সকলে হালকা ও অস্থায়ী মদ্যপ হয়। একজনও একথা চিন্তা করে মদপান শুরু করে না যে, সে মূল মদ পানকারী হবে। কোনো কোনো অস্থায়ী মদ্যপ এটাও বলে যে, আমি কয়েক বছর যাবত মদ পান করছি এবং আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখি। আমার একবারও নেশা হয় নি। ধরুন, একজন অস্থায়ী মদ্যপ যদি মাত্র একবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধর্ষণ করল অথবা নিজের কোনো মুহরিমার সঙ্গে ব্যভিচার করে বসল। পরবর্তীতে অনুভূতি তার ওপর সারা জীবন থাকবে। ব্যভিচারকারী এবং এর শিকার নারীর এতো বড় ক্ষতি হয় যে, তার পরিসংখ্যান অসম্ভব।

সুনানে ইবনে মাজার 'পান অধ্যায়' এর বাবু খমর (মদ অধ্যায়) হাদীস নং ৩,৩৭১ এ মদের হারাম হবার বিষয়টি আছে। প্রিয় নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, 'মদ পান করো না, নিঃসন্দেহে এটি সকল অপরাধের চাবি (মূল)'। ৩,৩৯২ নং হাদীসে বলা হয়েছে–

সকল নেশা এবং নেশাদ্রব্য হারাম। সামান্য পরিমাণ নেশার উদ্রেক করলে সামান্য পরিমাণও হারাম।

অর্থাৎ মদের এক ঢোক বা এক চামচও হারাম যে ব্যক্তি মদপান করে তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপ এবং ঐ সকল লোকের ওপরও আল্লাহ্র অভিশাপ যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদের লেনদেনের সাথে যুক্ত। সুনানে ইবনে মাজার (৩৩৮০) আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হলো-

আল্লাহ তাআলা মদের ওপর দশ প্রকারের অভিশাপ দিয়েছেন। তাহলো-

১. মদের সঞ্চয়কারীর ওপর। ২. মদ প্রস্তুতকারক। ৩. যার জন্য মদ প্রস্তুত করা হয়। ৪. মদের বিক্রেতা। ৫. যে মদের ক্রেতা হয়। ৬. মদের জন্য গমনকারীর ওপর। ৭. যার নিকট মদ নিয়ে যাওয়া হয়। ৮. মদের মূল্য আদায়কারীর ওপর। ৯. মদের পানকারীর ওপর। ১০. মদের পরিবেশনকারীর ওপর।

মদ এবং যাবতীয় নেশাদ্রব্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার বহু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। দুনিয়ায় মদের কারণে বহু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেক বছর মদের কারণে লাখ লাখ লোক মারা যায়। আমি এর সকল পরিসংখ্যান একত্র করতে চাই না। তবে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই-

১. পাকস্থলীর ক্যান্সার এক বহু প্রসিদ্ধ রোগ যা মদের কারণে হয়ে থাকে।

২. পাকস্থলীর অন্ত্রের ক্যান্সার এবং বৃহৎ অন্ত্রের ক্যান্সার।

৩. Cardiomyopatry অর্থাৎ হৃদয়ের অঙ্গে এর প্রভাব পড়ে রক্তচাপ এবং Coronary Artherosclerosis অর্থাৎ হৃদয়ের শিরাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এনজায়েনা এবং হার্ট এর চলার সকল রোগ মদের প্রভাবে হয়।

৪. মগজের নড়াচড়া এবং তার যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্ক নেশার সাথে।

৫. বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কের রোগ যেমন- Cortical, Peripheral, Neuropathy, Cerebellar Atrophy, Atrophy এসব বেশিরভাগ মদ পানের কারণে হয়।

৬. স্মৃতিশক্তির কমতি ঘটে।

৭ বেরিবেরি রোগ এবং দন্ত সম্পর্কীয় সকল রোগ মদ পানের কারণে হয়।

৮. ডিলিরিম রিমিনস ও বারবার মদ পানের কারণে হয় যা এক ধরনের মারাত্মক রোগ অপারেশনের পরে হয় এবং অনেক সময় এটা মৃত্যুর কারণও হয়। এর লক্ষণ হলো মেধার কমতি, ভীতি, ঘাবড়ানো ও ধারণা করা।

৯. এড়ো কারায়েন গজ রোগ যেমন Myoxodema, Florid Cushing, Hyperthyroidism ইত্যাদি।

১০. রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ততার রোগগুলো, রক্ত স্বল্পতা, এর কারণে Mycirocytic Anemia, এনিমিয়া, এরকান ইত্যাদি মদপান ও নেশাগ্রস্ততা থেকে জন্ম নেয়।

১১. রক্তের সাদা কণিকার স্বল্পতা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাবলি দেখা দেয়।

১২. সাধারণ ব্যবহার্য ওষুধ মেট্রো নিডাজল (ফ্লাজিল) মদের সাথে খুবই মারাত্মক রিঅ্যাকশন করে।

১৩. শরীরের ইনফেকশন থেকে বারবার প্রভাবিত হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় অতিরিক্ত মদ পানের কারণে।

১৪. সীনার ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের জ্বালা Emphysema এবং ফুসফুসের টি/বি, (যক্ষ্মা), মদের কারণে জন্মলাভকারী সাধারণ রোগ।

১৫. মদে অভ্যস্থকারী নেশার অবস্থায় বেশিরভাগ সময় বমি করে। এছাড়া যে সকল বিষয় শ্বাশনালীকে সংরক্ষণ করে তা নষ্ট করে দেয়। যার কারণে সাধারণত বমি ফুসফুসের মধ্যে চলে যায়, ফলে নিউমোনিয়া এবং ফুসফুসের ক্ষতি হয় এবং অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

১৬. মহিলাদের মধ্যে মদের বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পুরুষের তুলনায় মদ্যপ নারীর হার্টবিট বেশি হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের বাচ্চার ওপর খুব বেশি প্রভাব পড়ে।

১৭. চর্মের রোগ-বালাইও মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

১৮. চর্মের রোগগুলোর মধ্যে Atopecia অর্থাৎ গাঞ্জাপন, নখগুলো ভেঙ্গে যাওয়া, নখের ইনফেকশন ইত্যাদি রোগ মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

এখন ডাক্তার মদের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা করে এবং মদকে রোগের চেয়েও বেশি নাম দিয়ে থাকে। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন একটি পোস্টার প্রচার করে। যাতে একথা বলা হয়েছিল যে, যদিও মদ একটি রোগ, যা অনেক রোগের মূল। যা–

১. বোতলে বিক্রি করা হয়।

২. এর প্রসার, প্রচার রেডিও টিভিতে হয়।

৩. এর প্রচারের লাইসেন্স দেয়া হয়।

৪. এটা রাষ্ট্রের পক্ষে এক নম্বরী দুর্নীতি করে।

৫. বড় বড় শহরে ভয়ানক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর কারণ।

৬. ঘরোয়া জীবনকে ধ্বংস করে এবং অপরাধের বৃদ্ধি ঘটায়।

৭. জীবাণু ও ভাইরাস ব্যতীতই মানুষদের ধ্বংসের কারণ হয়।

মদ শুধু একটি রোগই নয় বরং এটা শয়তানের এক মারাত্মক হাতিয়ার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ সীমাহীন হিকমতের কারণে আমাদেরকে শয়তানের

জাল থেকে বাচানোর জন্য খবরদার (সাবধান) করে দিয়েছেন। এটা মানুষের প্রকৃতির ধর্ম। এর যে ধরনের বিধান আছে তা মানুষের মূল ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমান রাখার জন্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু মদ মানুষ ও সমাজের স্বাভাবিক প্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেয়। এটা মানুষকে পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে দেয়। যদিও সে আশরাফুল মাখলুকাত হবার দাবি করে। এ সকল কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১. ইসলামে শূকরের গোশ্তকে কেন নিষিদ্ধ করা হলো?

উত্তর : ইসলামে শূকরের গোশ্তকে কেন হারাম বা নিষিদ্ধ করা হলো এর কয়েকটি স্পষ্ট কারণ রয়েছে। আল কুরআনে শূকরের গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে কম-বেশি পাঁচ স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন–

২ নং সূরা বাকারার আয়াত নং ১৩৭

৫ নং সূরা মায়িদার আয়াত নং ০৩

৬ নং সূরা আনআম-এর আয়াত নং ১৪৫ এবং

১৬ নং সূরা নাহল-এর আয়াত নং ১১৫।

৫ নং সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

অর্থ : তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মৃত জিনিস রক্ত ও শূকরের গোশ্তকে।

এটা মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট যে, শূকরের গোশ্ত কেন হারাম করা হয়েছে। এবং খ্রিস্টানরাও তাদের নিজেদের ধর্ম গ্রন্থের তথ্য দিয়ে বলেন। যেমন : বাইবেলের আহাদনামা আতীক-এর ধর্ম গ্রন্থ Leviticus অর্থাৎ পাদ্রী বলেন–

এবং শূকর খেও না। কেননা এর পা খণ্ডিত এবং পৃথক, অবস্থা এই যে, তা পরিষ্কার থাকে না। তা তোমাদের জন্য নাপাক, তোমরা তার গোশ্ত ভক্ষণ কর না, এবং তার লাশের ওপর হাত লাগিও না, কেননা তা তোমাদের জন্য নাপাক।

এভাবে বাইবেলের Deuteronomy অর্থাৎ এস্তেনোমীতেও শূকরের গোশ্তকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এবং শূকর তোমাদের জন্য এ কারণে নাপাক যে, এর পা বিচ্ছিন্ন কিন্তু সে পরিষ্কার হয় না। তোমরা এ গোশ্ত খেও না এবং এর লাশ স্পর্শও কর না।

এরূপভাবে বাইবেলের ইসাইয়াহ ধর্ম গ্রন্থের অধ্যায় ৬৫ শ্লোক নম্বর ২ থেকে ৫ পর্যন্ত শূকরের গোশ্তের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বাকি অ-মুসলিম এবং খোদাকে অমান্যকারীকে প্রশান্তি দিতে তাদের সামনে আমি জ্ঞানগত ও বৈজ্ঞানিক

ভিত্তিতে একথা বলব যে, শূকরের গোশ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০ প্রকারের রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয়।

এর ভোক্তার পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে কয়েক প্রকারের কীড়া (জীবাণু) জন্ম লাভ করে, যেমন ওয়াল্ডওয়ার্ম, পেন ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক Taenia Soluim যাকে সাধারণভাবে 'কাদু দানা' বলা হয়। এটাকে অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং অনেক লম্বা হয়। এরপর ডিম্বাণু রক্তের মধ্যে মিশে শরীরের প্রায় সকল অঙ্গে পৌঁছে যায় এবং যদি তা মগজের মধ্যে পৌঁছে তাহলে স্মৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। যদি হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছে তাহলে হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। যদি চোখে চলে যায়, তাহলে নাবিনাপেন জন্মগ্রহণ করে। যদি এটা জঠরে পৌঁছায় তাহলে জঠর এর ক্ষতির কারণ হয় এবং এটা শরীরের প্রায় সকল অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এ ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, শূকরের গোশ্ত উত্তমরূপে পাকানো হলে ক্ষতিকর কৃমির ডিম্বাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমেরিকার এক গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, এদের চব্বিশ জন লোক যাদের Trichura Tichurasis রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যে ২২ জন লোক শূকরের গোশ্ত খুবই উত্তমরূপে পাক করতেন। এজন্য একথা প্রমাণিত হয় যে, শূকরের গোশ্তের মধ্যে বিদ্যমান জীবাণুও তাদের ডিম্বগুলো খুব বেশি পরিমাণ উত্তাপেও মরে না।

শূকরের গোশ্তের চেয়ে এর চর্বির মূল্য বেশি এবং চর্বি অত্যধিক পরিমাণে হয়। এর গোশত ভক্ষনে অবশ ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগ হয় এবং এটা আশ্চর্যের কথা নয় যে, আমেরিকার শতকরা ৫০ ভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপের রোগী। শূকর এ দুনিয়ার গাঢ় নাপাক প্রকৃতির জানোয়ার। যা গোবর, পায়খানা এবং ময়লা-আবর্জনার ওপর জীবন-যাপন করে। এবং একে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে অধিক নিকৃষ্ট জিনিসে ভোক্তা এবং ময়লা আবর্জনার ওপর লালিত-পালিত প্রাণী বানিয়েছেন। গ্রামে সাধারণভাবে ল্যাট্রিন নেই, যার কারণে লোকেরা খোলা স্থানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। এবং এ ধরনের ময়লা বেশির ভাগ শূকরেরা খতম করে। এক লোক বলেন যে, উন্নত দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া বা এ ধরনের দেশে শূকরদের পাক-সাফ স্থানে জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এদের কীভাবে পরিষ্কার স্থানে রাখা নিজেদের পায়খানাই নয় বরং সমস্ত সঙ্গীদের বর্জ্য ভক্ষণ করে। দুনিয়াতে প্রাপ্ত সকল প্রাণীর মধ্যে লজ্জহীন এবং এটা একমাত্র প্রাণী যে, অন্য সঙ্গীকে নিজ স্ত্রী শূকরী সঙ্গিনীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণের আহ্বান জানায়। আমেরিকার অধিকাংশ লোক এর গোশ্ত ভক্ষণ করে এবং কয়েক বার ড্যান্স (Dance) পার্টির পরে নিজ স্ত্রীদের বদল করে এবং বলে তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন কর এবং আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করব। এটা পরিষ্কার যে ব্যক্তি এদের গোশ্ত ভক্ষণ করে এদের দ্বারাই এরূপ কাজ সম্ভব।

প্রশ্ন-১২. পশু হত্যা অত্যাচারী কাজ তবে মুসলমানরা গোশ্‌ত ভক্ষণ করে কেন অর্থাৎ পশু হত্যা করে কেন?

উত্তর : ভেজিটেরীন অর্থাৎ সবজি ভক্ষণ সারা পৃথিবীতে এক প্রকার আন্দোলনে রূপলাভ করেছে। কিছু লোক একে প্রাণীদের অধিকারের সাথে মিলায় এবং যথেষ্ট বড় সংখ্যক লোক গোশ্‌ত এবং অন্য যাবতীয় অবৃক্ষীয় জিনিসকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রাণী অধিকারের বিপরীত বুঝে থাকেন।

ইসলাম এসব প্রাণীর সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দান করে। এর সাথে ইসলামের একথাও আছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীর বুকে সবজি এবং প্রাণী মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে এ সীমা মানুষের জন্য রয়েছে যে, সে সকল কিছু নির্দিষ্ট পন্থায় ইনসাফের সাথে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ও আমানতকে বুঝে ব্যবহার করবে। আসুন আমরা এর দ্বিতীয় পন্থায় বুঝার চেষ্টা করি।

একজন মুসলমান সবজি খেয়েও একজন উত্তম মুসলমান হতে পারেন। তার জন্য জরুরি নয় যে, সে গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে। কুরআনের আলোকে মুসলমানদের গোশ্‌ত খাবার অনুমতি আছে। আল-কুরআনের ১৪ পারার ১৬ নং সূরার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণসহ আরো অনেক ধরনের উপকার রয়েছে। তাদের কিছু অংশকে তোমরা আহারও করে থাকো।

আরো আছে ১৮ পারার ২৩ নং সূরা মমিনুন-এর ২১ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন—

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : তোমাদের জন্য এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে তার পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে তোমাদের (দুধ) পান করাই। তোমাদের জন্যে তাতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে— তার গোশ্‌তও তোমরা খাও।

অতৃণী খাবার (আমিষ জাতীয় খাবার) যেমন : ডিম, মাছ এবং গোশ্‌তের মধ্যে উত্তম পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় ৮ প্রকারের আমায়েনভেস্ট আছে। যা আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না তা

এখান থেকে অর্জন করতে হয়। গোশ্‌তের মধ্যে ফাওলাদ, ভিটামিন বি-ওয়ান এবং নিয়াসিন (Niacin)ও আছে।

এছাড়াও যদি আপনি সবজি ভক্ষণকারী প্রাণী যেমন : গাভী, ভেড়া, বকরী ইত্যাদির দাঁত দেখেন তাহলে এদের আপনি দেখে হয়রান হবেন। এ সকল প্রাণীর দাঁত চ্যাপ্টা যা সবজিজাতীয় খাবারের জন্য উত্তম এবং আপনি যদি গোশ্‌ত ভক্ষণকারী প্রাণীদের দেখেন, যেমন : চিতাবাঘ, সিংহ, কুকুর ইত্যাদি, এদের দাঁত সুচালো যা গোশ্‌ত ভক্ষণের জন্য উত্তম। যদি আপনি মানুষের দাঁত দেখেন তা ধারালো ও চ্যাপ্টা এ দু রকমের হয়। এজন্য এদের দাঁত গোশ্‌ত ও সবজি উভয় প্রকার খাবার গ্রহণের মতো করে করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা সব জিনিস খেতে পারবে। এখানে এ প্রশ্ন ওঠানো যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে যদি সবজি ভোগী বানাবেন তাহলে এ সুচালো দাঁতগুলো কেন দিলেন? একথা অবশ্যই যে, তিনি জানতেন মানুষের দুই প্রকার খাবারের আবশ্যক রয়েছে। প্রাণীদের হজম প্রক্রিয়া শুধু পাতাযুক্ত খাবার হজম করে থাকে এবং মাংশাসী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া গোশ্‌তকে হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া সবজি এবং গোশ্‌ত এ উভয় প্রকার খাদ্য হজম করে থাকে। যদি আল্লাহ চাইতেন আমরা শুধু সবজিভোজী হবো ,তাহলে কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উভয় প্রকারের হজম প্রক্রিয়া দিলেন? অনেক হিন্দু এমন আছেন যারা সবজি ভক্ষণের ওপর অটুট থাকেন। তাদের ধারণা এই যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন গোশ্‌ত ইত্যাদি ভক্ষণ তাদের ধর্ম বিরোধী হবে। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে তাদের ধর্মের অনুসারীদের গোশ্‌তের অনুমতি প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে লেখা আছে যে, হিন্দু মুনি ঋষীরা গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন। হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ মনু স্মৃতির ৫ম অধ্যায়ের ২৩তম লাইনে বলা হয়েছে–

যে ব্যক্তি এ সকল প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করে, যার গোশ্‌ত ইচ্ছা এর মধ্যে কোনো খারাবি নেই। যদিও সে প্রতিদিন এরূপ করে, কেননা আল্লাহ কিছু জিনিস খাওয়ার জন্য তৈরি করেছেন, আর কিছুকে ঐ জিনিস খাওয়ার জন্যও সৃষ্টি করেছেন।

এরূপভাবে মনু স্মৃতির ৫ম অধ্যায় এর ৩৯ ও ৪০ লাইনে এটাও লেখা রয়েছে আল্লাহ কুরবানীর জানোয়ারগুলো স্বয়ং কুরবানীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কুরবানীর জন্য তাদের হত্যা করা, হত্যা করা (ধ্বংস করা) নয়।

মহাভারত অনুশাসন প্রভা অধ্যায় নং ৮৮-তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পিতিম-এর মধ্যে কথোপকথনের উল্লেখ আছে যে, শরধার নিয়মে পেতরীকে কোনো খোরাক উপঢৌকন করা উচিত। যাতে এর কারণে নরদের শান্তি মিলে। যুধিষ্ঠির বলেন–

হে মহাশক্তি! আমি আমার বাপ-দাদাদের জন্য কী জিনিস দিতে পারি যা কখনো শেষ না হয়, সেটা কোন জিনিস যা সবসময় থাকে, সেটা কোনো জিনিস যা অমর হয়ে যায়।

ভীষণ উত্তর দিল, হে যুধিষ্ঠির শোন! উহা কোন জিনিস যেগুলো শরধা জান্তার নিকট এ ধরনের নিয়মের জন্য উপযোগী। হে মহারাজ! তার মধ্যে বীজ, চাল, যব, মাশকলাই, পানি এবং এ জাতীয় ফল হলো এমন বস্তু থাকবে। মাছ দিলে তাদের আত্মা দু'মাস পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে, ভেড়ার গোশ্‌তে তিন মাস, খরগোশের গোশ্‌তে চার মাস, বকরীর গোশ্‌তে পাঁচ মাস, শূকরের গোশ্‌তে ছয় মাস, পাখিদের গোশ্‌তে সাত মাস, ডোরাকাটা হরিণের গোশ্‌তে আট মাস, কৃষ্ণসার হরিণের গোশ্‌তে নয় মাস, গাভীর গোশ্‌তে দশ মাস, মহিষের গোশতে এগারো মাস, নীল গাভীর গোশতে এক বছর। ঘি মেশানো পেঁয়াজও সে গ্রহণ করে। ধর্মীয় নাম (বড় মহিষ) এর গোশ্‌তে বারো মাস পর্যন্ত। গণ্ডারের গোশ্‌ত যা চান্দ্র মাসের হিসেবে পরোক্ষ বর্ষার ওপর দেয়া হয় তা কখনো শেষ হবে না। ক্লাসিক বুটি, কাঞ্চনের ফুল, পৈতা এবং লাল ছাগলের গোশতও দেয়া যাবে, তবে তাও কখনো শেষ হবে না। এজন্য এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা যে, যদি আপনি আপনার পূর্ব পুরুষদের আত্মার শান্তি করতে চান তাহলে লাল ছাগলের গোশ্‌ত এ সুযোগে পেশ করুন।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয় নি। অনেক হিন্দু শুধু সবজি ও ডাল ইত্যাদি খায়। অপর ধর্মের প্রভাব থেকে গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো জৈন মত। কিছু কিছু ধর্ম সবজি এবং ডালকে পরিপূর্ণ খাবার হিসেবে এজন্য গ্রহণ করেছেন যে, তা প্রাণী হত্যার বিপরীত ধর্ম। যদি কেউ প্রাণী হত্যা ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে, তাহলে আমিই হব প্রথম সেই ব্যক্তি। কিন্তু এরূপ সম্ভব নয়।

অতীতে লোকদের ধারণা এই ছিল যে, বৃক্ষ জীবনহীন। কিন্তু আজ এটা এক গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বব্যাপী মত যে, বৃক্ষেরও জীবন আছে। আজ এ ধরনের লোকদের কথাও হালকা হয়ে গেছে যারা সবজি ভক্ষণ করে এবং জীব হত্যা করে না, এজন্য যে, বৃক্ষ ও সবজি কাটা ও জীব হত্যা করা। একটি প্রমাণ এরূপ দেয়া হয় যে, বৃক্ষের অনুভূতি নেই। এজন্য বৃক্ষও সবজি কাটা প্রাণী হত্যার চেয়ে কম অপরাধ। কিন্তু আজ বিজ্ঞান আমাদের একথা বলে দিচ্ছে যে, বৃক্ষও কষ্ট অনুভব করে। তবে হ্যাঁ তাদের চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। মানব কর্ণ এদের আওয়াজ শুনতে পায় না। কারণ মানব কর্ণের শ্রুতি শক্তি ২০ ডিবি থেকে ২০ হাজার ডিবি পর্যন্ত। বৃক্ষের ডিবি এর বাইরে। যদি কোনো আওয়াজ এর চেয়ে কম হয় অথবা বেশি, তাহলে মানুষের কান তা শুনতে সক্ষম নয়। কুকুর ৪০ হাজার ডিবি পর্যন্ত আওয়াজ শুনতে পায়। যে শব্দের ডিবি ১/৩০ হাজারের ওপরে এবং ৪০ হাজারের কম তা শুধু কুকুরই শুনতে পায়। মানুষ শোনে না। কুকুর নিজের মালিকের বাঁশির আওয়াজ শোনে এবং তার নিকট চলে আসে। একজন আমেরিকার বিজ্ঞানী গবেষণার পর এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যে, যা দ্বারা

বৃক্ষের চিৎকারও এভাবে পরিবর্তন করতে পারে যে, মানুষ তা শুনতে পায়। এর দ্বারা এতে তৎক্ষণাৎ বার্তা পৌঁছে যায় যে, কখন বৃক্ষ পানির জন্য চিৎকার করছে। আধুনিক গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃক্ষ খুশি ও কষ্ট অনুভব করে এবং চলতেও পারে।

একজন বিজ্ঞবান সবজিভোজীর সঙ্গে আমার বিতর্ক হলো। তিনি বললেন, আমি জানি বৃক্ষের জীবন আছে এবং কষ্টও অনুভব করে, কিন্তু বৃক্ষ প্রাণীর চেয়ে দুটি অনুভূতি কম রাখে, এজন্য বৃক্ষ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে কম অপরাধ। কিন্তু সাধারণ সমাজকে জিজ্ঞেস করি, ধরুন! আপনার একজন ভাই যে জন্ম থেকে বোবা ও বধির এবং তার দুটি অনুভূতি অন্য লোকের চেয়ে কম এবং যখন সে বড় হলো কেউ তাকে হত্যা করল। আপনি কি বিচারককে বলবেন যে, আপনি হন্তারককে শাস্তি কম দিন কারণ সে দু অনুভূতি কমকে হত্যা করেছে। না, বরং আপনি বিচারককে বলবেন যে, একে অধিক শাস্তি দিন কারণ আমার ভাই নির্দোষ ছিল। আল-কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا .

অর্থ : তোমরা খাও জমিনের বুকে যা হালাল ও পবিত্র তা থেকে।

যদি দুনিয়ার সকল লোক নিরামিষভোজী হতো, তাহলে দুনিয়ায় প্রাণীর সংখ্যা সীমা ছাড়া বেশি হয়ে যেতো। কেননা এদের জন্ম ও বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিজ্ঞতার সাথে নিজ সৃষ্টির মধ্যে এক বিশেষ ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো হয়রান হবার কারণ নেই যে, তিনি আমাদেরকে প্রাণী ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করেছেন। আমি তাকে খারাপ মনে করি না যিনি নিরামিষভোজী। পক্ষান্তরে যিনি আমিষ ভক্ষণ করতে প্রাণী হত্যা করেন তাকেও জালিম বা নির্দয় বলা যাবে না।

প্রশ্ন-১৩. মুসলমানগণ প্রাণীদের জালেমি পদ্ধতিতে হত্যা করে কেন?

উত্তর : যবেহ করার পদ্ধতি, যেভাবে মুসলমানগণ প্রাণীদের জবাই করে অধিকাংশ অমুসলিমের নিকট সমালোচনার বিষয়। যদি নিচের বিষয়গুলো জানা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, জবাই করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে দয়াশীল ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও উত্তম পদ্ধতি।

ইসলামি পদ্ধতিতে প্রাণীদের হত্যা করার সময় নিম্নলিখিত কিছু শর্তাবলির দিকে খেয়াল রাখতে হয়–

প্রাণীদের তীক্ষ্ণ ধারালো চাকু অথবা ছুরি দিয়ে জবাই করা। তীক্ষ্ণভাবে জবাই করতে হবে যাতে প্রাণীর কষ্ট সবচেয়ে কম হয়।

'যবেহ' শব্দটি আরবি। যার অর্থ রক্ত প্রবাহিত করা। প্রাণীদের জবাই করার সময় এদের গলা, শ্বাসনালী এবং ঘাড়ের মধ্যে পাওয়া যাওয়া রক্তনালী কেটে এদের হত্যা করতে হবে। প্রাণীদের মাথা পৃথক করার পূর্বে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সকল রক্ত বের করা উচিত। রক্ত বের করার কারণ এই যে, জীবাণুগুলো খুব দ্রুত রক্তের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। হারাম মগজ না কাটা উচিত কেননা এরূপ করলে হার্টের দিকে প্রবাহিত রগগুলো কাটাতে হার্টের রগ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এরূপ করাতে রক্তনালীর মধ্যে জমে যায়।

রক্ত বহু প্রকারের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনের স্থানান্তর করার মাধ্যম। এ সকল কারণে ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা অধিকতর নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত। এবং যেহেতু রক্তের মধ্যে সকল প্রকারের জীবাণু পাওয়া যায় এজন্য বেশির চেয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা গোশ্‌ত বেশি সময় পর্যন্ত তাজা থাকে, কারণ প্রাণীর রক্ত শরীরের মধ্যদিয়ে বের হয়ে যায় এবং তীক্ষ্ণতার সাথে কাটার কারণে নার্ভ এর নিকট রক্ত প্রবাহিত হয় যা ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং প্রাণী ব্যথা অনুভব করে না। যবেহ করার জন্য প্রাণী যে, তড়পাতে থাকে এবং পা ছুটোছুটি করে তা ব্যথার জন্য নয় বরং রক্ত কমে যাওয়ার কারণে। এ ছোটাছুটিতে রক্ত শরীর থেকে বের হবার ব্যাপারেও সহযোগিতা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১৪. বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষ যা ভক্ষণ করে তা তার ওপর প্রভাব ফেলে। ইসলাম নিজ অনুসারীদের কেন আমিষজাতীয় খাদ্য যেমন : গোশ্‌ত ইত্যাদি খাবার অনুমতি দিয়েছে, প্রাণীর গোশ্‌ত মানুষকে কি কঠিন ও জালেম বানায় না?

উত্তর : আমি একথা মানি যে, মানুষ যা ভক্ষণ করে তার প্রভাব তার নিজের ওপর পড়ে। এজন্য ইসলাম হিংস্র এবং ফেড়ে ছিঁড়ে ফেলায় অভ্যস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করে এ তাদের খাওয়া হারাম করে দিয়েছে। যেমন : বাঘ, চিতা ইত্যাদি যা ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলা প্রাণী এবং রক্তখেকো প্রাণী। এদের গোশ্‌ত ভক্ষণের ফলে মানুষ কঠিন ও জালিম হয়। যদিও ইসলাম শুধু পাখি অথবা তৃণ ভোজী প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। মুসলমান সোজা চলা নিরীহ প্রাণীদের গোশ্‌ত খায়। কেননা সে নিরাপত্তা এবং মিলমিশ ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। নবী করীম ﷺ এ সকল জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন যা ভালো নয়। কুরআন বলে ৭ নং সূরা আরাফ-এর ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .

অর্থ : নবী তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, اَلْخَبٰٓئِثُ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যিনি তাদের জন্য যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেন।

এবং সূরা হাশর ৫৯ নং সূরার ৭ নং আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন–

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

একজন মুসলমানের জন্য নবী করীম ﷺ এর এই নির্দেশ যথেষ্ট যা আল্লাহ্ চান যে, মানুষ সে গোশ্ত খাবে যা তার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো খাবে না যেগুলোর অনুমতি প্রদান করা হয় নি।

ছহীহাইনের হাদীস যা ছহীহ্ মুসলিমের হাদীস নং ১৯৩৪, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যাতে যবাই করার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইবনে মাজার হাদীস নং ৩২৩২, ৩২৩৩ এবং ৩২৩৪ ইত্যাদিতে দু ধরনের প্রাণী হারাম করার কথা বলা হয়েছে।

১. নখরধারী। অর্থাৎ ঐ বুনোপ্রাণী যাদের দাঁত সুচালো এবং তা গোশ্তভোজী, এবং বিড়াল প্রজাতির সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পুঁজি করে খাওয়া প্রাণী যেমন– ইঁদুর ইত্যাদি। বিষাক্তপ্রাণী যেমন– সাপ ইত্যাদি।

২. পাঞ্জা দ্বারা শিকারধারী পাখি, যেমন : চিল, শকুন, কাক ইত্যাদি এবং এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে, আমিষ ভোজন যেমন গোশ্ত খাবার দ্বারা মানুষের কাঠিন্য পছন্দ হয় বা এ ধরনের স্বভাব গঠিত হয়।

প্রশ্ন-১৫. মুসলমান এক কুরআনকে অনুসরণ করে। এরপরও তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এতো পার্থক্য কেন? এও বলতে পারি যে, ইসলামে এতো ফিরকা বা দল কেন?

উত্তর : আজ মুসলমান বিভক্ত হয়ে গেছে, যদিও ইসলামে এ ধরনের সুযোগ নেই। ইসলাম নিজ অনুসারীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস রাখে। আল-কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে রয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ : তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

এখানে আল্লাহর কোন্ রশির উল্লেখ হয়েছে? উত্তরে বলা যায়– এটা আল্লাহর রশি, যা সকল মুসলমান মজবুতভাবে ধারণ করবে। এ আয়াতে দুটি নির্দেশ আছে–

১. সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর এবং

২. পৃথক হয়ে যেও না, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আল-কুরআনে এটাও বর্ণিত আছে ৪ নং সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের মহান রব ইরশাদ করেন–

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।

এ কারণে সকল মুসলমানকে কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করা জরুরি। এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। আল-কুরআনে মহান রব ইরশাদ করেন। ৬ নং সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫৯–

اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ ـ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ তাআলার হাতে। তখন তিনি তাদের জানিয়ে দিবেন তাদের কৃতকর্ম যা তারা করে।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোকদের মুসলমানদের থেকে পৃথক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যারা দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। যখন মুসলমানদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কোন্ মুসলমান? তখন সাধারণত উত্তর দেয়া হয় আমরা সুন্নী বা আমরা শিয়া। এভাবে কিছু লোক নিজেদেরকে 'হানাফী', 'মালেকী', 'শাফেয়ী' অথবা 'হাম্বলী' বলে। কেউ কেউ বলে আমরা 'দেওবন্দী' অথবা 'ব্রেলভী'। এ লোকদের নিকট একথা জিজ্ঞেস করা দরকার যে, আমাদের নবী করীম ﷺ কোন্ (মাযহাবের অনুসারী) ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী না হানাফী ছিলেন? একেবারেই না, তিনি আল্লাহর সকল নবী যেমন মুসলমান ছিলেন যা তিনি প্রথমে ছিলেন। কুরআনে বর্ণনা করে ঈসা (আ) মুসলমান ছিলেন এবং নিজ হাওয়ারি (সঙ্গী)-দেরও সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫ নং আয়াতে রয়েছে : কে আছো আল্লাহর পথে– مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ আমার সাহায্যকারী?

উত্তরে হাওয়ারিগণ বলেছেন–

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন আমরা সবাই মুসলমান।

এ শব্দাবলি বর্ণনা করে যে, ঈসা (আ) এবং তাঁর অনুসারিগণ মুসলমান ছিলেন। এরূপভাবে ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ : (সঠিক ঘটনা হলো এই যে,) ইবরাহীম না ছিলেন ইহুদি, না ছিলেন খ্রিস্টান, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি মুশরিকদের দলভুক্তও ছিলেন না।

ইসলামের অনুসারীদের এ কথার ওপর আনুগত্য রয়েছে যে, তারা নিজেদের মুসলমান পরিচয় দেয়। যদি এক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান মনে করে, তাহলে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কে? তাহলে উত্তর দেয়া উচিত 'আমি মুসলমান।'এভাবে নিজেদের 'হানাফী', 'শাফেয়ী' এরূপ বলা উচিত নয়। কুরআনের ৪১ নং সূরা হা-মীম আস-সিজদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ : তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং সৎ আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় ভাষায়, আপনাকে এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ এ আয়াতে একথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি মুসলমান। নবী করীম ﷺ ৭ হিজরীতে অমুসলিম শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চিঠি লিখিয়েছিলেন। যার মধ্যে, রোম, সিরিয়া, হাবসী খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সূরা আলে ইমরানের শব্দাবলি লিখিয়েছিলেন–

وَاشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলমান।

আমি মুসলিম উম্মাহকে সম্মান করতে চাই, যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ইমাম মালেক (র) এবং

অন্যান্য উলামায়ে কিরাম শামিল আছেন। এঁরা সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকীহ্ ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের গবেষণা ও শ্রমের প্রতিদান তাঁদের দিন। যদি কোনো ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র) অথবা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আকিদা অথবা দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গবেষণার সাথে একমত হন, তবে তার ওপর কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে আপনি কে? উত্তরে বলা উচিত আমি 'মুসলমান'। কিছু লোক আবু দাউদ শরীফের হাদীস নং ৪৫৯ যা মুয়াবিয়া (রা) থেকে বরাত দেয়–

অর্থ : নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ৭৩ কাতারে বিভক্ত হবে, ৭২ দল দোযখে যাবে এবং এক দল জান্নাতে যাবে, যেটা হবে আল জামাআত।

হাদীস থেকে একথা বের করার চেষ্টা করা হয় নবী করীম ﷺ ৭৩ দল হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু আপনি তো একথা বলছেন না যে মুসলমান বিভক্ত হবার চেষ্টা করছে। কুরআন দলে দলে বিভক্ত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করতে চায়। যে লোক কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করে এ দল তৈরি করে না এবং লোকদের বিভক্ত করে না, সে সোজা রাস্তায় রয়েছে। তিরমিযীর হাদীস নং ২৬৪১ যা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন–

আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, এ সকল দল জাহান্নামে যাবে এক দল ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কোন্ দল? তিনি বললেন : ঐ দল, যে আমার ও আমার সাহাবীদের রাস্তার ওপর চলবে।

কুরআনের বহু আয়াত একথা বলে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। একজন মুসলমানের কুরআন এবং ছহীহ্ হাদীসের ওপর আমল করা উচিত। তার কোনো আলেম বা ইমামের ততক্ষণ পর্যন্ত একমত হওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত তার আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন এবং ছহীহ্ হাদীস মুতাবিক হবে। যদি তার আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ও নবী করীম ﷺ এর সুন্নাতের বিপরীত হবে, তবে তার কোনো গুরুত্ব নেই। যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে এর অধ্যয়ন করে এবং বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর আমল করে, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মতানৈক্য শেষ হয়ে যাবে এবং মুসলমানগণ এক ঐকমত্যে উম্মত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১৬. যদি ইসলাম একটি সুন্দর ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে অগণিত মুসলমান বেঈমান কেন? ধোঁকা দেয়া, ঘুষ খাওয়া এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলির সাথে কেন জড়িত?

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইসলাম এক সুন্দর ধর্ম, কিন্তু মিডিয়া পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে, যারা ইসলামের ব্যাপারে ভীতু। এই মিডিয়া ধারাবাহিকভাবে ইসলামের বিপরীত ভুল পদ্ধতির সংবাদ এবং তথ্য প্রচার করে।

এটা ইসলামের ব্যাপারে ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং ভুল বরাত দিয়ে থাকে, মূল ঘটনাকে বড় সড় করে প্রচার করে। যদি কোথাও বোমা ফাটে তাহলে বিনা প্রমাণে মুসলমানের ওপর অভিযোগ চাপিয়ে দেয়া হয়। খবরে এ ধরনের অভিযোগ বড় ধরনের কভারেজ পায়। আবার যখন বিশ্লেষণের পর অ-মুসলমানের কারসাজি প্রমাণিত হয়, তখন সংবাদ সামান্য কভারেজে প্রকাশিত হয়। যদি ৫০ বছরের কোনো মুসলমান ১৫ বছরের কোনো বালিকাকে বিবাহ করে, তবে পশ্চিমা সংবাদপত্রে এ খবরকে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে প্রচার করে কিন্তু যদি কোনো ৫০ বছরের অমুসলিম ৬ বছরের কোনো বাচ্চাকে ধর্ষণ করে, তাহলে এ খবর সাধারণ সংবাদের সাথে সাধারণ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। আমেরিকায় প্রতিদিন ২ হাজার ৭ শত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে কিন্তু এ খবরগুলো প্রচার করা হয় না। কেননা এ ঘটনা আমেরিকানদের জন্য সাধারণ ব্যাপার, তা জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

আমি এটা জানিয়ে দিতে চাই এমন মুসলমান অবশ্যই মজুদ আছে, যে দ্বীনদার নয়, ধোঁকা দেয়, এবং অন্য প্রকারের গুনাহের কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যেন (মনে হয়) এ শুধু মুসলমানরাই করে। অবস্থা হলো এমন লোক দুনিয়ার সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। আমার জানা আছে যে, অনেক মুসলমান মদপান করে এবং অমুসলিমদের সাথে মিলে। মুসলিম সমাজেও এরূপ লোক আছে, তবে অবশ্যই সর্বতোভাবে মুসলিম সমাজ উন্নততর সমাজ। ইসলামি সমাজই হলো সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য যে, মদপানের বিরোধিতা করে এবং ভিন্ন কথায় সাধারণভাবে মুসলমান মদপান করে না।

সামগ্রিকভাবে এটা ঐ সমাজ যা সম্পূর্ণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ করে এবং যার পর্যাপ্ত লজ্জা, চিন্তা-ভাবনা, চরিত্র গঠন ও মানবতার সম্পর্ক আছে। দুনিয়ার কোনো সমাজ এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। বসনিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তানের মুসলমান বন্দিদের সাথে খ্রিস্টানদের অত্যাচারী আচরণ এবং বৃটেনের মহিলা সাংবাদিকদের সাথে তালেবানদের আচরণ এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

যদি আপনি জানতে চান মার্সিডিজ-এর নতুন মডেলের গাড়ি কেমন এবং যে ব্যক্তি ড্রাইভিং সম্পর্কে জানে না, তিনি যদি স্টিয়ারিং-এর ওপর গিয়ে বসেন এবং গাড়িকে নষ্ট করেন তাহলে এ দোষ কার ওপর দিবেন? গাড়িকে নাকি ড্রাইভারকে? পরিষ্কার আপনি ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। এটা জানার জন্য যে গাড়ি কীরূপ তাহলে ড্রাইভার নয় বরং গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং তার বিভিন্ন পার্টস এর যাচাই প্রয়োজন। এটা কী গতিতে চলে? কোন্ প্রকারের ইঞ্জিন ব্যবহার করে? এটা কী পরিমাণ সংরক্ষিত ইত্যাদি। যদি একথা মানা হয় যে, মুসলমানগণ সঠিক নেই, তদুপরি আমি

ইসলামের অনুসারীদের পরীক্ষা করতে বলব না। যদি আপনি জানতে চান যে, ইসলাম কী পরিমাণ ভালো ধর্ম তাহলে এর মূল জিনিসগুলো পরীক্ষা করা কর্তব্য। অর্থাৎ কুরআন এবং ছহীহ্ হাদীস। যদি আপনি আমলের দিক দিয়ে এটা দেখতে চান যে, গাড়ি কেমন তাহলে স্টিয়ারিং-এর ওপর এমন কাউকে বসান যিনি দক্ষ ড্রাইভার। এরূপভাবে যদি এটা জানতে চান যে, ইসলাম কেমন দ্বীন, তাহলে এর উত্তম পদ্ধতি হলো আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ কে সামনে রাখুন। মুসলিম ছাড়াও এমন অনেক উদারপন্থী অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ সর্বোত্তম মানব ছিলেন।

মাইকেল এইচ. হার্ট '১০০ শত বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব' নামক বই লিখেছেন। তাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম সর্ব প্রথম রয়েছে। বইটিতে অনেক অমুসলিম ব্যক্তিত্ব আছে, যাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ এর অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন।

প্রশ্ন-১৭. অ-মুসলিমদের মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : একথা সত্য যে, আইন মুতাবেক অমুসলিমদের মক্কা-মদিনায় প্রবেশাধিকার নেই। এর অনেক কারণ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমি ভারতের একজন নাগরিক। এ সত্ত্বেও ভারতের বহু স্থানে যাওয়ার অনুমতি নেই। যেমন : ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন কিছু এলাকা থাকে যেখানে কোনো সাধারণ নাগরিক এর প্রবেশের অনুমতি থাকে না। এবং যে ব্যক্তি সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্ক থাকে কেবল তাদের জন্য অনুমতি থাকে। এরূপভাবে ইসলাম সমগ্র পৃথিবীল লোকদের নিয়ে এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম। ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট বা নিষিদ্ধ এলাকা হলো মাত্র দুটো। এক. মক্কা শরীফ এবং দুই. মদিনা শরীফ।

এর মধ্যে কেবল ঐ লোক প্রবেশ করতে পারবে যে ইসলাম কবুল করেছে বা ইসলামের রক্ষক। একজন বিধর্মী বা সাধারণ লোকের জন্য ঐ এলাকায় প্রবেশ করা অযৌক্তিক এবং তার ছাউনীর মধ্যে প্রবেশ করা আনুগত্যের বিরোধী। এরূপভাবে অমুসলিমদের এ অভিযোগ তোলা সম্পূর্ণ ভুল যে কেন তাদের মক্কা মদিনায় প্রবেশে বাধা প্রদান করা হচ্ছে?

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো দ্বিতীয় দেশে যেতে চায় তখন তাকে সর্বপ্রথম ঐ দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করতে হয়। যা ঐ দেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ বিধান, শর্তাবলি ও ভিসা চালু করার সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি রয়েছে, যে তা পূর্ণ করতে পারবে না তার পক্ষে অনুমতি হবে না।

ভিসার ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর বিধান হলো আমেরিকার। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের লোকদের জন্য। ভিসার ব্যাপারে তাদের অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়।

যখন আমি সিঙ্গাপুর যাবার ব্যাপারে একমত হলাম, তখন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে নিয়ম ছিল যে, সেখানে নেশাদ্রব্য নিয়ে প্রবেশকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এরূপ প্রত্যেক দেশ কিছু নিয়ম করে থাকে। আমি একথা বলব না যে, মৃত্যুদণ্ড পশুত্ব। যদি আমি এ সকল শর্তের সাথে একমত হই এবং এদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হই, তাহলে ওখানে যাবার অনুমতি প্রদান করা হবে।

কোনো ব্যক্তিকে মক্কা-মদিনায় প্রবেশের মৌলিক শর্ত বা ভিসা হলো সে নিজ মুখের কথা স্বীকার করে নিবে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ যার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

প্রশ্ন-১৮. অমুসলিমদের কাফির বলা কি গালি নয়?

উত্তর : কাফির তাকে বলে, যে অস্বীকার করে বা মিথ্যা মনে করে। এ শব্দ كُفْرٌ থেকে এসেছে, যার অর্থ মিথ্যারোপ করা বা গোপন করা, ঢেকে দেয়া। ইসলামের মতে 'কাফির' তাকে বলা হয়, যে ইসলামের শিক্ষা এবং তার সত্যতাকে গোপন করে অথবা তাকে মিথ্যা মনে করে এবং যে ব্যক্তি ইসলামকে অস্বীকার করে।

যদি কেউ অমুসলিম, নিজেকে অমুসলিম অথবা কাফির বলাকে গালি মনে করে, এর উদ্দেশ্য একই। এটা তার ভুল। তার উচিত ইসলাম এবং এর পরিভাষাগুলো বুঝে নেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে গালি মনে না করা। 'কাফির' গালি নয়। বরং মুসলমান এবং অন্য ধর্মের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য। এ শব্দের মধ্যে অপমান বা এ ধরনের কোনো নিচুতার বিষয় নেই। একে গালি মনে করা কম জ্ঞান ও কম বুঝের চিহ্ন।

প্রশ্ন-১৯. একথা কি সত্য নয় যে, উসমান (রা) কুরআনের অনেক কপি যা ঐ সময় পর্যন্ত ছিল, তিনি জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দান করেন এবং মাত্র এক কপি বাকি ছিল। এভাবে একথা কি সত্য নয় যে, বর্তমান কুরআন ঐ কপি যার তরতীব (ক্রমধারা) ও সংকলন উসমান (রা)-এর এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে ঐ কুরআন ছিল যা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন?

উত্তর : আল-কুরআন সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক ধারণা, ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) ঐ সকল কপি জ্বালিয়ে দেন যা একরূপ ছিল না এবং এক কপির সংকলন ও তার ওপর জোর দেন। প্রকৃতপক্ষে যে কুরআন দুনিয়ার মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, উহা ঐ কুরআন যা মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ হয়। যা

তিনি স্বয়ং লিখিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং তাকে জোর দিয়েছেন। আমি এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রত্যুত্তর করব যার আলোকে এ ধারণা করা হয় যে, কুরআনের সংকলন উসমান (রা) করিয়েছিলেন।

যখন নবী করীম ﷺ এর ওপর অহী নাযিল হতো, প্রথমে তিনি মুখস্থ করতেন। পরে তাঁর ﷺ সাহাবীদের শোনাতেন এবং এ নির্দেশনা দিতেন, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর সন্তুষ্ট হবে। তিনি অহী লেখকদের নির্দেশ দিতেন যে এ আয়াতগুলো লিখে নাও। আর তিনি নিজে শুনে এগুলোর সত্যায়ন করতেন। নবী করীম ﷺ নিরক্ষর ছিলেন এবং লেখা-পড়া জানতেন না। এজন্য প্রত্যেকবার অহী নাযিলের পর সাহাবীদের সামনে তা পড়তেন যাতে তারা তা লিখে নিতে পারেন। আবার নবী করীম ﷺ তার নিজ থেকে শুনতেন এবং এর মধ্যে কোনো ভুল হলে তা চিহ্নিত করে ঠিক করতেন। আর দু'বার তা শুনতেন ও নিশ্চিত করতেন। এভাবে সারা কুরআনের লেখনি নবী করীম ﷺ এর নিজের তত্ত্বাবধানেই হতো। পূর্ণ কুরআন সাড়ে বাইশ বছর ব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের সংকলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণের সময়কাল এর বিন্যাস অনুযায়ী করান নি। আয়াত এবং সূরার অহীর বিন্যাস এর পেছনে তা করতেন এবং এটা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের মাধ্যমে জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ ﷺ কে তা বলে দিতেন। যখন নাযিলকৃত আয়াত সাহাবাদের সামনে পড়তেন তখন মুহাম্মদ ﷺ এর আয়াত কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পরে হবে তাও বলে দিতেন। প্রত্যেক রমজানে মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের অবতীর্ণ অংশের আয়াতের বিন্যাস দোহরাতেন এবং জিব্রাঈল (আ) তাঁকে নিশ্চিত করতেন। মুহাম্মদ ﷺ এর ইনতিকালের পূর্ব রমজানে কুরআনের প্রত্যয়ন দুবার হয়েছে। এ কারণে একথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজ জীবদ্দশায় স্বয়ং কুরআনের সংকলন, প্রত্যয়ন এবং তাঁর লেখনি ও সাহাবা কিরামদের মুখস্থ করানো দু'দিক থেকেই হয়েছে।

মুহাম্মদ ﷺ এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন আয়াতের সঠিক বিন্যাস এবং এর পূর্বাপরের সঙ্গেই মজুদ ছিল। হ্যাঁ, এর আয়াতগুলো পৃথক পৃথক চামড়ার টুকরো, হালকা পাথর, গাছের পাতা, খেজুরের ডাল এবং উটের ধারালো হাড় ইত্যাদির ওপর লেখা হয়েছিল। তাঁর ওফাতের পর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশে বিভিন্ন জিনিসের ওপর লিখিত কুরআনের অংশগুলো একস্থানে লিপিবদ্ধ করে পাতার আকার দিলেন। এ পাতাগুলোকে ডোর দ্বারা বাঁধা হয়েছিল যাতে এর কোনো অংশ ধ্বংস না হয়ে যায়। এ কপি আবু বকর (রা) এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট ছিল এবং তাঁর ওফাতের পর উমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁর নিকটে ছিল। এরপর রাসূলের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট রাখা হয়। কিন্তু তাঁর প্রচার পর্যন্ত হয় নি।

তৃতীয় খলিফা উসমান (রা)-এর আমলে আল কুরআনের কিছু শব্দ লেখা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ মতানৈক্যে যদিও অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য হতো না, তবুও নও মুসলিম অনারবীদের নিকট এরও অনেক গুরুত্ব ছিল। কিছু লোক নিজেদের পাঠকে সঠিক এবং অন্যদের পাঠকে ভুল বলতেন। এজন্য উসমান (রা) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে কুরআনের মূল কপি চেয়ে নেন, যার মতন (মূল)-এর নিশ্চয়তা মুহাম্মদ ﷺ স্বয়ং করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) মুহাম্মদ ﷺ এর নির্দেশে কুরআনের চার লেখক সাহাবী যাদের প্রধান ছিলে যায়িদ বিন ছাবিত। তাঁদেরকে দায়িত্ব দিয়ে আল-কুরআনের নকল কপি লেখার নির্দেশ দিলেন। এ নকল কৃত কপিগুলোকে মুসলমানদের বড় বড় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। কিছু লোকের নিকট আল কুরআনের কিছু কিছু অংশ তাদের এক আকৃতিতে মওজুদ ছিল।

এটা সম্ভব ছিল যে, এর মধ্যে কিছু (আঞ্চলিক হরফে বা উচ্চারণে) অশুদ্ধ ছিল, এমন কি অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য উসমান (রা) এ সকল লোকদের নিকট আবেদন করেন যেন তারা ঐগুলো জ্বালিয়ে দেন যেগুলো মূল কপির অনুরূপ নয়। যাতে কুরআনের আমল মতন (মূল) সংরক্ষিত হয়ে যায়। মুহাম্মদ ﷺ এর কঠিন সত্যায়িত মূল কুরআনের মতন অনুযায়ী তৈরি করা কুরআনের দুটি নকল আজো দুনিয়ার মধ্যে মওজুদ আছে। যার মধ্যে এক কপি উজবেকিস্তান-এর তাসখন্দ শহরের যাদুঘরে এবং দ্বিতীয় কপি তুরস্কের ইস্তামবুলের তোপকাপি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। *(রাসূল ﷺ এর অনুকূলে কৃত উসমান (রা) কর্তৃক মূল আট কপির একটির ফটোকপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় ডান দিকে কাঁচ দিয়ে ঘিরে রাখা আছে। পাশেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কপি হাতে লেখা কুরআন মজিদ (মূল))– অনুবাদক।*

কুরআনের মূল কপিগুলোতে এবং হরকতের ইরাব তিনটি চিহ্ন যাকে উর্দুতে 'যের', 'যবর', 'পেশ' ও আরবিতে 'ফাতহা, দম্মা' এবং 'কাসরা' বলা হয়। এছাড়াও 'তাশদীদ', 'মদ' এবং 'জযম' ইত্যাদি আছে। আরবি ভাষীদের জন্য উপযুক্ত উচ্চারণে পড়ার জন্য এ চিহ্নগুলোর প্রয়োজন হতো না। কেননা আরবি তাদের মাতৃভাষা ছিল। অনারবিদের জন্য এ ইরাব (اِعْـرَابٌ) ব্যতীত কুরআন শরীফের সঠিক উচ্চারণ সহজ ছিল না। এ জন্য এ সকল চিহ্ন বনু উমাইয়ার পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে ৬৬ থেকে ৮৬ হিজরি মুতাবেক ৬৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রি. অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আগ্রহে আল-কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কিছু কিছু লোক একথাও বলে যে, কুরআন শরীফের বর্তমান রূপ যার মধ্যে ইরাব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে মুহাম্মদ ﷺ এর সময়কার মূল কুরআন নয়। কিন্তু তারা এ

মূল কথাটি বুঝতে সক্ষম হন নি যে, কুরআনের শাব্দিক অর্থ বার বার পড়া, অর্থাৎ তিলাওয়াত করার জিনিস। এজন্য লেখার নিয়ম কিছুটা ভিন্ন অর্থাৎ এর মধ্যে হরকত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কুরআনে করীমে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত যদি আরবি মতন এবং তার উচ্চারণ ওটাই থাকে যা শুরুতে ছিল তাহলে আবশ্যকীয় কথা এই যে, এটার অর্থ তা-ই আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। ১৫ নং সূরা হিজর-এর ৯ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থ : আমিই উপদেশ (সম্বলিত কুরআন) নাযিল করেছি, আমিই উহার সংরক্ষণকারী।

প্রশ্ন-২০. কুরআনে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কথা বলেন তখন نَحْنُ অর্থাৎ 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। এতে কি একথা বুঝা যায় না যে, ইসলামে অনেক খোদার ওপর ঈমান রাখা যায়?

উত্তর : ইসলাম সর্বশক্তি দিয়ে তাওহীদের নির্দেশদাতা ধর্ম এবং এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ শুধুই এক এবং তিনি নিজ গুণাবলিতে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিহীন, অর্থাৎ কেউ তার সমকক্ষ নেই। কুরআন শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশির ভাগ স্থানে নিজের জন্য نَحْنُ অর্থ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুসলিমগণ বহু খোদার ওপর বিশ্বাস রাখবেন। বহু ভাষায় বহুবচনের জন্য দু রকম (শব্দ) ব্যবহৃত হয়।

এক. সংখ্যাগত জমা বা বহুবচনে যার দ্বারা কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে এর সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এটা একের অধিক।

দুই. বহুবচনের দ্বিতীয় প্রকার হলো যা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজিতে যুক্তরাজ্যে নিজের জন্য আই (I) এর স্থলে 'উই' (We) শব্দ ব্যবহার করে। এ ধরনের সম্বোধনকে Royal Plural (রাজকীয় বহুবচন) বলা হয়।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হিন্দিতে বলতেন ہَمْ (হাম) 'আমি দেখব', এ ধরনের শব্দ দ্বারা একথা বলা যায় যে, উর্দু এবং হিন্দিতে ہَمْ (হাম) Royal Plural এ ধরনের আরবি ভাষায় যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে নিজের উল্লেখ করেন তখন বেশিরভাগ স্থানে আরবি نَحْنُ (নাহনু) শব্দ ব্যবহার করেন এবং এটা সংখ্যাগত বহুবচন নয় বরং সম্মানজনক বহুবচনের শব্দ। তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর একটি। এক এবং কেবল প্রকৃত এক মাবুদের অস্তিত্ব

এবং তাঁর সাথে কারো সমকক্ষ না হওয়া ঐ কথা যার উল্লেখ কুরআনের বহু স্থানে এসেছে। যেমন : ১১২ নং সূরা ইখলাছের ১ নং আয়াতে মহান রব বলেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। বলুন! ঐ আল্লাহ এক।

প্রশ্ন-২১. মুসলমানগণ আয়াতের মানসুখ হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস এই যে, কুরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত পরবর্তীতে অবতীর্ণ হওয়া আয়াতের দ্বারা মানসুখ (রহিত) করা হয়েছিল। এর দ্বারা কি এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) তাআলা ভুল করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটা শুধরে নিয়েছেন?

উত্তর : আল-কুরআনের এ কথাকে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যা ২ নং সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে। মহান রব ইরশাদ করেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا . اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : কিছু আয়াত যাকে আমি রহিত করি, একে আমি ভুলিয়ে দিই, তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমমানের আয়াত নিয়ে আসি। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আরবি শব্দ 'আয়াত' শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, অথবা বাক্য এবং এর দ্বারা অহীও উদ্দেশ্য নেয়া হয়। এ আয়াতের 'তাশরী' ও 'পথ' দ্বারা কী বুঝায়।

প্রথমত, হলো এ সকল আয়াত যা রহিত হয়ে গেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল অহী যা কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন : তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল-এর মূল আকৃতি যার পরিবর্তে অহী নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো অতীতের অহীগুলো সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় নি বরং এর চেয়ে উত্তম কালাম তার পরিবর্তে দেয়া হয়েছে এবং এর দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে কুরআনে আজীম এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত, যদি আমরা এ আয়াতের আরবি শব্দ 'আয়াত' দ্বারা কুরআনের আয়াত বুঝি এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর অহী না বুঝানো হয়। তাহলে এর এই অর্থ হবে যে, কুরআনের কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত মানসুখ হয় নি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তদ্স্থলে তার চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করেননি। এর দ্বারা একথা বলা যায় যে, কুরআনের কিছু আয়াত যা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরবর্তীতে অবতীর্ণ শক্ত আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি এ উভয় পদ্ধতির সাথে একমত। কিছু মুসলিম এবং অমুসলিম দ্বিতীয় পদ্ধতির সাথে

এ ভুল উদ্দেশ্য বের করে যে, কুরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত মানসুখ করা হয়েছিল যা আজ আমাদের ওপর প্রয়োগ হতো না। এজন্য পরবর্তীতে অবতীর্ণ নাসিখ (রহিতকারী) আয়াতগুলোকে সে স্থানে নেয়া হয়েছে। এ দলের এ দৃষ্টিভঙ্গিও আছে যে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিপরীত। আমরা এর উত্তরও দিব।

কিছু মুশরিক এ অভিযোগ করতো যে, মুহাম্মদ ﷺ এ কুরআন নিজে তৈরি করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ আরব মুশরিকদের ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নং আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ : বলুন! যদি সকল জ্বীন ও ইনসান এ কুরআনের সমতুল্য কোনো কিতাব বানিয়ে আনার জন্য একত্র হয়, তাতেও তারা এ রূপ করে আনতে সক্ষম হবে না, যদি তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়।

এরপর চ্যালেঞ্জকে আরো হালকা করে পেশ করা হয়েছে ১১ নং সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াতে–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : তারা কি বলে মুহাম্মদ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে এসেছে। আপনি বলুন! তোমরা স্বরচিত মাত্র ১০টি সূরা তৈরি করে নিয়ে আসো, আর আল্লাহ্ ছাড়া যে সাহায্যকারী পাও তাকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

আল্লাহ্ এ পরীক্ষা আরো সহজ করে ১০ নং সূরা ইউনূসের ৩৮ নং আয়াতে বলেছেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : তারা কি বলে, ইনি (মুহাম্মদ) এটি রচনা করে নিয়ে এসেছেন। আপনি বলুন, তোমরা এমন মাত্র ১টি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া আর যে সাহায্যকারী পাও তাকে ডাক যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

এরপর সবচেয়ে সহজ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমার বান্দার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তার সত্যতার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও, সেই একটি সূরার মতো সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তাদেরকেও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পারো আসলে কখনোই তোমরা তা পারবে না, তাহলে তোমরা ভয় কর সেই জাহান্নামকে যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর, যা নির্ধারণ করা হয়েছে অস্বীকারকারীদের জন্য।

এভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ চ্যালেঞ্জকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। এরপর নাযিল হওয়া আয়াতের দ্বারা প্রথমে তো মুশরিকদের এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে. উহা ঐ কুরআন যার মতো কোনো কিতাব তৈরি করে দেখাও। এরপর বলা হলো এর মাত্র দশটি সূরার অনুরূপ রচনা করে দেখাও এবং সর্বশেষ এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, কুরআনের সূরাগুলোর যেকোনো একটির মতো রচনা করে দেখাও। এর অর্থ এটা কখনো সম্ভব নয়। সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত প্রথম তিন আয়াতের বিপরীত এবং বিপরীত বলা হয় এমন দু'জিনিসের একত্রে উল্লেখ করা যা একত্রে থাকা সম্ভব নয়, এক সঙ্গে অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়।

কুরআনে করীমের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত যেগুলোকে 'মানসুখ' বলা হয় ঐগুলো আল্লাহর কালামের অংশ এবং ঐগুলোতে বর্ণিত বিধানগুলো আজো সত্য। যেমন কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ যে, রচনা করে নিয়ে এসো কুরআনের মতো একখানা গ্রন্থ, অথবা তার মাত্র ১০টি সূরার অনুরূপ সংস্করণ, অথবা মাত্র একটি ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা। এ চ্যালেঞ্জগুলো আজো বহাল আছে। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ পূর্ববর্তী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সহজ, তবে বৈপরিত্য নেই। যদি শেষের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার যোগ্যতা না থাকে তাহলে বাকি চ্যালেঞ্জগুলোর জবাব দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ধরুন, আমি এক ব্যাপারে বললাম, সে এমন মেধাহীন যে, স্কুলে মেট্রিক পাস করার যোগ্যতাও নেই। এরপর আমি এটা বলব যে, সে পঞ্চম শ্রেণীও পাস করবে না। এরপর আমি এটাও বলব যে সে, তো প্রথম শ্রেণীও পাস করবে না। সর্বশেষ আমি একথাও বলব যে সে কে.জি.তেও পাস করতে পারবে না। যেহেতু স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কে. জি. অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন পাস করা জরুরি। অন্য ভাষায় আমি একথা বলব যে, এ ব্যক্তি এমন মেধাহীন যে, সে কে.

জিও পাস করবে না। আমার চার পদ্ধতির কথা অন্য কথার বিপরীত নয়। যদি কোনো ছাত্র কে.জি. পাস না করে তবে সে প্রথম, পঞ্চম অথবা দশম শ্রেণি কীভাবে পাস করবে? এর তো প্রশ্নই আসবে না।

এ সকল আয়াতের অধিক দৃষ্টান্ত ঐ সকল আয়াত দ্বারা দেয়া যায় যা নেশার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধারাবাহিকতার প্রথম আয়াত ২ নং সূরা বাকারার, ২১৯ নং আয়াত–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ـ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ

অর্থ : তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করছে। বলুন, উভয়ের মধ্যে বিরাট গুনাহ ও মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে। উভয়ের উপকারিতার চেয়ে গুনাহ অনেক বেশি।

মাদক এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে পরবর্তী আয়াত ৪ নং সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَاتَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামাজের কাছে যেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু বলো তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারো।

নেশাদ্রব্য সম্পর্কে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৯০ এ বলা হয়েছে–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

আল-কুরআন সাড়ে বাইশ বছর পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় আর সমাজের প্রচুর সংশোধনী ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছে। এজন্য যে, নতুন বিধানের ওপর লোকদের আমল করতে সুবিধা হয়, কেননা কোনো সমাজে এক সাথে পরিবর্তন বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ির কারণ হয়।

মাদকদ্রব্যের অবৈধতা তিনটি স্তরে সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথম অহীতে শুধু বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বড় অপরাধ এবং তার মধ্যে কিছু উপকারিতাও রয়েছে তবে তার অপরাধই বেশি।

এরপরের অহীতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হলো যে, কাউকে মুসলমান হতে হলে, কিছু নেশাদ্রব্য তার জন্য নিষিদ্ধ এজন্য যে, মুসলমানের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। এ আয়াতে এ কথা নেই যে, রাতে যদি কেউ সালাত না আদায় করে তাহলে নেশা করতে পারবে। এর অর্থ সে চাইলে নেশা করতেও পারে, না চাইলে নাও করতে পারে।

এর পরে কুরআন শরীফে কোনো প্রকারের শিক্ষণীয় বিষয়ের চাপ নেই। যদি এ আয়াতে এ কথা বলা হতো যে, যখন নামাজ না পড়বে তখন মদপান করবে, তাহলে এটা সরাসরি বৈপরীত্য হতো। মহান রাব্বুল আলামীন বড়ই মাপা বাক্য ব্যবহার করেন। সর্বশেষ ৫ নং সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে সব সময়ের জন্য মাদক নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। যদি এগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য হতো তাহলে একই সঙ্গে এ সকলের ওপর আমল করা সম্ভব হতো না। সকল মুসলমানকে এ তাকীদ করা হয়েছে যে, সে আল-কুরআনের সকল আয়াতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ জন্য যখন সে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতের ওপর আমল করবে তখন পূর্ববর্তী সকল আয়াতের ওপর আমল করা হয়ে যাবে। ধরুন, আমি বললাম যে, আমি লজ এঞ্জেল্স-এ নেই, এরপর আমি বললাম যে, আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই। সর্বশেষ বললাম যে, আমি ইউনাইটেড স্টেট অভ আমেরিকাতে নেই। একথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, এ তিন বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। যেহেতু প্রত্যেক পরবর্তী কথা পূর্ববর্তী বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। অতএব যদি বলা হয় যে, আমি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকাতে নেই একথা নিজেই নিজেই প্রকাশ করে যে, আমি লজ এঞ্জেল্স-এও নেই, ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই, এরূপভাবে যখন মদের পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এসে গেল তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা এবং বড় গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা একবারেই হয়ে গেল।

আয়াতের মানসুখ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ফলাফল বের হলো যে, কুরআনে বৈপরীত্য নেই এজন্য যে, এক সময়ে কুরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা সম্ভব নয়, যদি এর মধ্যে বৈপরীত্য হয় তাহলে এ আল্লাহর কালাম হতে পারে না। মহান রব ৫ নং পারা ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন−

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : এরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না? এ গ্রন্থ যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল দেখতে পেতো।

প্রশ্ন-২২. কুরআনের কিছু সূরা الٓمٓ - حٰمٓ - يٰسٓ ইত্যাদি দ্বারা কেন আরম্ভ করা হয়েছে? এর গুরুত্ব কী?

উত্তর ঃ الم - حم এবং يس যে হরফগুলোকে 'হরফে মুকাত্তায়াত' বলা হয়। আরবি অ্যালফাবেট এই হরফে তাহাজ্জীতে ২৯টি হরফ রয়েছে এবং কুরআনের ২৯টি সূরা এ সকল হরফ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

তিন সূরার শুরু শুধু এক হরফ দ্বারা হয়েছে।

১. ৩৮ নং সূরা ছদ, ص হরফ দ্বারা।

২. ৫০ নং সূরা ক্বফ ق হরফ দ্বারা।

৩. ৬৮ নং সূরা ক্বলম ن হরফ দ্বারা।

১০ সূরার শুরুতে ২টি করে হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা শুরু হয়েছে।

১. ২০ নং সূরা ত্বহা طه দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

২. ২৭ নং সূরা নামল طس দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৩. ৩৬ নং সূরা ইয়াসীন يس দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৪. ৪০ নং সূরা মুমিন حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৫. ৪১ নং সূরা হামীম আস-সাজদা حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৬. ৪২ নং সূরা শূরা حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৭. ৪৩ নং সূরা যুখরুফ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৮. ৪৪ নং সূরা দুখান حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৯. ৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১০. ৪৬ নং সূরা আহকাফ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১৪টি সূরা তিন হরফ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১. ২ নং সূরা বাকারা الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

২. ৩ নং সূরা আলে ইমরান الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৩. ২৯ নং সূরা আনকাবুত الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৪. ৩০ নং সূরা রূম الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৫. ৩১ নং সূরা লুকমান الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৬. ৩২ নং সূরা আস-সাজদা الم। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৭. ১০ নং সূরা ইউনূস الر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

৮. ১১ নং সূরা হুদ الر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
৯. ১২ নং সূরা ইউসূফ الر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
১০. ১৪ নং সূরা ইবরাহীম الر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
১১. ১৫ নং সূরা হিজর الر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
১২. ২৬ নং সূরা শুয়ারা طسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
১৩. ২৮ নং সূরা কাসাস طسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

দুটি সূরা চার হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১. ৭ নং সূরা আরাফ المص। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
২. ১৩ নং সূরা রায়াদ المر। দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

দুটি সূরা পাঁচ হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১. ১৯ নং সূরা মারইয়াম كهيعص দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
২. ৪২ নং সূরা শূরা দু রকম حم عسق দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

এ সকল হরফের উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে জোর দিয়ে কোনো কিছু বলা হয় নি। মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিচে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো–

১. এ হরফগুলো কিছু বাক্য বা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। الم। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন اَللّٰهُ اَعْلَمُ।

   এ হরফগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ নয় বরং আল্লাহ তায়ালা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম অথবা চিহ্ন।

২. এ হরফগুলো কাফিয়া বন্দী (শুরুর বর্ণমালা) করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. এ হরফগুলো সংখ্যাগত মূল্য রাখে, কেননা সিরিয়ার ভাষায় অক্ষর সংখ্যার মর্যাদা রাখে।

৪. এ হরফগুলো মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরবর্তী শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. এ হরফগুলোর অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েক খণ্ড (কিতাব) লেখা যায়।

কিতাবের বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যে, তাশরীআত বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা যার গুরুত্ব ইমাম ইবনে কাছীর, আল্লামা জামাখশারী এবং ইবনে তাইমিয়াহ্ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ–

এক. মানুষের দেহ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত, মাটি এবং গারা ও তার মৌলিক গঠনের উপাদান। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে, মানুষ সম্পূর্ণ মাটির মতো। আমরা মানুষ যে সকল উপাদান দ্বারা তৈরি তা সম্পর্কে জ্ঞাত। আমরা যদি এ সকল উপাদান একত্র করি এবং তার মধ্যে কয়েক গ্যালন পানি ঢালি যার দ্বারা

মানব দেহ গঠিত হয়েছে কিন্তু আমরা এর মধ্যে জীবন দিতে পারবো না। আমাদের জানা আছে যে, মানবদেহে কোন কোন উপাদান রয়েছে এ সকল বস্তু থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো তখন হয়রান হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না। এরূপভাবে যখন কুরআনে ঐ সকল লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা আল্লাহর বিধানকে মানে না, তখন কুরআন তাদের বলে যে, এ কিতাব তোমাদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা ঐ ভাষা যার বাগ্মীতার ব্যাপারে অহংকার জাহির করতো। আরবীরা নিজ ভাষার ব্যাপারে অনেক বড়াই করতো এবং যখন কুরআন নাযিল হয় তখন আরবি ভাষা উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিল। হরফে মুকাত্তায়াত যেমন : الـم ـ يـس ـ حـم। ইত্যাদি ব্যবহার করে মানুষদের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, যদি এ কুরআন সঠিক এবং আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে এর মতো বা এর এক সূরার মতো একটি লিখে পেশ কর। প্রথমে কুরআন সকল জ্বীন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, তুমি কুরআনের মতো কালাম এনে দেখাও, এরপর পুনরায় বলেছে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করেও কখনো এ কাজ করতে পারবে না। এ চ্যালেঞ্জ ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নং আয়াত ৫২ নং সূরা তুর-এর ৩৪ নং আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর এ চ্যালেঞ্জ ১১ নং সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এরূপ ১০টি সূরা বানিয়ে দেখাও। এরপর ১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো এবং সর্বশেষ ২ নং সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন কর তোমরা যদি সত্যবাদী হও। তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। আর যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনোই তা করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে তার জ্বালানি, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

দুই. হিজাজবাসীর দক্ষতার মোকাবিলা করার জন্য এ নমুনা পেশ করেছেন এবং একই সঙ্গে এ দুটির উত্তর দিয়েছেন। আরবি ভাষার সকল কিছু এ হরফে

মুকাত্তায়াত-এর মধ্যেই। কুরআনের স্বাভাবিক মুজিজা শুধু এই নয় যে, তা আল্লাহ তাআলারই বাণী বরং এর মহত্ত্ব এও যে, এ সকল ঐ হরফ যার ওপর মুশরিকরা অহংকার করতো। কিন্তু তারা এর মোকাবিলায় কোনো বাক্য পেশ করতে সক্ষম হয় নি। আরবিরা নিজেদের বাগ্মিতা ভাষার অলঙ্কার এর ওপরে পণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল, যেরূপভাবে আমরা জানি দেহের উপাদান কোন কোন জিনিস, আমরা তা জোগাড়ও করতে পারি। এরূপভাবে কুরআনের অক্ষর الم। -ও তারা জানতো এবং শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে তারা তা ব্যবহারও করতো, কিন্তু যেরূপভাবে দেহের উপাদানসমূহ জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা তার মধ্যে জীবনপ্রবাহ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এরূপভাবে আমরা কুরআনের বাগ্মীতা ও তার বাণীর সৌন্দর্যের বিষয়াদি আয়তে আনত্তে সক্ষম নই। সুতরাং আল-কুরআন স্বয়ং এ কথার প্রমাণ যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী এবং এজন্যই সূরা বাকারার প্রথমে হরফে মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফ) এরপরে তৎক্ষণাৎ যে আয়াত তাতে কুরআনের মুজিযা হওয়ার এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইরশাদ হচ্ছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : এই সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত।

প্রশ্ন-২৩. কুরআনে এসেছে যে, জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বানানো হয়েছে। এ থেকে একথা বুঝা যায় যে, জমিন (ভূমি) চ্যাপ্টা এবং সমতল। একথা কি গ্রহণীয় আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সত্তার সাথে বৈপরত্য করে না?

উত্তর : প্রশ্নে ৭১ নং সূরা নূহ-এর ১৯ নং আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে এ জমিনকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন।

কিন্তু এ আয়াতে বাক্য পূর্ণ হয় নি। এ আয়াত পরবর্তী আয়াতে আছে যা এর পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে। ৭১ নং সূরা নূহ-এর ২০ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ـ

অর্থ : যেন তোমরা এর বুকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারো।

এরূপভাবে এ কথা ২০ নং সূরা ত্বহার ৫৩ নং আয়াতে একে পুনরায় বলা হয়েছে–

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.

অর্থ : যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য বহু ধরনের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন।

জমিনের উপরিস্তরের পুরুত্ব তেইশ মাইলেরও কম এবং এর তুলনা জমিনের অর্ধাংশের ওপর ধরা হয় যার দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ৩.৭৫০ মাইল। তাই জমিনের পুরুত্ব খুবই পাতলা মনে হবে। জমিনের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড গরম, তরল এবং যে কোনো প্রকারের জীবনযাপনের জন্য অসম্ভব স্থান। জমিনের উপরিস্তর গোলাকৃতির ঐ গোলকের ন্যায় যার ওপরে আমরা জীবন নিয়ে আছি। এজন্য কুরআন এটাকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিছানা অর্থাৎ 'কালীন' এর সাথে তুলনা করেছে। যাতে আমরা এর রাস্তা এবং পথের ওপর চলাফেরা করি। কুরআনের মধ্যে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে একথা বলা হয়েছে যে, জমিন চ্যাপ্টা অথবা সমতল। কুরআন শুধু জমিনের উপরিস্তরকে সমতল 'কালীন' এর সাথে তুলনা করেছে। বুঝা যায় যে, কিছু লোকের নিকট 'কালীন' (বিছানা) কেবল সমতল ভূমির ওপর বিছানো হয়। যদিও পাহাড়ি ভূমি যেমন বড় পাথরের ওপরও বিছানা বিছানো সম্ভব এবং এর অভিজ্ঞতা ভূমির গ্লোব-এর আকারের বড় নমুনা নিয়ে তার ওপর বিছানা বিছিয়ে আরাম করা যায়। বিছানা সাধারণভাবে এমন ছাদের ওপর বিছানো হয়, যার ওপর আরামে চলা যায়। কুরআনে জমিনের উপরিস্তরের উল্লেখ বিছানার ওপর করেছে যার নিচে গরম, তরল এবং জীবনের জন্য অসম্ভব পাওয়া যায়। বিছানা জমিনের ওপর বিছানো, 'কালীন' ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য কুরআনের এ বক্তব্য শুধু যুক্তির আলোকেই নয় বরং এর মধ্যে এমন এক সত্য বর্ণিত হয়েছে যা ভূমি বিষয়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জমিনকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫১ নং সূরা যারিয়াত-এর ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ.

অর্থ : আমি এই জমিনকেও তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরই না বিছিয়ে থাকি।

এমনভাবে কুরআনের বহু আয়াতে জমিনকে খোলা বিছানা বা ফেরাশ বলা হয়েছে। যেমন : ৭৮ নং সূরা নাবার ৬, ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি জমিনকে বিছানা ও পাহাড়কে পেরেকস্বরূপ বানাই নি?

কুরআনের এ আয়াতে কোনোরূপ ইঙ্গিতও করা হয় নি যে, আমি জমিনকে চ্যাপ্টা বা সমতল বানিয়েছি। শুধু এটা পরিষ্কার হয় যে, জমিন খোলা ও প্রশস্ত এবং এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। ২৯ নং সূরা আনকাবুতের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ـ

অর্থ : হে আমার বান্দারা যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো, আমার জমিন অনেক প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

প্রশ্ন-২৪. একথা কি ঠিক নয় যে, মুহাম্মদ ﷺ কুরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন?

উত্তর : অধিকাংশ সমালোচনাকারীরা এ কথা বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ এ কুরআন নিজে লেখেন নি বরং সকল মানবীয় উৎস থেকে অথবা পূর্বের খোদা প্রদত্ত কিতাব থেকে নকল করেছেন। তারা এ ধরনের অভিযোগ করে।

কিছু মুশরিকরা মুহাম্মদ ﷺ -এর ওপর এ অভিযোগ আরোপ করে যে, তিনি কুরআনকে মক্কার মুযাফাতে অবস্থানকারী এক রোমীয় ধর্মবিদের নিকট থেকে শিখেছিলেন, যিনি খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। মুহাম্মদ ﷺ বেশিরভাগ তার কাজ-কর্ম দেখতে যেতেন। কুরআনের একটি আয়াতই একথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট।

১৬ নং সূরা নাহল-এর ১০৩ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন –

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ـ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থ : হে নবী! আমি ভালো করেই জানি যে, এরা বলে এ কুরআন তো একজন মানুষ এসে এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়, যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইঙ্গিত করে এর ভাষা আরবি নয়, আর কুরআন হচ্ছে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা।

ঐ ব্যক্তি যার নিজ ভাষা কোনো ভিনদেশী। যে আরবি বিশুদ্ধভাবে বলতে পারে না, যে টোটা-ফোটা আরবি বলতে পারে তিনি কীভাবে কুরআনের উৎস হতে পারেন যা বিশুদ্ধ, সুন্দর বর্ণনা, মিষ্ট ভাষা উচ্চতম আরবি ভাষায়। একথা বলা যে, মুহাম্মদ

ﷺ কোনো বিদেশী থেকে কুরআন শিখেছেন এটা এমন যে, কোনো You জানাওয়ালা এক ব্যক্তি যে বিশুদ্ধভাবে ইংরেজি ভাষাও জানে না সে সেক্সপিয়ারকে লেখা-পড়া শিখিয়েছে।

এটাও বলা হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ খাদীজা (রা)-এর আত্মীয় ওরাকা বিন নওফেল থেকে এটা শিক্ষা লাভ করেছেন। যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ এর সম্পর্ক ইহুদি ও খ্রিস্টান পন্ডিতদের সাথে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। মুহাম্মদ ﷺ যে খ্রিস্টানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যোগাযোগ রাখতেন তিনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি ওরাকা বিন নওফেল ছিলেন। যিনি মুহাম্মদ ﷺ এর প্রথমা স্ত্রী খাদীজা (রা)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। যদিও তিনি আরবি ভাষাভাষী তবুও তিনি নিজে খ্রিস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নতুন ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে তাঁর দু'বার সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রথম বার যখন ওরাকা বাইতুল্লায় ইবাদত করছিলেন, তখন তিনি মুহাব্বতের টানে মুহাম্মদ ﷺ এর কপালে চুম্বন খেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার যখন মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এর তিন বছর পর ওরাকার ইন্তিকাল ঘটে। অথচ কুরআনের অবতরণ প্রায় তেইশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এজন্য একথা বলা যায় যে, ওরাকা বিন নওফেল ওহীর কারণ সম্পূর্ণ হাস্যকর এবং মূল্যহীন। একথা সম্পূর্ণ সঠিক যে, মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তর্ক-বিতর্ক হয়েছে কিন্তু এসব তো ওহী অবতীর্ণ হওয়ার তেরো বছরেরও অধিক পরে মদিনায় হয়েছে।

একথা বলা যায় যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কুরআনের উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল এবং বিরক্তকর অভিযোগ এসেছে এজন্য যে, মুহাম্মদ ﷺ ঐ সব বিতর্কে একজন শিক্ষক ও মুবাল্লিগের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন। তাদের বলতেন তাওহীদের জন্য তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে এসো। তাদের মধ্যে যথেষ্ট ইহুদি-খ্রিস্টান পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, নবুওয়তের ঘোষণার আগে মুহাম্মদ ﷺ মাত্র তিনবার মক্কার বাইরে সফরে গিয়েছিলেন।

* নয় বছর বয়সে তিনি মদিনায় নিজ মাতার ঘর যাকে তখন ইয়াসরিব বলা হতো সেখানে গিয়েছিলেন।
* নয় বছর থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যকালীন নিজ চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন।
* খাদীজা (রা) এর ব্যবসায়িক মালপত্র নিয়ে ২৫ বছর বয়সে সিরিয়া যান।

এ তিনটি সফরে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গে সাধারণ প্রকারের কথা-বার্তা ও সাক্ষাৎ হয়েছে। এর মাধ্যমে কুরআনের অস্তিত্বে যে কথা বলে আসলে এর মতো ভিত্তিহীন এবং অসম্ভব চিন্তা আর কী আছে। মুহাম্মদ ﷺ ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কখনোই কুরআন শেখেন নি। মুহাম্মদ ﷺ এর পূর্ণ জীবন একটি খোলা কিতাবের মতো এবং প্রকৃত ঘটনা এই যে, মুহাম্মদ ﷺ কে নিজ ঘরে পরবাসীর স্থান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ৪৯ নং সূরা হুজুরাত এর ৪ ও ৫ নং আয়াতে বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আপনাকে কক্ষের পেছন থেকে ডাকে তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না। যদি আপনি স্বেচ্ছায় বের হওয়া পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভালো হতো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

যদি মুহাম্মদ ﷺ ঐ লোকদের সঙ্গে মিলতেন কাফিরদের মতে যারা মুহাম্মদ ﷺ কে শেখাতেন, অহীর যে ধারা তাতে একথা বেশিদিন গোপন থাকতো না।

কুরাইশদের অনেক স্বনামধন্য সরদার যারা মুহাম্মদ ﷺ কে অনুসরণ করে, ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাদের মেধা এতোই তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ যে অহী পেশ করতেন তার মধ্যে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকত, তাহলে সহজেই তারা চিনে ফেলতে পারতেন এবং এতো কোনো সামান্য সময়ের ব্যাপার ছিল না। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত ও আন্দোলন ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কারোরই সামান্য সময়ের জন্য সন্দেহ জাগে নি। রাসূল ﷺ -এর এ দাওয়াতের বিরোধীরা সবসময় তাঁর পেছনে লেগেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ কে মিথ্যা প্রমাণিত করবে কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একটি সাক্ষ্যও পেশ করতে পারে নি যে, তিনি বিশেষ ইহুদি বা খ্রিস্টানদের সাথে গোপন সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। এ কথারও ধারণা করা যায় না যে, কোনো ব্যক্তি একথা মেনে নিবে যে, সে কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ বানাবে অথচ তার কৃতিত্ব নিজে নিবেন না। এজন্য যুক্তি এবং ঐতিহাসিকভাবে একথা মানা যায় না যে, কুরআন মানবসৃষ্ট। একথা বলা যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজে কুরআন লিখেছেন অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে নকল করেছেন। একথা ঐতিহাসিকভাবে এজন্য ভুল যে, মুহাম্মদ ﷺ একাডেমিক লেখা-পড়া জানতেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু স্বয়ং কুরআনে এ কথার সত্যায়ন করেছেন ২৯ নং সূরা আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبٍ وَّلَاتَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ -

অর্থ : আপনি ইতিপূর্বে কোনো কিতাব পড়েন নি, আপনি নিজ হাতে লিপিবদ্ধও করেনি যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একথা জানতেন যে, বহু লোক কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করবে এবং তাকে মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে সম্পৃক্ত করবে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সার্বক্ষণিক প্রজ্ঞা দ্বারা এক নিরক্ষরকে তাঁর সর্বশেষ নবী করে পাঠালেন যাতে বাতিল পূজারীদের মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর সন্দেহের আদৌ কোনো অবকাশ না থাকে। মুহাম্মদ ﷺ এর বিরোধীদের একথা বলা যায় না যে, তিনি অন্য উৎস থেকে কুরআনের বিষয় অর্জন করে একে সুন্দর আরবিতে রূপান্তর করে নিয়েছেন, মনে হয় একথার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব বা তাৎপর্য হালকা রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আপত্তি এই অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের ওপর উল্টে দেয়া হয়েছে। মহান রব ৭ নং সূরা আরাফ-এর ১৫৭ নং আয়াতে এ কথার সত্যায়ন করে বর্ণনা করেন–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

অর্থ : যারা এই বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে চলে, যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।

উম্মী নবীর আগমনের বার্তা বাইবেলের ইয়াসইয়াহ পুস্তকের ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে :

পুনরায় ঐ কিতাব তাকে দিব যিনি লেখা-পড়া জানেন না, তাকে বলা হবে পড়ো, তিনি বলবেন, আমি লেখা-পড়া জানি না।

কুরআন শরীফে কমপক্ষে চার স্থানে এ কথার সত্যায়ন করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ একাডেমিক লেখা-পড়া জানতেন না। এর উল্লেখ ৭ নং সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াত, ৬২ নং সূরা জুমুয়ার ৬ নং আয়াতেও বলা হয়েছে। মুহাম্মদ ﷺ এর সময়ে আরবিতে বাইবেল ছিল না। আহাদনামা আতীকের সর্বপ্রথম যে আরবি অনুবাদ তা পাদরি R. Saadeas Gaon ৯০০ খ্রিস্টাব্দে করেছেন। এ কাজ মুহাম্মদ ﷺ এর ইন্তিকালের ২৫০ বছর পরের যখন নিউ টেস্টামেন্টের সর্বপ্রথম আরবি অনুবাদ আরপানিয়াস (Erpenius) রাসূল ﷺ-এর বিদায়ের প্রায় এক হাজার বছর পর ১৬১৬ খ্রি. করেছেন। কুরআন এবং বাইবেলের একটি এমন বক্তব্যও নেই যা

দ্বারা বুঝা যায় যে, বাইবেল থেকে কুরআন নকল করা হয়েছে। মূলত এটা এ কথা প্রমাণ যে, এই উভয় কোন তৃতীয় শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকল আসমানী সহীফার উৎস স্থল একটি সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যিনি সকল সৃষ্টির প্রভু। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কিতাব এবং তার পূর্ববর্তী আসমানী ছহীফাগুলোতে মনুষ্য হস্তক্ষেপের কারণে কিছু অংশ তা থেকে সংরক্ষিত আছে এবং তা বেশিরভাগ ধর্মের সাথে মিল আছে। একথাও সঠিক যে, কুরআন এবং বাইবেলের মধ্যে কিছু বিষয়ের মিল আছে, কিন্তু এ ভিত্তিতে মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর এ অভিযোগ আরোপের কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন। অথবা এখান থেকে গ্রহণ করে কুরআনের বিন্যাস সাধন করেছেন। যদি এ অভিযোগ সত্য হয় তাহলে এ অভিযোগ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপরও ফিরে আসে এবং ভুলের ওপর এ দাবিও করা যায় যে, ঈসা মসীহ (আ) সত্য নবী ছিলেন না এবং তিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছিলেন।

কুরআন এবং বাইবেলে পাওয়া একটা কথাই সঠিক যে, মূলত এর উৎস এক, তাহলো আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা। এটা তাওহীদের পয়গামের ধারাবাহিকতা, এ সত্ত্বেও একথা বলার সুযোগ নেই যে, পরবর্তী নবিগণ পূর্ববর্তী নবিগণ থেকে নকল করেছেন। যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে তাহলে নিশ্চয়ই সে নিজ শিক্ষকের নিকট একথা লিখবে না যে, আমি আপনার কাছে বসে অমুক ছাত্রের কাছ থেকে নকল করেছি। যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর সম্মান ও তাদের বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনেও একথা বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের ওপর আল্লাহ তাআলা ছহীফা নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে প্রধান চার কিতাবের উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানগণ এ সব কিতাবের ওপর ঈমান রাখে। এগুলো হলো–

তাওরাত : মুসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয় যা তক্তার আকৃতিতে।

যাবুর : দাউদ (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

ইঞ্জিল : ঈসা (আ) -এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

কুরআন : সর্বশেষ কিতাব যা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺএর ওপর অবতীর্ণ হয়।

সকল নবী এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান আনা প্রত্যেকটি মুসলমানের ওপর আবশ্যক। কিন্তু বিদ্যমান বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঁচ কিতাবকে মুসা (আ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং Psalms অথবা মাযামীর দাউদ (আ) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, এছাড়াও ওল্ড টেস্টামেন্টে এর চার ইঞ্জিল ও তাওরাত, যাবুরও ইঞ্জিল নয় যার উল্লেখ কুরআনে কারীমে করা হয়েছে। আজকের বাইবেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী কিছু থাকতে

পারে। তবে নিশ্চিতরূপেই তা মূল অবস্থায় নেই। এটা সার্বিকভাবে নেই এবং এর মধ্যে নবীদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া বাণীও নেই।

কুরআন সব নবীর ওপর এক ধারার নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং একথা বলে যে, এদের নবুওয়াতের একই উদ্দেশ্য ছিল এবং একই মৌলিক বাণী ছিল। এ ভিত্তির ওপর কুরআন এ কথাকে প্রমাণ করে যে, বড় বড় ধর্মের মৌলিক শিক্ষা পরস্পর বিরোধী নয়, যদিও নবীদের কালের অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। এর কারণ এই যে, এদের সকলের উৎস একই এবং তিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। এজন্য কুরআন এটা বলে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায়, তার দায়িত্ব নবীদের ওপর বর্তায় না, বরং তার দায়িত্ব তাঁদের অনুসারীদের ওপর বর্তায়, যারা শিখিয়ে দেয়া এক অংশ ভুলে গিয়েছেলেন, এছাড়াও তারা আল্লাহর কিতাবে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল এবং এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছিল। অতএব একথা কুরআন সম্পর্কে বলা যাবে না যে, এটা এমন কিতাব যা মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীর শিক্ষার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। এর বিপরীত এই কিতাব পূর্ববর্তী নবীদের পয়গামকে জোরদার ও সত্যায়ন করে এবং তাকে পরিপূর্ণ করে এবং তাকে পূর্ণতায় পৌছায় যা নিজ উম্মত দ্বারা করিয়েছেন।

কুরআনের নাম 'ফুর্কান'। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী দাঁড়ি বা মাপকাঠি। কুরআনের ভিত্তির ওপর আমরা এটা জানতে পারি পূর্বের আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ আল্লাহ্ তাআলার বাণী। কুরআন এবং বাইবেলের ওপর অধ্যয়নের পর আপনারা এমন অনেক বিষয় পাবেন যাতে উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যাবে। কিন্তু আপনি যখন এগুলোকে যাচাই করবেন তখন বুঝা যাবে যে তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে যিনি খ্রিস্টান ও ইসলাম এর কোনো শিক্ষার ওপর গভীর জ্ঞান রাখেন না, সেক্ষেত্রে ফয়সালা করা শক্ত সমস্যা হবে উভয় কিতাবের মধ্যে সঠিক কোন্টা। হ্যাঁ আপনি যদি উভয়ের গ্রহণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পর পরখ করেন তবে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, মূল কোন্টা। কয়েকটি উদাহরণ আপনার সামনে সত্যকে প্রকাশ করে দিবে।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে একথা লেখা আছে যে, পৃথিবী সৃষ্টিতে ছয় দিন লেগেছে এবং প্রত্যেক দিন চব্বিশ ঘণ্টার ছিল। কুরআনেও একথা বলা হয়েছে যে, পৃথিবী ছয় দিনে (اَيَّامٌ)-এ সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন অনুযায়ী এ اَيَّامٌ যুগ (বারো বছর) এর ওপর শামিল এবং অন্য কথায় এর দ্বারা এক ধারা বা এক দাওরা/চক্কর অথবা এক যুগ। যা যথেষ্ট দীর্ঘকাল। যখন আল কুরআন বলে এ পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য আসমানসমূহ এবং জমিনকে ছয়টি দীর্ঘ চক্কর বা যুগে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের একথার ওপর কোন অভিযোগ

নেই। সৃষ্টি জগৎ তৈরিতে বহু বছর লাগে এবং একথা বাইবেলের চিন্তার বিপরীত। যাতে বলা হয়েছে সৃষ্টিজগত মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয়েছে বা অস্তিত্বে এসেছে যে দিন মাত্র ২৪ ঘন্টায়।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবে একথা লেখা আছে যে, আলো, দিন এবং রাত সৃষ্টি জগতের প্রথম দিনে তৈরি করেছেন।

আল্লাহ সবার আগে জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন বিরান ও শূন্য ছিল, তার উপরে অন্ধকার ছিল এবং আল্লাহর রূহ পানির ওপর ছিল এবং আল্লাহ বললেন, আলো হয়ে যাও এবং আলো হয়ে যায় এবং আল্লাহ দেখলেন আলো সুন্দর হয়েছে এবং আল্লাহ আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন, আল্লাহ আলোকে দিন ও অন্ধকারকে রাত করলেন, সন্ধ্যা হলো এবং ভোর হলো এরূপে প্রথম দিন শুরু হলো।

আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা বলে যে, সৃষ্টি জগতের ঘূর্ণনের যে আলো যা তারকাগুলোর মধ্যে এক প্রকারের পেচানো প্রকারের আলোকের কারণে ছিল। যেহেতু বাইবেল বলে যে, সূর্য, চাঁদ এবং তারকাগুলোর জন্ম চতুর্থ দিনে হয়।

আল্লাহ দুটি বড় বড় আলোদানকারী সৃষ্টি করেন। এক হলো বড় যে দিনের ওপর হুকুম চালায়, অন্য হলো ছোট যে রাতের ওপর হুকুম চালায় এবং তিনি তারকাগুলোকে সৃষ্টি করেন এবং এদের আসমানের ওপর রাখেন, যাতে এগুলো জমিনের ওপর আলো ফেলতে পারে। রাত ও দিনের ওপর হুকুম চালায় এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে এবং আল্লাহ দেখলেন যে সুন্দর সকাল শুরু হলো এবং সন্ধ্যা হলো, ভোর হলো এভাবে চতুর্থ দিন হলো।

এটা যুক্তি বিরোধী যে, আলো দানকারী সূর্য তিন দিন পর সৃষ্টি হলো এবং দিন রাতের ধারাবাহিকতা যা সূর্যের আলোর কারণে হয়, প্রথমে দিন সৃষ্টি করলেন আরো এই যে, দিনের অঙ্গ অর্থাৎ ভোর ও সন্ধ্যার ধারাবাহিকতা সূর্যের পূর্বে জমিনের ঘূর্ণনের পরে সম্ভব, কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য অনুযায়ী সূর্যের সৃষ্টির তিন দিন পূর্বে ভোর ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

অপরদিকে আল-কুরআনে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির মধ্যে কোনো অবৈজ্ঞানিক কালের বিন্যাসের বর্ণনা নেই। এজন্য একথা বলা হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ এ বিষয়ে বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন, বরং এ ধরনের অযৌক্তিক, আশ্চর্য ও দূর সম্পর্কের বক্তব্য প্রদান করা সম্পূর্ণ ভুল ও হাস্যকর। বাইবেল একথা বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে আলো বের করে, যেমন সৃষ্টি কিতাবের পরের বরাতে একথা প্রমাণিত এবং সেখানে বড় আলো দানকারী ও ছোট আলো দানকারী হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সে শুধু সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। একথা আল কুরআনে সত্য বলে প্রমাণ করে।

যে চাঁদ مُنِيْرٌ (মুনীর) অর্থ আলোকে প্রতিবিম্বকারী এবং সে যে আলো দেয় তা প্রতিবিম্ব দ্বারা আসে। এটা বুঝা তো অনেক দূরের কথা যে, মুহাম্মদ ﷺ বাইবেলের এ বিজ্ঞানের ভুলকে সংশোধন করে কুরআনের ইবারতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের ১ অধ্যায়ের ১১ থেকে ১৩ নং শ্লোকে রয়েছে যে, সবজি, খবীস, বীজ বহনকারী গাছ এবং ফলদায়ক বৃক্ষ তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐ অধ্যায়ে ১৪ থেকে ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সূর্যকে চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী এটা কীভাবে সম্ভব যে, সূর্যের উত্তাপ ব্যতীত গাছপালা জন্ম লাভ করল? বাইবেলে যেভাবে বলা হয়েছে। অভিযোগ উত্থাপনকারী অমুসলিমদের কথা অনুযায়ী যদি মুহাম্মদ ﷺ বাস্তবে কুরআনের লেখক হতেন এবং তিনি যদি বাইবেল থেকে কিছু বিষয় নকল করতেন তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, তিনি অবৈজ্ঞানিক অংশ বাদ দিলেন? এবং কুরআনে এমন কোনো কথাই নেই যা বিজ্ঞানের সত্য বিরোধী। বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈসা (আ) থেকে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত যেসব এ জমিনের প্রথম মানব আদম (আ) পর্যন্ত বর্ণনাকৃত বংশধারা অনুযায়ী আদম (আ) আজ থেকে ৫৮০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর এবং ইবরাহীম (আ) এর মাঝে ১৯৪৮ বছরের পার্থক্য।

ইবরাহীম এবং ঈসা (আ) এর মাঝে প্রায় ১৮০০ বছরের ব্যবধান এবং ঈসা (আ) থেকে আজ পর্যন্ত ২০০০ বছরের ব্যবধান। এ সময়ের রাজ ইহুদি ক্যালেন্ডারও প্রায় ৫৮০০ বছরের পুরাতন যার শুরু সৃষ্টির শুরু থেকে। পুরাতন চিহ্ন এবং Anthropology-এর ভিত্তির ওপর বলা হয় যে, প্রথম মানব যখন পৃথিবীতে পা রাখেন তিনি আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছিলেন। আল কুরআন মোতাবেকও যিনি পৃথিবীতে প্রথম পা রাখেন আদম (আ)-ও (তখন এসেছিলেন) কিন্তু বাইবেলের বিপরীত এতে কোনো তারিখ বর্ণনা করা হয় নি এবং একথা বর্ণনা করে না যে, তিনি পৃথিবীতে কত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ছিলেন। বাইবেলের বর্ণিত বিষয়াবলি বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের ৬, ৭ ও ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, নূহ (আ)-এর প্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল যা জমিনে থাকা সকল জীবন্ত জিনিসকে শেষ করে দিয়েছিল, তারা ব্যতীত যারা নূহ (আ)-এর কিশতিতে বা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। তা মানুষ বা প্রাণী যাই হোক না কেন পা বিশিষ্ট প্রাণী বা পা বিশিষ্ট পাখি, সব খতম হয়ে গিয়েছিল, শুধু নূহ (আ)-এর আরোহীরা জীবিত থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মোতাবেক এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ ঘটনা আদম (আ)-এর জন্মের ১৬৫৬ সাল পরে অথবা ইবরাহীম (আ)-এর জন্মের ২৯২ বছর পূর্বে যখন নূহ (আ)-এর বয়স

২০০ বছর ছিল। অর্থাৎ এ প্লাবন ঈসা (আ)-এর ২১ অথবা ২২ শতক পূর্বে হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণিত ঘটনা অতীত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের বিপরীত। যাতে এ কথা প্রমাণিত যে, এ সকল শতকে মিশরের ১১তম রাজবংশ ও ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ, কোনোরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চলছিল। এ ধরনের প্লাবন সেখানে হয় নি। বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী প্লাবনের তথ্যের বিপরীতে কুরআনে নূহ (আ)-এর প্লাবনের ব্যাপারে যে ঘটনা বলা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রত্নতত্ত্বের বিপরীত নয়।

১. আল কুরআন এ ঘটনার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা বছর উল্লেখ করে নি।

২. আল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল না। যার দরুন সকল প্রকারের প্রাণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য একথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, এ প্লাবনের ঘটনা মুহাম্মদ ﷺ বাইবেল থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ঘটনাকে কুরআনে বর্ণনা করার সময় ভুলগুলোও সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

আল কুরআন এবং বাইবেলে মূসা (আ) এবং ফিরাউনের যে ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমের সাথে দ্বিতীয়টির বহু মিল রয়েছে। উভয় কিতাবের এ কথা পর্যন্ত মিল রয়েছে যে, ফিরআউন মূসা (আ)-এর পেছনে অনুসরণে করে এবং মূসা (আ) এরপর রাস্তা পার হবার চেষ্টা করার সময় ডুবে যায় এবং মূসা (আ) বনী ইসরাঈল লোকদের সাথে পার হয়ে যান। আল-কুরআনের ১০ নং সূরা ইউনূসের ৯২ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۔

অর্থ : আজ আমি শুধু তোমার লাশকেই বাঁচিয়ে রাখবো যাতে তুমি (লাশ) তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকতে পারো।

ড. মরিস বুকাইলির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণের পর একথা প্রমাণ করেছেন যে, ফিরআউন দ্বিতীয় রামসীস এজন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, সে বাইবেল অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম করেছে, কিন্তু মূলত সে ঐ সময় খতম হয়ে যায় যখন মূসা (আ) মাদইয়ানে আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় রামসীসের পুত্র মুনফাতাহের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সে ইহুদিদের মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বাহীরা কলযমে ডুবে যায়। ১৮৯৮ খ্রি. মিসরের ওয়াদী মুলুকে মুনফাতাহের লাশের প্রদর্শনী হয়। ১৯৭৫ সালে ডা. মরিস বুকাইলি সকল বিজ্ঞবানদের সঙ্গে মিলে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এর যে ফলাফল তিনি লাভ করেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনফাতাহ ডোবা অথবা কঠিন আঘাতে মৃত্যুবরণ করে, যা তার ওপরে মৃত্যুর কিছু আগে ঘটে। এজন্য এটা কুরআনের আয়াতের অনেক বড় অবদান যে, 'আমি শিক্ষার

জন্য তার লাশকে রক্ষা করব।' ফিরআউনের লাশ পাওয়ায় প্রমাণিত হয়, যে লাশ আজ মিসরের জাদুঘর কায়রোতে আছে। এ কুরআনের আয়াত ড. মরিস বুকাইলিকে, যিনি তখন খ্রিস্টান ছিলেন, কুরআন অধ্যয়ন করতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে তিনি 'বাইবেল, কুরআন বিজ্ঞান' এ শিরোনামে কিতাব লেখেন এবং এ কথাকে স্বীকার করেন যে, কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কিতাব নয়। ড. বুকাইলি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল দলিল এ কথাকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয় নি। বরং কুরআন তো 'ফুরকান' অর্থাৎ এ দাঁড়িপাল্লা যা দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। এ দ্বারা এ উপকারিতা অর্জন করা যাবে যে, বাইবেলে কোনো কোন অংশ আল্লাহর বাণী তা চিহ্নিত করা যাবে। কুরআন স্বয়ং একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ৩২ নং সূরা সাজদা ১ থেকে ৩ নং আয়াতে–

الٓمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ۔ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۔

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকেই এই কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ কিতাব সে ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে? (না) বরং এ হচ্ছে তোমার প্রভুর নিকট থেকে সত্য (অবতারিত) যাতে এর দ্বারা তুমি এক জাতিকে ভীতি প্রদর্শন কর যাদের প্রতি তোমার পূর্বে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নি। আশা করা যায় তারা হেদায়েত লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন-২৫. কুরআন আল্লাহর কালাম নয় বরং এটা শয়তানের কাজের বিবরণ।

উত্তর : গোঁড়া প্রকৃতির পশ্চিমা লেখক ও পাদরী এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ দেয়। এ ধরনের অভিযোগ মক্কার কাফিররাও দিত যে, মুহাম্মদ ﷺ শয়তানের পক্ষ থেকে ইলহাম পায়। এ ব্যপারে সহীহ্ বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ের সূরা আদদুহা-এর হাদীস নং ৪৯৫০ জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত–

একবার মুহাম্মদ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন এ জন্য তিনি দু:তিন রাত কিয়াম (সালাতে তাহাজ্জুদ) আদায় করেন নি। এ সময়ে এক মহিলা এসে রাসূল ﷺ কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছে।

আমি দু'তিন রাত তাকে তোমার কাছে আসতে দেখি না।' এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন–

وَالضُّحٰى ـ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ـ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাতের কসম যখন তা ছেয়ে যায়, আপনার প্রভু আপনাকে ছেড়েও যান নি, আপনার ওপর অসন্তুষ্টও হন নি।

এরপরে ৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নং ৭৭ থেকে ৮০ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। মহান রব ইরশাদ করেন–

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ـ لَّايَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : অবশ্যই কুরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি সযত্ন রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত, পূত পবিত্র ব্যতিরেকে কেউ তা স্পর্শ করে না। সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত।

'কিতাব মাকনুন' এমন কিতাব যা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এবং এ দ্বারা আসমানের ওপর 'লাওহে মাহফুজ'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর ওপর পবিত্রগণ ছাড়া কেউ হাত লাগায় না। এর অর্থ সকল প্রকার নাপাকি এমনকি বদ জ্বীনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শয়তান কুরআনকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি তার কাছেও আসতে পারে না। এতে এ প্রশ্নই ওঠে না যে, সে কুরআনের আয়াত লিখেছে। ২৬ নং সূরা শোয়ারার ২১০ থেকে ২১২ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ـ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ـ

অর্থ : এ কুরআন কোনো শয়তান নাযিল করে নি। ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন ক্ষমতা রাখে, তাদের তা শোনারও অধিকার নেই।

বহুলোক শয়তানের ব্যাপারে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। তাদের ধারণায় শয়তান সকল কাজ করে শুধু আল্লাহর জিম্মায় যে কাজ থাকে তা ছাড়া, তাদের ধারণায় স্বাধীনতা ও ক্ষমতায় শয়তান আল্লাহর থেকে কম নয়। এ লোকেরা একথা মানতে রাজি নয় যে, আল কুরআন মুজিযা এবং রূহানি এ কারণে তারা বলে যে এটা শয়তানের কাজ। আপনি চিন্তা করুন, যদি শয়তান কুরআন লিখত তা হলে এর মধ্যে ১২ নং সূরা নাহলের ৯৮ নং আয়াতে এর উল্লেখ থাকতো না–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থ : অতঃপর তোমরা যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

আপনার এরূপ ধারণা যে, শয়তান এটা লিখেছে? সে কি একথা বলেছে যে, আমার কিতাব পড়ার পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ডাকো যাতে তিনি তোমাকে আমার থেকে আশ্রয় দান করেনএবং এই কুরআনের এমন কোনো আয়াত থাকবে যাতে প্রমাণ থাকবে যে, এ কিতাব শয়তানের নয়। ৭ নং সূরা আরাফের ২০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মহান রব ইরশাদ করেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : কখনো যদি শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

শয়তান নিজ অনুসারীদের কীভাবে বলে যে, যখন তাদের মগজে কোনো কুমন্ত্রণা আসে, তখন সে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পানাহ চাইবে, যে তার প্রকাশ্য দুশমন।

৩৬ নং সূরা ইয়াসীনের ৬০ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থ : হে আদম সন্তান আমি কি বলি নি তোমরা শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

শয়তান মেধাবী এ কারণে এটা কোনো হয়রানির কথা নয় যে, সে কিছু লোকের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, শয়তান কুরআন লিখেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিঃশর্ত শক্তির মোকাবিলায় শয়তানের কোনো সাহস নেই এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী। তিনি শয়তানকে অপছন্দ করেন, এজন্য তিনি কুরআন অধ্যয়ন করার সময় এমন ভূমিকা রাখতে বলেছেন যাতে প্রমাণ হয় যে, এটা কুরআন আল্লাহর কালাম এবং কখনো শয়তানের লিখিত নয়। ইঞ্জিল এর মিরাকস এ আছে–

যদি কোনো রাজত্বে ফুট (সমস্যা) পড়ে তাহলে তা কায়েম থাকবে না, যদি কোনো ঘরে ফুট পড়ে তাহলে সে ঘরও টিকে থাকবে না। যদি শয়তান নিজের বিরোধিতায় ফুট নিয়ে নেয় তাহলে সেও কায়েম থাকবে না বরং সে শেষ হয়ে যাবে।

এ কারণে এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, শয়তান নিজের বিপরীতে এমন কিতাব লিখবে যা নিজের মূল কেটে দেবে এ কারণে কুরআনের ব্যাপারে মক্কার কাফির, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মূলের বিরোধী।

প্রশ্ন-২৬. কুরআনের কয়েক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। আবার এর সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। আসলে তিনি কি ক্ষমাশীল নাকি শাস্তিদাতা?

উত্তর ঃ আল কুরআনের কোনো অবস্থায় একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ খুবই দয়াশীল। আল কুরআনের ৯ নং সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরা এ সুন্দর বাণী- পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসা'র ২৫ নং আয়াতে ৫ নং সূরা মায়িদা'র ৭৪ নং আয়াতে এবং আরো বহু স্থানে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। - বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এর সাথে তিনি অনেক কঠোরও। যে লোক শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তিও দেন। আল কুরআনে কয়েক স্থানে স্বঅবস্থায় আল্লাহ এটাও বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বেদ্বীন ও কাফিরদের কঠিন শাস্তি দিবেন। তিনি তাদের শাস্তি দিবেন যারা তাঁর নাফরমানি করবে। কয়েকটি আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির কথা বর্ণিত আছে যা দোযখে নাফরমানদের দেয়া হবে।

৪ নং সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ـ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের অচিরেই আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, অতঃপর যখন পুড়ে চামড়া গলে যাবে, তখনই আমি তার বদলে নতুন চামড়া গজিয়ে দিব, যাতে তারা আযাব ভোগ করতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মহান পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কৌশলী।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল নাকি শাস্তি দানকারী? এ বিষয়ের ওপর মনোযোগ জরুরি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমাশীল, দয়াময় সাথে সাথে শাস্তির যোগ্য, খারাপ আমলকারী এবং খারাপ লোকদের জন্য কঠিন শাস্তিও দিবেন তিনি ন্যায়বিচারক। ৪ নং সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এক অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না।

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۔ وَكَفَى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۔

অর্থ : কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম জুলুম করা হবে না। যদি সামান্য সরিষা দানা পরিমাণ আমলও থাকে আমি এনে হাজির করব। হিসাব নেবার জন্য আমিই যথেষ্ট।

কোনো শিক্ষক কি ঐ ছাত্রকে ছেড়ে দেবেন যে পরীক্ষায় নকল করে? কোনো ছাত্রকে যদি পরীক্ষায় নকল করা অবস্থায় পায় এবং পরীক্ষক হাতে হাতে ধরে ফেলেন তাহলে কি শিক্ষক একথা বলেন যে, সে বড়ই দয়ার যোগ্য এবং পুনরায় তাকে নকল করার অনুমতি দিয়ে দেয়? যদি এরূপ করে তাহলে তাকে পরিশ্রমী ছাত্ররা (শিক্ষককে) রহমদীল ও দয়াময় বলবে না বরং অবিচারক বলবে। শিক্ষকের এমন কাজ অন্য ছাত্রদেরও নকল করার প্রতি উৎসাহিত করবে। যদি শিক্ষকগণ এরূপ করেন এবং দয়াশীল হোন এবং ছাত্রদের নকলে অনুমতি দান করে তাহলে কোনো ছাত্রই পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করবে না এবং তারা নকল করে পরীক্ষায় উন্নতমানে পাস করবে। দৃশ্যত সকল ছাত্রই এ গ্রেডে বিশেষ মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং কর্মজীবনে ব্যর্থ হয়ে যাবে আর পরীক্ষার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৬৭ নং সূরা মূলক-এর ২ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۔

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে আমলের দিক দিয়ে উত্তম হতে পারে?

যদি আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে ক্ষমা করে দেন এবং কাউকে শাস্তি না দেন, তাহলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য কীভাবে করবে? আমি একথা মানি যে, এ অবস্থায় কোনো লোক জাহান্নামে যাবে না, তবে এর ফলে অবশ্যই পৃথিবীটা জাহান্নামে পরিণত হবে। যদি একথা প্রচার হয়ে যায় যে, সব মানুষই জান্নাতে যাবে, তাহলে মানুষের এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য আর কী থাকলো? এ অবস্থায় দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জন্য আর পরীক্ষাগার হিসেবে থাকলো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু তওবাকারীকেই ক্ষমা করবেন না, বরং তাকে ক্ষমা করবেন যে নিজ কর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়েছে এবং তওবা করেছে। ৩৯ নং সূরা যুমার-এর ৫৩ থেকে ৫৫ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ ـ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থ : বলুন! হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, আল্লাহর তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অতএব, তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আযাব আসার পূর্বেই। (কেননা আযাব এসে গেলে) অতঃপর তোমাদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না। তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিত আযাব নাযিল হবার পূর্বেই তোমাদের মালিকের নাযিলকৃত গ্রন্থের অনুসরণ কর।

অনুতপ্ত হওয়ার ও তওবার শর্ত চারটি। তাহলো–

১. এ কথার ওপর একমত হওয়া যে, একটি খারাপ কাজ করে ফেলেছে।
২. এ কাজ থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসা।
৩. পরবর্তীতে কখনো এ পাপ না করা।
৪. যদি এ কাজের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। (এভাবে তওবা করলে কঠিন অপরাধীকেও আল্লাহ মাফ করে দেন।)

প্রশ্ন-২৭. আল কুরআনে বলা হয়েছে মায়ের গর্ভে যে বাচ্চা তার সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানতে পারেন। কিন্তু আজ বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং আমরা সহজেই আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে বাচ্চার ছেলে-মেয়ে হওয়া সম্পর্কে জেনে ফেলছি। কুরআনের আয়াত কি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়?

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও খবর রাখেন। তিনি কিছু বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন কিন্তু সকল দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কেবল তাঁরই। কিছু লোক এটা বুঝেছেন যে, আল কুরআন এ দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলাই শুধু মায়ের উদরে যে সন্তান আছে তার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে জানেন। আল কুরআনের ৩১ নং সূরা লুকমানের ৩৪ নং

আয়াতে বলা হয়েছে−

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ . وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ . وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের আগমন জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন যা গর্ভাশয়ে বিদ্যমান আছে। কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামিকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু জানেন।

আজ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মায়ের উদরের সন্তানের লিঙ্গ (নারী-পুরুষ) সম্পর্কে সহজে নির্ধারণ করা যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অনুবাদের মধ্যে একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভে অবস্থিত বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু আপনি এ আয়াতের আরবি মতন (মূল) বিশ্লেষণ করে দেখতে পাবেন যে, ইংরেজি শব্দ Sex-এর কোনো আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। মূলত কুরআনে যা বলেছে তাহলো গর্ভে যা আছে তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তাআলারই আছে। অনেক তাফসীরকারকদের ভুল হয়েছে, তারা এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভের বাচ্চার Sex সম্পর্কে জানেন। একথা ঠিক নয়, এখানে লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয় নি। বরং ইঙ্গিত এ দিকে যে, মাতৃজঠরের বাচ্চার প্রকৃতি কী হবে। সে কি স্বীয় পিতা-মাতার জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হবে নাকি দুর্ভাগ্যের। সে কি সমাজের জন্য করুণার কারণ হবে নাকি শাস্তির। সে কি সৎ হবে নাকি অসৎ, সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে। এ সকল বক্তব্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই। দুনিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এ পর্যায়ে উন্নতি হয়নি যার দ্বারা এ সকল প্রশ্নোত্তর বা সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন-২৮. কুরআনে আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কুরআনের এ সকল বক্তব্য কি পরস্পর বিরোধীর দিকে ইঙ্গিত করে না?

উত্তর : কুরআনের ৩২ নং সূরা সাজদা, ২২ নং সূরা হাজ্জে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট যে দিন তা আমাদের হিসাবে এক হাজার বছরের সমান। যেমন ৩২ নং সূরা সাজদার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে−

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ

অর্থ : আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সব কিছুকে তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুকে তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যাবেন একদিন যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে, একদিন তোমাদের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ৭০ নং সূরা মায়ারেজ-এর ৪ নং আয়াতে–

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ـ

অর্থ : ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করবে এমন একদিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

এ সকল আয়াতের সাধারণ অর্থ এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সময়ের পরিমাণ জমিনের মতো নয়, এর দৃষ্টান্ত জমিনের এক হাজার অথবা পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা দিয়েছেন। অন্য কথায় আল্লাহ তাআলার নিকট যে একদিন তা জমিনের হাজার হাজার দিন অথবা তার চেয়েও অধিক হতে পারে। এ সকল আয়াতে আরবি يَوْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ একদিন এবং এ ছাড়াও দীর্ঘ সময়, এ ছাড়াও যুগও হয়। যদি يَوْمٌ -এর অর্থ যুগ বা Period করেন তাহলে এর দ্বারা কোনো সন্দেহ জাগবে না। ২২ নং সূরা হাজ্জের ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ـ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ

অর্থ : এরা তোমার নিকট আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে, আল্লাহ কখনো তার ওয়াদার খেলাপ করেন না, তোমার প্রভুর নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

যখন কাফিররা বলতে থাকল যে, আযাব কেন বিলম্ব হচ্ছে? এবং তা কেন শীঘ্রই আসছে না? তখন কুরআন জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপারে ব্যর্থ নন। তোমাদের নিকট সময়ের যে ব্যাপ্তি এক হাজার বছরের, তা আল্লাহর নিকট মাত্র এক দিনের। সূরা সাজদায় বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সবকিছু পৌঁছাতে আমাদের হিসেবে এক হাজার বছরের সময় লাগে। সূরা মায়ারিজের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় ফেরেশ্তা রূহুল কুদস এবং সকল

রূহের আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছাতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় লাগে। এটা আবশ্যক নয় যে, দু'ধরনের কাজের ব্যবস্থা করতে এক রকম সময় লাগবে। যেমন আমরা এক স্থানে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে, আবার অন্যত্র যেতে পঞ্চাশ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এ দ্বারা কখনো একথা বুঝায় না যে, আমি বিপরীতমুখী কথা বলছি। এভাবে আল কুরআনের আয়াতগুলো একে অপরের বিপরীত নয় বরং এটা বিজ্ঞানের মূলের সাথে মিল রাখে।

প্রশ্ন-২৯. কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে মানুষকে বীর্য (نُطْفَةٌ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করবেন যে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে করীমে মানুষকে তুচ্ছ শুরুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং একে একথা বলা হয়েছে যে, সে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্ট। একথা বহু আয়াতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭৫ নং সূরা কিয়ামাহর ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى

অর্থ : সে কি এক ফোঁটা স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

কুরআনের বহু স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ২২ নং সূরা হাজ্জ এর ৫ নং আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ .

অর্থ : হে মানুষ, পুনর্জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

আজকের এ সময়ে আমরা জানি যে, মানব দেহের উপাদান যার মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে সবই কম-বেশি কিছু পরিমাণ মাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। এ কারণে এ কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত আছে যাতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল কুরআনের কিছু আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে বীর্যের ফোঁটা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অপর আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছে। তো এ উভয় কথার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্য তাকে বলে যা পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ এক সময়ে দুটি সত্য হতে পারে না। এমন কিছু স্থানে কুরআনে মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়েছে। যেমন ২৫ নং সূরা ফুরকানের ৫৪ নং আয়াতে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا ـ

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান এ তিন কথারই সত্যায়ন করে। মানুষকে বীর্য, মাটি ও পানি এ তিন জিনিস দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। ধরুন, আমি বললাম, এক কাপ চা তৈরি করতে পানি ব্যবহৃত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও চায়ের পাতা এবং দুধ অথবা পাউডারও চাই। এ দুই বক্তব্য বিপরীত নয়। কারণ চা তৈরির জন্য পানি এবং চায়ের পাতি দুই-ই প্রয়োজন। এর অতিরিক্ত যদি আমি মিষ্টি চা বানাতে চাই তাহলে চিনিও লাগবে। এজন্য কুরআন যখন বলে মানুষকে ধাতু, মাটি অথবা পানি থেকে বানানো হয়েছে, তো এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই বরং তিন কথার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য চালু আছে। Contradistinction বা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এক বিষয়ের ওপর এমন দু'ধারণার বিষয়ে কথা বলা যা পরস্পর বিপরীত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি বলি মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলে এবং এর স্বভাব মিথ্যার। তবে এটা বিপরীত বক্তব্য হবে। তবে যদি বলি মানুষ দ্বীনদার, দয়ালু এবং ভালোবাসাসম্পন্ন, তাহলে এর দুই বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা হবে।

প্রশ্ন-৩০. কুরআনে কয়েক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, জমিন এবং আসমান ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সূরা ফুসসিলাত বা হামীম আস সিজদায় বলা হয়েছে জমিন এবং আসমান ৮ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কি কুরআনের বৈপরিত্য নয়? এ আয়াতে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জমিন ছয় দিনে তৈরি হয়েছে পুনরায় আসমান দু'দিনে তৈরি করা হয়েছে। এরূপ বলা Big Bang-এর বিপরীত। যার কথা হলো আসমান জমিন এক সময়ে অস্তিত্বে এসেছিল।

উত্তর : আমি একথার সাথে একমত যে, আল কুরআনের বর্ণনানুযায়ী আসমান এবং জমিন ছয় দিনে দ্বিতীয় কথায় ছয় চক্করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উল্লেখ আল-কুরআনের নিচের আয়াতগুলোতে এসেছে–

৭ নং সূরা আরাফ, ৫৪ নং আয়াত

১০ নং সূরা ইউনুস, ৩ নং আয়াত

১১ নং সূরা হুদ,৭ নং আয়াত

২৫ নং সূরা ফুরকান, ৫৯ নং আয়াত

৩২ নং সূরা সাজদা, ৪ নং আয়াত

৫০ নং সূরা ক্বফ, ৩৮ নং আয়াত

৫৭ নং সূরা হাদীদ, ৪ নং আয়াত

কুরআনের ঐ আয়াতগুলো যেগুলোর ব্যাপারে আপনার ধারণা হলো যে, আসমান ও জমিন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো সূরা ফুসসিলাত বা হামীম আস সাজদা, যার সূরা নং ৪১, আয়াত নং ৯ থেকে ১২ তে বলা হয়েছে–

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ـ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ـ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ـ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ـ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ـ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ـ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ـ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

অর্থ : বলুন! তোমরা কি তাকে অস্বীকার করতে চাও, যিনি দু'দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা অন্য কাউকে কি তারই সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাও? অথচ ইনিই সারা সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনিই এ জমিনের মাঝে ওপর থেকে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন চার দিন সময়ের ভেতর। অনুসন্ধানীদের জন্য সবই সমান।

অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ। এরপর তিনি তাকে ও জমিনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, তারা উভয়েই বলল, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি।

অতঃপর তিনি দুই দিনের ভেতর এ (সেই ধূম্রকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার আদেশনামা পাঠালেন। পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (জ্বীন ও শয়তান থেকে) সুরক্ষিত করলাম। এসকলই পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ মহা-মহিমের নির্ধারণ।

আল কুরআনের এ আয়াতগুলো প্রকাশ্যে এটাই বলে যে, আসমান-জমিন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ আয়াতগুলোর শুরুতে বর্ণনা করেন যে, ঐ লোক এ সকল বাক্যের অংশের বর্ণনাকৃত তথ্যের এবং সত্যতার

ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য ভুল অনুমান পেশ করে, আসলে সে কুফরী প্রচারের ইচ্ছে রাখে এবং আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে।

আল্লাহ তাআলা এর সাথে আমাদের এটাও বর্ণনা করেন যে, কিছু কাফির এমনও আছে যে, এই প্রকাশ্য বৈপরীত্যের ভুল অনুমান পেশ করবে। যদি আপনি মনোযোগ ও সুবিবেচনার সাথে এ আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার হবে যে, এখানে জমিন এবং আসমানের দুই পৃথক সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড় ব্যতীত জমিনকে দুই দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং চার দিনে পাহাড়গুলোকে জমিনের ওপর শক্ত করে স্থাপন করা হয়েছে এবং জমিনে বরকত রাখা হয়েছে এবং একে লেপন করা ও এতে রিযক দেয়া হয়েছে। এজন্য ৯ এবং ১০ নং আয়াত অনুযায়ী পাহাড়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ ও ১২ নং আয়াতে আছে যে, অতিরিক্ত দিনগুলোতে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ নং আয়াতের শুরুতে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য 'আবার' অথবা উহা ব্যতীত। কুরআনের কিছু তরজমায় এর উদ্দেশ্যে 'অতঃপর' লেখা হয়েছে এবং এরপর 'ব্যতীত' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যদি এর অনুবাদ ভুল অনুমানে ফেরানো হয় তাহলে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে সব মিলে আট দিন গণ্য হবে এবং একথা কুরআনের দ্বিতীয় আয়াতের বিপরীত হবে। যাতে বলা হয়েছে যে, আসমান জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও এ আয়াত ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতেরও বিপরীত হবে। যাতে এটা বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমানকে এক সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে এ আয়াতে ثُمَّ শব্দটি সঠিক তরজমা 'এটা ব্যতীত' অথবা এর সাথে সাথে হবে। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী সঠিক অনুবাদ 'Moreover' করেছেন, যাতে এটা পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট হয় যে, যে সময়ে পাহাড় ও জমিন ইত্যাদি সমেত ছয় দিনে জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে একই সময়ে এর সঙ্গে দুদিনে আসমানগুলোকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সকল কিছুর সৃষ্টি আট নয় ছয় দিনে হবে। ধরুন, একজন রাজমিস্ত্রি বললেন যে, দশ তলা বিল্ডিং এবং তার চার দেওয়াল ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবে এবং এর সমাপ্তির পরে এর অতিরিক্ত তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলল, বিল্ডিং এর মূল কাঠামো দু'মাসের মধ্যে হয়েছে এবং দশ তলার গঠন চার মাসে হয়েছে এবং যখন কাঠামো ও মূল বিল্ডিং এক সাথে সমাপ্ত করল সেই সাথে বিল্ডিং এর চার দেয়ালের কাজও শেষ করেছে যা দু মাসের দৈর্ঘ্য সময় লেগেছে। এ কথার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। বরং দ্বিতীয় বর্ণনায় বিল্ডিং এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে । আল কুরআনের কয়েক স্থানে সৃষ্টিকুলের পয়দার উল্লেখ রয়েছে। কোথাও سَمٰوٰتٌ ও اَلْاَرْضِ বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে اَلْاَرْضُ ও

سَمٰوٰتٌ শব্দাবলিও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ২১ নং সূরা আম্বিয়ায় ৩০ নং আয়াতে Big Bang-এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে এক সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : এ কাফিররা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমিন (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, আমি প্রাণবন্ত সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এসব জানার পরও কি তারা ঈমান আনবে না?

২ নং সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ ـ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তিনি সেই মহান সত্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন। সাথে সাথে তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সাত আসমান তৈরির কাজকে সুষম করলেন। তিনি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত।

এ আয়াতে ثُمَّ -এর অনুবাদ 'অতঃপর' করি, তাহলে এ আয়াত আল কুরআনে অন্য কিছু আয়াতের এবং Big Bang এর বিপরীত হয়ে যায়, এজন্যই ثُمَّ-এর সঠিক তরজমা 'সাথে সাথে' অথবা 'একই সাথে' করতে হবে।

প্রশ্ন-৩১। আল কুরআনে একটি আয়াত রয়েছে যাতে একথা এসেছে যে, আল্লাহ দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব-এর মালিক। আপনি এ কুরআনের আয়াতের কী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করবেন?

উত্তর : আল কুরআনে এটা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। কুরআনের ৫৫ নং সূরা আর রহমানের ১৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ـ

অর্থ : দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। আরবিতে مَشْرِقٌ এবং مَغْرِبٌ শব্দদ্বয়ের দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। ভূগোল ও বিজ্ঞান থেকে আমরা এ

তথ্য জানতে পারি যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। কিন্তু এর উদয়স্থল সারা বছর পরিবর্তন হতে থাকে। বছরে দুবার ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর যা (বসন্ত ও শরতের মাঝে) এর নামে প্রসিদ্ধ এবং তারিখও আছে যখন সূর্য সম্পূর্ণ পূর্ব দিক থেকে উদয় হয় অর্থাৎ মধ্য ক্রান্তির ওপর ভ্রমণ করে। বাকি দিনগুলোতে সম্পর্ণ পূর্ব থেকে কিছুটা উত্তর বা দক্ষিণ দিকে থেকে উদয় হয়।

গ্রীষ্মের মওসুমে ২২ জুন সূর্য পূর্বের এক প্রান্ত থেকে কর্কটক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে বের হয়। শীত মওসুমেও একদিন ২২ ডিসেম্বর পূর্বের দ্বিতীয় প্রান্ত মকরক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে বের হয়। এভাবে সূর্য গ্রীষ্মে ২২ জুন এবং শীতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমের দুভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। প্রকৃতির এ দৃশ্য কোনো শহরের লোক সহজে দেখতে পারে অথবা কেউ উঁচু বিল্ডিং থেকে উদয় ও অস্তের এ দৃশ্য দেখে থাকে।

আপনি দেখবেন যে, সূর্য গরমে ২২ জুন পূর্বের এক প্রান্ত থেকে বের হয় এবং ঠাণ্ডায় ২২ ডিসেম্বর অন্য প্রান্ত থেকে বের হয়। সংক্ষেপে এই যে, সূর্য সারা বছর পূর্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে অস্তমিত হতে থাকে। এজন্য আল কুরআনে যখন আল্লাহ তাআলার উল্লেখ দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব হিসেবে করে তখন তার এ উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ব-পশ্চিমের দুই প্রান্তের সংরক্ষক ও মালিক। আরবিতে বহুবচনের দুটি সীগাহ (শব্দ ও ওযন) এক হলো তাসনিয়ার জমা অর্থাৎ দুই এর জন্য। দ্বিতীয় হলো দু'এর অধিক এর জন্য। সূরা আর রহমানের ১৭ নং আয়াতে مَشْرِقَيْنِ এবং مَغْرِبَيْنِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বি-বহুবচনের শব্দ। এর উদ্দেশ্য দুই মাগরিব ও দুই মাশরিক। ৭০ নং সূরা মায়ারিজের ৪০ নং আয়াতে আয়াতে আছে–

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۔

অর্থ : কখনোই নয়। আমি উদয়াচল ও অস্থাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

এ আয়াতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য مَشَارِقٌ ও مَغَارِبٌ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুয়ের অধিক প্রকাশ করছে। এ থেকে আমরা এ ফলাফল বের করতে চাই যে, আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার উল্লেখ সকল পূর্ব-পশ্চিমের স্থানগুলোর প্রতিপালক (رَبٌّ) ও মালিক হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব-পশ্চিমের দুই শেষ প্রান্তেরও মালিক এবং রব।

প্রশ্ন-৩২. ইসলামে কি কাঠিন্য, খুন. খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়? আল কুরআন মুসলমানদের বলে যে, যেখানে কাফিরদের পাও হত্যা কর।

উত্তর : কুরআনের কিছু বিশেষ আয়াত যা ভুল আন্দাজে এজন্য বরাত দেয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয় যে, এর দ্বারা এমন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগকে সাহায্য করে এবং নিজ অনুসারীদের বলে যে, ইসলামের বাইরের লোকদের হত্যা কর। এ ধারাবাহিকতায় সমালোচকরা ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের বরাত দেয়, যাতে এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ, খুন-খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ـ

অর্থ : তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।

মূলত ইসলামের ওপর দোষারোপ করার এ আয়াতের বরাত আসল এবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আয়াতের মূল বিষয় বুঝার জন্য আবশ্যক হলো সূরার অধ্যয়ন প্রথম আয়াত থেকে করা। এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে যে নিরাপত্তা চুক্তি ছিল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এ চুক্তি শেষ করার জন্য আরবে শিরক এবং মুশরিকদের অস্তিত্ব কার্যত আইন বিরুদ্ধ এ স্বীকৃতি লাভ করে। কেননা রাজ্যের অধিকাংশের ওপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য এছাড়া আর কোনো পথ ছিল না যে, হয়তো লড়বে নয়তো রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। এ দ্বারা ইসলামের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা শক্ত ও মজবুত করার প্রয়োজন ছিল। মুশরিকদের নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চার মাসের জন্য সময় দেয়া হয়েছিল।

৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে রয়েছে–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ـ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : অতঃপর যখন নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই তোমরা হত্যা করবে। তাদের বন্দি করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের ধরার জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, তবে এরা যদি তওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও বড় দয়াময়।

আমার জানা আছে যে, এক সময় আমেরিকা ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। ধরুন! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা আমেরিকার জেনারেল যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার সৈন্যদের বললেন, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাও তাদের হত্যা কর। আমি এ কথাকে বরাত হিসেবে উপস্থাপন করার সময় যদি আজ এই বুঝ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা জেনারেল একথা বলেছেন যে, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও সেখানে তাদের হত্যা কর, তাহলে এমন লাগে যে, আমি কোনো কসাই এর কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু আমি যদি এ কথাকে উপযুক্ত বুঝ মোতাবেক বর্ণনা করি তাহলে এটা যৌক্তিক মনে হবে। কেননা আসলে যুদ্ধের দিনে তিনি নিজ সৈন্যের সাহস বাড়ানোর জন্য এক হুংকারের মতো নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, যেখানে শত্রু পাও তাদের হত্যা কর। যুদ্ধ সমাপ্তির পর এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এরূপ ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।' এ নির্দেশ যুদ্ধের অবস্থায় অবতীর্ণ হয় এবং এর উদ্দেশ্য মুশরিক সৈন্যদের উদ্দীপনা বাড়ানো ছিল। কুরআন মূলত মুসলমান সৈন্যদের একথা বলছিল যে, সে যেন ভীত না হয় এবং যখনই তাদের সামনে শত্রু পড়বে তাদের হত্যা করবে।

অ্যারুন শৌরী ভারতে ইসলামের কঠিন সমালোচক হিসেবে গণ্য। সেও নিজ পুস্তক 'ফাতওয়া দুনিয়া'-এর ৫৭২ পৃ. সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের বরাত দিয়েছে। এ আয়াতের বরাত দেবার পর সে হঠাৎ ৭ নং আয়াতে পৌছে গেছে। সকল প্রজ্ঞাবান মানুষই এটা অনুভব করতে পারে যে, সে জেনে বুঝে ৬ নং আয়াত থেকে লাফ দিয়েছে। ৬ নং আয়াতে এ অভিযোগের সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দিয়েছে যাতে বলা হয়েছে ইসলাম কঠিন, পশুত্ব এবং খুন-খারাবির সুযোগ দেয়। এ আয়াতে ইরশাদ হয়–

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আপনার নিকট আশ্রয় চায় তাকে আপনি আশ্রয় দিন, যাতে আল্লাহর বাণী সে শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিন। কারণ তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়।

আল কুরআন শুধু এটাই বলে না যে, যদি কোনো মুশরিক যুদ্ধকালীন আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দাও বরং তাকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌছে দেবার নির্দেশও দান করে। এটা সম্ভব যে, আজকে যুদ্ধরত কওমের মধ্যে একজন দয়াবান এর নিরাপদকামী একজন জেনারেল যুদ্ধ চলাকালীন শত্রু সৈন্যদের নিরাপত্তা চাওয়ার

কারণে জীবন বাঁচাবে কিন্তু এমন কোনো সৈন্যের জেনারেল কি আছেন যিনি নিজ সৈন্যদের একথা বলবে যে, যুদ্ধ চলাকালীন কোনো সৈন্য নিরাপত্তা চাইলে তাকে শুধু ছেড়েই দেবে না বরং নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?'

প্রশ্ন-৩৩. হিন্দু পণ্ডিত অ্যারুণ শৌরী এ দাবি করেছে যে, আল-কুরআনে হিসাবে একটি ভুল রয়েছে। তার বক্তব্যে সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের অংশগুলো যদি যোগ দেয়া হয় তাহলে সংখ্যা একের অধিক হয়। এজন্য কুরআনের রচয়িতা গণিত জানে না।

উত্তর : উত্তরাধিকারের বিধান কুরআনে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

১. ২ নম্বর সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াত।
২. ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াত।
৩. ৪ নম্বর সূরা নিসার ৭ নং থেকে ৯ নং আয়াত।
৪. ৪ নম্বর সূরা নিসার ১৯ এবং ৩৩ নং আয়াত।
৫. ৫ নম্বর সূরা মায়িদাহ্-এর ১০৫ এবং ১০৮ নং আয়াত।

তবে অংশীদারের অংশের ব্যাপারে ৪ নং সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার বিধানাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সূরা নিসার আয়াত নং ১১ এবং ১২ কে বিশ্লেষণ করবো। যার বরাত অ্যারুন শৌরী দিয়েছে। কুরআন বলেছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ـ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ـ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ـ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ـ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ـ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে এই মর্মে তোমাদের জন্যে বিধান জারি করেছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, কিন্তু উত্তরাধিকারী কন্যারা যদি দুয়ের বেশি হয়, তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর সে কন্যা সন্তান যদি এক হয় তাহলে তার (অংশ) হবে (পরিত্যক্ত) সম্পত্তির অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার

পিতা-মাতার জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপরদিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই যদি হয় তার একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই-বোন (বেঁচে) থাকে, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ। (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেওয়ার পরই (এসব ভাগ বাটোয়ারা করতে হবে) তোমরা জানো না তোমাদের পিতা-মাতা তোমাদের সন্তান-সন্ততি এর মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশি নিকটবর্তী, (অতএব) এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তিনিই হচ্ছেন মঙ্গলময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ - فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْدَيْنٍ - غَيْرَ مُضَارٍّ - وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এ অংশ পাবে।) তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ। মৃত্যুর আগে তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে)।

যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা-মাতাও নেই, শুধু আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার

জন্যে থাকবে ছয় ভাগের একভাগ। ভাই-বোন মিলে তারা যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তবে (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই সমান অংশীদার হবে। অবশ্য এ সম্পত্তির ওপর মৃত ব্যক্তির যা ওসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ পরিশোধ, এরপরই এই ভাগাভাগি করা যাবে। তবে কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে তা যেন ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়। সে কথাও খেয়াল রাখতে হবে, (উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ্ তাআলা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

ইসলামে উত্তরাধিকার আইন খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। কুরআন এক পরিপূর্ণ এবং ভিত্তিশীল মূল বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুহাম্মদ ﷺ এর হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এটা এতো পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত যে, যদি কোনো অংশীদাররা বিভিন্ন কৌশল ও বিন্যাসের সাথে এর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে এজন্য সারাজীবন ব্যয় করার প্রয়োজন হবে।

১. অ্যারুন শৌরী আছে যে কুরআনের দুআয়াত দ্রুত ও উপরি উপরি অধ্যয়ন থেকে এবং শরয়ী মাপকাঠি না জেনেই এ বিধান জানার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। এর দৃষ্টান্ত হলো তার মতো যে, বীজগণিতের এক সরল সমাধান করার সখ রাখে; কিন্তু গণিতের মূল নিয়মের আগাও নয়। যা অনুযায়ী এ কথা আবশ্যকীয়ভাবে জানা থাকতে হবে যে, গণিতের কোন্ চিহ্ন আগে আসবে, প্রথমে তো মৌলিক নিয়ম সমাধান করার প্রয়োজন।

২. প্রথমে আপনাকে ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগ ও বিয়োগের কাজ করতে হয়। যদি অ্যারুন শৌরী হিসাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং সরল অংকের প্রথমে গুণন দিয়ে শুরু করে, এরপর বিয়োগ করে, এরপরে ব্র্যাকেট করে, এরপর ভাগের দিকে আসে এবং সর্বশেষে যোগের কাজ করে তাহলে নিশ্চিতই এর উত্তর ভুল হবে। এরূপভাবে ৪ নং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তবে যদিও প্রথমে সন্তানদের অংশের উল্লেখ করেছে এরপরে পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সবার আগে ঋণ এবং কর্তব্য আদায় করতে হবে। এরপরে পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশ দিতে হবে যা ভিত্তির ওপর হবে যে, মৃত তার পেছনে সন্তান রেখে এসেছে কিনা? এরপরে বাকি অংশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বণ্টন করতে হবে। এভাবে করলে বেশি হবার প্রশ্ন আবার কোথায় থাকল? (যেমন আ: করিম– পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুই ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা গেল। বিধি মোতাবেক পিতা $\frac{১}{৬}$ + মাতা $\frac{১}{৬}$ + স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ = (৪ + ৪ + ৩)/২৪ = $\frac{১১}{২৪}$ এবং বাকি $\frac{১১}{২৪}$ অংশ পাঁচ ভাগ হবে এবং প্রত্যেক

ছেলে প্রত্যেক মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে পাবে। অংশ বাকি থাকার বা যোগফল ১ এর অধিক হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।)

এজন্য আল্লাহ তাআলা গণিত জানেন না তা নয় বরং অ্যারুন শৌরী গণিতের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ।

প্রশ্ন-৩৪। যদি আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে থাকেন তাহলে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাকে অপরাধী কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার ৬-৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ـ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা অস্বীকারকারী, তাদের তুমি ভীতি প্রদর্শন কর আর না কর উভয়টাই সমান। এরা কখনো ঈমান আনবে না। (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তাআলা তাদের মন, মগজ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও আবরণ পড়ে আছে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালের) প্রচণ্ড শাস্তি।

এ আয়াতগুলো সাধারণ কাফিরদের জন্য নয়, যে ঈমান আনে নি। আল কুরআনে এজন্য إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল লোক যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। মুহাম্মদ ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'তুমি তাদের ভয় দেখাও বা না দেখাও সব সমান তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তায়ালা এদের হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এদের কান ও চোখের ওপর পর্দা দিয়েছেন।' তাদের অন্তরের ওপর মোহর ও চোখের ওপর পর্দা দেয়ার কারণে তারা ঈমান আনেনি ব্যাপারটা তা নয় বরং ব্যাপারটা এর উল্টো। এর কারণ এই যে, এ কাফির সকল অবস্থায় সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য লেগে থাকে এবং আপনি তাদের ভয় দেখান আর নাই দেখান তারা ঈমান আনবে না, এজন্য এর দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নয় বরং কাফির নিজের।

ধরুন! এক শিক্ষক ফাইনাল পরীক্ষার আগে বলল, 'অমুক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করবে, এজন্য যে, সে খুব দুষ্ট, পড়ার দিকে মনোযোগ নেই, নিজ চিন্তা ও

মনোযোগ পরিপূর্ণ করে না।' যদি এ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে এ দোষ কার ওপর পড়বে শিক্ষকের ওপর নাকি ছাত্রের ওপর? শিক্ষক তো এর ব্যাপারে অগ্রিম কথা বলেছেন, এজন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না। এরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারও প্রথম থেকে জানা আছে যে, কিছু লোক এমনও আছে যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টারত এবং আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এজন্য অমুসলিমদের ঈমান এবং আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব তাদেরই।

প্রশ্ন-৩৫. আল-কুরআনে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন। সে কখনো ঈমান আনবে না। অথচ বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, জ্ঞান ও বুঝ এবং ঈমান কবুল করার কাজ দেমাগের (মস্তিষ্কের)। তাহলে কুরআনের এ দাবি কি বিজ্ঞানের বিপরীত নয়?

উত্তর : আল-কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা অস্বীকারকারী তাদের আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন আর নাই করুন উভয়ই সমান, তারা কখনো ঈমান আনবে না। (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তাদের মন, মগজ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও আবরণ পড়ে আছে। তাদের জন্য (পরকালের) প্রচণ্ড শাস্তি।

আরবি قَلْبٌ শব্দ দ্বারা অন্তর এবং মেধা ও উদ্দেশ্য। এ সকল আয়াতে যে قَلْبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর ও মেধা উভয়ই। এজন্য এ সকল আয়াতের অর্থ এটাও যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের অনুধাবন শক্তির যোগ্যতার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এজন্য সে বুঝে না এবং ঈমানও আনে না। আরবি قَلْبٌ দ্বারা জ্ঞান ও বুঝের কেন্দ্র ও উদ্দেশ্য নেয়া হয় এবং এটা জ্ঞান ও বুঝের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতেও এরূপ শব্দ প্রচুর আছে। যা শাব্দিক অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন Lunatic যার শাব্দিক অর্থ 'চান্দ্রিক', চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। আজ সকল লোক এ শব্দটিকে ঐ লোকের জন্য ব্যবহার করে যে পাগল অথবা মস্তিষ্কের সমস্যার শিকার। এ কথা সকলেই জানে যে, কোনো পাগল কিংবা মস্তিষ্কের রোগী চান্দ্র পীড়িত বা এরূপ নয়। এ সত্ত্বেও ডাক্তারও এ শব্দ ব্যবহার করে। এটা কোনো ভাষার সাধারণ পরিবর্তনের একটা

উদাহরণ। এ পরিভাষা এ ভুল ধারণার সাথে চালু হয়ে গেছে যে, চাঁদের পরিবর্তনগুলো বিরাট প্রভাব ফেলে। কবি মহোদয়গণ চাঁদের সঙ্গে প্রেম ও পাগলামির সৃষ্টির উল্লেখ বেশিরভাগ করে থাকেন।

Disaster এর উদ্দেশ্য হলো একটি কুলক্ষণে তারকা। কিন্তু আজ সকলে এ শব্দ হঠাৎ করে অবতীর্ণ হওয়া দুর্ভাগ্য অথবা বিপর্যয়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমাদের সকলের জানা আছে যে, দুর্ভাগ্যের সাথে কুলক্ষণে তারকার কোনো সম্পর্ক নাই।

Sunrise এবং Sunset :

Sunrise অর্থ সূর্যোদয়। আজ যখন এ শব্দ বলা হয়, অথচ লোকেরা এ বিষয়ে অজ্ঞ নয় যে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। জ্ঞানবানদের জন্য এ তথ্য জানা আছে যে, সূর্য কখনো উদয় হয় না। এতদ্‌সত্ত্বেও আকাশ বিজ্ঞানীরাও এ শব্দ ব্যবহার করে। এরূপভাবে Sunset বা সূর্যাস্ত সম্পর্কে আমরা জানি যে, সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না, তা সত্ত্বেও একথা বলা হয়ে থাকে।

ইংরেজিতে ভালোবাসা ও আবেগের স্থান হলো দিল বা অন্তর। অন্তর দ্বারা উদ্দেশ্য শরীরের ঐ অংশ যা রক্তকে পাম্প করে। এ শব্দ অন্তরের খেয়াল, ভালোবাসা এবং আবেগের কেন্দ্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজ আমরা জানি যে, খেয়াল, ভালোবাসা ও আবেগের কেন্দ্র হচ্ছে দেমাগ বা মস্তিষ্ক। এ সত্ত্বেও যখন কোনো লোক নিজের আবেগ প্রকাশ করে তখন বলে 'আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে চাই'। কিছুটা বুঝুন যে, এক বিজ্ঞানী যখন নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করতে একথা বলবে যে, তুমি তো বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নও যে, আবেগের কেন্দ্র হলো মস্তিস্ক, অন্তর নয়– সে কি এ কথা বলবে যে, তুমি একথা বলবে 'আমি তোমাকে মস্তিষ্কের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসি।' সে এরূপ বলবে না বরং স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণ করবো قَلْبٌ শব্দ ধারণার কেন্দ্র এবং জ্ঞান ও বুঝের ওপর বলা হয়। কোনো আরব একথা কখনো বলবে না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের দিলে বা অন্তরে কেন মোহর মারলেন? এ কারণে যে, সে একথা ভালভাবে জানে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের ধারণা, চিন্তা এবং আবেগের কেন্দ্র।

প্রশ্ন-৩৬. আল কুরআন একথা বলে যে, যখন কোনো পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হুর অর্থাৎ সুশ্রী সঙ্গিনী পাবে। কোনো নারী জান্নাতে গেলে সে কী পাবে?

উত্তর : 'হুর' শব্দটি কুরআনে কমপক্ষে চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে–

৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৪ নং আয়াতে–

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

অর্থ : এরূপভাবে আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গী বানাবো।

৫২ নং সূরা তুর এর ২০ নং আয়াতে–

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

অর্থ : আমি তাদের জুড়ে দিব বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে।

৫৫ নং সূরা আর রাহমান-এর ৭২ নং আয়াতে–

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ

অর্থ : এই হুররা তাঁবুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ্ ২২ ও ২৩ নং আয়াতে–

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ـ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

অর্থ : সুন্দরী সুনয়না তরুণ দল, তারা যেন একেকটি সযত্নে ঢেকে রাখা মুক্তা।

কুরআনের অনুবাদকারীরা حُوْرٌ শব্দের অনুবাদ বিশেষ করে উর্দু অনুবাদকারীরা 'সুশ্রী সুন্দরী' অর্থাৎ বালিকা করেছেন। এ অবস্থায় তারা শুধু পুরুষের জন্যই, তবে নারীদের কী হবে? حُوْرٌ শব্দটি মূলে اَحْوَرُ অথবা حَوْرَاءُ উভয় বহুবচনের শব্দ। এটা ঐ সকল লোকের দিকে ইঙ্গিত করে যাদের চোখগুলো حُوْرٌ যেমন হয়, যা জান্নাতে প্রবেশকারী পুরুষ বা নারীদের রূহ প্রশান্ত করবে। যা বিশেষ গুণ এবং এটা আত্মিক চোখের সাদা অংশের প্রান্ত রংকে প্রকাশ করে। কুরআনের অনেক আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, জান্নাতে তোমাদের জন্য اَزْوَاجٌ অর্থাৎ জুড়ি হবে এবং তোমাদের জোড়া বা পবিত্র সঙ্গী মিলবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ২ নং সূরা বাকারা ২৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ـ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ـ وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর যারা (এর উপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের সুসংবাদ দিন এমন এক জান্নাতের, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। যখনি তাদের এ জান্নাতের কোনো একটি ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে,

এ ধরনের ফলতো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিল। তাদের এমনি ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে। তাদের জন্যে আরো সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিণী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৪ নং সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ـ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً ـ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে, আমি তাঁদের প্রবেশ করাবো এমন এক জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা। আমি তাদের প্রবেশ করাবো চিরন্তন স্নিগ্ধ ছায়ায়।

এজন্য حُوْرٌ-শব্দ কোনো বিশেষ জাতির জন্য খাস নয়। আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ حُوْرٌ-এর অনুবাদ Spouse স্বামী/স্ত্রী করেছেন। যেখানে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এর অনুবাদ (Companion) সাথী করেছেন। অনেক আলেমের মতে, জান্নাতে কোনো পুরুষের যেমন হুর মিলবে। তাদের বড় বড় চমক সৃষ্টিকারী চোখবিশিষ্ট সুশ্রী বন্ধু হবে তখন জান্নাতী নারীদের যে সাথী মিলবে তাদেরও বড় বড় উজ্জ্বল চোখবিশিষ্ট হবে। অনেক আলেম এটাও বলেন, কুরআনে যে حُوْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর দ্বারা নারীই বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা এদের বিষয়ে উল্লেখ পুরুষের সাথে করা হয়েছে। এর উত্তর যা সকলের গ্রহণযোগ্যতা হাদীসে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে এ প্রশ্ন এলো যে, যদি পুরুষদের জান্নাতে হুর দেয়া হয়, তাহলে নারীদের কী দেয়া হবে? তিনি ইরশাদ করেন, নারীদের এ জিনিস মিলবে যা তাদের মনে কখনো উদয় হয় নি, তাদের কানে কখনো শ্রবণ করে নি, তাদের চোখ কখনো তা দেখেনি। অন্য কথায়, নারীদের জান্নাতে কোনো বিশেষ কিছু দেয়া হবে। (কোনোরূপ চাহিদা বা অভাব থাকবে না।)

প্রশ্ন-৩৭. কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে যে ইবলিস একজন ফেরেশতা ছিল, কিন্তু সূরা কাহফে এটা বলা হয়েছে যে, ইবলিস জ্বীন ছিল। এ দ্বারা কুরআনের বৈপরীত্য কি প্রমাণিত হয় না?

উত্তর : আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আদম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ২ নং সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে রয়েছে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلاَّ اِبْلِيْسَ ـ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ـ

অর্থ : আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল।

এছাড়াও কুরআনে উল্লেখ রয়েছে–

১. ৭ নং সূরা আরাফের ১১ নং আয়াতে।

২. ১৫ নং সূরা হিজরের ১৩ ও ২৮ নং আয়াতে।

৩. ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১ নং আয়াতে।

৪. ২০ নং সূরা ত্বহার ১১৬ নং আয়াতে।

৫. ৩৮ নং সূরা ছদ এর ৭১ ও ৭৪ নং আয়াতে।

কিন্তু ১৮ নং সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতে রয়েছে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ـ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ـ

অর্থ : (স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে তার প্রভুর নাফরমানি করল।

সূরা বাকারার বর্ণিত কয়েক আয়াতের প্রথম অংশ থেকে আমরা জানলাম যে, ইবলিস একজন ফেরেশ্‌তা ছিলেন। কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরবি ভাষায় একটি সাধারণ কায়েদা আছে যাতে, যদি অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়, তাহলে অল্পসংখ্যক নিজে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন : আমি ১০০ ছাত্রের এক শ্রেণিতে বক্তা যার মধ্যে ৯৯ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। আমি আরবিতে যদি বলি সকল ছাত্র দাঁড়িয়ে যাও, তা হলে এর প্রয়োগ ছাত্রীর উপরও পড়বে। আমাকে আলাদাভাবে এ ছাত্রীকে সম্বোধন করা আবশ্যক নয়। এরূপভাবে কুরআন অনুযায়ী যখন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন ফেরেশ্‌তাদের সম্বোধন করেছেন তখন ইবলিস সেখানে ছিল এবং এটা আবশ্যক ছিল না যে, তার উল্লেখ আলাদা করতে হবে, এজন্য সূরা বাকারা এবং অন্যান্য সূরায় ইবলিস ফেরেশ্‌তা হোক বা না হোক তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াত মোতাবেক ইবলিস একজন জ্বীন ছিল। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয় নি যে, ইবলিস একজন ফেরেশ্‌তা ছিল, এজন্য আল কুরআনে এ ব্যাপারে কোনো বৈপরীত্য নেই।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, জ্বীনদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছে প্রদান করা হয়েছে। সে চাইলে আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে। তবে ফেরেশতাদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছে দেয়া হয় নি এবং তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করে থাকে।

এজন্য এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না যে, কোনো ফেরেশ্‌তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাফরমানি করবে। একথা থেকে এ জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, ইবলিস একজন জ্বীন ছিল, ফেরেশ্‌তা নয়।

প্রশ্ন-৩৮. কুরআনে একথা বলা হয়েছে যে, মারইয়াম (আ) হারুন (আ) এর বোন ছিলেন। মুহাম্মদ ﷺ যাদের দিয়ে কুরআন লিখিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) একথা জানতো না যে, হারুন (আ)-এর বোন মারইয়াম (আ) ঈসা মসীহ-এর মাতা Mary থেকে ভিন্ন মহিলা ছিলেন। এবং এ দুজনের মধ্যে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান ছিল।

উত্তর : আল-কুরআনের ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ـ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ـ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ـ

অর্থ : অতঃপর সে তাকে নিজের কোলে তুলে নিজের জাতির কাছে ফিরে এলো, লোকেরা বলল। হে মারইয়াম! তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তোমার মাতাও তো কোনো খারাপ মহিলা ছিল না।

খ্রিস্টীয় মসীহ একথা বলছে যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর ঈসা মসীহ-এর মাতা মেরী ও হারুনের বোন মারইয়ামের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান ছিল না। অথচ দুজনের মধ্যে ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান। কিন্তু সে জানে না যে, আরবিতে اُخْتٌ এর অর্থ বংশধরও হয়, এজন্য লোকেরা মারইয়ামকে হারুনের اُخْتٌ (বংশধর) বলে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হারুন (আ)-এর বংশধর। বাইবেলে 'বেটা' শব্দটাও বংশধরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মথির ইঞ্জিল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে রয়েছে– ঈসা মসীহ দাউদের বেটা (বংশধর)।

লুক-এর ইঞ্জিল-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

যখন ইচ্ছা স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগলো, ঐ সময়ে তিনি ৩০ বছরের ছিলেন এবং ইউসুফের বেটা (বংশধর) ছিলেন।

এক ব্যক্তির দুজন পিতা হতে পারেন না। এজন্য যখন একথা বলা হয় যে, ঈসা মসীহ দাউদ (আ)-এর বেটা ছিলেন তখন এর অর্থ হবে, মসীহ (আ) দাউদ (আ)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেটা দ্বারা বংশধর উদ্দেশ্য। এ ভিত্তির ওপরে আল কুরআনের ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ২৮ নং আয়াতের ওপর অভিযোগ

সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেননা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে اُخْتَ هَارُوْنَ (হারুনের বোন) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হারুনের বোন নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য মারইয়াম (আ) এর মাতা যিনি হারুন (আ)-এর আওলাদ অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন।

প্রশ্ন-৩৯. কুরআনে কি একথা বলা হয় নি যে, ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র কালিমা ও আল্লাহ্র রূহ। এতে কি খোদায়িত্বের শান প্রকাশ পায় না?

উত্তর : কুরআন অনুযায়ী মসীহ্ (আ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কালিমা : 'আল্লাহ্র কালিমা' নয়। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৪৫ নং আয়াতে রয়েছে–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর ফেরেশতারা বলল, অবশ্যই আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম হবে মসীহ্ ইবনে মারইয়াম। দুনিয়া-আখিরাতের উভয় দিকেই তিনি সম্মানিত হবেন। তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলকারীদের মধ্যে একজন।

কুরআনে মসীহ্ (আ)-এর উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক কালিমা'-এর দিক থেকে করা হয়েছে। 'আল্লাহ্র কালিমা'-এর দিক থেকে না। আল্লাহ্র এক কালিমা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র পয়গাম বা সংবাদ। কারো ব্যাপারে যদি 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক কালিমা' বলা হয়, তবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি আল্লাহ্র পয়গম্বর বা নবী। বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কোনো নবীকে কোনো উপাধি দেওয়া হয়, তবে এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে এ উদ্দেশ্য হয় না যে, অন্য কোনো নবীর মধ্যে এ গুণ পাওয়া যাবে না। যেমন ইবরাহীম (আ)-কে কুরআনে 'খলীলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র বন্ধু বলা হয়। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য নবী আল্লাহ্র বন্ধু নয়।

মূসা (আ)-কে 'কলিমুল্লাহ্' বলা হয়, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা অন্য সকল নবীদের সঙ্গে কথা বলেন নি। এভাবে মসীহ্ (আ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র কালিমা' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্যান্য নবী আল্লাহ্র কালিমা বা পয়গম্বর নন। ইয়াহ্ইয়া (আ) যাকে খ্রিস্ট ইউহোন্না সিবাগ (রঞ্জিত) (John the Baptist) বলেন এর মধ্যেও ঈসা (আ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কালিমা বলা হয়েছে। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ـ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ـ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ فَنَادَتْهُ الْمَلٰۤئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ـ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থ : সেখানে দাঁড়িয়েই যাকারিয়া তাঁর রবের নিকট দোআ করলেন, হে আমার রব, তুমি তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের প্রতীক হিসেবে একটি নেক সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি দোআ শ্রবণ করো। ফেরেশতারা তাকে ডাক দিল– এমন সময় যখন ইবাদতের কক্ষে নামায আদায় করছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, আল্লাহর কালিমার সত্যতা প্রমাণ করবে, সে হবে নেতা, সততার প্রতীক, নবী এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন।

কুরআনে মসীহ (আ)-এর উল্লেখ 'রুহুল্লাহ' হিসেবে নয় বরং সূরা নিসায় 'রুহুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রূহ বলা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪ নং সূরা নিসায় ১৭১ নং আয়াতে–

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ـ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ـ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ـ وَلَاتَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ـ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ـ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ـ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ـ

অর্থ : হে আহলে কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং [ঈসা (আ)-এর বিষয়ে] আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং মারইয়ামের ওপর প্রেরিত আল্লাহর বাণী। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো এক রূহ। অতঃপর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো। তিন (মাবুদ) বলো না। এ থেকে তোমরা দূরে থাকো, এতেই তোমাদের কল্যাণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি একক মাবুদ, তিনি সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র। আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর। অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, ঈসা (আ) (নাউযুবিল্লাহ) মাবুদ। আল-কুরআনে কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেন। যেমন ১৫ নং সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে–

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর আমি যখন তাকে সুঠাম করবো এবং আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবে।

৩২ নং সূরা সাজদার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ـ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থ : পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে তিনি তার নিজের কাছ থেকে রূহ ফুঁকে দিলেন। তোমাদের জন্যে তাতে কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দান করলেন। তোমাদের কম লোকই কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

প্রশ্ন-৪০. একথা কি সঠিক নয় যে, কুরআনের সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ ইন্তেকাল করলেন অতঃপর জীবিত করলেন এবং উঠিয়ে নিলেন?

উত্তর : আল কুরআনে একথা কখনো বলা হয় নি যে, ঈসা (আ) ফওত হয়ে ছিলেন বরং তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তাতে ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ـ

অর্থ : আমার ওপর শান্তি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো, যেদিন পুনরায় উত্থিত হবো।

কুরআনে একথা বলা হয়েছে যে, 'শান্তি আমার ওপর যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি। যেদিন আমি মরবো।' একথা বলা হয় নি যে, যেদিন আমি মরে গিয়েছিলাম। এখানে ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকালের নয়, আল কুরআনের ৪ নং সূরার ১৫৭ ও ১৫৮ নং আয়াতে আরো কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে–

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ـ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ـ

অর্থ : তাদের উক্তি যে আমরা অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি। তারা কখনোই তাকে হত্যা করে নি। তারা তাকে শূলবিদ্ধও করে নি। তাদের নিকট এমন কিছু একটা মনে হয়েছিল। তারা মতবিরোধ করেছিল, তারাও এতে সন্দেহে পড়ে গেল। এ ব্যাপারে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং (মূল ঘটনা হলো) আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর নিজের কাছেই তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

মূলত আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-কে ইহুদিদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে জীবন্ত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এ সময় তিনি দাজ্জালের ফিতনা শেষ করবেন এবং সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে ইন্তিকাল করবেন।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

ইসলাম
ও
হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য

SIMILARITIES BETWEEN HINDUISM & ISLAM

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আঃ কুদ্দুস

বি.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এম (অল ফাস্ট ক্লাশ অ্যান্ড স্কলারস)

বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস. (অর্থনীতি), ঢা.বি.

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

১. ভূমিকা

এ বইয়ে আমরা বিশ্বের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম : হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যকার সাদৃশ্যতাসমূহ অথবা উভয়টির জন্য প্রযোজ্য একই ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এ বইতে যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েই করা হয়েছে। আয়াতটি হল–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ। তোমরা এমন বিষয়ের প্রতি আসো যেগুলো তোমাদের এবং আমাদের মাঝে সমান। আর সে বিষয়গুলো হচ্ছে : আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতে করবো না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার বানাবো না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবো না। অতঃপর তারা যদি এ বক্তব্যে সম্মতি প্রদান না করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা তাদেরকে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

আমরা এ পর্যায়ে কীভাবে একজন মানুষ একটি ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারি সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করবো। এর সাথে সাথে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

২. একটি ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায়

ক. একটি ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করো না; বরং ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানো

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এ কথাটি হিন্দুধর্মের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের বেলায়ও।

একটি ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য ঐ ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা যে কারো জন্য সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ অনুসারীই তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন নয়। এভাবে যে কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে জানা অর্থাৎ ঐ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা।

খ. ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয়। আর তাদের ঐক্যের মূল বিষয় হলো ইসলাম ধর্মের প্রকৃত উৎস তথা মহিমান্বিত 'আল-কোরআন'। আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত আল-কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা : ৫৯)

পবিত্র আল কোরআনকে বোঝার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো– যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে– সেই নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দেয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানা। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হলো ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর তা হলো : মহিমান্বিত আল-কোরআন (যা মহান আল্লাহর কথা) এবং ছহীহ হাদীসসমূহ (যা মহানবী ﷺ-এর নিজস্ব উক্তি এবং অনুমোদন)।

গ. হিন্দুধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ

একইভাবে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে এ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা। আর তা হচ্ছে : হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, শ্রীমৎ ভগবদগীতা ও পুরাণ ইত্যাদি।

আমাদেরকে বিশ্বের এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে এ ধর্ম দুটোর প্রকৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই এগুলো সম্পর্কিত আলোচনা এ বইতে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হবে।

ঘ. ঐসব সাদৃশ্যতার প্রতি নজর দিতে হবে যেগুলো সাধারণত অজ্ঞাত

আমাদের গবেষণা কর্ম 'ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যসমূহ'– এখানে আমরা ঐসব মিলসমূহের আলোচনা করব না যেগুলো এ উভয় ধর্মের অধিকাংশ অনুসারীদের জানা রয়েছে। যেমন, একজন মানুষের সবসময় সত্য কথা বলা উচিত, তার মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, তার চুরি করা উচিত নয়, তার দয়ালু হওয়া উচিত, তার নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি। এর পরিবর্তে আমরা ঐসব মিলসমূহই আলোচনা করব যেগুলো এ উভয় ধর্মের সব অনুসারীদের সাধারণভাবে জানা নেই এবং এগুলো তাদেরই জানা রয়েছে যারা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

৩. ইসলামের পরিচয়

১. ইসলামের সংজ্ঞা

'ইসলাম' একটি আরবি শব্দ। এটির উৎপত্তি হচ্ছে ÜKÓ শব্দ থেকে। যার অর্থ শান্তি। অথবা, ÜK থেকে। যার অর্থ 'তোমার ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ কর।' সংক্ষেপে বলা যায়, 'ইসলাম' অর্থ হচ্ছে 'স্বীয় ইচ্ছেকে আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।'

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে-ইমরানের ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ .

অর্থ : নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। (সূরা আলে-ইমরান : ১৯)

২. একজন মুসলমানের পরিচয়

একজন মুসলমান হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তার সব সামর্থ্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় 'মুসলিম' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

৩. ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

কিছু লোকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে। আর তা হলো ইসলাম একটি নতুন ধর্ম যা ১৪০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মহানবী মুহাম্মদ ﷺ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। যা হোক, আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হয় যে, ইসলাম এমন কোনো একক ধর্মের নাম নয়, যা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক প্রথম বারের মতো উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে অর্থে তাঁকে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তা যথার্থ নয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্য কেবল এক সৃষ্টিকর্তা প্রভুর জন্যই নির্ধারিত। এটা মানবজাতির প্রতি মহান প্রভুর এমন একটি নির্দেশনা, যা সৃষ্টির একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়ে আসছে। নূহ (আ), সোলাইমান (আ), দাউদ (আ), ইব্রাহিম (আ), ইসহাক (আ), মূসা (আ) এবং ঈসা (আ)সহ অন্য নবীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের সবাই একই বিশ্বাস ও তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুয়াতি) এবং আখিরাত (পরকাল) সম্পর্কে একই সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এই নবীগণ (আ) ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না– যা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বসূরিদের প্রচারিত আক্বিদা এবং বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

যাহোক, মহানবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাঁর দ্বারা একই নির্ভেজাল আক্বিদার পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন– যা তাঁর পূর্বে অন্যসব নবীই প্রচার করে গিয়েছিলেন। এ নির্ভেজাল বাণী ইতোপূর্বে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন সময় মানুষের দ্বারা বহুবিধ ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তারা নানা ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এ নির্ভেজাল আক্বিদায় ভেজাল ও ভুল আকিদার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা এসব ভুল আক্বিদার অপসারণ করা এবং

ইসলামের সঠিক ও প্রকৃতরূপ মানবজাতির সামনে তুলে ধরার জন্যে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন।

যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ -এর পরে আর কোনো নবী নেই, তাই তাঁর প্রতি এমন একটি মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল (মহিমান্বিত কোরআন)। যার প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে পরবর্তীকালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তা হেদায়াতের উৎস হিসেবে টিকে থাকতে পারে। এভাবে সব নবীর প্রচারিত ধর্মই ছিল– 'মহান আল্লাহর ইচ্ছের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ' এবং এজন্য একটি মাত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় 'ইসলাম'। ইবরাহিম (আ) এবং ঈসা (আ)-ও মুসলমান ছিলেন। যেমন : আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াতে ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন–

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর যখন ঈসা (আ) তাদের মধ্যে কুফরির ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কারা আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হব। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি। সাক্ষী থেক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

এছাড়া ইবরাহিম (আ) সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ : ইবরাহীম (আ) ইহুদি বা নাসারা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৪. হিন্দুধর্মের পরিচয়

১. একজন হিন্দুর পরিচয়

ক. 'হিন্দু' শব্দটির ভৌগোলিক তাৎপর্য রয়েছে এবং এটা প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যারা সিন্ধু নদের তীরে অথবা সিন্ধু নদের পানি দ্বারা সিক্ত হয় এমন এলাকায় বসবাস করে।

খ. ঐতিহাসিকদের মতে, এ শব্দটি প্রথম ঐসব পারস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল যারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমন করেছিল। 'হিন্দু' শব্দটি আরবিয়দের দ্বারাও ব্যবহৃত হতো।

গ. 'হিন্দু' শব্দটি ভারতীয় সাহিত্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বে কোথাও উল্লেখ ছিল না। এ তথ্যটি 'এনসাইক্লোপিডিয়া অভ্ রিলিজিয়নস অ্যান্ড ইথিকস–৬ : ৬৯০'-এ পরিবেশিত হয়েছে।

ঘ. জওহারলাল নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অভ্ ইন্ডিয়া' বইয়ের ৭৪ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্বে 'হিন্দু' শব্দটি দ্বারা 'মানুষকে' বুঝানো হতো এবং কোনোভাবেই নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানো হতো না। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানোর জন্য 'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ঘটনা।

ঙ. সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'হিন্দু' শব্দটি একটি ভৌগোলিক পরিভাষা যেটা 'সিন্দু' নদের তীরে বসবাসকারী লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা যারা ভারতে বসবাস করে তাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. হিন্দুধর্মের পরিচিতি

ক. হিন্দুতত্ত্ব বা হিন্দুধর্ম কথাটি 'হিন্দু' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'নিউ এনসাই-ক্লোপেডিয়া বিটেনিকার–২০ : ৫৮১ পৃষ্ঠায়' বলা হয়েছে 'হিন্দুধর্ম' নামটি ইংরেজি ভাষায় ইংরেজরা ব্যবহার শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর দ্বারা হিন্দুস্তানের জনগণের বহুবিধ বিশ্বাস বা আক্বিদাকে বুঝানো হয়ে থাকে। বৃটিশ লেখকরা ১৮৩০ সালে প্রথম 'হিন্দুধর্ম' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। এর দ্বারা তারা মূলত ভারতের ঐসব সমবিশ্বাসের লোকদেরকে বুঝাতো যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, 'হিন্দুইজম' বা 'হিন্দুতত্ত্ব' শব্দটি একটি মিথ্যা পরিভাষা। আর 'হিন্দুধর্ম' বলতে 'সনাতন ধর্ম'কে বুঝানো হয়ে থাকে। সনাতন ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন ধর্ম অথবা এর দ্বারা বৈদিক ধর্মকে বুঝায় যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'এ ধর্মের অনুসারীরা 'বেদতত্ত্ববাদী' হিসেবে পরিচিত।'

এখন, আমরা ইসলাম ধর্মের আক্বিদার বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ঐগুলোকে হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে দেখবো। আমরা আরো যাচাই করবো ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে, সেগুলো এতদুভয়ের মাঝে তুলনাও করে দেখবো।

ইসলামে ঈমানের বিষয়বস্তু এবং ঐগুলোর সাথে হিন্দুধর্মীয় ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত ধর্মবিশ্বাসের তুলনা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত কোরআনের সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ـ

অর্থ : পূর্বদিকে এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো সৎকাজ বা সওয়াব নিহিত নেই। বরং প্রকৃত সৎকর্ম বা পুণ্যের কাজ করছে ঐ ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফিরিশতা, আসমানি কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি যথার্থ ঈমান আনয়ন করেছে।'

সহীহ মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের কিতাবুল ঈমানের ৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে– একজন লোক মহানবী ﷺ -এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! ঈমান কী? উত্তরে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, 'ঈমান হচ্ছে তুমি বিশ্বাস আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর নবীগণের প্রতি, পরকালের পুনরুত্থানের প্রতি এবং তোমার তাকদীরের (অদৃষ্টের) প্রতি।' এভাবে ইসলামে ঈমানের বিষয়গুলো হচ্ছে–

১. তাওহীদ (ঈমানের প্রথম বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। আর তা হচ্ছে সব সৃষ্টির স্রষ্টা একক, চিরন্তন।)
২. আল্লাহর ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস;
৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস;
৪. তাঁর নবীগণের প্রতি বিশ্বাস;
৫. পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস;
৬. অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস।

এখন, আমাদেরকে এ দুটো ধর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব বা গুণাবলি সম্পর্কে কী কী ধারণা দেয়া হয়েছে তা ঐ ধর্ম দুটোর ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করবো এবং এতদুভয়ের মাঝে কোনো সমতা আছে কিনা তাও পর্যালোচনা করবো। প্রথমে আমরা হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য আছে তা আলোচনা করবো।

৫. হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

যদি আপনি কোনো সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কয়জন খোদায় বিশ্বাস করে? তাদের কেউ কেউ বলবে, তিনজন। কেউ কেউ বলবে, তেত্রিশজন। আবার কেউ কেউ বলবে, এক হাজার জন। কেউ কেউ হয়তো এটাও বলবে, তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি এ প্রশ্নটি কোন একজন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাহলে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলবেন, একজন হিন্দু অবশ্যই এবং প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রভুতে বিশ্বাস করেন এবং কেবল একজন সৃষ্টিকর্তারই উপাসনা করেন।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সম্বন্ধবাচক শব্দ ব্যবহারে

ইসলাম বলে, Everything is God's অর্থাৎ 'সবকিছুই আল্লাহর (সৃষ্টি)'। পক্ষান্তরে, হিন্দুধর্মে বলা হয়, Everything is God অর্থাৎ 'সবকিছুই প্রভু'।

একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো– একজন সাধারণ হিন্দু স্বর্বেশ্বরবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে, 'সবকিছুই প্রভু, গাছ একজন প্রভু, সূর্য একজন প্রভু, চন্দ্র একজন প্রভু, সাপ একজন প্রভু, বানর একজন প্রভু, মানুষ একজন প্রভু।' পক্ষান্তরে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, 'এ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর (সৃষ্টি)।'

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই প্রভুর (সৃষ্টি)। অর্থাৎ সবকিছুই প্রভুর সাথে (স্রষ্টা-সৃষ্টির) সম্পর্কে সম্পর্কিত। সবকিছুই এক এবং একমাত্র একক চিরন্তন সত্তার মালিকানাধীন। গাছের মালিক প্রভু, সূর্যের মালিকও প্রভু, চন্দ্রের মালিকও প্রভু, সাপের মালিকও প্রভু, বানরের মালিকও প্রভু, মানুষের মালিকও প্রভু। অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বা মালিক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

এভাবে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 'সম্বন্ধবাচক' শব্দের ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। হিন্দুরা বলেন, 'সবকিছুই প্রভু'। আর মুসলমানরা বলেন, 'সবকিছুই প্রভুর'। আমরা যদি সম্বন্ধবাচক (Apostrophe) ('s)) শব্দের ব্যবহারজনিত সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে হিন্দু এবং মুসলমানরা এক হয়ে যাবে। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ ـ

অর্থ : তোমরা এমন সাধারণ বিষয়ের প্রতি আসো– যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান। আলোচনার প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না।

সুতরাং আমাদেরকে এমন সব সমান বিষয়ের প্রতি আলোচনা করা দরকার যেগুলো ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়।

উপনিষদ

উপনিষদ হচ্ছে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

১. চান্দগোয়া উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ২ নং সেকশনের ১নং ধারায় বলা হয়েছে Ekam Evadvitiyam অর্থাৎ, 'তিনি এক, একমাত্র একক এবং অদ্বিতীয়।' (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৪৪৭ এবং ৪৪৮ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, খণ্ড-১, উপনিষদ, ১৯ অংশের ৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২. সুভাস ভাত্তারা উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে– Nacasya Kascij Janita na cadhipah অর্থাৎ, 'তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর কোনো প্রভুও নেই'। (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৭৪৫ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড–১৫, উপনিষদ, ২য় অংশের ২৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩. সুভাস ভাত্তারা উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে– Na tasya pratima asti. অর্থাৎ, 'তাঁর মতো আর কেউ নেই।' (রাধাকৃষ্ণের মূল উপনিষদের ৭৩৬, ৭৩৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড, ১৫, উপনিষদ ২য় অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায়)

৪. সুভাস ভাত্তারা উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ের ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে– Na samdrse tisthati rupam asya na caksusa pasyati Kas canainam. অর্থাৎ, "তাঁর আকার দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখ দ্বারা দেখতে পায় না" (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদ ৭০৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড ১৫, উপনিষদ ২ নং অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠা)

শ্রীমৎ ভগ্বদগীতা

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীমৎ ভগ্বদগীতা সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ৭: ২০-এ বলা হয়েছে– 'যাদের বুদ্ধি-জ্ঞান পার্থিব কোনো বস্তু দ্বারা চুরি হয়ে গেছে তারাই উপদেবতার উপাসনা করে।' অর্থাৎ 'যারা বস্তুবাদী তারাই শুধু উপদেবতার উপাসনা করে।' –এ কথার অর্থ হচ্ছে বস্তুবাদীরা সত্য প্রভুকে ছেড়ে প্রতিমার উপাসনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে।

এছাড়া ভগবদগীতার ১০ : ৩-এ শ্লোকে বর্ণিত আছে– 'তিনি সেই সত্তা যিনি আমাকে জন্মের পূর্ব থেকেই জানেন, যাঁর কোনো আদি নেই, তিনি হচ্ছেন জগৎসমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু।'

ইয়াজুর বেদ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। মৌলিকভাবে বেদ ৪ প্রকার : ঋগ বেদ, ইয়াজুর বেদ, শ্যাম বেদ এবং অথর্ব বেদ।

১. ইয়াজুর বেদের ৩২ অধ্যায়ের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে– "na tasya pratima asti" অর্থাৎ, 'তাঁর ব্যাপারে কোনো কল্পনা করা যায় না।' এটা আরো বলেছে, "তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা যিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।' (ইয়াজুর বেদ ৩২ : ৩) (দেবী চাঁদ এম.এ. কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

২. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮নং ধারায় বলা হয়েছে– 'তিনি হচ্ছেন নিরাকার এবং বিশুদ্ধ।' (র‍্যালফ আই. এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

৩. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং চ্যাপ্টারের ৯নং ধারায় বলা হয়েছে– 'সে জাহেলিয়াতে প্রবেশ করে, যে প্রাকৃতিক কোনো জিনিসের উপাসনা করে।' যেমন, প্রাকৃতিক কোনো বিষয় বায়ু, পানি, আগুন, সূর্য এবং চন্দ্র ইত্যাদি কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের উপাসনা করা।

এটি আরো বলেছে, 'তারা গভীর মূর্খতায় নিমজ্জিত যারা সৃষ্টির উপাসনা করে। যেমন : টেবিল, চেয়ার, পুতুল ইত্যাদি তৈরিকৃত জিনিসের উপাসনা করা।' (র‍্যালফ আই. এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ শ্যামহিতা-এর পৃষ্ঠা-৫৩৮)

অথর্ব বেদ

১. অথর্ব বেদের ৫৮ নং অধ্যায়ের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে– 'প্রভু অত্যন্ত মহান'। (অথর্ব বেদের খণ্ড ২, উইলিয়াম ড্রুইট-হিটটি, পৃষ্ঠা ৯১০)

ঋগ বেদ

১. ঋগ বেদ বই নং ১, স্তুতিগান নং ৬৪, ধারা ৪৬-এ বলা হয়েছে– 'মহাজ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে।'

সত্য এক, প্রভু একক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন। এ একই কথা বলা হয়েছে ঋগ বেদের বই নং ১০, স্তুতিস্তাবক ১১৪-ধারা-৫-এ।

২. ঋগ বেদের বই ২, স্তুতিস্তাবক – ১-এ বলা হয়েছে ঋগ বেদে মহাক্রম প্রভুর **কমপক্ষে ৩৩টি গুণাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়।** এসব গুণের অনেকের বর্ণনাই ঋগবেদের বই-২, স্তুতিস্তাবক-১-এ উল্লিখিত হয়েছে।

ক. ব্রহ্ম = স্রষ্টা = খালিক : ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-৩

ঋগ বেদে স্রষ্টার যেসব গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রভুর অন্যতম সুন্দর গুণ হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' অর্থ স্রষ্টা। যদি এটাকে আরবিতে অনুবাদ করা হয় তাহলে দাঁড়ায় 'খালিক'। ইসলাম মহান প্রভুকে খালিক, স্রষ্টা বা ব্রহ্ম বলে ডাকতে নিষেধ করে না। কিন্তু কেউ যদি বলে ব্রহ্ম, তথা সর্বশক্তিমান প্রভুর– চারটি মাথা এবং প্রতি মাথায় একটি মুকুট এবং চারটি হাত আছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামের বড় আপত্তি রয়েছে। কারণ, এ ধরনের বর্ণনা প্রভু সম্পর্কে মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, 'তাঁর সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না।'

খ. বিষ্ণু = পালনকর্তা = রব : ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা ৩

ঋগ বেদে প্রভুর অন্য একটি সুন্দর গুণের কথা বলা হয়েছে। যেমন বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-৩-এ বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু। 'বিষ্ণু' অর্থ হচ্ছে রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা। আপনি যদি এ শব্দটাকে আরবিতে অনুবাদ করেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'রব'। আর কেউ যদি সর্বশক্তিমান প্রভুকে 'রব' 'রক্ষাকর্তা' কিংবা 'বিষ্ণু' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাতে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, বিষ্ণুই হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভু এবং এ বিষ্ণুর চারটি হাত আছে, ডান হাতদ্বয়ের একটি হাত দ্বারা শঙ্খ বর্ম বা খোলস এবং বিষ্ণু পাখি কিংবা সাপের ছোবলের সামনে বাহনে উপবিষ্ট– তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের ঘোর আপত্তি আছে। কারণ, বিষ্ণুর এ ধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান প্রভুর আকৃতি সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩. ঋগ বেদের বই-৮, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১-এ বলা হয়েছে– ! 'তিনি (প্রভু) ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না। তিনি একমাত্র স্বর্গীয়। কেবল তারই প্রশংসা করো।' (ঋগ বেদ সমিতি, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১ এবং ২)

৪. ঋগ বেদের বই-৫, স্তুতিস্তাবক-৮১, ধারা-১-এ বলা হয়েছে– 'সত্যিই স্বর্গীয় স্রষ্টার গৌরব অত্যন্ত সুমহান।' (ঋগ বেদ সমিতি, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮০২ এবং ১৮০৩)

৫. ঋগ বেদের বই-৬, স্তুতিস্তাবক-৪৫, ধারা-১৬-এ বলা হয়েছে– 'তাঁরই প্রশংসা করো যার কোনো তুলনা নেই এবং তিনি একক।' (র‍্যাঙ্ক টি.এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ঋগ বেদ, পৃষ্ঠা-৬৪৮)

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে– 'স্রষ্টিকর্তা কেবল একজন এবং দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই, আদৌ নেই, কখনো ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

উপরে বর্ণিত সব ধারা এবং অধ্যায় হিন্দুধর্মের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। এসব ধারা স্পষ্টভাবে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান প্রভুর একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা প্রমাণ করে। অধিকন্তু, এসব ধারা সত্য প্রভু একক আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। এসব ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাকে স্পষ্ট করে দেয়।

অতএব, কেউ যদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহকে অধ্যয়ন করে তবে তিনি হিন্দুধর্মের প্রভু সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারবে।

৬. ইসলামে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

আল-কোরআন একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাই উপস্থাপন করেছে। সুতরাং আপনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে প্রভু তথা আল্লাহর ধারণা সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে মিল দেখতে পাবেন।

ক. ব্যাখ্যাসহ সূরা ইখলাস

ইসলামের মতে, মহান প্রভুর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসে দেয়া হয়েছে। যেমন : সূরা-১১২, আয়াত-(১-৪)-এ বলা হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ যিনি এক এবং একক। আল্লাহ চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।)। তিনি কাউকে জন্মদান (জৈবিকভাবে) করেন নি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এখানে 'আস সামাদ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিরন্তন অস্তিত্ব হওয়ার গুণটি শুধুই আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং বিশ্বে অন্যসব প্রাণীর অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য অথবা শর্তযুক্ত। এর আরো অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং অন্য সব ব্যক্তি এবং বস্তুই তার ওপর নির্ভরশীল।

এটা ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরা ইখলাস অর্থাৎ আল কোরআনের ১১২ নং সূরাটি হচ্ছে ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর। 'Theo' শব্দটি গ্রিক– যার অর্থ হচ্ছে প্রভু এবং 'logy' অর্থ হচ্ছে তত্ত্ব। এভাবে Theology অর্থ হচ্ছে– প্রভুতত্ত্ব এবং সূরা ইখলাস হচ্ছে– প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

যদি আপনি কোনো স্বর্ণের অলঙ্কার কিনতে বা বিক্রি করতে চান তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম এটাকে যাচাই করে নিতে হবে। এ ধরনের স্বর্ণ অলঙ্কারের যাচাই-বাচাই কেবল স্বর্ণকারের কষ্টিপাথরের সাহায্যেই করা সম্ভব। সে স্বর্ণ অলঙ্কারের কষ্টিপাথরের সাথে ঘষবে এবং এর রঙকে ঘর্ষণকৃত পাথরের রংয়ের সাথে তুলনা করে দেখবে। যদি এটার রং ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের রঙের মতো উজ্জ্বল হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, আপনার অলঙ্কারে ব্যবহৃত স্বর্ণ হচ্ছে ২৪ ক্যারেট প্রকৃত স্বর্ণ। যদি এটি উচ্চ গুণসম্পন্ন প্রকৃত স্বর্ণ না হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, এটা হয়তো ২২ ক্যারেট স্বর্ণ, নয়তো ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ অথবা এটা আদৌ স্বর্ণ নয়। এটা হতে পারে নকল কারণ, কথায় বলে, 'চকচক করলেই সোনা হয় না।'

একইভাবে সূরা ইখলাস (পবিত্র কোরআনের ১১২ নং সূরা) হচ্ছে– প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর– যেটা এ সত্য যাচাই করতে পারে যে, তুমি যে প্রভুর ইবাদত করছ তিনি প্রকৃত প্রভু নাকি মিথ্যা প্রভু। কারণ, সূরা ইখলাস হচ্ছে– কোরআনে প্রদত্ত সর্বশক্তিমান প্রভুর চার লাইনে দেয়া পরিচয়। যদি কেউ সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে এ চার লাইনের পরিচয়ের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। আমরা মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তা বলতে আল্লাহকে বুঝি। মহিমান্বিত কোরআনের সূরায় ইখলাস হচ্ছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটা হচ্ছে– 'ফুরকান' তথা পার্থক্যকারী। যেটা সত্য প্রভু এবং মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার খোদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সুতরাং পৃথিবীতে ভিন্নধর্মী মানুষ যেসব দেবতার উপাসনা করে সেসব দেবতা যদি পবিত্র আল-কোরআনের সূরা ইখলাসের বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করতে পারে, তাহলে সে দেবতার উপাসনা করা অর্থবহ এবং সেই দেবতাই প্রকৃত প্রভু। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে, তবে সে দেবতাকে বর্জন করতে হবে।

খ. প্রভুর গুণাবলি

মহান আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী।

১. পবিত্র কোরআনের ১৭ নং সূরার ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى

অর্থ : হে নবী ﷺ ! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রহমান' নামে ডাক। তবে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো না কেন (সেটাই উত্তম)– তিনি সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী।

আপনি আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু সে নামটি অবশ্যই সুন্দর হওয়া উচিত এবং সে নামটি এমন হওয়া উচিত নয় যে, তাতে মানসিকভাবে প্রভুর কোনো কল্পনা অঙ্কিত হয়।

মহান প্রভুর কমপক্ষে ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে 'আর রহমান', 'আর রাহীম', 'আল হাকীম' অর্থাৎ, পরম দয়াবান, পরম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। এতোসব গুণবাচক নামের মধ্যে একটিমাত্র নাম হিরন্ময় আর সেটা হচ্ছে 'আল্লাহ'। পবিত্র কোরআন এ বাণীটির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, আল্লাহ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী। আর আল-কুরআনে বর্ণিত এই সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমেই আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণিত। কারণ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের একটিরও কোন স্ত্রী বাচক এবং বহুবচন শব্দও নেই।

সূরা আল আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اَسْمَاۤئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থ : আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকো, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে শীঘ্রই দেয়া হবে।

সূরা ত্ব-হার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى .

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই।

সূরা আল-হাশরের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সব উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

গ. 'আল্লাহ' নামটি 'গড' তথা 'প্রভু' নামের চেয়ে অধিকতর পছন্দণীয়

মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে ইংরেজি শব্দ 'গড'-এর পরিবর্তে 'আল্লাহ' নামেই ডাকতে বেশি পছন্দ করে। এ আরবি শব্দটি খাঁটি এবং স্বতন্ত্র আর এটি ইংরেজি শব্দ 'গড'-এর মতো নয়। নিম্নে 'গড' শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হলো:

যদি আপনি 'গড' শব্দটির সাথে 's' অক্ষর যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Gods যেটা God শব্দের বহুবচন অথচ আল্লাহ হলেন এক এবং একক। তাই 'আল্লাহ' শব্দের বহুবচন হয় না। যদি আপনি God শব্দের সাথে dess যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Goddess যেটা হয় God শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ। অথচ মহিলা আল্লাহ কিংবা পুরুষ আল্লাহর ন্যায় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। আবার আপনি যদি God শব্দের সাথে Father শব্দটি যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় 'Godfather' যেমন, He is my Godfather. এর অর্থ হচ্ছে, সে আমার অভিভাবক। কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আবার আপনি যদি mother শব্দটি God-এর সাথে যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Godmother. কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ আম্মু' কিংবা 'আল্লাহ মাদার' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যদি আপনি God শব্দের পূর্বে Tin শব্দটি যোগ করেন তাহলে এটি হয় Tingod যার অর্থ হলো 'মিথ্যা প্রভু'। কিন্তু ইসলামে 'মিথ্যা আল্লাহ' কিংবা 'নকল আল্লাহ' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। 'আল্লাহ' শব্দটি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র শব্দ। এটি দ্বারা মানসপটে কোনো কিছুর চিত্রাঙ্কন করতে পারে এমন কিছুকে বুঝায় না। আর এর পূর্বে কিংবা পরে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা যায় না। মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে বুঝাতে 'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহারকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা যখন অমুসলিমদের সাথে আলোচনা করে তখন আল্লাহর পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ শব্দ God-এর ব্যবহার করে থাকে।

'আল্লাহ ' শব্দটির ব্যবহার হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায়

'আল্লাহ' শব্দটি– যা দ্বারা আরবিতে সর্বশক্তিমান প্রভুকে বুঝায়, তার ব্যবহার নিম্নোক্ত হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূতেও পাওয়া যায়। যেমন–

–ঋগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১১

–ঋগ বেদ বই-৩, স্তুতিস্তাবক-৩০, ধারা-১০

–ঋগ বেদ বই-৯, স্তুতিস্তাবক-৬৭, ধারা-৩০

–একটি উপনিষদ আছে যার নামই হলো ALO উপনিষদ।

৭. ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের সমর্থক আয়াতসমূহ

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী প্রভুর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পবিত্র কোরআনের ১১২ নং সূরার (১-৪) নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। যেমন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, সেই আল্লাহ এক এবং একক। তিনি চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্মদান (জৈবিকভাবে) করেন নি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে এমন অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলো পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসের মর্মার্থের সমর্থক। যেমন–

ইসলাম ধর্ম	হিন্দুধর্ম
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং একক। (সূরা ইখলাস)	তিনি কেবল একজন এবং অদ্বিতীয়। (চান্দগোয়া উপনিষদ ৬ : ২ : ১)
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ অর্থ : আল্লাহ চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্ম (জৈবিকভাবে) দেন নি, আর কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি। (সূরা ইখলাস)	তিনি সেই সত্তা যাকে কেউ জন্ম দেয় নি, তাঁর কোনো শুরু নেই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু। (ভগবদগীতা ১০ : ৩) এবং তাঁর কোনো পিতা-মাতা নেই, নেই কোনো প্রভু। (সুবাসভাট্টারা উপনিষদ ৬ : ৯)
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ অর্থ : আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)	'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' (সুবাস ভাট্টারা উপনিষদ ৪ : ১৯ আর ইয়াজুর বেদ ৩২ : ৩)

স্মরণ করে দেখুন যে, হিন্দুধর্মের ব্রক্ষসূত্র পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে–

Ekam Brahm, devitity naste neh na naste kinchan

'সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন, দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই। আদৌ নেই, কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।'

৮. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে ফিরিশতাদের ধারণা

এখন, আমরা এ দুটি প্রধান ধর্মে প্রভুর ফিরিশতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই-বাচাই করে দেখবো এবং এ দুটির মাঝে কোনো মিল আছে কিনা তাও খুঁজে দেখবো।

১. ইসলামে ফিরিশতা

ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সাধারণত এদেরকে দেখা যায় না। তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই এবং তারা সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন। নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকার কারণে তারা প্রভুর কোনো নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিরিশতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিযুক্ত হন। যেমন : জিবরাঈল (আ)-কে আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

যেহেতু ফিরিশতারা প্রভুর সৃষ্টি, তাই তারা প্রভু নয় তারা প্রভুর সেবক। মুসলমানরা কখনোও ফিরিশতাদের উপাসনা করে না।

২. হিন্দুধর্মে ফিরিশতা

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে 'ফিরিশতা' সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। যাহোক, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, একশ্রেণীর দেবদূত আছে। তারা এমন সব কাজ করে যেসব কাজ সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। এসব হিন্দুদের কেউ কেউ ইসলামের ফিরিশতাদের সাথে তুলনা করে নি। এসব দেবদূতের উপাসনা করে। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের সাথে দেবতাদের কোন তুলনা বা সাদৃশ হয় না।

৯. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা

এখন, আমরা ইসলাম ধর্মে ধর্ম গ্রন্থ এ সম্পর্কে আলোচন করব। আসমানি কিতাব অবতীর্ণের এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে মানবজাতির দিকনির্দেশনার ব্যাপারে যেসব বক্তব্য রয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন করে দেখবো।

i. ইসলামে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা রাদ-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ـ

অর্থ : প্রত্যেক যুগেই একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. পবিত্র কোরআনে চারটি প্রধান আসমানি কিতাবের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যুগে যুগে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশনা দেবার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মাত্র চারখানা কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। এগুলো হলো: যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন। যাবুর ছিল ওহী। এটা দাউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাওরাতও ছিল ওহী। এটা মূসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ইঞ্জিলও ছিল ওহী। এটা ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআন ছিল সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ওহী। আর এটা অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর।

৩. পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবই কেবল একদল নির্দিষ্ট মানুষের নিকট নির্দিষ্ট সময় এবং যুগের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের সব আসমানি কিতাবই নির্দিষ্ট সময়ের এবং নির্দিষ্ট মানুষের হেদায়াতের জন্য এসেছিল।

৪. আল-কোরআন সমগ্র মানবতার হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু কোরআন হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত অবতীর্ণ হওয়া আসমানি কিতাব তাই এটা কেবল মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয় নি। বরং এটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া কোরআন কেবল মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর যুগের মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয় নি বরং এটা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে পথ নির্দেশক হিসেবে।

ক. পবিত্র কোরআনের সূরা ইবরাহিমের ১নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। আমি আপনার নিকট এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি– যা দ্বারা আপনি মানবজাতিকে ঘন অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে

আসতে পারেন। তাদের কল্পিত প্রভুকে ত্যাগ করে সে প্রভুর পথে– যিনি পরাক্রমশালী এবং চির প্রশংসিত।

যেহেতু এটা হচ্ছে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা। সুতরাং এর যথার্থতা এবং পবিত্রতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এ জন্যেই পবিত্র কোরআনের সূরা আল-হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এ জিকির (কিতাব) নাযিল করেছি এবং আমিই এর (যে কোনো ধরনের বিকৃতি থেকে) হেফাজতকারী।

খ. আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহিমের ৫২ নং আয়াতে বলেছেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : এটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত বাণী। যাতে এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তাদেরকে এ তথ্য প্রদান করা যায় যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র মাবুদ এবং এর থেকে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

গ. আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র আল-কোরআনের সূরা আল-বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ : রমজান এমন একটি মাস, যাতে এমন কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল যা বিশ্বমানবতার জন্য পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের ৩৯ নং সূরা যুমারের ৪১ নং আয়াতে বলেছেন–

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট মানবজাতির (নির্দেশনার) জন্য সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

আল-কোরআন হচ্ছে মহান প্রভুর কথা। এটা ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত অবতীর্ণ আসমানি কিতাব। এটি ইংরেজি পঞ্জিকার ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৫. পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থে আল-কোরআনের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মেও আল-কোরআনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা পবিত্র কোরআনের সূরা শূরার ১৯৬ নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে–

وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লোকদের জন্য প্রেরিত কিতাবে এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মহিমান্বিত আল-কোরআনের বর্ণনা এবং মহান আল্লাহর এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাবের উল্লেখ পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থেই এবং অন্য সব ধর্মেই পাওয়া যায়।

৬. হাদীস : কোরআন ব্যতীত ইসলামের অন্য যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার নাম হাদীস। হাদীস হচ্ছে মহানবী ﷺ-এর কথা এবং ঐতিহ্যের সমষ্টি। এসব হাদীস হচ্ছে মহিমান্বিত কোরআনের পরিপূরক। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা কোরআনের কোনো শিক্ষাকে খারিজ করা যায় না এবং এগুলো কোরআনের কোনো বক্তব্যের বিপরীতও হতে পারে না।

(ii) হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ

হিন্দুধর্মে দু'ধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। যেমন : শ্রুতি এবং স্মৃতি।

শ্রুতি হচ্ছে এমন সব বাণী যেগুলো শ্রুত, অনুধাবিত, অবহিত অথবা অবতীর্ণকৃত। এটা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন এবং পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ। শ্রুতিকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেদ এবং উপনিষদ। আর এ দু'শ্রেণীকেই স্বর্গীয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

স্মৃতি, শ্রুতির মতো এতো পবিত্র নয়। যদিও এটা বর্তমানে হিন্দুদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্মৃতি হচ্ছে স্মরণ করা বা স্মৃতিপটে অঙ্কন করা। এ হিন্দু সাহিত্য কর্মটি অনুধাবন করা সহজ। কারণ এটা জগতের সত্যসমূহকে প্রতীকবাদ এবং পুরাণতত্ত্বের বর্ণনা করে। স্মৃতিকে স্বর্গীয় মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং এটাকে মানবীয় রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্মৃতি তালিকা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজের কার্যাবলিকে বিধিবদ্ধ করে দেয়। এটি ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রত্যাহিক কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা এবং বিধিবদ্ধ করে দেয়। এগুলো ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। স্মৃতিগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়ে

গঠিত। যেমন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাস গ্রন্থসমূহ। হিন্দুধর্মে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদ; উপনিষদ এবং পুরাণ।

১. বেদ

(i) 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'vid' থেকে নেয়া হয়েছে। vid অর্থ হচ্ছে 'জানা'। সুতরাং 'বেদ' অর্থ হচ্ছে চমৎকার জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। বেদে চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে (যদিও তাদের মতানুযায়ী এ সংখ্যা ১,১৩১ এবং যার মধ্য থেকে প্রায় এক ডজনের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। পাঠান জেলীর মহা বৈশ্যের মতে, ঋগ বেদ ২১ প্রকারের, অথর্ব বেদ ৯ প্রকারের, ইয়াজুর বেদ ১০১ প্রকারের এবং শ্যাম বেদ ১,০০০ প্রকারের)

(ii) ঋগ বেদ, ইয়াজুর বেদ এবং শ্যাম বেদ–এসব গ্রন্থকে অধিকতর প্রাচীন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো একত্রে 'ত্রিবেদ' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' নামে পরিচিত। ঋগ বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটা তিনটি দীর্ঘ এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। চতুর্থ বেদ হচ্ছে অথর্ব বেদ। যেটি সবচেয়ে পরে রচিত হয়েছে। ঋগ বেদ প্রধানত প্রশংসাসূচক গানের সঙ্কলন। ইয়াজুর বেদ ত্যাগের মহিমা সংক্রান্ত সূত্রাবলির সঙ্কলন। শ্যাম বেদ হচ্ছে সুর সঙ্গীতের সঙ্কলন। অথর্ব বেদ হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক মন্ত্র সংক্রান্ত সূত্রাবলির সঙ্কলন।

(iii) চার প্রকার বেদ সঙ্কলনের বা অবতীর্ণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত মতামত পাওয়া যায় না। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দায়ানন্দের মতে, বেদগুলো ১,৩১০ মিলিয়ন বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্য পণ্ডিতের মতে, এগুলো ৪,০০০ বছরের চেয়ে অধিক পুরাতন নয়।

(iv) একইভাবে এসব গ্রন্থসমূহ কোথায় এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও মতপার্থক্য রয়েছে তবুও বেদকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. উপনিষদ

'উপনিষদ' শব্দটি 'উপ' যার অর্থ 'নিকট', নি, যার অর্থ 'নিচ' এবং 'ষদ' যার অর্থ 'বসা' থেকে সঙ্কলিত। সুতরাং উপনিষদ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিচে এবং নিকটে বসা'। একদল লোক শিক্ষকের নিকটে পবিত্র মতবাদসমূহ শেখার জন্য তাঁর নিকটে বসে। শ্যামকারার মতে, উপনিষদ শব্দটি 'ষদ' শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ ঢিলা করা, পৌছানো, কিংবা ধ্বংস করা। আর 'উপ' এবং 'নি' এতে প্রত্যয় হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং উপনিষদ অর্থ হচ্ছে 'ব্রহ্ম জ্ঞান' যার দ্বারা অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা হয়।

উপনিষদের সংখ্যা ২০০-এর বেশি। যদিও ভারতের ঐতিহ্যে এ সংখ্যা ১০৮টি বলে ধরা হয়। প্রধান উপনিষদের সংখ্যা ১০টি। যাহোক, কেউ কেউ এ সংখ্যাকে ১০-এর বেশি বলে মনে করেন। অন্যদের মতে, এ সংখ্যা ১৮টি।

(ii) 'বেদান্ত' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উপনিষদ। যদিও বর্তমানে শব্দটি উপনিষদ ভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাব্দিকভাবে, বেদান্ত, অর্থ হচ্ছে বেদের পরিসমাপ্তি। উপনিষদ হচ্ছে বেদের পরিশিষ্ট অংশ এবং কালানুক্রমে তারা বৈদিক যুগের শেষে এসেছিলেন।

(iii) কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, বেদের চেয়ে উপনিষদ উৎকৃষ্টতর।

৩. ইতিহাস-মহাকাব্য

হিন্দুধর্মে দুটি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে যাঁর নাম রামায়ণ এবং মহাভারত।

(i) রামায়ণ হচ্ছে একটি মহাকাব্য, যেটি রামের জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করে। অধিকাংশ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত।

(ii) মহাভারত হচ্ছে অন্য একটি মহাকাব্য, যেটি দুজন কাজিন অর্থাৎ পান্দাবাস এবং কাওরাবাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এটি কৃষ্ণের জীবন নিয়েও আলোচনা করেছে। অধিকাংশ হিন্দুই মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে কম-বেশি অবগত।

৪. ভগ্বদগীতা

ভগ্বদগীতা হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বজন পরিচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশমাত্র এবং এর বিশ্বপর্বের (২৫–৪২) পর্ব অর্থাৎ, ১৮টি পর্ব দিয়ে রচিত। এটি কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিল তারই বর্ণনা মাত্র।

৫. পুরাণ

যথার্থতা বিচারে পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পুরাণ যেটি সবচেয়ে বেশি পঠিত ধর্মগ্রন্থ। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রাচীন'। পুরাণে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, আর্য উপজাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং হিন্দুধর্মের দেবতাদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ বেদের ন্যায় অবতীর্ণ হওয়া বাণী। এটা বেদের সমসাময়িককালে অথবা বেদের নিকটবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহাশ্বেরী বৈশ্য পুরাণকে ১৮টি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এসব খণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভবৈষ্য পুরাণ। এটাকে এ ধরনের নামকরণের কারণ হলো, এতে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দুরা ভবৈষ্য পুরাণের কথাকে প্রভুর কথা হিসেবে মনে করে। মহাশ্বেরী বৈশ্যকে এ বইয়ের নিছক সম্পাদক হিসেবে মনে করা হয়। আর এর প্রকৃত লেখক হলেন স্বয়ং প্রভু।

৬. অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

এছাড়া আরো কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেমন : মনু এবং স্মৃতি ইত্যাদি।

৭. সবচেয়ে নির্ভেজাল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল হিসেবে বিবেচনা করা হয় বেদকে। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থই বেদের যথার্থতাকে বাতিল করে দেয় না। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, বেদের সাথে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের বৈপরিত্য দেখা দিলে, বেদের কথাই প্রাধান্য পাবে।

এভাবে আমরা ফিরিশতা এবং কিতাবের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের মধ্যে মিল খুঁজে পাই। আলোচ্য বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা নবুয়ত, পরকাল, ভাগ্যলিপি এবং ইবাদতের ব্যাপারে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা যাচাই করে দেখবো।

এখন আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে নবুয়ত এবং প্রভুর গুণাবলির ধারণার মধ্যে সমতা যাচাই করে দেখবো।

১০. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের আলোকে নবুয়তের ধারণা

ক. ইসলামের রাসূলের ধারণা

আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণ হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে সর্বশক্তিমান প্রভু তাঁর বাণী মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন।

প্রতিটি জাতির নিকটই রাসূল প্রেরিত হয়েছিল

ক. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের দশম সূরা, সূরায়ে ইউনূসের ৪৭ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

অর্থ : প্রতিটি জাতির জন্যই রাসূল প্রেরিত হয়েছিল। অতঃপর যখন তাদের রাসূল তাদের সামনে আসতেন তখন তাদের মধ্যকার বিষয়গুলোকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দিতেন। যাতে তাদের প্রতি জুলুম করা না হয়।

খ. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের ১৬তম সূরা, সূরায় নাহলের ৩৬নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ـ

অর্থ : প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি অবশ্যই একজন নবী প্রেরণ করেছি। (তিনি ঐ জাতিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত তথা শয়তানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ অনেককে হেদায়াত দান করেছেন এবং অনেকের জন্য ভ্রষ্টতাকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করো।

গ. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের ৩৫তম সূরা, সূরায় ফাতিরের ২৪নং আয়াতে বলেছেন–

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَفِيْهَا نَذِيْرٌ ـ

অর্থ : এমন কোনো উম্মত ছিল না যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয় নি।

ঘ. পবিত্র কোরআনের ১৩তম সূরা, সূরায় রাদের ৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ

অর্থ : আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন পথপ্রদর্শক (নবী) ছিলেন।

কয়েকজন নবীর নাম কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে

১. নবী আদম (আ), ২. নবী সালেহ (আ.), ৩. নবী ইদরীস (আ.), ৪. নবী নূহ (আ.), ৫. নবী হুদ (আ.), ৬. নবী শীষ (আ.), ৭. নবী লুত (আ.), ৮. নবী ইবরাহীম (আ.), ৯. নবী ইসমাইল (আ.), ১০. নবী ইসহাক (আ.), ১১. নবী ইয়াকুব (আ.), ১২. নবী ইউসুফ (আ.), ১৩. নবী শুয়াইব (আ.), ১৪. নবী দাউদ (আ.), ১৫. নবী সোলায়মান (আ.), ১৬ নবী ইলিয়াস (আ.), ১৭. নবী ইল্‌ইয়াসা (আ.), ১৮. নবী মূসা (আ.), ১৯. নবী আজিজ (উযাইর) (আ.), ২০. নবী আইউব (আ.), ২১. নবী যুলকিফ্‌ল (আ.), ২২. নবী ইউনূস (আ.), ২৩. নবী যাকারিয়া (আ.), ২৪. নবী ইয়াহ্‌ইয়া (আ.), ২৫. নবী ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ২৬. নবী মুহাম্মদ ﷺ।

পবিত্র কোরআনে শুধু কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে

ক. পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সূরা, সূরায় নিসার ১৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ـ

অর্থ : কতিপয় নবীর কাহিনী আমি ইতোপূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কতিপয় নবীর কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করি নি। আর আল্লাহ স্বয়ং মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

খ. পবিত্র কোরআনের ৪০তম সূরা, সূরায় মুমিনের ৭৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ

অর্থ : আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি। তাদের মধ্য থেকে আপনার নিকট অনেকের কাহিনী বর্ণনা করেছি এবং অনেকের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করি নি।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ১ লাখ ২৪ হাজার নবী পাঠানো হয়েছে

'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৭৩৭ নং হাদীসে এবং 'মাসনাদে আহমদ বিন হাম্বল' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৫-২৬৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ১ লাখ ২৪ হাজার জন নবী প্রেরিত হয়েছেন।'

পূর্ববর্তী নবীদেরকে কেবল স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট পাঠানো হয়েছে

মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বে যে সকল নবীর আগমন ঘটেছিল তাদের সবাই স্বগোত্রীয় এবং সুজাতির লোকদের নিকটই প্রেরিত হয়েছিল এবং তাঁদের দ্বারা প্রচারিত বাণী কেবল ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল

পবিত্র কোরআনের ৩৩তম সূরা, সূরায় আহযাবের ৪০নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থ : মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্য থেকে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সীলমোহর (সর্বশেষ)। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

নবী মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন

ক. যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত আল্লাহর রাসূল তাই তিনি কেবল মুসলমানদের কিংবা আরবদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন নি। বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা, সূরায়ে আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে এটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।

খ. পবিত্র কোরআনের ৩৪তম সূরা, সূবায় সাবা-এর ২৯ নং আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

গ. সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাতের ৫৬তম অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীকেই তার স্বগোত্রীয় লোকদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমি মুহাম্মদ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

ঘ. হিন্দুধর্মে অবতার এবং রাসূলের ধারণা

১. সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী 'অবতার'

ক. সাধারণ হিন্দুদের নিকট অবতারের ধারণাটি হলো : 'অবতার' শব্দটি একটি সংস্কৃত পরিভাষা। এখানে 'অব' অর্থ হচ্ছে 'নিচ' এবং 'তার' অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি উৎসব'। এভাবে 'অবতার' অর্থ হচ্ছে নিচে অবতরণ করা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতারের অর্থ হচ্ছে– (হিন্দু ধর্মতত্ত্বে) ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার অবতরণ বা পৃথিবীতে আত্মাকে শারীরিকরূপে মুক্তি দান করা। সাধারণ কথায়, সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী অবতার হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভুর পৃথিবীতে শারীরিক অবয়বের রূপ ধারণ করে নেমে আসা।

একজন সাধারণ হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান প্রভু শারীরিক রূপ ধারণ করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্যএবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করার বা মানবজাতির কল্যাণে বিধান

জারি করার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র গ্রন্থ বেদের কোথাও 'অবতার' সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই। যেমন, শ্রুতি। যাহোক : এটা স্মৃতি তথা পৌরাণিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসের বইতে লেখা আছে।

খ. হিন্দুধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক পঠিত বইতে অবতারের ধারণা পাওয়া যায় :

ক. ভগ্বদগীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭-৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে, 'হে ভারতবাসী, যখন সত্য অবলুপ্ত হবে এবং অসত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করবো সত্যকে রক্ষার জন্য, দুষ্টকে ধ্বংস করার জন্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।'

খ. পুরাণের ৯ : ২৪ : ৫৬-তে উল্লেখ আছে, 'যখন সত্য বিলুপ্ত হবে এবং পাপাচার বেড়ে যাবে, মহিমান্বিত প্রভু তখন নিজেকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত করেন।'

২. বেদ এবং ইসলামে অবতারের কোনো ধারণা নেই বরং আছে রাসূলের ধারণা

ইসলাম একথা বিশ্বাস করে না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন। বরং তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন এবং তাদের সাথে উচ্চ পর্যায় থেকে যোগাযোগ করা হয় যাতে তারা আল্লাহর বাণীকে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিতে পারেন আর এসব ব্যক্তিদেরকে বলা হয় প্রভুর দূত বা সংবাদবাহক। আর এ দূত বা সংবাদবাহকরাই হলেন নবী। 'অবতার' সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে নিচে নেমে আসা বা নিচে অবতরণ করা। কিছু পণ্ডিত বর্ণনা করেছেন যে, 'প্রভুর অবতরণ' নির্দেশ করে যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের আবির্ভাব যাঁর সাথে প্রভুর বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। চার প্রকার বেদের বেশ কিছু জায়গায়ই প্রভুর সাথে মানুষের এ সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে যদি আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সাথে ভগ্বদগীতা এবং পুরাণের বক্তব্যকে তুলনা করে দেখি তাহলে আমরা ভগ্বদগীতা এবং পুরাণের সাথে ঐ বক্তব্যের সাথে একমত হবো যাতে 'অবতার' বলতে প্রভু কর্তৃক মানুষের মনোনয়নকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামে এ ধরনের মানুষকে নবী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

১১. প্রভুর গুণাবলি

প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত

ক. প্রভুর মানুষকে বোঝানোর জন্য মানবীয় রূপ ধারণ করার দরকার হয় না

এক সময় অনেক অ-সেমিটীয় ধর্ম ছিল কিংবা অন্যান্য ধর্মও প্রাণী বা বস্তুতে·নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। যেমন : প্রভুর মানবীয় রূপ ধারণ করার

ধারণা। যারা এতে বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সাধারণ যুক্তি রয়েছে। তারা বলেন যে, সর্বশক্তিমান প্রভু এতোই নির্ভেজাল এবং পবিত্র যে, তিনি মানুষের কঠোরতা, ব্যর্থতা, দুর্বলতা, অনুভূতি, আবেগ এবং লোভ সম্পর্কে অনবহিত। তিনি জানেন না কীভাবে একজন লোক আহত কিংবা সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় তার অনুভূতি প্রকাশ করে। সুতরাং মানুষের আচরণ বা ব্যবহারকে শাসন করার জন্য প্রভু পৃথিবীতে মানুষের রূপে নেমে আসেন। এ যুক্তির কারণে এটাকে খুবই যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা যাচাই করা উচিত।

খ. সৃষ্টিকর্তা একটি নির্দেশনামূলক পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন

মনে করুন, আমি একটি টেপ রেকর্ডার উৎপাদন করি। এখন আমার কি টেপ রেকর্ডার হওয়া প্রয়োজন এই জন্য যে, কোন্‌টি ভালো বা মন্দ টেপ রেকর্ডার তা জানার জন্য? উৎপাদকের কখনোই নিজেকে একটি টেপ রেকর্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না একথা বুঝার জন্য যে, সাধারণ ব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারের কী কী অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং উৎপাদনকারী হিসেবে ব্যবহারকারীর জন্য আমি একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা লিখে দিব। এ পুস্তিকায় আমি বলব, "একটি অডিও ক্যাসেট শোনার জন্য, একটি ক্যাসেট প্রবেশ করান এবং 'প্লে' চিহ্নিত বাটনে চাপ দিন। আবার বন্ধ করার জন্য, 'স্টপ' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিন। যদি আপনি দ্রুত সামনে যেতে চান তাহলে 'ফাস্ট ফরওয়ার্ড' বোতামে চাপ দিন। এটিকে অতি উষ্ণ জায়গায় রাখবেন না তাহলে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকে পানিতে ডোবাবেন না, তাহলে এটি অকেজো হয়ে যাবে।' উৎপাদনকারী একটি নির্দেশনা পুস্তিকা অথবা ব্যবহারকারীর জন্যে পুস্তিকা লিখবেন যেটিতে ঐ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় কাজ লেখা থাকবে।

গ. মহিমান্বিত কোরআন মানুষের জন্য নির্দেশনা পুস্তিকা

একইভাবে আমাদের প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কোন্‌টি ভালো এবং কোন্‌টি মন্দ তা জানার জন্য মানুষের রূপ ধরে আগমনের প্রয়োজন পড়ে না। তিনিই সেই সত্তা, যিনি এ বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাঁর কেবল কর্তব্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্দেশিকা পুস্তিকা অবতীর্ণ করা। এ ধরনের পুস্তিকা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিচের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবে–

ক. মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খ. কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? (গ) চিরন্তন সফলতা লাভের জন্য তাদের কী করা উচিত এবং কী ধরনের কাজ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত?

সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা পুস্তিকা হচ্ছে মহিমান্বিত আল-কোরআন।

ঘ. আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে মনোনীত করেন

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিকা পুস্তিকা লেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নেমে আসার প্রয়োজন হয় না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে মনোনীত করেন এবং তার সাথে কিতাবের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ধরনের মনোনীত লোকদেরকে বলা হয় প্রভুর নবী বা সংস্কারক। প্রভু এ ধরনের লোকদের নিকট তার মতামত কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

প্রভু মানুষের রূপ ধরেননি বা ধরবেন না

ক. প্রভু সবকিছু করতে পারেন না

কিছু কিছু লোক বলেন যে, প্রভু সবকিছু করতে পারেন তাহলে তিনি কেন মানুষের রূপ ধরতে পারবেন না? যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, মানুষের গুণাবলি এবং প্রভুর গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা।

১. প্রভু অমর; আর মানুষ হচ্ছে মরণশীল

প্রভু অমর ; মানুষ হচ্ছে মরণশীল। আপনি একজন 'প্রভুমানব' হতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন অমর এবং একজন মরণশীল একই সময়ে দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না। এটা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। প্রভুর কোনো শুরু নেই। কিন্তু মানব জীবনের শুরু আছে। আপনি এমন একজন ব্যক্তি হতে পারেন না যার শুরু নেই এবং একই সময়ে যার শুরু আছে। প্রভুর কোনো শেষ নেই। মানব জীবনের শেষ আছে। আপনি একই সময়ে এমন দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না যাদের মধ্য থেকে একজনের শেষ নেই এবং অন্যজনের শেষ আছে। এটা অর্থহীন।

২. প্রভুর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান প্রভুর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। মহিমান্বিত আল-কোরআনের সূরা আনআমের ১৪নং আয়াতে বলেছেন–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ -

অর্থ : আর তিনি সেই সত্তা যিনি খাওয়ান, কিন্তু তাঁকে খেতে হয় না।

৩. প্রভুর বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রয়োজন হয় না

প্রভুর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। প্রভুর ঘুমের প্রয়োজন হয় না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। পবিত্র আল-কোরআনের সূরা বাকারার ২২৫ নং আয়াতে বলেছেন–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

অর্থ : আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং ঘুমও। ভূ-মণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর।

খ. অন্য মানুষের উপাসনা করা একটি পাপের কাজ

যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তার প্রভু হওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং একজন মানুষের উপাসনা করার মধ্যে কোনো উপকার নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে করুন, আমি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষকের ছাত্র এবং আমি নিয়মিতভাবে তাঁর নির্দেশনা এবং পড়াশুনায় তার সহযোগিতা গ্রহণ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হলেন এবং তাঁর স্মৃতি বিলোপ হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর স্মৃতি এমনভাবে হারিয়ে গেল যা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখন পড়াশুনার ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের নির্দেশনা কিংবা সহযোগিতা চাওয়া আমার জন্য বোকামি ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কারণ, ঐ শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার পর যখন তার স্মৃতিলোপ পেয়েছে তখন তিনি আর পড়াশুনার নির্দেশনা প্রদানে বিশেষজ্ঞ নন। একইভাবে, কীভাবে একজন মানুষ এমন একজন প্রভুর উপাসনা করতে পারে এবং তাঁর নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করতে পারে যে তাঁর স্বর্গীয় যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজেকে আপনার এবং আমার মতো মানুষে রূপান্তরিত করেছে? যদি একজন মানুষ একজন মানুষের উপাসনা করে তাহলে কেন অন্য লোকেরা আপনার এবং আপনার পাশে অন্যান্য লোকের উপাসনা করতে পারবে না?

গ. মানুষ প্রভু হতে পারে না

সুতরাং অস্তিত্ব আছে এমন কোনো জীব একই সময় প্রভু এবং মানুষ উভয় হতে পারে না। যদি প্রভু তাঁর ঐশ্বরীয় শক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে তিনি আর মানুষ হতে পারেন না। কারণ, মানুষের ঐশ্বরীয় শক্তি থাকে না। আবার যদি প্রভু মরণশীল হন যেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের গুণ, তাহলে তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, প্রভু হলেন অমর। এছাড়া একই মানুষ প্রভু হতে পারে না। কারণ, মানুষের জন্য প্রভু হওয়া সম্ভব নয়। যদি এরূপ হওয়া সম্ভবই হয়–তাহলে আপনি এবং আমিও প্রভু হতে পারতাম এবং ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী হতে পারতাম। এ কারণেই প্রভু কখনো মানুষের রূপ ধারণ করবেন না অথবা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন না। পবিত্র কোরআন প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণার বিপরীত বক্তব্যের সমর্থক। প্রভুর মানুষের রূপ ধারণা করা সম্পর্কিত ধারণা অযৌক্তিক।

ঘ. প্রভু অপ্রভুচিত কোনো কাজ করবেন না

ইসলাম এ কথা বলে না যে, প্রভু যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারেন। বরং ইসলাম বলে যে, প্রভুর সমগ্র বস্তুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে চাই যে, প্রভু সাধারণ সব কাজ করতে পারেন। কারণ তিনি স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী।

(i) প্রভু কখনো মিথ্যা কথা বলেন না

প্রভু কেবল প্রভুচিত কাজই করেন। তিনি অপ্রভুচিত কোনো কাজ করেন না। প্রভু মিথ্যা বলতে পারেন না। এমনকি মিথ্যা বলার কিংবা মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের ইচ্ছেও তিনি করতে পারেন না। প্রভু কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। কারণ মিথ্যা বলা অপ্রভুচিত কাজ। প্রভু যে মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলেন, তখন তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

(ii) প্রভু কোনো অবিচার করবেন না

প্রভু অবিচার করতে পারেন না কিংবা কোনো অন্যায় কাজ বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছেও করতে পারেন না। তিনি এ ধরনের কাজ করবেন না এবং এ ধরনের কাজ তিনি করতে পারেন না কারণ অন্যায়কারী বা অবিচারকারী হওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কোরআন ৪র্থ সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে বলেছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۔

অর্থ : আল্লাহ কখনোই সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না।

যে মুহূর্তে প্রভু অন্যায় কাজ করেন তখন তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন যে, প্রভু একই সময়ে প্রভু হতে এবং প্রভু না হতে পারেন না। তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঐশ্বরীয় গুণাবলির এবং অমরতার গুণাবলি আর তাঁর সৃষ্টির এসব গুণাবলির অধিকারী হতে পারেন না বা হতে পারেন এটা কীভাবে সম্ভব?

(iii) প্রভু ভুল করতে পারবেন না

পরিপূর্ণতা কেবল সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর সৃষ্টি কখনো এ গুণের অধিকারী হতে পারে না। আমরা শুধু ধারাবাহিকভাবে উন্নতির চেষ্টা করতে পারি কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি না।

সুতরাং প্রভু কি কখনো ভুল করতে পারেন? তিনি কখনো ভুল করতে পারবেন না। ভুল করা মানুষের স্বভাব। ভুল করা অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কোরআনে ২০তম সূরা, সূরায় ত্বহার ৫২নং আয়াতে বলেছে–

....لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۔

অর্থ : ... আমার প্রভু ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

গ্রহণ না করে শুধু কল্পনা করে দেখুন যে, প্রভু যদি ভুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহলে প্রভু যখন ভুল করতেন তখনই তিনি আর প্রভু থাকতেন না।

(iv) প্রভু ভুলে যাবেন না।

প্রভু ভুলে যাবেন না কারণ ভুলে যাওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআনের ২০তম সূরা, সূরা ত্বহার ৫২নং আয়াতে বলেছেন–

....لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ۔

অর্থ : ... আমার প্রভু ভুল করেন না এবং ভুলে যান না।

যে মুহূর্তে প্রভু ভুলে যান তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না।

৬. প্রভু শুধু প্রভুচিত কাজই করেন

(i) সমগ্র বস্তুর ওপরই আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে

পবিত্র কোরআন বেশ কয়েকটি জায়গায় বলেছে। যেমন, ২য় সূরা, সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বস্তুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।

এই একই বর্ণনা আমাদের বোধোদয়ের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

১. সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াত

২. সূরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াত

৩. সূরা আলে ইমরানের-এর ২৯ নং আয়াত

৪. সূরা নাহল-এর ৭৭ নং আয়াত

৫. সূরা ফাতির-এর ১ নং আয়াত

(ii) আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন

মহিমান্বিত কোরআনের ৮৫তম সূরা সূরাতুল বুরুজের ১৬ নং আয়াতে বলেছে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন।'

এখন, আমি নিশ্চিত যে, আপনি নিজে একথা বিনয় এবং বিশ্বস্ততার সাথে স্বীকার করবেন যে, প্রভু কেবল প্রভুচিত বিষয়েরই ইচ্ছে পোষণ করেন অপ্রভুচিত বিষয়ের তিনি ইচ্ছে পোষণ করেন না। মানুষের জন্য আরোপীয় গুণাবলি যেমন, ভুলে যাওয়া, ভুল করা, দুর্বলতা অনুভব করা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ঈর্ষা এবং পছন্দ

করা– ইত্যাদি গুণ আল্লাহর জন্য আরোপ করার মাধ্যমে কেউ যেন তার প্রভুকে উপহাস করল এবং এ ঠাট্টায় মেতে ওঠল। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন আমরা মানুষেরা কীভাবে মানুষের এসব গুণকে প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করে থাকি? তাই এটা কি কোনো ভালো পছন্দ এবং সত্যিকার যাচাই নয় যে, আমাদের প্রভু এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি যা অজ্ঞ মানুষরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত? এজন্য মহিমান্বিত কোরআনের ৫৯তম সূরা, সূরা হাশরের ২৩নং আয়াতে বলেছে–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ বলুন, মুশরিকরা যে বিষয় আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবুয়তের ধারণা এবং প্রভুর গুণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মিল খুঁজে পাই। এ সিরিজের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পরকাল, অদৃষ্ট এবং ইবাদতের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা আলোচনা করব।

এখন, আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবী মোহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তার আলোচনা উপস্থাপন করব।

১২. মুহাম্মদ ﷺ-কে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেই নবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

ক. ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

ভবিষ্য পুরাণের প্রাতী স্বরাগ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩-এর ৫-৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'একজন বিদেশী, যিনি বিদেশী ভাষায় কথা বলবেন এবং আধ্যাত্মিক গুরু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মোহাম্মদ। রাজা ভোজ, এই ঐশ্বরিক স্বভাবের ব্যক্তিত্বকে 'পঞ্চগভা' এবং গঙ্গার পানিতে গোসল করানোর (সব পাপ থেকে তাকে পবিত্র করণের) পর তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শনের পর এ প্রস্তাব দিবেন যে, "আমি আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আর আপনি হলেন মানবজাতির জন্য গৌরবের বিষয়; আরবের অধিবাসী। আপনি শয়তানকে হত্যা করার জন্য একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন।'

এ ধারাটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে–

(i) নবীর নাম হবে মুহাম্মদ।

(ii) তিনি হবেন আরবের অধিবাসী, সংস্কৃত শব্দ 'মরুস্থল' অর্থ হচ্ছে বালুময় জায়গা বা মরুভূমি।

(iii) নবীর সঙ্গী অর্থাৎ সাহাবাদের বিশেষ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ-এর ন্যায় অন্য কোনো নবীর এতো অধিক সংখ্যক সাহাবী ছিল না।

(iv) তাঁকে বিশ্বমানবতার জন্য গৌরবের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিমান্বিত কোরআনের ৬৮তম সূরা, সূরায় কলামের ৪ নং আয়াতে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

এবং ৩৩তম সূরা, সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ والْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

অর্থ : নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

(v) তিনি অশুভ আত্মাকে হত্যা করবেন। অর্থাৎ তিনি সব ধরনের পাপাচার এবং শয়তানি উপাসনাকে ধ্বংস করবেন।

(vi) তিনি তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, রাজা ভোজ নবুয়তের এ ধারণা বর্ণনা করেছেন একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মহানবী মোহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের ৫০০ বছর পরে। আর তিনি ছিলেন রাজা শ্যালিভ্যানের অধস্তন ১০ম বংশীয়। এসব লোক এ কথাটা উপলব্ধি করতে ভুলে গেছে যে, 'ভোজ' নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন না। মিসরীয় রাজাদেরকে বলা হতো 'ফারাও' এবং রোমানদের রাজাদের বলা হতো 'সিজার'। একইভাবে ভারতের রাজাদের বলা হতো 'ভোজ'। এ ধরনের 'ভোজ' রাজাদের সংখ্যা ছিল অনেক যারা একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে রাজা ছিলেন।

মহানবী ﷺ শারীরিকভাবে 'পঞ্চগভা' এবং গঙ্গার পানিতে গোসল করেন নি। যেহেতু গঙ্গানদীর পানিকে পবিত্র মনে করা হয়, তাই গঙ্গার পানিতে গোসল করা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এর অর্থ হচ্ছে যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা অর্জন করা। এখানে নবুয়তের ধারণায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ 'মাছুম' বা নিষ্পাপ ছিলেন।

খ. ভবিষ্য পুরাণে মহানবী মোহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান

ভবিষ্য পুরাণের প্রাতীস্বরাজ পর্ব-III, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক নং ১০–২৭ নং-এ মহাঋষি ব্যাস নবুয়ত সম্পর্কে বলেছেন, বিদেশী লোকটি যাঁর ভাষাও হবে বিদেশী সুপরিচিত আরবভূমিকে কলুষিত করবে। দেশে আর্য ধর্মকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতোমধ্যে সেখানে একজন ভ্রষ্ট শয়তান উপস্থিত হবে যাকে আমি হত্যা করেছিলাম। সে এখন পুনরায় শক্তিশালী শত্রু হিসেবে উপস্থিত হবে। এসব শত্রুকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং তাদের পথনির্দেশনা প্রদান করার জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ, যিনি আমা কর্তৃক প্রেরিত, ব্রহ্মের বিশেষ দূত, দুষ্টলোকদের সঠিক পথে আনয়নের জন্য সদা ব্যস্ত থাকবেন। হে রাজা! তোমাকে বোকা বর্বরদের দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, বরং তুমি যেখানে আছ সেখানে থেকেই আমার দয়ার দ্বারা পবিত্র হবে। রাতে ঐশ্বরিক মেজাজে, ধূর্ত লোকটি পিশাচের ছদ্মবেশে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজা! তোমার আর্য ধর্মকে সব ধর্মের উপরে স্থান দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার নির্দেশনা অনুযায়ী, আমি মাংসভোজীদের শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ কার্যকর করেছি।

আমার অনুসারীরা খাৎনাবিশিষ্ট মানুষ হবে, তাদের মাথায় কোনো লেজ থাকবে না, দাঁড়ি রাখবে, আযানের ধ্বনির মাধ্যমে বিপ্লবের ঘোষণা দিবে এবং সব বৈধ জিনিস ভক্ষণ করবে। তারা শূকর ছাড়া সকল প্রকার জন্তুর গোশত খাবে। তারা পবিত্র গুল্মোদ্যানের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে না কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করবে। ধর্মহীন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা 'মুসলমান' হিসেবে পরিচিত হবে। আমি গোশত খাওয়া জাতির ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।'

এখন, আমরা পরকাল এবং অদৃষ্টের ওপর বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে যে ধারণা পেশ করা হয়েছে তা যাচাই-বাছাই, গবেষণা এবং উপস্থাপন করবো।

১৩. মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ধারণা

হিন্দুধর্মের মৃত্যুর পরের জীবন

১. হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা : আত্মার পুনর্জন্মবাদ বা স্থানান্তর

অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যুর এবং পুনর্জন্মের চক্রে বিশ্বাস করে, যাকে 'সমসার' বলে।

'সমসার' কিংবা পুনর্জন্মবাদকে 'আত্মার পুনর্জন্মবাদ' বা 'স্থানান্তরবাদ'ও বলা হয়। এ মতবাদকে হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুনর্জন্মবাদ

তত্ত্ব অনুযায়ী, বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে পার্থক্য এমনকি জন্মের সময়ও যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হচ্ছে তাদের অতীত কর্ম অর্থাৎ পূর্বজন্মে তারা যে কাজ করেছিল তার প্রভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে অথচ অন্য একটি শিশু প্রতিবন্ধী কিংবা অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ পার্থক্য তাদের পূর্বের জন্মের কর্মের গুণেই হয়ে থাকে। যারাই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, যেহেতু এ জীবনে সকল কাজের ফলাফল প্রতিফলিত হতে পারে না তাই তাদের কর্মের সব ফলাফল পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে অন্য জীবনের প্রয়োজন হয়।

ক. ভগবদগীতার ২:২২ ধারায় বলা হয়েছে– 'একজন মানুষ যেভাবে নতুন পোশাক পরিধান করে এবং পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে, আত্মাও একইভাবে নতুন দেহ গ্রহণ করে এবং পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য দেহত্যাগ করে।'

খ. পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব বৃহদারানিকা উপনিষদের ৪ : ৪ : ৩ ধারায়ও বর্ণিত হয়েছে– 'একটি শুয়া পোকার যা ধীরগতিতে তৃণভূমির কোনো পত্রের শীর্ষভাগ দিয়ে অতিক্রম করায় এতে একটি নতুন তৃণপত্র সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে আত্মা যখন কোনো দেহ থেকে সরিয়ে রাখা হয় তাহলে তা একটি নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করে।'

২. কর্ম : কারণ এবং ফলাফলের বিধি

'কর্ম' মানে কাজ। এর দ্বারা কেবল দেহ দ্বারা সম্পর্কিত কোনো কাজকে বুঝায় না বরং মন দ্বারা কোনো কাজের পরিকল্পনাকেও বুঝায়। কর্ম হচ্ছে প্রকৃত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কিংবা কারণ এবং ফলাফলের বিধি। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' – প্রবাদ দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন কৃষক গম চাষ করে ধানের আশা করতে পারে না। একইভাবে, প্রতিটি ভালো চিন্তার কাজ কিংবা বিষয় অন্য একটি সমান প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। আর প্রতিটি দয়াহীন চিন্তা, কর্কশ কথা এবং মন্দ কাজ আমাদের এ জীবন কিংবা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতি করার জন্য ফিরে আসে।

৩. ধর্ম : সঠিক কর্তব্যসমূহ পালন

'ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সত্য এবং সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন। এটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শ্রেণিভিত্তিক এবং বিশ্বময় সত্য ও সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভালো কর্ম করার জন্য, ধর্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা উচিত। অন্যথায় মন্দ কর্ম সম্পাদিত হয়। ধর্ম ইহকাল এবং পরকাল উভয়কেই প্রভাবিত করে।

৪. মোকসা : পুনর্জন্মবাদ চক্র হতে মুক্তি লাভ

'মোকসা' হচ্ছে 'সামসার' বা পুনর্জন্মবাদ চক্র হতে মুক্তি লাভ। প্রত্যেক হিন্দুর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে যে, পুনর্জন্মবাদ চক্র একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং তার আর নতুন করে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এটা তখনই ঘটবে যখন পুনর্জন্ম হওয়ার জন্য ব্যক্তির কোনো কর্ম অবশিষ্ট থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, তার ভালো এবং মন্দ কাজের কিছু বাকি থাকবে না।

৫. বেদে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের কথা উল্লেখ নেই

মনে রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে নির্ভেজাল ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ বেদে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করে নি, উপস্থাপন করে নি। এমনকি এর কথা উল্লেখও করা হয় নি। বেদে আত্মার স্থানান্তর তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও উল্লিখিত হয় নি।

৬. 'পুনর্জন্ম' দ্বারা পুনর্জন্মবাদের চক্রকে বুঝায় না বরং এর দ্বারা মৃত্যুর পরের জীবনকে বুঝায়

পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের জন্য সাধারণত যে শব্দটিকে বুঝায় তা হচ্ছে 'পুনর্জন্ম'। সংস্কৃত ভাষায়, 'পুণার' বা 'পুনা' অর্থ হচ্ছে 'পরবর্তী কাল' বা 'পুনরায়'। আর 'জন্ম' অর্থ হচ্ছে জীবন। সুতরাং 'পুনর্জন্ম' অর্থ হচ্ছে পরবর্তী জীবন বা পরকালের জীবন। এর দ্বারা মৃত্যুর পর পৃথিবীতে জীবন্ত সৃষ্টির ন্যায় বার বার ফিরে আসাকে বোঝায় না।

যদি কেউ বেদ ব্যতীত অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কিত ধারাগুলো অধ্যয়ন করে এবং মনে মনে মৃত্যুর পরের জীবনকে কল্পনা করে তাহলে সে মৃত্যুর পরের জীবনের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারবে কিন্তু বার বার পুনর্জন্মের কথা কোথাও খুঁজে পাবে না। ভগ্বদগীতা ও উপনিষদে পুনর্জন্ম সম্পর্কে যেসব বর্ণনা আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য। পুনর্জন্ম চক্র বা বার বার জন্ম সম্পর্কিত ধারণাটি বৈদিক যুগের পরে এসেছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন উপনিষদ, ভগ্বদগীতা এবং পুরাণে পুনর্জন্মের ধারণাটি মানুষের সংযোজন। বিভিন্ন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জন্মগত যে পার্থক্য, বিভিন্ন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট যাতে লোকেরা তাদের মধ্যে এ ধারণা পায় যে, 'সর্বশক্তিমান প্রভু মিথ্যা নয়'– এসব বিষয়কে যৌক্তিক এবং ব্যাখ্যা করার জন্যই পুনর্জন্ম ধারণাটির উন্মেষ ঘটেছে। সুতরাং প্রভু যেহেতু মিথ্যা তাই মানুষের মাঝে যেসব পার্থক্য এবং অসমতা পরিলক্ষিত হয় তা কেবল তাদের অতীত জীবনের কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে। এ যুক্তির ব্যাপারে ইসলামের অত্যন্ত যৌক্তিক জবাব রয়েছে– যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব, ইনশাল্লাহ।

৭. বেদে মৃত্যুর পরের জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এগুলো নিচে আলোকপাত করা হলো :

ক. ঋগ বেদের ১০ নং বইয়ের স্তুতিস্তাবক–১৬, ধারা-৪-এ বর্ণিত আছে। 'অজাত অংশ, অগ্নির উত্তাপ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তাদের গৌরবকে আগুনের শিখায় জ্বলতে দাও, এর (জ্বালা) ভোগ কর, ঐসব সম্মানিত সদস্যদের সাথে যারা তোমাদের মধ্যে জাতভেদ সৃষ্টি করেছে, ধার্মিকদের সাথে ঐ জগতে নিয়ে চলো।

সংস্কৃত শব্দ 'Sukritamu Lokam' অর্থ হচ্ছে ধার্মিকদের কথা বা ধার্মিকদের অঞ্চল, এর দ্বারা পরকালকে বুঝানো হয়েছে।

খ. ঋগ বেদের বই-১০, স্তুতিস্তাবক-১৬, ধারা-৫-এ বলা হয়েছে– '......আকাশ সম্পর্কীয় জীবন, অবশিষ্ট অংশ (দেহের মতো) বিদায় নেয়, তাকে, জাতভেদ দেহের সাথে মিশে যায়।' এ ধারাটিতেও দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে বুঝানো হয়েছে।

৮. প্যারাডাইস : বেদে স্বর্গ

বেদের বেশ কয়েকটি জায়গায় স্বর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

ক. অথর্ব বেদের বই-৪, স্তুতিস্তাবক-৩৪, ধারা-৬-এ (দেবীবান্দ) বলা হয়েছে, 'ননীর এসব ধারা, তাদের মধুর তীরে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা পণির, দুধ, মাখনের সাথে এবং পানি তোমার গৃহজীবনে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে আনন্দ বৃদ্ধি পায়। তুমি পূর্ণভাবে এসব বস্তু গ্রহণ করে রূপান্তরিত রূহকে শক্তিশালী করতে পারো।'

ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন

১. জীবন কেবল একটিই অতঃপর পরকালে আবার জীবন পাওয়া যাবে

পবিত্র কোরআনের ২য় সূরা, সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

অর্থ : তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করছো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত অতঃপর তিনি তোমাদের জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। পরিশেষে, তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

ইসলাম বলে যে, একজন মানুষ এ পৃথিবীতে কেবল একবারই আগমন করে এবং পরে সে মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যর পর শেষ বিচারের দিন সে পুনরায় জীবন ফিরে

পাবে। সে তার কাজের ওপর নির্ভর করে হয়তো জান্নাতে নয়তো জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

২. জীবন হচ্ছে পরকালের জন্য পরীক্ষা

পবিত্র কোরআনের ৬৭ নং সূরা মূলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর কাজ করে (তা জানার জন্য) তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

এ জীবনে আমরা যে সময় অতিবাহিত করি তা হচ্ছে পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা। যদি আমরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশগুলো মেনে চলি এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহলে আমরা জান্নাতে অর্থাৎ চিরশান্তির জায়গায় প্রবেশ করতে পারবো। আর যদি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশগুলো অনুসরণ না করি এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হই তাহলে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করব।

৩. শেষ বিচার দিবসে পরিপূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে

পবিত্র কোরআনের তৃতীয় সূরা, সূরা আলে-ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَاالْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। আর তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিবসে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবে। পার্থিব জীবন একটি সামান্য প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়।

৪. বেহেশত : আল-জান্নাত

ক. আল-জান্নাত অর্থাৎ বেহেশত হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী সুখের স্থান। আরবিতে 'জান্নাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বাগান। পবিত্র কোরআন অত্যন্ত বিশদভাবে জান্নাতের বিবরণ উপস্থাপন করেছে, এ বাগানের তলদেশ দিয়ে পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এ নহর হচ্ছে একেবারে খাঁটি দুধের নহর এবং নহর হচ্ছে পবিত্র

ও বিশুদ্ধ মধুর দ্বারা তৈরি। বেহেশতে সব ধরনের ফলাফল থাকবে। সেখানে কোনো ধরনের অশান্তির লেশ মাত্র থাকবে না এবং কোনো ধরনের মন্দ কথা-বার্তা বা আলোচনাও সেখানে হবে না। সেখানে কোন ধরনের পাপ, কঠোরতা, দুশ্চিন্তা, সমস্যা, বা দারিদ্রতার স্থান নেই। এভাবে জান্নাতে থাকবে সুখ আর সুখ।

খ. পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে :

(i) পবিত্র কোরআনের ৩য় সূরা, সূরা আলে-ইমরানের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে.–

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

অর্থ : ...যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এতে রয়েছে সতী-সাধ্বী নারীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।

(ii) সূরা আলে-ইমরানের ১৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ

অর্থ : যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে।

(iii) সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ـ

অর্থ : আর যারা ঈমান এনেছে সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের জন্য তাতে রয়েছে সতী-সাধ্বী রমণীগণ। আর আমি তাদেরকে সুদীর্ঘ ছায়ায় প্রবেশ করাবো।

(iv) ৫ম সূরা সূরাতুল মায়িদার ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ : তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট তারাও প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট। এটাই মহান সফলতা।

(v) ৯ম সূরা সূরায় তওবার ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ : আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং নারীদেরকে এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তিনিও চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদেরকে উত্তম বাসস্থান দিবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের জন্য বড় পাওনা। এটাই মহান সফলতা।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন–

(vii) ১৫তম সূরা, সূরাতুল হিজরের (৪৫-৪৮) নং আয়াতে

(vii) ১৮তম সূরা, সূরা ক্বাফের ৩১ নং আয়াতে

(viii) ২২তম সূরা, সূরায় হাজ্জের ২৩ নং আয়াতে

(ix) ৩৫তম সূরা, ফাতিরের (৩৩-৩৫) নং আয়াতে

(x) ৩৬তম সূরা, সূরা ইয়াসীনের (৫৫-৫৮) নং আয়াতে

(xi) ৩৭তম সূরা, সূরা আস্‌সাফফাতের (৪১-৪৯) নং আয়াতে

(xii) ৪৩তম সূরা, সূরা যুখরুফের (৬৮-৭৩) নং আয়াতে

(xiii) ৪৪তম সূরা, সূরা দুখানের (৫১-৫৭) নং আয়াতে

(xv) ৫২তম সূরা, সূরা মুহাম্মাদের ১৫ নং আয়াতে

(xvi) ৫৫তম সূরা, সূরা আর রাহমানের (৪৬-৭৭) নং আয়াতে

(xvii) ৫৬তম সূরা, সূরা ওয়াকিয়ার (১১-৩৮) নং আয়াতে

৫. নরক : জাহান্নাম

নরক হচ্ছে নিদারুণ যন্ত্রণার জায়গা, যেখানে পাপীরা ভীষণ যন্ত্রণার শিকার হবে এবং নরকাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে। এ অগ্নির জ্বালানি

হবে একশ্রেণির মানুষ এবং পাথর। এছাড়া কোরআন বর্ণনা করেছে যে, যতবার তাদের শরীরের চামড়া পুড়ে যাবে ততবারই নতুন চামড়া পরিয়ে দেয়া হবে যাতে তারা যন্ত্রণা অনুধাবন করতে পারে। পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াতে জাহান্নামের বিবরণ দেয়া হয়েছে–

(i) ২য় সূরা, সূরা বাক্বারার ২৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : যদি না পার, কখনোই পারবে না, আর তাহলে (জাহান্নামের) অগ্নিকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। বস্তুত কাফিরদের জন্যই তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ii) ৪র্থ সূরা, সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার আয়াতের অস্বীকারকারীদের আমি (জাহান্নামের) অগ্নিতে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখন তাতে (নতুন) চামড়া পরিবর্তন করে দিব, যাতে তারা আযাবের স্বাদ ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ।

(iii) ১৪তম সূরা, সূরা ইবরাহীমের (১৬-১৭) নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ـ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ـ

অর্থ : তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম আর তাকে পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি। তা তাকে টেনে নিবে, কোনো কিছুই তাকে রক্ষা করবে না এবং সব জায়গা থেকেই যেন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে অথচ সে মরবে না। তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(iv) ২২ তম সূরা সূরায় হাজ্জের (১৯-২২) নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ـ يُصْهَرُ بِهٖ مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ـ كُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ

অর্থ : এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। তাদের পেটে যা কিছু আছে তা বের হয়ে আসবে আর চামড়াও খসে পড়বে। তাদের জন্য রয়েছে লোহার দণ্ড। যখন তারা তার নিকষ অন্ধকার হতে বের হয়ে আসতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং (বলা হবে) উত্তপ্ত (অগ্নির) শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করো।

(v) ৩৫ তম সূরা, সূরা ফাতিরের ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ـ

অর্থ : আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামে) অগ্নির শাস্তি। আর তাতে তারা মরে যেতে পারবে না এবং আযাবের সামান্য অংশও কমানো হবে না। আর এভাবেই আমি কাফিরদের প্রত্যেককে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৬. বিভিন্ন ব্যক্তিতে পার্থক্যের যৌক্তিক ধারণা

হিন্দুধর্ম, দুই ব্যক্তির জন্মে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার অতীত জীবনের কর্ম অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাজের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুনর্জন্ম চক্রের কোনো বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

ইসলাম কীভাবে এ পার্থক্যের ব্যাখ্যা করে? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ ইসলামি ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআনের ৬৭ নং সূরা সূরা মুলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করতে পারেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তাই আমরা যে জীবনযাপন করি তা পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র।

১৪. ইসলাম ও হিন্দুধর্মে অদৃষ্ট এবং নিয়তির ধারণা

১. নিয়তির ধারণা : ইসলামে তাকদীর

'ক্বদর' হচ্ছে নিয়তির ধারণা। মানব জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। যেমন : কোথায় এবং কখন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করবে? কোন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে সে জন্মগ্রহণ করবে? কত বছর সে বাঁচবে? এবং কোন কোথায় ও কীভাবে সে মৃত্যুবরণ করবে? এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত।

২. হিন্দুধর্মে নিয়তির ধারণা

হিন্দুধর্মে নিয়তির ধারণা বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুরূপ।

৩. বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে একটি পরীক্ষা

পবিত্র কোরআনে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে যাতে পরিষ্কার করে ঐসব বিষয়কে নির্দিষ্ট করেছে যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরীক্ষা করেন। পবিত্র কোরআনের ২৯তম সূরা, সূরা আনকাবুতের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ـ

অর্থ : মানুষেরা কি ধারণা করেছে যে, তারা বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি'– আর (সাথে সাথে) তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

২য় সূরা, সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ـ

অর্থ : তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় (পরীক্ষা) করা হবে না? (অবশ্যই তা করা হবে) তাদেরকে দুর্ভোগ এবং দুর্ভিক্ষ আচ্ছাদিত করেছিল আর এমনভাবে প্রকম্পিত করে তোলা হয়েছিল যে, তাদের রাসূল এবং তাঁর সাথে যেসব ঈমানদারগণ ছিলেন সকলেই (সমস্বরে) বলেছিলেন, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে?' আহা! নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী?

২১তম সূরা, সূরা আম্বিয়ায় ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ـ

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে মন্দ এবং উত্তম জিনিস দ্বারা কঠোরভাবে পরীক্ষা করার ন্যায় পরীক্ষা করব? আর আমার নিকটেই তোমরা ফিরে আসবে?

২য় সূরা, সূরা বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ـ

অর্থ : আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ফলমূল, জীবন ও সম্পদের বিনষ্টিকরণের দ্বারা। আর আপনি (এসব ব্যাপারে) ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করুন।

৮ম সূরা, সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ـ

অর্থ : আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটই উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

৪. প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতেই বিচার করা হবে

প্রত্যেক মানুষকেই এ পৃথিবীতে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ পরীক্ষার ধরন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারণ, এ পরীক্ষা করা হয় আল্লাহ্ ব্যক্তিকে যে সুযোগ-সুবিধার জন্য রাখে, তার ওপর ভিত্তি করে। আর তিনি তার বিচারও ভিন্ন ভিন্ন করে সম্পন্ন করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষক একটি কঠিন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন, তাহলে তার উত্তরপত্র সাধারণত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে যাচাই করেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষক যদি সহজ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন তাহলে তার উত্তরপত্র সাধারণত কঠোরভাবে যাচাই করেন।

একইভাবে, কিছু কিছু মানুষ ধনী পরিবারে আবার কিছু কিছু মানুষ গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রত্যেক এমন ধনী লোক যার যাবতীয় খরচের পর সঞ্চয়ের পরিমাণ নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ, ৮৫ গ্রাম স্বর্ণমূল্যের সমান হয়–তার ঐ সম্পদের ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রতি চন্দ্র বর্ষে গরিবদেরকে প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামে এ পদ্ধতিটিকেই 'যাকাত' বলে। কিছু ধনী লোক সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে বাকিগুলো দান করতে পারে। আবার কিছু সংখ্যক

লোক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রেখে বাকিটা দান করতে পারে। আবার কিছু লোক মোটেই যাকাত আদায় নাও করতে পারে। এভাবে একজন ধনী লোক যাকাতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দানের জন্য পূর্ণ নম্বর পেতে পারে। অন্য একজন তার চেয়ে কম নম্বর পাবে; আবার অন্য একজন ০ (শূন্য) নাম্বারও পেতে পারে।

অপরপক্ষে, একজন গরিব লোক যার ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ সঞ্চয় হয়েছে– সেও যাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে। কারণ এ লোকের জন্য যাকাত ফরজ হয় নি। যে কোনো মানুষই ধনী হতে চায় এবং কেউই গরিব হতে চায় না। কেউ কেউ ধনী লোকদের প্রশংসা করে এবং গরিবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কিন্তু সে জানে না যে, একই সম্পদ যা ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে তার যাকাত আদায় না করে। আর সম্পত্তির কারণে লোভী চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। অন্যদিকে একজন গরিব মানুষের দারিদ্রতা তাকে নিঃসন্দেহে বেহেশতের পথে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। একজন ধনী লোক তার জনসেবা মানবতার মাধ্যমে সহজেই জান্নাত অর্জন করতে পারে। আবার একজন গরিব লোক যে প্রবলভাবে মূল্যবান সম্পদের লালসা করে এবং তা পাওয়ার জন্য অবৈধ পথ অবলম্বন করে সে শেষ বিচারের দিবসে হয়তো সমস্যায় পড়ে যাবে।

৫. যেসব শিশু পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ

কিছু কিছু শিশু সুস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আবার কিছু কিছু শিশু পঙ্গু হয়ে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ইসলামে শিশু সুস্বাস্থ্য বা পঙ্গুত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক সে নিষ্পাপ বা 'মাসুম'। এ ধরনের কোনো কথা নেই যে, পূর্ববর্তী জীবনের পাপের কারণে সে পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এ ধরনের বিশ্বাস অন্য মানুষের প্রতি সহৃদয়বান হওয়ার গুণটিকে ধ্বংস করে দেবে। তাহলে অন্যরা বলতে পারবে যে, এ শিশুটি তার জন্মকে কলুষিত করেছে বা পঙ্গু হয়েছে কারণ এটা তার মন্দ কর্মের ফল।

ইসলাম বলেছে যে, এ ধরনের পঙ্গু শিশু তার পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা। তারা এজন্য তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? তারা ধৈর্য ধারণ করে কি না? তারা তাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে কি না? (এসব দেখার জন্য)।

বিখ্যাত একটি উক্তি আছে যে, 'একজন লোক দুঃখিত হয়েছিল কারণ, তার পায়ে পরার জন্য জুতা ছিল না। কিন্তু যখন সে একজন পা ছাড়া লোককে দেখল তখন তার দুঃখ থাকল না।'

পবিত্র আল-কোরআনের ৮ম সূরা, সূরা আনফালের ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَآ اَمْوٰلُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۔

অর্থ : আর তোমরা জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটেই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? হতে পারে পিতা-মাতা সৎকর্মশীল, ধার্মিক এবং জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত। এখন আল্লাহ যদি তাদেরকে জান্নাতের উচ্চতর আসনে সমাসীন করতে চান; তাহলে তিনি তাদের পুনরায় পরীক্ষা করবেন অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে একটি পঙ্গু শিশু দান করবেন। এরপর যদি তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন, তাহলে তারা উচ্চতর পুরস্কারের জন্য অর্থাৎ, জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য উপযুক্ত হয়ে যান।

একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, পরীক্ষা যত কঠিন হবে পুরস্কার ততই উচ্চতর হবে। কলা এবং বাণিজ্যে ডিগ্রী পাস করা তুলনামূলকভাবে সহজ আর যদি আপনি পাস করেন তাহলে কোনো বিশেষ উপাধি ছাড়া আপনাকে কেবল গ্রাজুয়েট বলা হবে। কিন্তু আপনি যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী নিতে চান, যা অর্জন করতে তুলনামূলক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে আপনি গ্রাজুয়েট হওয়ার পাশাপাশি আপনাকে ডাক্তার বলে ডাকা হবে এবং 'ডা.' উপাধিটি আপনার নামের পূর্বে যোগ করে দেয়া হবে।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন, কাউকে স্বাস্থ্য দ্বারা, কাউকে রোগ দ্বারা, কাউকে অর্থ দ্বারা, কাউকে দারিদ্র্যতা দ্বারা, কাউকে অধিক পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা, কাউকে কম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এবং ব্যক্তিকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার দ্বারা এভাবে তিনি প্রত্যেককেই পরীক্ষা করে থাকেন।

এভাবে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, এ জীবন পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কোরআন এবং বেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য সেটা আত্মার স্থানান্তর বা 'সামসারা' অর্থাৎ অতীত জীবনের পাপের কারণে হয় না। এসব বিশ্বাসকে পরবর্তীকালের ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন : উপনিষদ, ভগ্বদগীতা এবং পুরাণে যোগ করা হয়েছিল। জন্ম এবং মৃত্যুর পুনর্ব্যক্ত চক্র সম্পর্কে বৈদিক যুগে কিছুই জানা ছিল না এবং শোনাও যায় নি।

এখন আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে ইবাদত এবং জিহাদের ধারণার মধ্যে যেসব মিল রয়েছে তা আলোচনা, যাচাই এবং প্রকাশ করবো। আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যেসব মিল রয়েছে তাও আলোচনা করব।

১৫. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে ইবাদতের ধারণা

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

১. ইসলামি মতবাদ

ক. সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের 'কিতাবুল ঈমানের' ৮নং হাদীসে বলা হয়েছে– ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূল ﷺ বলেছেন, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি পাঁচটি। যেমন–

(i) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল;

(ii) ইকামাতুস সালাত (নামায প্রতিষ্ঠা করা);

(iii) যাকাত আদায় করা;

(iv) রমযান মাসে রোযা পালন করা এবং

(v) হজ্জ আদায় করা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার কাবায় গমন করা)।

খ. ঈমানের প্রামাণিক সাক্ষ্য

ইসলামের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে এই ঘোষণা দেয়া, সত্যায়ন করা, সাক্ষ্য দেয়া এবং প্রমাণ বহন করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্তা বা দেবতা ইবাদতের, আনুগত্যের অভিবাদন এবং আত্মসমর্পণ যোগ্য নন এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মহানবী ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী। ঈমানের এ ভিত্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সালাত

ক. ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সালাত

'সালাত' শব্দের ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Prayer বা প্রার্থনা। প্রার্থনা করার অর্থ হচ্ছে সাহায্য বা সহযোগিতা চাওয়া। নামাযে আমরা মুসলমানরা কেবল আল্লাহর নিকট সাহায্য সহযোগিতা কামনা করি না বরং আমরা তার প্রশংসা এবং তার পক্ষ থেকে হেদায়াতও কামনা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে একে একটি ন্যায়বিচার হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, মনে করুন,

নামাযে সূরা ফাতিহার পরে, ইমাম সাহেব মহিমান্বিত কোরআনের ৫ম সূরা, সূরায় মায়িদার ৯০ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি পড়লেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পাথর (উৎসর্গীকৃত), এবং তীর ধনুক (যা দ্বারা বিভক্ত করা হয়) অপবিত্র শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত যা ইমাম সাহেব নামাযে পড়লেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন যে, আমাদের মদ পান করা উচিত নয়, আমাদের জুয়া খেলা, পুতুলের ইবাদত এবং ভাগ্য বলার কাজে অংশগ্রহণ উচিত নয়– এসব কাজই শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে এবং আমরা যদি সফলতা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রকৃত এবং পরিপূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সালাত' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Prayer' দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না।

খ. নামায আপনাকে অশ্লীল এবং মন্দকাজ হতে বিরত রাখে

পবিত্র কুরআনের ২৯তম সূরা, সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : আপনার নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তা থেকে তিলাওয়াত করুন এবং নামায প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকির (জীবনের) সবচেয়ে বড় বিষয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন।

গ. সুস্থ মনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায

একটি স্বাস্থ্যবান শরীর গড়ার জন্য মানুষের প্রতিদিন তিনবার খাবারের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে একটি সুস্থ মন গড়ার জন্য প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করা দরকার।

আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ১৭তম সূরা, সূরা ইসরার ৭৮ নং আয়াতে এবং ২০তম সূরা ত্ব-হার ১৩০ নং আয়াতের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন।

ঘ. সিজদা নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ

নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিজদাহ। যেমন :

(i) পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা, সূরা আলে-ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

অর্থ : হে মারিয়ম! তোমার প্রভুর সামনে বিনয়াবনত হও এবং সিজদা কর এবং রূকুকারীদের সাথে রূকু কর।

(ii) পবিত্র কুরআনের ২২তম সূরা, সূরা হাজ্জের ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! রূকু কর, সিজদা কর, তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং ভালো কাজ কর। সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। (সিজ্‌দার আয়াত শাফেয়ী মাযহাব মতে)

হিন্দুধর্মের সাথে সামঞ্জস্যতা

হিন্দুধর্মে এক ধরনের প্রার্থনা হচ্ছে 'ষষ্ঠাঙ্গ' হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা এবং উপাসনার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এসব ধরনের অন্যতম 'ষষ্ঠাঙ্গ'। 'ষষ্ঠাঙ্গ' শব্দটি 'Sa' এবং 'Asht' যার অর্থ 'আট' এবং 'Ang' যার অর্থ 'শরীরের অঙ্গ'–দ্বারা গঠিত। এভাবে 'ষষ্ঠাঙ্গ ' হচ্ছে উপাসনার এমন একটি ধরণ যাতে শরীরের আটটি অঙ্গের স্পর্শ প্রয়োজন হয়। কোনো হিন্দু ব্যক্তি এ উপাসনা যথাযথভাবে সম্পাদনা করতে চাইলে একজন মুসলমান তার সালাতে সিজদা আদায় করার সময় যে আটটি অঙ্গ অর্থাৎ, কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা ব্যবহার করেন তাকেও এগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

হিন্দুধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ

(i) প্রতিমাপূজা, যেটা হিন্দুধর্মের মাঝে খুবই সাধারণ বিষয়–এটা হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ। ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ ধারায় বলা হয়েছে, 'ঐসব ব্যক্তি যাদের বুদ্ধিমত্তাকে পার্থিব (সম্পদ) অর্জনের অভিপ্রায় দ্বারা হরণ করা হয়েছে তারাই প্রতিমা পূজা করে।'

(ii) সুবেটাস ভাট্টারা উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায়ও এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

(iii) ইয়াজুর বেদের ৩২তম অধ্যায়ের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, 'তাঁর কোন প্রতিমা নেই।'

(iv) ইয়াজুর বেদের ৪০তম অধ্যায়ের ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, 'যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ (যেমন : বাতাস, পানি, অগ্নি, ইত্যাদি)-এর উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। আর যারা সৃষ্ট জিনিস (যেমন : টেবিল, চেয়ার, গাড়ি, প্রতিমা ইত্যাদি)-এর উপাসনা করে তারা অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।'

৩. যাকাত (দরিদ্রের প্রাপ্য)

ক. যাকাত অর্থ পবিত্রতা এবং প্রবৃদ্ধি

যাকাত ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি; যার অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা এবং প্রবৃদ্ধি।

খ. ২.৫% দান করতে হয়

প্রত্যেক ধনী মুসলমান যার সঞ্চয়কৃত অর্থের মূল্য কমপক্ষে নিসাব (৮৫ গ্রাম স্বর্ণ মূল্য বা এর সমান অর্থের মালিক) পরিমাণ তার উক্ত সম্পদের ২.৫% প্রতি চন্দ্রবর্ষে দান করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)।

গ. যদি সব ধনী ব্যক্তি যাকাত দেয় তাহলে কেউ ক্ষুধায় মারা যাবে না

যদি সব ধনী ব্যক্তি যথাযথভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে দারিদ্র্যতা পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যে না খেয়ে মারা যাবে।

ঘ. সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হবে না– যাকাত তা নিশ্চিত করেছে

যাকাতের নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা, সূরায় আল হাশরের ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

অর্থ : সম্পদ যাতে কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হতে না পারে সেজন্য (যাকাত ফরয করা হয়েছে)...।

৬. হিন্দুধর্মে দান

হিন্দুধর্মেও দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে

(i) ঋগবেদের বই-১০, স্তুতিস্তাবক–১১৭. ধারা-৫-এ বলা হয়েছে, 'ধনীদের উচিত গরিব ভিক্ষুকদের সন্তুষ্ট করা। আর তার চোখকে দীর্ঘতর পথপানে আনমিত করা উচিত। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এখন একজন, এরপর হবেন অন্য একজন এবং গাড়ির চাকার মতো তা চিরকাল ঘুরতেই থাকবে।'

'যদি এরূপ আশা করা হয় যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরিব ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করবে তাহলে ধনী ব্যক্তিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে (তাকে ভাবতে হবে আজকের ধনী আগামিকাল ধনী থাকবে না) মনে রেখ যে, ধনী ব্যক্তি হিসেবে একজনের স্থানে অন্যজনের আগমন ঘটে যেভাবে সারথির চাকাসমূহ একটির স্থানে অন্যটির আগমন ঘটে।'

(ii) ভগ্বদগীতার বেশ কয়েকটি জায়গায় দান করার ব্যাপারে বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, ১৭তম অধ্যায়ের ২০ নং ধারা এবং ১৬তম অধ্যায়ের ৩ নং ধারা।

৪. সিয়াম : রোযা রাখা

ক. বর্ণনা

সিয়াম বা রোযা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের চান্দ্রমাস রমজানের পূর্ণমাস সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকাই রোযা।

খ. রোযা আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়

রোযা রাখার কারণ পবিত্র কুরআনের ২য় সূরা বাক্বারার ১৮৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, যদি একজন ব্যক্তি তার ক্ষুধাকে সংবরণ করতে পারে, তাহলে তার পক্ষে অধিকাংশ ইচ্ছেকে সংবরণ করা খুবই সহজ ব্যাপার।

গ. মদপান, ধূমপান এবং অন্যান্য নেশাকে রোযা নিরুৎসাহিত করে

পূর্ণ এক মাস রোযা রাখা মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। যদি একজন লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদপান থেকে বিরত থাকে, তবে তার জন্য একদিনের পুরো ২৪ ঘন্টা মদপান থেকে বিরত থাকা খুবই সহজ কাজ। যদি একজন লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ধূমপান থেকে ভালোভাবে বিরত থাকতে পারে।

ঘ. চিকিৎসাগত সুবিধা

রোযার বিভিন্ন চিকিৎসাগত সুবিধা রয়েছে। রোযা অন্ত্রের শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়। এটা কোলেস্টরলের মাত্রাও কমায়।

ঙ. হিন্দুধর্মে রোযা (উপোস)

হিন্দুধর্মে রোযার বিভিন্ন ধরন এবং পদ্ধতি রয়েছে। মনুস্মৃতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'পবিত্রতা অর্জনের জন্য একমাস রোযা পালন করা উত্তম।' রোযা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে–

মনুস্মৃতির ৪র্থ অধ্যায়ের ২২২ নং ধারায়

মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ২০৪ নং ধারায়

৫. হজ্জ : তীর্থযাত্রা

ক. বিবরণ

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান যার হজ্জ করার অর্থাৎ পবিত্র নগরী মক্কায় তীর্থযাত্রা করার সামর্থ্য আছে–তার জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

খ. আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ

হজ্জ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তব উদাহরণ এবং নিদের্শনা। হজ্জ হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বার্ষিক সম্মিলন যেখানে ২.৫ মিলিয়ন লোক বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে এসে একত্রিত হয়। সকল তীর্থযাত্রীই দুই খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে। এ কাপড় সাধারণত সাদা হয়, এভাবে এটা পরানো হয় যাতে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন না যে, কে ধনী, কে গরিব, কে রাজা, কে প্রজা। সকল গোত্রের এবং বর্ণের মানুষেরা একত্রে এক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়।

গ. হিন্দুধর্মের তীর্থযাত্রা

হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রার বিভিন্ন জায়গা নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম জায়গা হচ্ছে–

(i) ঋগ বেদের বই-৩, স্তুতিস্তাবক-২৯, ধারা-৪-এ বলা হয়েছে, 'ইয়াসপদ যেটি নব পার্থবিতে অবস্থিত।' "Ila" অর্থ হচ্ছে প্রভু বা আল্লাহ এবং "Spad" অর্থ হচ্ছে জায়গা। সুতরাং"Ilayspad" অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্থান। "Nabha" অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র এবং "Prathvi" অর্থ হচ্ছে 'পৃথিবী' এভাবে এ বেদের ধারাটিতে তীর্থযাত্রার স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

M. Monier Williams কর্তৃক সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানে (২০০২ সালে সংস্করণ) বলা হয়েছে যে, 'ইয়াসপদ' হচ্ছে 'তীর্থের নাম' অর্থাৎ তীর্থযাত্রার স্থান। যা হোক, এর সঠিক অবস্থান বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নি (তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলই এর মূল অর্থ)।

(ii) পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা, সূরায় আলে-ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই মানব জাতির (ইবাদতের) জন্য নির্মিত প্রথম ঘর সেটা মক্কা নগরীতে অবস্থিত। আর এটি হচ্ছে পবিত্র গৃহ এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের দিশারী।

'বাক্কা' হচ্ছে মক্কা নগরীর অন্য নাম এবং আমরা জানি যে 'মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।'

পরবর্তী সাতটি ধারায় বলা হয়েছে–

(iii) ঋগবেদের বই–৩, স্তুতিস্তাবক ২৯, ধারা-১১-তে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ -কে 'নরসঞ্চা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে আমরা উপসংহার টানতে পারি যে, এ ইয়াসপদ তথা তীর্থযাত্রার স্থান–যা ঋগবেদে উল্লেখিত হয়েছে– তা হচ্ছে মক্কা।

(iv) মক্কাকে ইয়াসপদ হিসেবে ঋগবেদের বই-১, স্তুতিস্তাবক-১২৮ এবং ধারা-১-এও বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬. ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে জিহাদের ধারণা

ইসলাম সম্পর্কে শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয় বরং অমুসলমানদের মধ্যেও একটি বড় ভুল ধারণা হচ্ছে যে, ইসলাম জিহাদকে সমর্থন করে। অমুসলিম এবং মুসলিমরা ধারণা করে যে, মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত যে কোন যুদ্ধ– তা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, হোক তা ভালো কিংবা মন্দ–সবই জিহাদ।

'জিহাদ' একটি আরবি শব্দ, যা 'জাহাদা' থেকে সংকলিত হয়েছে। আর 'জাহাদা' অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা বা সংগ্রাম করা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার প্রাণপণ চেষ্টা করে তাহলে সে 'জাহাদা' করছে।

ইসলামি পরিভাষায়, 'জিহাদ' মানে হচ্ছে কারো নিজের মন্দ বা খারাপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এর এমন অর্থও হতে পারে যে, সমাজকে উন্নততর করার চেষ্টার নাম সংগ্রাম। এর দ্বারা আত্মরক্ষার সংগ্রাম কিংবা যুদ্ধের ময়দানে আগ্রাসন কিংবা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করাকেও বুঝায়।

১. জিহাদ পবিত্র যুদ্ধ নয়

শুধু অমুসলিম পণ্ডিতরাই নন বরং মুসলিম পণ্ডিতরা পর্যন্ত 'জিহাদ' শব্দের ভুল অর্থ করে বলেন, 'পবিত্র যুদ্ধ'। পবিত্র যুদ্ধের আরবি শব্দ হচ্ছে 'হারবুন মুকাদ্দাসুন'। পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না।

'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের সময়– যাতে তারা খ্রিস্টধর্মের নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। বর্তমানে এ পবিত্র যুদ্ধ পরিভাষাটি অন্যায়ভাবে জিহাদকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ 'জিহাদ' অর্থ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা। ইসলামের পরিভাষা হচ্ছে– 'সঠিক কারণে আল্লাহর পথে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করাকে জিহাদ বলে।' যেমন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

২. জিহাদের কয়েকটি ধরনের একটিমাত্র ধরন হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা

বিভিন্ন ধরনের জিহাদ অর্থাৎ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা রয়েছে। চেষ্টা-সংগ্রামের একটি ধরন হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নির্যাতন এবং হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

অরুণ শূরীসহ কয়েকজন ইসলামের সমালোচক পবিত্র কোরআনের ৯ম সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের উল্লেখ করেন। যাতে বলা হয়েছে–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ ـ

অর্থ : ....মুশরিক এবং কাফিরদের হত্যা করো, যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও...।

যদি আপনি কুরআন পড়েন, তাহলে এ আয়াতটি পাবেন কিন্তু, অরুণ শূরী এটিকে প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করেছেন।

সূরায় তওবার ৫ম আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াতে মুসলমানগণ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ শান্তি চুক্তি একতরফাভাবে মক্কার মুশরিকদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছিল। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য চারমাসের চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেন নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেন। আর তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ময়দানের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'সংগ্রাম করো এবং মুশরিকদের (মক্কার শত্রুদের) যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো এবং তাদেরকে ধরো এবং বন্দি করো। আর তাদের জন্য যুদ্ধের প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে বসে অপেক্ষা করো।'

এ আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সেনাবাহিনীর যে কোনো সেনাপতি সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য বলবে, 'দুর্বল হয়ো না, লড়াই করো এবং শত্রুদের হত্যা করো তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে যেখানেই পাওয়া যায়।' অরুণ শূরী তার বই "The world of fatwas"-এ সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়ার পর এক লাফে ৭ নং আয়াতে চলে গেছেন। যে কোনো যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই বুঝবে যে, ৬ নং আয়াত হচ্ছে এ অভিযোগের জবাব।

সূরা তওবার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ـ

অর্থ : যদি কোনো মুশরিক (শত্রুদের কেউ) তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনার সুযোগ পায় এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।

বর্তমানে সবচেয়ে দয়ালু সেনাপতি তার সৈন্যদের শত্রুদের ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, যদি শত্রুরা শান্তি চায় তাদেরকে শুধু ছেড়ে দিও না বরং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এমন কি কোনো সেনাপতির কথা

বর্তমান যুগে অথবা সমগ্র মানব ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কখনো এমন দয়ার্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন? আমরা এখন অরুণ শূরীর কাছে জানতে চাই তিনি কেন ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন না?

৩. ভগ্বদগীতায় জিহাদের কথা উল্লেখ আছে

প্রায় প্রতিটি প্রধান ধর্মই তার অনুসরণকারীদের ভালো কাজের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করতে বলেছে। ভগ্বদগীতার ২:৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'অতএব হে মুমিন! আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের জন্য প্রচেষ্টা করো, যেটা হচ্ছে সব কাজের কলা-কৌশল।'

৪. লড়াইয়ের কথা ভগ্বদগীতায়ও উল্লেখ আছে

(ক) আত্মরক্ষা কিংবা নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো বিষয় সময় বা অন্যান্য সময় লড়াই– সংগ্রামের কথা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেই বলা হয়েছে।

মহাভারত একটি মহাকাব্য এবং হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে দুই চাচাতো ভাই– পান্থভাস এবং কৌরাভাসের মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনীই প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে অর্জুন যুদ্ধ করাকে পছন্দ করে নি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পর তাকে নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে হত্যা করা হয়। এমন মুহূর্তে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের ময়দানে উপদেশ বাণী শোনান এবং এ উপদেশমালাই ভগ্বদগীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগ্বদগীতায় বেশ কটি ধারা আছে যাতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের এবং আত্মীয় হলেও শত্রুকে পর্যন্ত হত্যা করার উপদেশ দিয়েছেন।

(খ) ভগ্বদগীতার ১ম অধ্যায়ের (৪৩-৪৬) নং ধারায় বলা হয়েছে–

৪৩. 'হে কৃষ্ণ! জনগণকে রক্ষা করো। আমি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শুনেছি যে, যারা পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট করে তারা সর্বদা নরকে বাস করবে।'

৪৪. 'হায়! কি আশ্চর্য যে আমরা নিজেদের পাপাচারমূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করেছি। এ ধারণা রাজকীয় সুখ অর্জনের অভিপ্রায় থেকেই গৃহীত হয়েছে।'

৪৫. 'ধ্রীতারাস্ত্রের ছেলেরা আমাকে নির্দয়ভাবে এবং বাধাহীনভাবে হত্যা করার চেয়ে আমি বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অধিকতর উত্তম মনে করি।'

(গ) কৃষ্ণের পিতা ভগ্বদগীতার ২য় অধ্যায়ের (২-৩) নং ধারায় যে জবাব দিয়েছিলেন তাও এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণযোগ্য।

(ঘ) কৃষ্ণের পিতা ভগ্বদগীতার ২য় অধ্যায়ের (৩১-৩৩) নং ধারায় যা বলেছেন তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে।

(ঙ) কেবল ভগ্বদগীতায়ই শত শত ধারা রয়েছে যেগুলোতে যুদ্ধ এবং হত্যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সময় এসব ধারাকে কোরআনের আয়াতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনে করুন, এখন যদি কেউ এভাবে বলেন যে, ভগ্বদগীতায় স্বর্ণলাভের জন্য পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং সে গীতা থেকে যথার্থ অংশের উদ্ধৃতি না দেন তাহলে এ ধরনের কথা বিতর্কের জন্ম দেবে। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে থেকে কেউ যদি বলেন যে, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করা জরুরি যদি তা তোমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হয়– তাহলে এ বর্ণনা সবাই সহজেই বুঝতে পারবেন।

যখন ইসলামের সমালোচকগণ বিশেষ করে হিন্দু সমালোচকগণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও হত্যার দিকে তাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করেন তখন আমি বিস্মিত হয়ে যাই। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে এই যে, তারা হয়তো তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করেন নি। যেমন : ভগ্বদগীতা, মহাভারত এবং বেদ।

(চ) হিন্দুধর্মাবলম্বীসহ ইসলামের সমালোচনাকারিগণ কোরআন এবং নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে যখন বলেন, এতে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি জিহাদে রত থাকা অবস্থায় নিহত হও, তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারা এক্ষেত্রে সহীহ্ বোখারীর ৪র্থ খণ্ডের কিতাবুজ জিহাদের ৪৬ নং হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তিনি শাহাদাতবরণকারী মুজাজিদদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অন্যথায় তিনি তাকে সহীহ্ ছালামতে পুরস্কারসহ বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

ভগ্বদগীতার একাধিক ধারায় যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্বর্গে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন : ভগ্বদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৩৭ নং ধারায় বলা হয়েছে।

'হে কুন্তির সন্তান, হয়তো তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে, নতুবা তুমি বিশ্বরাজ্যকে জয় করে তা উপভোগ করবে। অতএব জেগে ওঠো এবং দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করো।'

(ছ) একইভাবে ঋগবেদের বই-১, স্তুতিস্তাবক-১৩২, ধারা ২৬ এবং আরো কয়েকটি হিন্দুধর্মগ্রন্থে যুদ্ধ এবং হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. অন্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে জিহাদের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা আল-কোরআনের তৃতীয় সূরা সূরায় আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ বলুন, এমন কথার প্রতি আসো যা তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্যই সমান।

ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার খণ্ডানোর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থে যেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণী আছে তার উদ্ধৃতি দেয়া।

যখন আমি এমন একজন হিন্দুর সাথে কথা বলবো যে ইসলামের জিহাদের ধারণার সমালোচক, তখন আমি মহাভারত এবং ভগ্বদগীতার সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বিবরণ রয়েছে তার উদ্ধৃতি দিব। কারণ, মহাভারতে যুদ্ধ সম্পর্কে যে বিবরণ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা খুব ভালো জানেন। এতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে আল- কোরআনের বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে বলবে যে, কোরআন যদি সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে তবে এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই এবং তারা আল-কোরআনে প্রদর্শিত সহানুভূতির প্রশংসা করবে (সূরা তওবা, আয়াত -৬)

১৭. আল-কোরআন এবং বেদের বর্ণনার সামঞ্জস্যতা

বেদে এমন কিছু ধারা রয়েছে যেগুলোর অর্থ আল-কোরআনের আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন–

ইসলাম ধর্ম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১. সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য। (সূরা ফাতিহা : ২)

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

২. 'তিনি অত্যন্ত দয়ালু, দয়াবান।' (সূরা ফাতিহা : ৩)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ ـ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

৩. আমাদেরকে সঠিক বা সহজ পথ প্রদর্শন করুন, যে পথে ঐসব লোক চলে গেছেন যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথে নয় যারা বিপথগামী হয়েছে এবং যাদের ওপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। (সূরা ফাতিহা : ৬ –৭)

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

৪. আপনি কি তাকে দেখেছেন যে, বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? অতঃপর সে তো ঐ লোক যে ইয়াতিমদের গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং ইয়াতিমকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় না। (সূরা মাউন : ১-৩)

হিন্দুধর্ম

১. 'নিশ্চয়ই স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার জন্য বৃহৎ গৌরব নির্ধারিত।' (ঋগবেদ, ৫ : ৮১-১)

২. 'সবচেয়ে বেশি দয়ার আধার।' (ঋগবেদ ৩ : ৩৪ : ১)

৩. 'আমাদেরকে উত্তম পথে চালিত করুন এবং পাপাচার থেকে মুক্তি দিন– যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং বিপদগামী করে।' (ইয়াজুর বেদ ৪০ : ১৬) একই বাণী ঋগবেদের বই - ১, স্তুতিস্তাবক-১৮৯, ধারা ১,২-এ বলা হয়েছে।

৪. 'ঐ লোক যার নিকট খাদ্য মওজুদ আছে, যখন কোনো অভাবী লোক অসহায় হয়ে তার নিকট খাদ্য ভিক্ষে করে তখন তার হৃদয় ঐ লোকের জন্য কঠোর হয়ে যায় এমনকি যদি কোনো বৃদ্ধ লোকও তাকে কাজ করে দেয় কাউকেই সে শান্তি দেয় না।' (ঋগবেদ ১০ : ১১৭ : ২)

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের শিক্ষার মধ্যে মিলসমূহ

১. মদ নিষিদ্ধ

(ক) পবিত্র কোআনের ৫ম সূরা, সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ্ জুয়া (উৎসর্গীকৃত) পাথর, তীর-ধনুক (যা দ্বারা বিভক্তি করা হয়) নিশ্চয়ই অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। তোমরা হয়তো (এগুলো থেকে বিরত থাকবে) সফল হতে পারবে।

(খ) বর্ণিত আছে –

(i) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে– 'আত্মহত্যাকারী, মদপানকারী, চোর এবং গুরুজনের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী এদের সবাই প্রতারক এবং আলাদাভাবে মহাপাপী হিসেবে পরিচিত হবে।'

দুটি ধারায় বলা হয়েছে–

(ii) মনুস্মৃতি ৯ : ২৩৮

'এসব মহাপাপী লোক, কারো তার সাথে একত্রে আহার করার জন্য উচিত নয়। কারো তার জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করা উচিত নয়। কারো তার সাথে অধ্যয়ন করা উচিত নয় এবং কারো তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। তাকে পৃথিবীর সব ধর্ম থেকেই বহিষ্কার করা উচিত।'

(iii) প্রায় একই কথা বলা হয়েছে মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ৫৫ নং ধারায়– 'শিকারি প্রাণীকে হত্যাকারী, মদপানকারী, চোর, গুরুর বিবাহ করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং এসব কাজের সাথে জড়িত লোকদেরকে অবশ্যই মহাপাপী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।'

(iv) মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ৯৪ নং ধারায়ও এরকমই বলা হয়েছে।

গ. মনুস্মৃতির বেশ কয়েকটি জায়গায় মদপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :

(i) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৩, ধারা-১৫৯

(ii) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৭, ধারা-৪৭

(iii) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৯, ধারা-২২৫

(iv) মনুস্মৃতির অধ্যায়-১১, ধারা-১৫১

(v) মনুস্মৃতির অধ্যায়-১২, ধারা-৪৫

(vi) ঋগবেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২, ধারা-১২

(vii) ঋগবেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২১, ধারা-১৪

২. জুয়া নিষিদ্ধ

পবিত্র আল-কোরআনের ৫ম সূরা, সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :

ঋগবেদের বই - ১০, স্তুতিস্তাবক - ৩৪, ধারা (৩ - ৪) এ বলা হয়েছে।

'একজন জুয়াখেলায় আসক্ত ব্যক্তি বলে, আমার স্ত্রী আমার সাথে শত্রুভাবাপন্ন, আমার মা আমাকে ঘৃণা করে। এসব উন্মাদ লোক কাউকেই সহ্য করতে পারে না।'

ঋগবেদের ১০ : ৩৪ : ১৩ ধারায় আরো বলা হয়েছে–

তাস খেলো না, অনুর্বর জমি চাষ করো না, লাভবান হও এবং মনে রেখ যে প্রচুর সম্পদ লাভ করবে।

মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে–

'মদ্যপান, জুয়া খেলা, স্ত্রীলোক (বিবাহ বহির্ভূত) এবং শিকার করা এবং যে তার জানা অনুচিত এদের শ্রেণি হচ্ছে পাপী।'

খ. মদপানকে নিম্নোক্ত ধারাগুলোর দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(i) মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৪৭ নং ধারা

(ii) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের (২২১–২২৮) নং ধারা

(iii) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৫৮ নং ধারা।

১৮. উপসংহার

এ গবেষণা কর্মটি মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীর অধিকতর নিকটে আসতে সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ। এ বইটি কেবল বরফ গলানোর কাজে কয়েকটি নির্দেশিকা। কিছু লোককে বোঝাতে দশটি ইশারা আবার কিছু লোককে বোঝাতে একশটি ইশারার প্রয়োজন হয়। আবার কিছু লোককে হাজারো ইশারা দেয়ার পরও সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। পবিত্র কোরআন এর ২য় সূরা, সূরা বাকারার ১৮ নং আয়াতে এসব বদ্ধ মানসিকতা সম্পন্ন লোকের ব্যাপারে বলেছে–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ـ

অর্থ : এসব লোক বোবা, কানা এবং অন্ধ তারা (সত্যপথে) প্রত্যাবর্তন করবে না।

সমস্ত প্রশংসা কেবল একক স্রষ্টা আল্লাহর জন্য, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায়। আমি প্রার্থনা করি যে, এ বিনয়ী কাজটি তিনি কবুল করে নেন। আর তাঁর নিকটই ক্ষমা এবং হেদায়াত কামনা করছি। আমিন।

ইসলামে নারীর অধিকার আধুনিক নাকি সেকেলে?

WOMEN'S RIGHTS IN ISLAM MODERNISING OR OUTDATED

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ সফিউল্লাহ (সফি)

বি. এস. এস সম্মান অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামি শিক্ষা বিভাগ

সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা

সূচিপত্র

১০. প্রশ্ন : আমি ভিমলা দালাল। পেশায় আইনজীবী। ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

১১. প্রশ্ন : আমার নাম বিলাল লালা। আমার প্রশ্ন হল, কেন ইসলাম আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি মুসলিম পুরুষদের দিয়েছে। মুসলিম মহিলাদের কেন আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আহলে কিতাব মহিলারা কি মুশরিক নয়?

১২. প্রশ্ন : আমি আকিলা ফাতেরপেকার। আমার প্রশ্ন হল, ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে দেয় না? সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন।

১৩. প্রশ্ন : আমার নাম রোসান রংওয়ালা। ডঃ জাকির! আপনি বলেছেন, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে সমানাধিকার দিয়েছে। তাহলে কেন নারীদেরকেও ৪টি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কি ৪টি বিয়ে করতে পারে না?

১৪. প্রশ্ন : আমি সরদারী হাকিম। আমার প্রশ্ন হল, আপনি বলেছেন যে, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে। কিন্তু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কি সে নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারে?

১৫. প্রশ্ন : আমি প্রকাশ লাট। বিশ্বাসী লোকদেরকে ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন, সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভাল বিষয় আছে। কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা নামে মানুষ নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রশ্ন হল, বই এ যা লিখা আছে, বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কি লেখা রয়েছে তাতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কি লেখা আছে, ওই বইয়ে কি লেখা আছে তা বলার চেয়ে কি করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার।

১৬. প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম, আমি কামার সাইদ। আপনি আপনার মূল্যবান বক্তৃতায় বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভরণ পোষণ করবে। কিন্তু যদি তারা সক্ষম না হয় তখন মেয়েটি কি করবে?

১৭. প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম। আমি সৈয়দ রিয়াজ। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনি যা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি বিশেষত উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

১৮. প্রশ্ন : আমি বিজয়, মুম্বাই আই আইটির ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো ইসলামে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ অনুমোদন করে না, এটি কি ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা?

১৯. 'প্রশ্ন : আমি সুজাত। আমার প্রশ্ন হল, মহিলাগণ কি এয়ারহোস্টেস হিসেবে চাকরি করতে পারবে? যেহেতু এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

২০. প্রশ্ন : আমি রশীদ শেখ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল ইসলামে সহশিক্ষার কি অনুমতি আছে?

২১. প্রশ্ন : আমি জানতে চাই, কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যাদান করার মত কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তারা কত শতাংশ?

২২. প্রশ্ন : আমি জেনিফার – আমার প্রশ্ন হলো কেবল স্বামীই কি স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোন নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কি করতে হবে?

২৩. প্রশ্ন : ইসলামে নারীদের কেন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি?

২৪. প্রশ্ন : আমি প্রশ্ন করতে চাই আজকের এ সম্মেলনটি 'ইসলামে নারীর অধিকার' এর ওপর কিন্তু মঞ্চে কেন একজনও নারী আলোচক নেই? কেন শুধু পুরুষ? যদি ব্যাপারটি এ রকম হয় যে, এটি এখানকার মহিলা শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন?

২৫. প্রশ্ন : স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

২৬. প্রশ্ন : আমার নাম ইয়ার হোসাইন। ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তবে কিভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করত?

২৭. প্রশ্ন : আমি মোহাম্মদ আসলাম গাজী। আমার প্রশ্ন হল, ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও সহ-শিক্ষা সংস্কৃতির কারণে বর্তমান সময়ে যৌন অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে – সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কি বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার ব্যাপার আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

২৮. প্রশ্ন : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি মিসেস রাজিয়া খান। আমার প্রশ্ন হলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক – কিন্তু কেন?

ইসলামে নারীর অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?

ড. মুহাম্মদ : আসসালামু আলাইকুম–

আপনাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

মুহতারাম বিচারপতি কাজী, মুহতারাম বয়োজ্যেষ্ঠগণ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, ভাই ও বোনেরা!

সামাজিক অনেক অসুস্থতা, সমস্যা এবং বৈরিতা আজ নারী সমাজ মোকাবিলা করছে এবং আমাদের আন্তরিকভাবেই তাদের জন্য টেকসই স্বচ্ছ ও মানবিক সমাধানের প্রয়োজন।

এ উদ্দেশ্যে অধিকতর সমসাময়িক বিশ্লেষণযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং মানবীয় আকর্ষণীয় বিষয় হলো 'নারী অধিকার'।

আমাদের সকলের অন্যান্য কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও এ উদ্দেশ্যেই এখানে সমবেত হয়েছি।

IRF-এর পক্ষ থেকে আমি ডা. মুহাম্মাদ নায়েক, কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর, আপনাদের সকলকে আন্তরিক আনন্দ ও হৃদয়ের গভীর নিষ্ঠা নিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছি।

আজকের প্রোগ্রাম আমরা যথারীতি ভাই আশরাফ মুহাম্মাদীর ক্বিরাত এবং পাশাপাশি ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমে শুরু করছি।

আশরাফ মুহাম্মাদী : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থ : অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

অর্থ : অসীম দয়াময়, পরম দাতা আল্লাহর নামে।

يٰـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۔ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۔

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করে উভয়ের মাধ্যমে অজস্র নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ভয় কর সে আল্লাহকে যার দ্বারা তোমরা পরস্পর অধিকার তলব কর, আরো সম্মান কর সেই মাতৃগর্ভকে (যা তোমাকে ধারণ করেছে)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।

ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও, আর উত্তম দ্বারা খারাপ জিনিস বদল করো না। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাঁদের সম্পদও খেয়ো না। নিশ্চয়ই সেটা হবে বড় অপরাধ। (সূরা নিসা : ১ - ২)

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ - আল্লাহ সত্যই বলেছেন।

ড. মুহাম্মাদ : আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে ধন্যবাদ, ভাই আশরাফ।

আজ ডা. জাকির নায়েক 'ইসলামে নারীর অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?' এ বিষয়ের ওপরে আলোচনা করবেন।

আজকের এই উন্মুক্ত ময়দানে ইসলামি আইন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন আমরা নারীর অধিকার ও নারীর প্রতি সুবিচার বিষয়ে আলোচনা করব, ঠিক সে মুহূর্তে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্তভাবে আমাদেরকে আনন্দিত করে এ প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত বিচারক, সম্মানিত বিচারপতি মুহাম্মাদ মুজীবুদ্দীন কাজী।

বিচারপতি ১৯৬৮ থেকে ১৯৮১-এ ১৩ বছর বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর শাখার সরকারি উকিল ছিলেন। সেখানকার মহারাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা।

বার থেকে বেঞ্চে উত্তীর্ণ বোম্বে হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি এম. সি. চাগরার পরে ১৯৮১ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

১৯৯২ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় ভারতের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা 'হিতওয়াদা' তাঁর সম্পর্কে লিখেছিল 'ক্ষণজন্মা ভদ্র বিচারকদের একজন বিচারক হলেন বিচারপতি কাজী।'

বিচারপতি কাজী বর্তমানে সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য ইতিপূর্বে তিনি নয়াদিল্লীতে ইসলামি এবং তুলনামূলক আইন জার্নালের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি কাজী মহারাষ্ট্র প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে সৌভাগ্যবান ও সম্মানিত হন। যা বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতির সমমর্যাদার পদ।

এটা হলো উচ্চ ক্ষমতাশীল ট্রাইব্যুনাল যা বোম্বে হাইকোর্টের সকল সরকারি চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত এবং একটি শাখা। সর্বোপরি তাঁর "Demeanor" হ্যান্ডবিল ও আচরণ এবং মানবের প্রকৃত অগ্রগতির গভীর আবেগ— তাঁকে বিশেষ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে— তিনিই আজকের চলমান (প্রোগ্রামের) সভাপতিত্ব করছেন।

তিনি আজকের বিষয়ের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবেন এবং সুপরিচিত ডা. জাকির নায়েক-এর পরিচিতিও দিবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা... বিচারপতি এম. এম. কাজী।

বিচারপতি এম. এম. কাজী : প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক, ডা. মোহাম্মদ নায়েক, প্রাক্তন গভর্নর ও অ্যামবেসেডর মি: তালইয়ার খান, বিদেশী সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ।

প্রথমেই আমি IRF-এর আয়োজকবৃন্দকে এ অধিবেশনে আমাকে সভাপতিত্ব করার উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেয়ার জন্য বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আমার বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য ডা. মুহাম্মাদ নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, আজকের সকালে যে বিষয়ে আলোচনা তা হলো, 'ইসলামে নারীর অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?'

আধুনিকায়ন অর্থ হলো— এমন কিছু যা সেকেলে বা প্রাচীন নয়, বিষয়টি যে অর্থ দান করে তা হলো— ১৪শ' বছর পূর্বে ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে তা কি আজও সচল?

শতাব্দীর পর শতাব্দী বর্ণালি সমাজ নারীদেরকে যে অবস্থানে রেখেছে সে বিতর্ক, যা বিলম্বে হলেও কিছু বিষয়ে সতর্কতার দাবি রাখে। যেমন তালাক, বহুবিবাহ, মুসলিম নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, যেগুলো বর্তমান মিডিয়ার মন্তব্য ও আলোচনার নিয়মিত বিষয়। সেখানে কিছু সমস্যা থাকতে পারে তবে মিডিয়া অতিরঞ্জিত করেছে একথাও অনস্বীকার্য।

সন্দেহ নেই যে, বিগত ২০০ বছর যাবৎ ক্ষয়িষ্ণু সংগ্রামের মাধ্যমে পশ্চিমা নারীরা আজ আর্থ-সামাজিক, আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলতে চাই, সেই সংগ্রাম ও পদ্ধতির মাধ্যমে সে সবকিছু হারিয়েছে।

সে হারিয়েছে, আপনারা যদি পশ্চিমা সমাজের প্রতি নিবিষ্ট হন, তাহলে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সে তার পারিবারিক জীবন হারিয়েছে, সে মনের শান্তি হারিয়েছে, এমনকি সে তার সম্মান-মর্যাদা এবং নারীত্বও হারিয়েছে।

অপরপক্ষে, ইসলাম তাঁকে দিয়েছে, ... তাঁকে দিয়েছে অসংখ্য অধিকার, ১৪শ' বছর পূর্বে — যখন সমসাময়িক সভ্যতাগুলো নারী জাতি আদৌ মানব কিনা। এ বিষয়ে চিন্তা করছিল।

অতএব আমাদেরকে বাস্তবতার আলোকে, আবেগহীন ও ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে নারীদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পর্যাপ্ত এবং বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য কী না?

আপনারা ভাগ্যবান যে, আপনারা ডা. জাকির নায়েকের মতো একজন প্রখ্যাত বক্তা পেয়েছেন, যিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করবেন। অতএব নারী অধিকার সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও রাসূল (স) এর হাদীসগুলো আমি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না।

যাহোক আমি দুটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই, যাতে ইসলামে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দানের বিষয়ে ঘোষণা আছে।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

অর্থ : তাদের মতো নারীদেরও একই ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তবে পুরুষের মর্যাদা এক স্তর ওপরে। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

আমি আপনাদের এ আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দ মনে রাখার অনুরোধ করব, এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার রয়েছে।

এ শব্দাবলি .... আয়াতের এ অংশ কুরআনের অন্য কোন অংশের দ্বারা মিশ্র বা ব্যাখ্যায়িত হয়নি। আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে– 'পুরুষের মর্যাদা নারীর এক স্তর ওপরে।'

এগুলো সে সব শব্দ যেগুলো সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ এখানে এসেই অধিকাংশ লোক থমকে দাঁড়ায়, এমনকি কিছু বিশ্লেষকরাও ভুল অর্থ গ্রহণের প্রয়াস পান।

শুরুতে আমি আপনাদের বলতে চাই– এর পরবর্তী অংশে অধিকার সংক্রান্ত কিছুই করার নেই। অধিকারগুলো যে সম্পর্কে আমি এইমাত্র বলেছি আমরা দেখেছি যা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে 'নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমঅধিকার রয়েছে।'

এ আয়াত পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে এ শব্দাবলি যাতে বলা হয়েছে– 'পুরুষের নারীদের ওপর এক স্তর বেশি সুবিধা রয়েছে।' আমরা সূরা নিসা, এর আরেকটি আয়াত নং-৩৪ এর দিকে তাকাই–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

অর্থ : পুরুষেরা নারীদের সংরক্ষক এবং ব্যবস্থাপক, কেননা আল্লাহ্ একজনের চেয়ে অন্য জনকে বেশি (শক্তি) দান করেছেন, আরো কারণ এই যে, পুরুষেরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাঁদের পিছনে। (সূরা নিসা : ৩৪)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুরুষ নারীদের সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক।'

আরো বলা হয়েছে– 'আল্লাহ্ একজনকে অপরের উপর অধিক দান করেছেন।'

স্বীকৃত যে, নারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

নৃবিদ্যার দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী এবং পৃথক প্রকৃতির অধিকারী যা জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতিই তাকে (পুরুষকে) এ সুবিধা দিয়েছে, এজন্য এ বিষয়ে পুরুষের কোন কৃতিত্ব নেই তেমনি নারীর কোন অসম্মানও নেই।

কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই, এ সুবিধা যা পুরুষকে দেয়া হয়েছে তা এজন্য যে, সে এ কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে (প্রাকৃতিকভাবে) সক্ষম।

দায়িত্ব যেটা তাকে দেয়া হলো, যা কিনা সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব, এ জন্য ব্যাপারে অধিকারের কোন বিষয় নেই যা আমি ইতোপূর্বে বললাম। এ সুবিধা নারীর গুরুত্ব এবং অধিকার কোনটাই কমায় না।

এখন যে প্রশ্নটা উঠে আসে...আমি আপনাদেরকে সে বিষয়ে ভাববার ও চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করি, তাহলো আজকের সামাজিক গঠন। আমার মতে, এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক দায়িত্ব পুরুষের জন্য তাহলো, নারীদের রক্ষা করা। এটা খুবই, আপনি দেখুন এটা খুবই গভীর অনুভূতি, যা অনুধাবন করা দরকার। একজনের জীবন রক্ষার অনুভূতি এটা কোন সামগ্রিক ও সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যই নয়, অনুগ্রহ করে বুঝার ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

আপনাকে আমি অনুরোধ করব এ বিষয়ে চিন্তা করার, পুরুষেরা তাদের কর্ম সম্পাদন করছে কি না? এবং যদি আপনি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চিত, আপনি এ উপসংহারে এসে পৌঁছাবেন যে, সকল পুরুষ তাদের গুরুদায়িত্বই ত্যাগ

করেছে... তা হলো নারীদের নিরাপত্তা। অতএব তারা তাদের মৌলিক কর্তব্যেই অবহেলা করেছে।

এ মুহূর্তে আমি কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না, কেননা আমার আয়ত্তে এ সময় নেই। (তবে এ প্রশ্ন থাকছেই) কে এই দুঃখজনক অবস্থা আনার জন্য দায়ী?

হতে পারে নারীরা। হতে পারে তারাও দায়ী...এ অবস্থা টেনে আনার জন্য।

কিন্তু বাস্তবতা থেকেই যাচ্ছে যে, বিশাল আকারে তার সম্মান ও মর্যাদাহানীর ফলশ্রুতিতে নারীর ওপর এ ধরনের অপরাধ এবং জুলুম চেপে বসেছে।

ভারতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারায় আমরা নারীত্বের পাপ মোচন করব। কোন নারীই এ ধরনের স্বাধীনতার জন্য বিতর্ক করবে না, আর না কোন পুরুষও রক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্বকে পরিত্যাগ করতে চাইবে।

নারী-পুরুষের এই চূড়ান্ত নাজুক সম্পর্ক একজন বিখ্যাত চিন্তানায়ক এবং কবি ড. ইকবাল 'নারীর সংরক্ষণ' নামক কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাটি উর্দুতে 'তিন জোড়া কবিতা' আবৃত্তির পরে আমি তা অনুবাদ করে শোনাব।

আল্লামা ইকবাল বলেন–

ایك زنده حقیقت میرے سینے میں هے مستور (٢)
کیا جانبگاوه جسکے راگوه میں هے لحو سرد (٢)
نه پرده نه تعلیم نیی هوکی پورانی
نسوا نیت ای جنکا نگاه بن هے فقط مرد
جس قوم نے زنده حقی جس قوم نے اس زنده حقیقت کونه پایا ۔
اس قوم کا خورشید بهت جلد هوا جرد ۔

অনুবাদ এই হবে :

ایك زنده حقیقت میرے سینے میں هی مستور

আমার হৃদয় মাঝে এক জীবন্ত সত্য আছে।

کیا سمجیگاوه جسکے راگوں سے هے لحو سرد

কি বুঝবে যার রগে ঠাণ্ডা রক্ত প্রবাহিত? অর্থাৎ যার অনুভূতি নেই।

نه پرده نه تعلیم نیی هوکی پوانی

পর্দাও নাই শিক্ষাও নাই...নতুন কি পুরাতন।

نسوانیت ای جنکا نگاه بان هے فقط مرد

নারীর মর্যাদার সংরক্ষক একমাত্র পুরুষই হতে পারে।

جس قوم نے یه زنده حقیقت کونه پایا ۔

যে জাতি এ বাস্তব সত্য না বুঝতে পারে

اس قوم کا خورشید بہت جلد هواجرد ۔

তার সৌভাগ্যের সূর্য অবশ্যই অস্তমিত হবে।

বন্ধুগণ! যা আমি এইমাত্র বলেছি...যে আমার হাতে একেবারেই সীমিত সময়, ডা. জাকিরও এখানে এসে পড়েছেন, যিনি বিষয়টা পুরোপুরি ... পুরোপুরিভাবেই এবং পর্যাপ্তভাবেই বলবেন।

আমি আপনাকে বলতে চাই যে, কুরআনে নারীদেরকে মর্যাদাপূর্ণ আসনই দিয়েছে। বাস্তব সমস্যা হলো একটি, সেটা হলো আমাদের অজ্ঞতা কুরআনের মূল বিষয় বুঝার ব্যাপারে। অতএব, প্রকৃত সমাধান হলো জনগণকে শিক্ষিত ও আলোকিত করে তোলা।

আমি এ মুহূর্তে থমাস জেফারসনের বিখ্যাত উক্তিটি মনে করিয়ে দিতে চাই...একটা জাতি যখন আশা করে...আশা করে অজ্ঞ থাকতে এবং স্বাধীন হতে, সে এমন আশা করে যা কোনদিন ছিল না এবং কোনদিন হবেও না।

وہ معجزتھے زمانے میں مسلمان ہوکر
اور تم خوار ہئے تارك قراں هوکر

'তাঁরা মুসলমান হয়েই যুগের সম্মানিত ছিলেন, আর তোমরা কুরআন ছেড়ে দিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছ।'

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! আমাদের মাঝে বোম্বের যুবক কিন্তু মেধাবী এবং দীপ্তিশীল বক্তা ডা. জাকির নায়েক আছেন। যদিও পেশায় তিনি একজন ডাক্তার, তিনি প্রচারের কাজে, ইসলাম প্রচারের কাজে, তাঁর সঠিক অর্থে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি IRF-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, যেটা ১৯৯১ সালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তিনি দেশে বিদেশে অনেক সফর করেছেন এবং অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। এ ধরনের যুবক বয়সেই তিনি কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। যা রবি ঠাকুরের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়– একটি বাতি অপর বাতিকে আলোকিত করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার নিজের শিখাকে প্রজ্বলিত না করে।

এটা অন্যায় হবে, এ মুহূর্তে আমি যদি এড়িয়ে যাই– আমি ডা. জাকির নায়েক এর সম্মানিত পিতা-মাতার কথা নাইবা বললাম, কিন্তু যাদের দিকনির্দেশনা এবং দোয়ায় ডা. জাকির নায়েক এ পর্যায়ে এসে পৌছেছেন। আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ড. মুহাম্মাদ : ড. জাকির নায়েকের বক্তব্য, আজকের বিষয়ের ওপরে – ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির :

মুহতারাম বিচারপতি এম. এম. কাজী, সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠগণ, আমার প্রিয় ভাই ও ভগ্নিগণ! আমি ইসলামি অভিভাষণের মাধ্যমে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের সকলের প্রতি। আজকের বিষয়– 'ইসলামে নারীর অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?'

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী– 'নারীর অধিকার হলো ঐ সকল অধিকার, যা একজন নারীকে সামাজিক এবং আইনগত সমতার দিক দিয়ে পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করে।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী– সেগুলো হলো ঐ সকল অধিকার, যা নারীদের জন্য দাবি করা হয়েছে – যা পুরুষের সমান – ভোট প্রয়োগ এবং সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

'আধুনিকায়ন' অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী এর অর্থ– 'আধুনিক করা, আধুনিক প্রয়োজন বা অভ্যাসের সাথে খাপ খাওয়ানো।'

ওয়েবস্টার শব্দকোষ অনুযায়ী এর অর্থ আধুনিক করা, নতুন বৈশিষ্ট্য (চরিত্র) বা আকৃতি দান করা যেমন– কারো ধারণার আধুনিকায়ন।

সংক্ষেপে, আধুনিকায়ন হলো বর্তমান অবস্থার চাইতে উন্নততর করার (হওয়ার) জন্য সমসাময়িক হওয়া বা একটি পথ বাছাই করা। এটা বর্তমান আধুনিক অবস্থা নয়।

আমরা কি নিজেদের আধুনিক বানাতে পারি, আমাদের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে, আমাদের জীবনের নতুন পন্থা উপলব্ধি করতে, সমগ্র মানব জাতির জন্যে?

আমি আধুনিক ধারণার সাথে জড়িত নই, উল্লিখিত বর্ণনা যেগুলো বিজ্ঞানীগণ এবং আরাম কেদারায় বসে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দিয়েছেন যে, মহিলাদের জন্য কিরূপ জীবন যাপন করা উচিত।

আমি যে বর্ণনা ও মন্তব্যগুলো পেশ করছি তার ভিত্তি সত্য এবং সেগুলো অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বাস্তব স্বচ্ছ বিশ্লেষণ এবং সত্যের ও তত্ত্বের ভিত্তিতে নিশ্চিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত।

আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তবতার আলোকে যাচাই করা উচিত, অন্যথায় অনেক সময়েই মানসিক প্রস্তুতি বৃথা হয়ে যায় — বাস্তবেই বড় বড় মেধাবীরা এক সময় বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী সমতল ছিল (গোলাকার ছিল না)।

যদি আমরা পশ্চিমা মিডিয়ার দ্বারা বর্ণিত রূপে 'ইসলামে নারীর অধিকার'-এর সাথে একমত পোষণ করি, তাহলে এ ছাড়া আর বিকল্প থাকে না যে, ইসলামে নারীর অধিকার সেকেলের।

নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা বক্তব্য বাস্তবে তাঁর দেহ ভোগের ছদ্মবেশী প্রতারণা, তার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা এবং তাঁর নারী সত্তাকে অবমূল্যায়ন করার নামান্তর।

পশ্চিমা সমাজ যারা নারীর মর্যাদাকে উন্নত করতে চায়, বাস্তবে তারা নারীদেরকে গৃহকর্ত্রী থেকে উপপত্নীর স্তরে নামিয়ে আনতে চায়, তাঁদেরকে প্রজাপতি নয় বরং সেক্স এর কারবারী ও আনন্দ অন্বেষণকারীর হাতের ক্রীড়নক বানাতে চায়, যা কিনা কৃষ্টি ও কালচারের রঙিন পর্দার আড়ালে ছদ্মবেশে বিদ্যমান।

ইসলামের মৌলিক বৈপ্লবিক আদর্শ, মহিলাদেরকে উপযুক্ত অধিকার ও মর্যাদা জাহেলিয়াতের যুগেই প্রদান করেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে।

ইসলামের লক্ষ্য ছিল এবং এখনো অব্যাহত আছে– আমাদের চিন্তাকে আধুনিক করা, আমাদের জীবন-যাপন, আমাদের দেখা-শুনা, সমাজে নারীদের শৃঙ্খলমুক্ত করা ও তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য আমাদের অনুভূতি ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় সামনে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করতে বলব।

এক. আনুমানিক পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মুসলিম। তবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রকমের। কোন কোন সমাজ ইসলামের কাছাকাছি আবার কোন কোন সমাজ অনেক দূরে অবস্থান করে (ব্যবহারিক দিক দিয়ে)।

দুই. 'ইসলামে নারীর অধিকার' এর বিচার হবে ইসলামের মূল সূত্রের আলোকে – মুসলমানরা কী করে এবং মুসলিম কী করে এর ওপর ভিত্তি করে নয়।

তিন. ইসলামের মূল সূত্রগুলো হলো, পবিত্র কুরআন– আল্লাহর বাণী এবং সুন্নাহ যা আমাদের প্রিয়নবী করীম ﷺ এর বাণী।

চার. কুরআন নিজের সাথে বৈপরীত্য করে না এবং ছহীহ হাদীসেও অন্য হাদীসের সাথে বৈপরীত্য নেই, এমনকি এ দুই মূল সূত্র কখনো একে অপরের সাথে বৈপরীত্য করে না।

পাঁচ. অনেক সময় পণ্ডিতগণ মতানৈক্য করেন, এ মতানৈক্য কুরআনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা দূর করা সম্ভব নয়। কারণ যদি কুরআনে নির্দিষ্ট কোন আয়াত যদি জটিল হয় তাহলে অনেক সময়ই কুরআনেরই অন্য কোথাও তার সমাধান আছে। কিছু লোক হয়তো এক সূত্র উল্লেখ করে অন্যগুলোকে অবহেলা করতে পারে।

ছয়. সর্বশেষ হলো, প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ যাই হোক তার কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় কাজ করা। নিজের মতে সন্তোষ অর্জন ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এখানে সমতা মানে অভিন্নতা নয়।

ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের, বিরোধিতার নয়, যা শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে লিপ্ত করে।

যেখানে "ইসলামে নারীর অধিকার" তাকে আমি ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছি।

১. আত্মিক অধিকার

২. অর্থনৈতিক অধিকার

৩. সামাজিক অধিকার

৪. শিক্ষার অধিকার

৫. আইনগত অধিকার

৬. রাজনৈতিক অধিকার।

১. আত্মিক অধিকার

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এই যে, তারা চিন্তা করে...ইসলামে জান্নাত শুধু পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

এ ভুল ধারণা ৪নং সূরা নিসার ১২৪নং আয়াত-এর দ্বারা দূর করা যায়। মহান রব বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ـ

অর্থ : তোমাদের যে কেউ সে নারী হোক বা পুরুষ মুমিন সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না।

একই রূপ বর্ণনায় ১৬নং সূরা আন নাহলে ৯৭নং আয়াতে মহান রব বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎ আমল করবে সে নারী-পুরুষ যাই হোক না কেন তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব।

এটা এ কারণে যে, ইসলামে জান্নাতে প্রবেশের জন্য লিঙ্গ জেন্ডার কোন মাপকাঠি নয়। আপনি কি এ ধরনের অধিকারকে আধুনিক বলবেন না কি সেকেলে বলবেন?

আরেকটি ভুল ধারণা, যেটা পশ্চিমা মিডিয়ার রয়েছে তা হলো– 'নারীর কোন আত্মা নেই।'

বাস্তবে এটা ছিল সপ্তদশ শতকে, যখন বিত্তবানদের কাউন্সিল রোমে সমবেত হয়েছিল এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছিল যে, নারীর কোন আত্মা নেই।

অথচ ইসলামে নর-নারীর একই প্রকৃতির আত্মা রয়েছে এবং আমাদের যুবক ক্বারী ভাই আশরাফ মুহাম্মদীর দ্বারা পরিষ্কার হয়েছে। যিনি ৪নং সূরা নিসার প্রথম থেকে তেলাওয়াত করেছেন।

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔

অর্থ : ওহে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের প্রভুর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গিনীকে।

পুনরায় ৪২নং সূরা আশ শুয়ারার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۔

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া তৈরি করেছেন।

শুধু এ কারণে যে, ইসলামে নর-নারীর আত্মার প্রকৃতি একই। আপনারা ইসলামে এ ধরনের অধিকারকে আধুনিক বলবেন নাকি পশ্চাৎপদ?

আল-কুরআন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আত্মা মানবের মধ্যে ফুঁকে দিলেন। আপনারা যদি ১৫নং সূরা আল-হিজর-এর ২৯ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ বলেন–

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۔

অর্থ : অতঃপর আমি যখন তাঁকে [আদম (আ.) কে] সুষম করব এবং তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিব তখন তোমরা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যেও।

একই বিষয় ৩২নং সূরা সাজদার, ৯নং আয়াতে মহান রব পুনরায় বলেন–

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ۔

অর্থ : অতঃপর তাঁকে তিনি সুষম করলেন এবং তার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন।

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যে বললেন– 'তাঁর (মানবের) মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন' এর অর্থ যীশুর রক্তমাংস দেহ বা সর্বেশ্বরবাদী তত্ত্বের রূহ ফুঁকে দেয়া অবশ্যই নয়।

বস্তুত এখানে খ্রিস্টান ও হিন্দুদের কাল্পনিক বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

এর অর্থ হলো, আল্লাহ প্রত্যেক মানবকে তাঁর থেকে আত্মিক প্রকৃতি দান করেছেন, আরও দান করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞান যাতে মানবতা তার নিকটবর্তী হতে পারে।

আরো কথা হলো, এখানে আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের কথাই বলা হয়েছে, উভয়কেই আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁক দেয়া হয়েছিল।

পুনরায় আমরা আল-কুরআনে পড়ছি যে আল্লাহ মানবকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। যেন মানুষ তাঁর ফরমান দুনিয়ায় জারি করতে পারে।

১৭ নং সূরা ইসরায় ৭০নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۔

অর্থ : আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকেই বিশেষ মর্যাদা দান করেছি।

এখানে সকল আদম সন্তানকে সম্মানিত করা হয়েছে পুরুষ এবং নারীকে।

কিছু ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, যেমন বাইবেল, যা মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আ)-কে দায়ী করে। বাস্তবে যদি আপনি আল-কুরআনের ৭নং সূরা আরাফ ১৯ থেকে ২৭ নং আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, দেখবেন সেখানে আদম ও হাওয়াকে এক ডজনের অধিক বার সময় সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়েই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন, উভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করেছিলেন এবং উভয়কে ক্ষমা করা হয়েছিল।

বাইবেলের জেনেসিস ৩য় অধ্যায় পড়লে দেখবেন মানবতার পতনের জন্য শুধু হাওয়া (আ)-কে দায়ী করা হয়েছে এবং 'মূল পাপ'এর বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আ)-এর কারণে সকল মানবতা পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। বাইবেলের জেনেসিস, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে বলা হচ্ছে– নারীদের লক্ষ্য করে : তুমি গর্ভধারণ করবে, দুঃখের মাঝে জন্ম দেবে, তোমার আশা হবে তোমার স্বামী এবং

সে তোমাকে শাসন করবে। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানকে বাইবেলে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসববেদনা এক ধরনের শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে যদি আপনি আল-কুরআন তেলাওয়াত করেন, দেখবেন গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মদান নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

৩১ নং সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৪-তে বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। তাই আমি নির্দেশ দিলাম আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।

৪৬নং সূরা আহকাফ, আয়াত নং ১৫-এ একই নির্দেশ–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا.

অর্থ : আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। 'তাঁর মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে।

কষ্ট সহ্য করে তাকে দুগ্ধ দান করেছে। আল-কুরআনে গর্ভধারণ নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেনি।

এই যে, গর্ভধারণে ইসলামে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করল এ ধরনের অধিকার দানকে আপনি আধুনিক নাকি সেকেলে বলবেন?

আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া' তথা খোদাভীতি বা 'ন্যায়নীতি'।

সূরা আল হুজুরাতে ১৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

অর্থ : ওহে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদের এক জোড়া মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পরিচিতির জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ এগুলো ইসলামের কোন মাপকাঠি নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে মাপকাঠি হল 'তাকওয়া'। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ কি নারী এ কোন মাপকাঠি নয়।

যদি আপনি ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করলে দেখবেন– আল্লাহ্ বলেছেন–

أَنِّيْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

অর্থ : আমি তোমাদের কোন কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে নারী হোক কি পুরুষ, তোমরা পরস্পরের সঙ্গী।

আমি আমার বক্তব্য ৩৩ নং সূরা আল আহযাব এর ৩৫নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। যাতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ – মুসলিম নর ও মুসলিম নারীর জন্য

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ – বিশ্বাসী নর ও নারীর জন্য

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ – একনিষ্ঠ নর ও নারীর জন্য

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ – সত্যবাদী নর ও নারীর জন্য

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ – ধৈর্য ও সহনশীল নর ও নারীর জন্য

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ – বিনয়ী নর ও নারীর জন্য

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ – সৎ নর ও সতী নারীর জন্য

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ – রোযাদার নর ও নারীর জন্য

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ – লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নর ও নারীর জন্য

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرٰتِ – আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী নর ও নারীর জন্য

আয়াতের শেষে আল্লাহ্ বলেন–

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيْمًا۔

অর্থ : আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এ আয়াতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে আত্মিক কর্তব্য, নৈতিক কর্তব্য নারী-পুরুষের জন্য সমান।

উভয়কে ঈমান আনতে হবে, সালাত আদায় করতে হবে, উভয়কে সাওম পালন ও যাকাত আদায় করতে হবে ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলামে নারীদের জন্য বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন করেছে।

যদি তিনি ঋতুমতী বা গর্ভবতী হন তাহলে তাঁকে রোযা রাখতে হবে না, তবে পরবর্তিতে স্বাস্থ্য ভাল হলে রোযা পালন করবেন। ঋতুকালীন ও সন্তান জন্মদানের পর তাঁকে নামাযও পড়তে হয় না। পরবর্তীতেও এ সালাত আদায় করতে হবে না।

২. অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে।

একজন পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত হন বা নাই হন, কারো সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই সম্পদের মালিক হতে পারেন, বিলি-বণ্টন করতে পারেন, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারেন।

১৮৭০ সালে প্রথম ইংল্যান্ডে বিবাহিত মহিলাকে কারো সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন ও বণ্টন করার আইনগত অধিকার দান করা হয়।

আমি এ বিষয়ে একমত যে, ইসলাম নারীদেরকে ১৪০০ বছর (পশ্চিমাদের তুলনায়) পূর্বে যে অর্থনৈতিক অধিকার দান করেছে এটা অনেক পুরাতন অধিকার। সেগুলো কি আধুনিক নাকি সেকেলে?

ইসলামে একজন নারী যদি কাজ করতে চায় তাহলে করতে পারে, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কোন দলিল নেই, যতক্ষণ না তা হারাম হবে, সে বাইরেও যেতে পারবে তবে (তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে) শরীয়াহ্ সমর্থিত পোশাক পরিধান করে যেতে হবে।

কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে তিনি তাঁর দেহ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনীমূলক কোন কাজে অংশ নিতে পারবেন না। যেমন মডেলিং, অশ্লীল সিনেমা এবং এ ধরনের নানাবিধ কাজে। আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ আছে যা নারীর জন্য হারাম, পুরুষের জন্যও হারাম। যেমন– সুরা বা মদ সরবরাহ করা। জুয়া খেলা, অন্যান্য অসৎ ব্যবসা এ

সকল কাজ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। সত্যিকার মুসলিম সমাজ নারীদের ডাক্তারি পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করে। আমাদের মহিলা গাইনোকোলজিস্ট দরকার। আমাদের মহিলা নার্স দরকার, মহিলা শিক্ষিকা দরকার।

কিন্তু একজন মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবারের পুরুষের ওপর ন্যস্ত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আছে, সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এখানেও তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, তিনি তার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন।

আমি যে সকল পেশার কথা উল্লেখ করলাম এর বাইরে তিনি ঘরে দর্জির কাজ করতে পারেন। এমব্রয়ডারী, কুমারের কাজ বা ঝুড়ি তৈরির কাজসহ তার সাধ্যানুযায়ী যে কোন বৈধ কাজ করতে পারেন।

তিনি ফ্যাক্টরি বা ছোট আকারের কারখানা যেগুলো নারীদের জন্য করা হয়েছে, সেখানেও কাজ করতে পারেন।

তিনি এমন স্থানে কাজ করতে পারেন যেখানে নারীদের জন্য পৃথক সেকশন করা আছে। কেননা ইসলামে নারী-পুরুষে মেলামেশার বিধি-নিষেধ রয়েছে।

তিনি ব্যবসা করতে পারেন, যেখানে লেনদেনের প্রশ্ন আসে, বিশেষ করে বিদেশী কোন পুরুষ বা গায়রে মাহরামের সাথে লেন-দেনের প্রশ্ন আসে সেখানে তিনি পিতা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্রের মাধ্যমে এগুলো করতে পারেন।

সর্বোত্তম উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দিতে পারি বিবি খাদীজা (রা.)-এর যিনি আমাদের প্রিয়নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন এবং তিনি তাঁর লেন-দেন তাঁর স্বামী নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে করতেন। একজন নারী পুরুষের তুলনায় অধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে। যেমন পূর্বেই আমি আপনাদের বলেছি, অর্থনৈতিক দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তায় না। এটা পরিবারের পুরুষের ওপর। এটা পিতা, বা ভ্রাতার ওপর বিয়ের পূর্বে। বিয়ের পর স্বামী অথবা সন্তানের ওপর। বিয়ের পর তার থাকা, খাওয়া, পোশাক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব তার স্বামীর ওপর বর্তায়।

বিয়ের সময় তিনি অংশ পাচ্ছেন। তিনি একটা উপহার পাচ্ছেন, যাকে বলা হয় 'দেনমোহর'। এটাও আল-কুরআনের ৪নং সূরা আন নিসার ৪নং আয়াতের নির্দেশ–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً –

অর্থ : নারীদের তাদের মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়ে দাও।

বিবাহকে ইসলাম পবিত্র করণার্থে দেনমোহর আবশ্যকীয় করেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শুধু নামকা ওয়াস্তে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়, কুরআনের নির্দেশের নামান্তর মাত্র। যেমন- ১৫১ রুপী, বা কোন কোন লোক ৭৮৬ রুপী, অথচ তারাই রিসিপশন, সাজানো, ফুল, দুপুরের ও রাতের খাবারের পিছনে লাখ লাখ রুপী খরচ করছে।

ইসলামে দেনমোহর নির্ধারণের কোন সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। কিন্তু যখন কেউ রিসিপশনেই লাখ লাখ রুপী খরচ করে তখন দেনমোহর এর তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া উচিত।

মুসলিম সমাজে বহু অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষ করে পাক-ভারত এলাকায়। তারা সামান্য দেনমোহর দিয়ে আশা করে স্ত্রীর নিকট হতে ফ্রিজ, টিভি, আসবাব, আশা করে স্ত্রী তাকে ফ্লাট দিবে, গাড়ি দিবে ইত্যাদি এবং বিরাট অংকের যৌতুক স্বামীর মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে। সে যদি গ্রাজুয়েট হয় তাহলে ১ লাখ রুপী আশা করতে পারে, যদি প্রকৌশলী হয় তাহলে ৩ লাখ, যদি ডাক্তার হয় তাহলে ৫ লাখ।

যৌতুক দাবি করা.... একজন স্বামীর জন্য তাঁর স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যদি কনের পিতা-মাতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কোন কিছু দেয় তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোর করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যদি কোন মহিলা চাকরি করে, সে যে আয়-ই করুক, এগুলো সম্পূর্ণরূপে তাঁর সম্পত্তি। এক পাইও তার স্বামীর জন্য খরচ করতে সে বাধ্য নয়। তবে যদি স্বেচ্ছায় করতে চায়, সেটা তাঁর ব্যাপার। স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তাঁর থাকা-খাওয়া ও পূরণের খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে। যদি তালাকের মতো বা স্বামী হারানোর মতো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে 'ইদ্দত' কাল পর্যন্ত খোরপোশ পাবে। সন্তান থাকলে তাদের খরচও লাভ করবে। ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকার দান করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে। যদি আপনি কুরআন অধ্যয়ন করেন তাহলে সূরা নিসা, সূরা বাকারা ও সূরা মায়িদার বহু আয়াতে আপনি পাবেন একজন নারী তিনি স্ত্রী, মা, বোন বা কন্যা যাই হন না কেন তার উত্তরাধিকার রয়েছে এবং এগুলো আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা) কর্তৃক আল-কুরআনে নির্ধারিত। আর আমি জানি, প্রশ্ন রয়েছে ইসলামের উত্তরাধিকার ন্যায়ত নয়। কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার করার সময় আমি পাব না। তবে আল্লাহ চাইলে আমি আশা করি এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন পাব এবং তখন বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব।

৩. ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার

একে চারটি উপ-বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সামাজিক অধিকার যেগুলো দেয়া হয়েছে– কন্যাকে, স্ত্রীকে, মাকে ও বোনকে।

কন্যাকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে সেদিকে আসছি। ইসলাম নারী শিশু হত্যা নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে সূরা তাকভীরের ৮ ও ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ـ

অর্থ : যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

শুধু কন্যা সন্তান হত্যাকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি? সকল প্রকারের শিশু যে পুত্র শিশু বা কন্যা শিশু যাই হোক না কেন?

৬নং সূরা আনআমের ১৫১ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ـ

অর্থ : আর তোমরা খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমরাই তোমাদের ও তাদের আহার যোগাই।

একইরূপ বর্ণনা ১৭নং সূরা ইসরা-এর ৩১ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

অর্থ : আর খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের শিশুদের হত্যা করো না, আমরাই তাদের রিযিক দেই ও তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা বড় ধরনের অপরাধ।

ইসলামপূর্ব আরবে যখনই কোন কন্যা শিশু জন্মলাভ করত, তাদের বেশিরভাগকেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে এ শয়তানি প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও আমাদের ভারতে এ কুপ্রথা চলছে। বি. বি. সি. রিপোর্ট অনুযায়ী, 'তাকে (কন্যা) মরতে দাও' নামক অনুষ্ঠানে এমিনি বেকমেন নামক একজন ব্রিটিশ নাগরিক যিনি ব্রিটেন থেকে ভারতে কন্যা শিশু হত্যার পরিসংখ্যান প্রদানের জন্য এসেছিলেন, তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী–

এ প্রোগ্রামটি এক বছরেরও বেশি পূর্বে স্টার টি. ভি. প্রচার করেছিল, আলহামদু লিল্লাহ এটা প্রত্যেক মাসে দেখানো হচ্ছিল এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও এর পুনঃপ্রচার করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামে এ পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক দিন ৩,০০০ এরও অধিক ভ্রূণ হত্যা করা হয় এটা জানার পর যে, সেগুলো কন্যা। যদি আপনি এ সংখ্যাকে ৩৬৫ দ্বারা গুণ করেন তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের দেশে প্রতি বছর এক মিলিয়নেরও অধিক কন্যা ভ্রূণ-এর গর্ভপাত করানো হচ্ছে। আর তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাষ্ট্রে বড় বড় পোস্টার ও প্রচারপত্র শোভা পাচ্ছে যেগুলোতে বলা হচ্ছে : ৫০০ রুপী খরচ করুন ৫ লাখ রুপী বাঁচান।

এর অর্থ কি? যে আলট্রাসনোগ্রামী বা ঐ ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষায় ৫০০ রুপী খরচ করে দেখুন যে, মা কী শিশু বহন করছেন? যদি কন্যার ভ্রূণ হয় তাহলে গর্ভপাত করুন এবং পাঁচ লাখ রুপী বাঁচান– কিভাবে?

তাকে লালন-পালন করতে কয়েক লাখ রুপী খরচ হবে বাকি তার বিয়ের যৌতুক হিসেবে। তামিলনাড়ু সরকারি হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী–জন্মগ্রহণকারী প্রতি ১০টি কন্যা শিশুর মধ্যে ৪টি শিশুকে মারা যাওয়ার জন্য রেখে দেয়া হয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারতে পুরুষ জনসংখ্যার চাইতে নারী জনসংখ্যা কম। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ আমাদের দেশে কন্যা শিশু হত্যাযজ্ঞ চলে আসছে। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন ১,০০০ পুরুষের বিপরীতে ৯৭২ জন মহিলা ছিল। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান ও আদমশুমারি অনুযায়ী ১,০০০ পুরুষের বিপরীতে ৯৩৪ জন নারী। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ১,০০০ জন পুরুষের বিপরীতে ৯২৭ জন নারী। আপনি বিশ্লেষণ করলে আরও দেখতে পাবেন যে, নারীর অনুপাত দিন দিন কমছেই এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে এ ধরনের শয়তানি চর্চা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম আপনাদের সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছে। সে শিশু ছেলে শিশু বা মেয়ে শিশু যাই হোক না কেন? আপনি কি এ সকল অধিকারকে আধুনিক বলবেন নাকি সেকেলে?

ইসলাম নবজাতককে হত্যা করতেই কেবল নিষেধ করেনি, বরং এই হত্যাকাণ্ডের কঠোর তিরস্কার করে এবং পুত্র সন্তান জন্মের আনন্দকেও ঘৃণা করে এবং কন্যা সন্তান হত্যা করাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

যদি আপনি ১৬ নং সূরা নাহল-এর ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াত পড়েন, আপনাকে বলছে–

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ـ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থ : যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের ফয়সালা কতই না নিকৃষ্ট।

ইসলামে একজন কন্যাকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হবে। আহমদ শরীফের একটি হাদীস অনুযায়ী রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে যথাযথভাবে লালন করবে, সে শেষ বিচারের দিন এরকম আমার সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আমার খুবই নিকটবর্তী হবে।

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে কোন ব্যক্তি ২টি কন্যাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করবে, তাদের ভালভাবে যত্ন করবে, তাদেরকে স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইসলামে ছেলেমেয়ে লালন পালনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা যাবে না। রাসূল ﷺ এর আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর উপস্থিতিতে এক লোক তার ছেলেকে চুমু দিল এবং উরুর ওপর রাখল কিন্তু মেয়ের সাথে তেমনটি করল না। রাসূল ﷺ সাথে সাথে এ ঘটনার প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, তুমি অন্যায়কারী, তোমার উচিত তোমার মেয়েকেও চুম্বন করা এবং তাকে অন্য উরুতে বসানো। নবী করীম ﷺ ন্যায় বিচারের কথা শুধু মুখেই বলতেন না বাস্তবেও নমুনা উপস্থাপন করতেন।

ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার

পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাই নারীকে 'শয়তানের যন্ত্র' হিসেবে বিবেচনা করত। কুরআন নারীকে 'মুহসানা' আখ্যা দিয়েছেন যার অর্থ 'শয়তান থেকে সুরক্ষিত।' ভাল নারীকে একজন বিয়ে করলে সে তাকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর টিকিয়ে রাখে— যেটা হচ্ছে সঠিক পথ।

একটি হাদীসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, 'ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই।'

সহীহ আল-বুখারীর ৭ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ৪নং হাদীসে রাসূল ﷺ যুব সম্প্রদায়কে বলেন, যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে। এটা তাদের চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।

আনাস (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে বিয়ে করে সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে।

একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ দু'বার বিয়ে করে তবে তার দ্বীন পূর্ণ হবে বলে কি এখানে ইঙ্গিত আছে?

লোকটি রাসূল ﷺ-এর বাণী ভুল বুঝতে পেরেছে।

যখন রাসূল ﷺ ঘোষণা করলেন, যখন তুমি বিয়ে করলে তখন অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করলে এর অর্থ হলো, যখন তুমি বিয়ে করলে, এটা তোমাকে অবাধ যৌনতা, ব্যভিচার, সমকাম ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, যা এ পৃথিবীর অর্ধেক পাপ।

শুধু বিয়ের মাধ্যমেই আপনি স্বামী বা স্ত্রী হতে পারেন, বিয়ের মাধ্যমেই আপনি পিতা-মাতা হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। পিতা-মাতার কর্তব্য, অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্যের খুবই গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। সুতরাং কেউ এক, দুই, তিন বা চার বিয়ে করলে কোন পার্থক্য নেই, সে দ্বীনের অর্ধেকই পূর্ণ করল।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছি।'

যদি আপনি ৩০ নং সূরা রূম-এর আয়াত নং ২১ পড়েন, যেখানে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً -

অর্থ : আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গীদের বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, তদুপরি তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

৪নং সূরা নিসার ২১ নং আয়াত অনুযায়ী বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি, পবিত্র কনটাক্ট। ৪নং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ـ

অর্থ : হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা যায়েজ নেই।

অর্থাৎ বিয়েতে উভয়ের অনুমতি ও সম্মতি প্রয়োজন। এটা আবশ্যক যে, নর-নারী উভয়কে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে অন্য কেউ এমনকি পিতাও তার কন্যার অসম্মতিতে জোর করতে পারবেন না।

সহীহ্ আল বুখারীর ভলিউম-৭, অধ্যায়-৪৩, হাদীস নং-৬৯-এর হাদীসে বলা হয়েছে– এক নারীর বিয়ে তার অসম্মতিতে তার পিতা দিয়েছিলেন, তিনি মহানবীর নিকট গেলেন, মহানবী (স) তার বিয়ে বাতিল করে দেন।

ইবনে হাম্বল-এ ২৪৬৯ নং হাদীসে আছে এক কন্যাকে তার অসম্মতিতে বিয়ে দেন তার পিতা, বিষয়টি কন্যা রাসূলের নিকট পেশ করলে, রাসূল ﷺ বললেন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে বহাল রাখতে পার, অন্যথা বিয়ে বাতিলও করতে পার। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতি দরকার।

ইসলামে নারীকে 'হোম মেকার'-এর মর্যাদা দিয়েছে। সে হাউস ওয়াইফ নয় কারণ তাকে হাউস-এর সাথে বিয়ে দেয়া হয়নি। অনেক লোক অর্থ না জেনেই পরিভাষা ব্যবহার করে। হাউস ওয়াইফ অর্থ হাউজ-এর স্ত্রী গৃহবধূ। সুতরাং আমার বিশ্বাস গৃহিণী না বলে এখন থেকে আমার বোনেরা তাদেরকে হোম মেকার বলা বেশি পছন্দ করবেন। কেননা তারা বেশি হোমেই থাকেন। ইসলামে একজন নারীকে মনিবের সাথে বিয়ে দেয় না যে, তার সাথে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করবে, তাকে সমমর্যাদার একজনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়।

ইবনে হাম্বল-এর হাদীস নং ৭৩৬, ৭৩৯৬ এখানে বলা হয়েছে পরিপূর্ণ মুমিন তারাই, যারা চরিত্রে ও আচরণের দিক দিয়ে সর্বোত্তম এবং তারা যারা তাদের পরিবার ও স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।

ইসলাম নর-নারীকে সমান অধিকার দান করেছে, যেমন মুহতারাম বিচারপতি এম, এম, কাজী উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন বলে, নর-নারী, স্বামী-স্ত্রীর সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার শুধু পরিবারের নেতৃত্বের ক্ষেত্র ছাড়া, এটা আল-কুরআনের ২নং সূরা বাকারার ২২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ـ

অর্থ: নারীদের পুরুষের ওপর তেমনি ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে যেমনি রয়েছে পুরুষের নারীদের ওপর, তবে তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক স্তর বেশি।

আমি সম্পূর্ণরূপে বিচারপতি এম. এম. কাজীর সঙ্গে একমত যে, বেশিরভাগ মুসলিম এ আয়াতটি ভুল বুঝেছেন। কেননা বলা হয়েছে, "পুরুষের এক স্তর বেশি" আমি বলেছি আমাদের কুরআনকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

এটাই ৪নং সূরা নিসার ৩৪নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ـ

অর্থ : পুরুষেরা নারীদের রক্ষক ও ব্যবস্থাপক কেননা আল্লাহ্ একজনকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন অপরজন থেকে এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।

লোকেরা বলেন قَوَّامٌ অর্থ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, কিন্তু বাস্তবে قَوَّامٌ শব্দটি قَامَةٌ। শব্দমূল থেকে এসেছে। ইকামাত অর্থ যেমন আপনি নামাযের পূর্বে ইকামাত দেন আপনি দাঁড়ান। সুতরাং ইকামাত অর্থ দাঁড়ানো। অতএব কওয়াম শব্দের অর্থ দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়। এমনকি আপনারা যদি ইবনে কাছীরের তাফসীর পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়। এ দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিতে পালিত হবে। এটাই ২নং সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ

অর্থ : তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।

পোশাকের উদ্দেশ্য কী? এটা ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, একে অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন, এটা হাত এবং হাতমোজার সম্পর্ক। আল-কুরআন বলে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে পছন্দ নাও কর, তার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

৪ নং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا ط وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো যদি তোমরা তাদের কোন কিছু অপছন্দও কর, হতে পারে আল্লাহ তার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ তোমরা তা অপছন্দ করছ। এমনকি আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে অপছন্দও করেন, আপনাকে তার সঙ্গে দয়া-মমতার আচরণ করতে হবে।

এ কারণে যে, ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সমান। ইসলামে এ ধরনের অধিকারকে আপনি আধুনিক বলবেন নাকি সেকেলে?

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার :

মায়ের সম্মানের ওপরে এক সম্মানই আছে তাহলো আল্লাহর ইবাদত। ১৭ নং সূরা ইসরা এর ২৩ নং আয়াত দেখুন –

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ـ

অর্থ : আর আপনার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।

যদি একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যান তখন এমন শব্দ তাদের সামনে বলবেন না যাতে তারা কষ্ট পায়, বরং সম্মানের সাথে কথা বলবে, তোমাদের দয়ার ডানাকে তাদের ওপরে ছড়িয়ে দিবে এবং বলবে প্রভু আমার। তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা স্নেহ দিয়ে আমাদের লালন করেছেন ছোটবেলা।

৪নং সূরা নিসা ১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন– 'সম্মান কর সে মাতৃগর্ভের যা তোমাকে বহন করেছে।'

৬নং সূরা আন আমের ১৫১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন – وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

৩১নং সূরা লুকমানের ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ –

অর্থ : আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য, তার মাতা তাকে কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে দু বছর যাবৎ দুগ্ধদান করেছে। তোমরা আমার প্রতি ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

একই কথা ৪৬ নং সূরা আহকাফ-এর ১৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا

অর্থ : আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য, কষ্ট সহ্য করে তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন; কষ্ট সহ্য করে তার মাতা তাকে প্রসব করেছেন।

ইবনে মাজাহ ও আহমদে বর্ণিত একটি হাদীস— 'জান্নাত মায়ের পদতলে।' এর অর্থ এই নয় যে, মাতা রাস্তায় হাঁটছেন আর তার পদধূলি, ময়লা ইত্যাদি জান্নাত হবে।

সহীহ বুখারীর ভলিউম ৮, অধ্যায়-২, হাদীস নং-২ এবং সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত, এক লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এ দুনিয়ায় কে আমার সদ্ব্যবহার ও সম্মান পাওয়ার বেশি হকদার? রাসূল উত্তর দিলেন, তোমার মাতা, তারপর কে? তোমার মাতা। তারপর কে? তোমার মাতা। লোকটি চতুর্থ বার

জিজ্ঞেস করল তারপর কে? নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার পিতা। ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান।

চারভাগের তিনভাগ সম্মান, মর্যাদার প্রথমাংশ বরং উত্তমাংশ মাতার জন্য, বাকি চার ভাগের এক ভাগ সম্মান এবং মর্যাদা পিতার জন্য। সংক্ষেপে স্বর্ণের মেডেল মায়ের জন্য রৌপ্যের মেডেল পিতার জন্য, আবার ব্রোঞ্জের মেডেল মাতার জন্য হলে পিতার জন্য শুধু সত্ত্বনা পুরস্কার।

আমি খুবই খুশি, আমার ভায়েরা এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় সাধারণত আমি ক্ষমা চাই যাতে না আমার ভাইদের মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আমি দুঃখিত ইসলাম আমাকে এরূপই বলে। তারপরও আমি খুশি যে, এখানে আমার যে ভাইয়েরা রয়েছেন তারা ইসলাম বুঝতে পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বোন হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার

৯ নং সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ـ

অর্থ : আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।

এখানে اَوْلِيَاۤءُ শব্দের অর্থ সহায়ক ও ব্যবস্থাপক, তারা একে অপরের সহায়ক ও ব্যবস্থাপক। সংক্ষেপে, তারা পরস্পরের ভাই বোন সদৃশ। রাসূল ﷺ বলেন : নারীরা 'সাকাত' 'সাকাত' অর্থ বোন। এর আরেক অর্থ 'অর্ধেক'। অর্থাৎ মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত– নর ও নারী। এর অর্থ অর্ধেকও হয়, বোনও হয়।

ইসলামে নারীর অনেক সামাজিক অধিকার রয়েছে যা আলোচনা করতে কয়েক সপ্তাহ দরকার।

কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হচ্ছি না। যেমন বহু বিবাহ, তালাক, ডিভোর্স ইত্যাদি। কেননা আমাকে অন্য বিষয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি বুঝতে পারি ইনশাআল্লাহ এ আলোচনা প্রশ্নোত্তর পর্বে কভার করবে। আমি আশা করি আপনারা প্রশ্ন করবেন এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে যতদূর পারি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।

৪. ইসলামে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার

আল-কুরআনের প্রথমে নাযিলকৃত পাঁচ আয়াত হলো সূরা আলাক বা সূরা ইকরা-৯৬ এর ১-৫ নং আয়াত।

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : পড় বা তেলাওয়াত কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু রক্তপিণ্ড দ্বারা।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - 'পড়, তোমার প্রভু বড়ই সম্মানিত'

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -' যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন'

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - 'যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।'

আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশনা যেটা মানবতার প্রতি নাযিল হয়েছিল তা নামায নয়, রোযা নয়, যাকাত দান নয়– তা ছিল পড়া– ইসলাম শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

নবী করীম ﷺ পিতা-মাতাকে সর্বাধিক তাগীদ দিয়েছেন যেন তারা কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দেয়। একজন নারীর বিয়ের পর স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা। সে যদি নিজে এটা করতে সক্ষম না হয় অথচ স্ত্রী যদি তা চায় তাহলে স্বামী অন্য কোথাও শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ত্রীকে যেতে দেবেন।

সহীহ আল বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী নারীরা জ্ঞানার্জনের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা একদা নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আপনি সাধারণত পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, আপনি আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করলে আমরা আপনাকে (প্রয়োজনীয়) প্রশ্ন করতে পারি। নবী করীম ﷺ রাজি হলেন। তিনি নিজে তো যেতেনই অনেক সময় সাথীদেরও তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করতেন।

ভেবে দেখুন, ১৪০০ বছর পূর্বে যখন নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হতো তাদের শিক্ষা তো দূরের কথা, তাদেরকে পণ্য দ্রব্যের মতো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সে মুহূর্তে নারীর শিক্ষাদানের প্রতি কতই না তাকীদ।

আমাদের নিকট বহু পণ্ডিত মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে।

সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত যেটা আমি আপনাকে দিতে পারি তা হলো মা আয়েশা (রা.) যিনি ছিলেন প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) এর কন্যা এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর স্ত্রী। তিনি রাসূলের সাহাবা এমনকি খলিফাদের পর্যন্ত দিকনির্দেশনা দিতেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ভাগিনা উরওয়া ইবনে জুবাইর (রাঃ)। তিনি বলেছেন, আমি কুরআনের ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি; ফরয, হালাল, হারাম এবং আরবি, ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতায় তার জ্ঞানের জুড়ি নেই।

আয়েশা (রা) শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন না, চিকিৎসা বিষয়েও তার অগাধ জ্ঞান ছিল। যখনই বিদেশী প্রতিনিধি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসতেন এবং আলোচনা করতেন, তিনি তাদের গবেষণাধর্মী আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তা মনে রাখতেন।

গণিতশাস্ত্রেও তাঁর ভাল দখল ছিল, অনেক সময় সাহাবীগণও মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান নিতে আসতেন। মিরাস কত অংশে বিভক্ত হবে, কত অংশ প্রত্যেকে পাবে এ সম্পর্কে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি চার খলিফাসহ অন্যান্য সাহাবীগণকেও দিকনির্দেশনা দিতেন। অনেক সময় তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি নিজে ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু উম্ম, আবু মুসার মতে তিনি [আয়েশা (রা)] একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, যখনই আমাদের সাহাবীদের কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব ঘটত, আমরা তখন আয়েশা (রা)-এর নিকট যেতাম এবং অবশ্যই তাঁর নিকট এ বিষয়ের জ্ঞান ছিল। তিনি ৮৮ জনের অধিক পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন। সংক্ষেপে বললে তিনি পণ্ডিতদের পণ্ডিত ছিলেন।

আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, এমনকি সুফিয়া (রা.) যিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ইসলামি ফিকহে দক্ষ ছিলেন। ইমাম নববীর মতে, 'সুফিয়া (রা) ঐ সময়ের মহিলাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বুদ্ধিমতি ছিলেন।'

আরেক দৃষ্টান্ত হযরত উম্মে সালামা (রা.) যিনি প্রিয়নবী ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন। ইবন হাযার-এর মতে 'তিনি বিভিন্ন ধরনের ৩২ জন পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

আরো অনেক উদাহরণের মধ্যে ফাতিমা বিনতে কায়স। বলা হয় যে, তিনি একবার আয়িশা ও ওমর (রা.) এর সঙ্গে সারাদিন ফিকহ শাস্ত্রের ওপর আলোচনা করার পরও তাঁকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন নি। ইমাম নব্বী (র)-এর মতে, তিনি প্রথম যুগে ইসলামে প্রবেশ করেন এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

অন্য উদাহরণ : যেমন উম্মে সুলাইম, যিনি আনাস (রা) এর মাতা, তিনি দাওয়াহর ক্ষেত্রে অনেক ভাল ভূমিকা রাখেন। যেমন সাইয়্যেদা নাফিসা যিনি হাসান (রা) এর পৌত্রী ছিলেন, চার মাযহাবের এক প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শিক্ষিকা ছিলেন। আরো উদাহরণ যেমন উম্মে দারদা (রা), যিনি আবু দারদার স্ত্রী এবং বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন যে, তিনি তার ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন। আপনি আরো উদাহরণ দিতে পারবেন।

সে সময় যখন নারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো, যখন জন্ম লাভের সাথে সাথে নারীদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তখন চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমান দক্ষ নারীরা ছিলেন। কারণ ইসলাম ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক নারী হবেন শিক্ষিত। আপনি ইসলাম প্রদত্ত নারীর এ অধিকার প্রদানকে আধুনিক বলবেন নাকি সেকেলে বলবেন?

৫. ইসলামে নারীর আইনগত অধিকার

ইসলামি আইন অনুযায়ী নর-নারী সমান। শরিআত নর-নারী উভয়ের জীবন এবং সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে সে কঠিন শাস্তি লাভ করবে, আর তা হলো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২নং সূরা বাকারার ১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

'তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোন নারী হত্যা করে সেও হত্যাকৃত হবে।'

ইসলামের আইন অনুসারে নারী পুরুষের 'কিসাস' সমভাবে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দেহের বদলে দেহ উভয়ে সমান শাস্তি পাবে। যদি মৃতের অভিভাবক এমনকি সে যদি নারীও হয় এবং বলে যে, হত্যাকারীকে মাফ করে 'দিয়াত' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর— তার মতকেও বাতিল করা যাবে না। তাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে। যদি নিহতের আত্মীয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়, কেউ বলে হত্যাকারীকে হত্যা করাই উচিত, কেউ বলে 'দিয়াত' গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দেয়া উচিত— লোকদের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত। সমভাবে নারী-পুরুষ যেই মতামত দিক না কেন তার গুরুত্ব (মূল্য) একই।

৫নং সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢبِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ : চোর সে নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, তার হাত কেটে দাও, তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত।

অর্থাৎ নারী পুরুষ যেই চুরি করুক তার হাত কাটা হবে, শাস্তি একই।

২৪নং সূরা নূরের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ

অর্থ : কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন তাকে ১০০ দোররা মার।

ব্যভিচারের শাস্তি সে নারী বা পুরুষ যেই করুক না কেন তার শাস্তি একই অর্থাৎ ১০০ দোররা, ইসলামে নারী পুরুষের একই শাস্তি।

ইসলামে মহিলাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। ভেবে দেখুন, ইসলাম একজন নারীকে ১৪০০ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দেবার অধিকার প্রদান করেছে।

অথচ এখন আধুনিককালে ইহুদি পুরোহিতরা বিবেচনা করছে যে, নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কিনা? যা ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে সে অধিকার দিয়ে রেখেছে।

২৪নং সূরা নূর ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰنِينَ جَلْدَةً ـ

অর্থ : যদি কেউ কোন নারীর সতীত্ব নিয়ে কথা তোলে তাকে চার জন সাক্ষী হাজির করতে হবে, না পারলে তাদেরকে ৮০ দোররা মারতে হবে।

ইসলামে ছোট অপরাধে দুই জন সাক্ষী এবং বড় অপরাধে চার জন সাক্ষী প্রয়োজন। কোন নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য। অতএব তার জন্য চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে আপনি আধুনিক সমাজে দেখুন, আপনি দেখবেন পুরুষ নারীকে অপবাদ দিচ্ছে, তাদেরকে বাজে ধরনের গালি দিচ্ছে, তাদেরকে বেশ্যা আখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ যদি নারীকে বেশ্যা বলে, জনসমক্ষে অথবা অন্য কোথাও, এ জন্য সে যদি পুরুষকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তাহলে চার জন সাক্ষী হাজির করতে হবে। সে যদি চার জন সাক্ষী আনেও এবং তাদের একজনও দ্বিধা করে তাহলে এ সাক্ষ্যদাতাদের সকলকে ৮০ দোররা মারা হবে। ভবিষ্যতে তাদের সকলের সাক্ষ্যও অগ্রহণযোগ্য।

ইসলাম নারীদের সতীত্বের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণত যখন কোন মহিলার বিয়ে হয় তখন সে স্বামীর নাম গ্রহণ করে। ইসলামে সুযোগ আছে ইচ্ছে করলে স্বামীর নাম গ্রহণ করবে অথবা তার কুমারী নামই থাকবে। কুমারীতে নাম গ্রহণের সুযোগ ইসলামে আছে এবং আমরা অনেক মুসলিম সমাজে পাই বিয়ের পরেও

তারা বিবাহপূর্ব নাম বহাল রাখে। কারণ, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। আপনি কি একে আধুনিক বলবেন নাকি সেকেলে?

৬. ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার

৯ নং সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন –

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۔

অর্থ : আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।

তারা সামাজিক সহায়কই নয়, রাজনৈতিকভাবেও নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী। ইসলামে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি আপনি ৬০ নং সূরা মুমতাহিনা-এর ১২ নং আয়াত পড়েন, দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ ۔

অর্থ : ওহে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে আসবে।

এখানে আরবি শব্দ بَايَعْنَ -এর অর্থ আধুনিক ও বর্তমান ভোটের চেয়েও অধিক ক্ষমতা, কারণ নবী মুহাম্মদ ﷺ শুধু আল্লাহর রাসূলই ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্র প্রধানও ছিলেন। এবং নারীরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসতেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিয়ে সম্মতি দিতেন। সুতরাং ইসলাম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে। এমনকি নারীরা আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। বিখ্যাত হাদীস, ওমর (রা.) সাহাবীদের সঙ্গে মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, যাতে যুবকেরা বিয়েতে উৎসাহিত হতে পারে। পিছনের সারি থেকে একজন মহিলা প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, যখন কুরআন বলে : ৪নং সূরা নিসা, ২০ নং আয়াতে–

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا ۔

অর্থ : তুমি বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিতে পার মোহর হিসেবে।

যেখানে কুরআন কোন সীমা নির্ধারণ করেনি, সেখানে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওমর কে? তৎক্ষণাত ওমর (রা) বলে উঠলেন, ওমর ভুল করেছেন, মহিলাই সঠিক। ভেবে দেখুন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মহিলা, যদি বিখ্যাত কোন মহিলা হতেন তাহলে হাদীসে তাঁর নাম আসত। যেহেতু হাদীসে তাঁর নাম আসেনি, আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন। অর্থাৎ একজন সাধারণ

মহিলা যিনি রাষ্ট্র প্রধানকে তাঁর কাজে প্রতিবাদ করলেন। পরিভাষায় বলা যায় যে, তিনি সংবিধান চ্যুতি বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ কুরআন মুসলিমদের সংবিধান, অর্থাৎ একজন মহিলা আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারেন।

নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন। বুখারী শরীফে পূর্ণ একটা অধ্যায়ই রয়েছে "যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারী" নারীরা পানি সরবরাহ্ করেছেন, সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। এখানে নাসিবা নামের একজন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য যিনি ওহুদ যুদ্ধে প্রিয় নবী করীম ﷺ-কে প্রতিরক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।

যেহেতু কুরআন বলেন, পুরুষ নারীদের সংরক্ষক, এ কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়, এটা পুরুষের দায়িত্ব। শুধু প্রয়োজনেই নারীদের অনুমতি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তাঁরা কেবল প্রয়োজনেই যুদ্ধে যাবেন অন্যথায় নন। অন্যথায় আপনাদের সে অবস্থা যা যুক্তরাষ্ট্রে আছে। তাদের নারীরা ১৯০১ সাল থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি লাভ করে এবং তা মাত্র নার্স এর ভূমিকায়। পরবর্তীতে নারী অধিকার আন্দোলন যা ১৯৭৩ সালে শুরু হয়, এ নারী অধিকার আন্দোলন দাবি করল, কেন নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না? সুতরাং ১৯৭৬ সালের পর আমেরিকার সরকার নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকা প্রতিরক্ষা বিভাগ কর্তৃক যেটা ১৯৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত হয়, তাদের একটি কনভেনশনে ৯০ জন লোক যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়, যার মধ্যে ৮৩ জন নারী। এছাড়া ১১৭ জন অফিসারকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়। ভেবে দেখুন মাত্র একটা কনভেনশনে ৮৩ জন নারী যৌন নিপীড়নের স্বীকার হন।

ঐ ১১৭ জন কর্মকর্তার অপরাধ কি ছিল? তারা নারীদের দৌড়াতে বাধ্য করেছিল, তাদের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারা তাদেরকে যৌন অঙ্গগুলো অনাবৃত উলঙ্গ অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করেছিল। জনসাধারণের সামনে যৌন ক্রিয়া করেছিল। আপনি কি এটাকে নারী অধিকার বলবেন? যদি আপনি একে নারী অধিকার বলতে চান তাহলে আপনি আপনার পকেটে এ অধিকার রাখতে পারেন। আমরা আমাদের বোন, আমাদের কন্যা, আমাদের মায়েদের যৌন নিপীড়নের শিকার হতে দিতে চাই না। পার্লামেন্টে হৈ চৈ উঠল, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জনসমক্ষে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন— 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' আপনারা জানেন রাজনীতিবিদরা যখন বলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে, তখন কী হয়?

সুতরাং ইসলাম নারীদের শুধু জরুরি অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। তবে তাদের ইসলামি হিযাব, ইসলামি নিয়ম এবং সতীত্ব বজায় রাখতে হবে। উপসংহারে আসার আগে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি বলেছি ইসলাম নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাস করে, সমঅধিকার বলতে সমরূপ বুঝায় না।

মনে করেন একটি শ্রেণিতে ২ জন ছাত্র A এবং B এক পরীক্ষায় যৌথভাবে তারা প্রথম হয়েছে। তারা ৮০% নম্বর পেয়েছে। A ও B দুজনই ১০০ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছে। যখন আপনি প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলেন এবং দেখলেন, ১০টি প্রশ্ন প্রতিটিতে পূর্ণ নম্বর ১০ করে। প্রথম প্রশ্নে A ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে B পেয়েছে ৭, প্রথম প্রশ্নে A ছাত্রটি B এর চেয়ে ভাল। দুই নম্বর প্রশ্নে A পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৭ এবং B পেয়েছে ৯। দ্বিতীয় প্রশ্নে B ছাত্রটি A এর চেয়ে ভাল। ৩নং প্রশ্নে উভয়ে সমান। যোগ করে A ও B সমান নম্বর ১০০-র মধ্যে ৮০। সংক্ষেপে A ও B ছাত্রদ্বয় সমান যদিও কোন প্রশ্নে A ভাল, কোনটিতে B ভাল। একইরূপে দৃষ্টান্তটি ধরে, আল্লাহ পুরুষকে বেশি দিয়েছেন, মনে করুন ঘরে একজন চোর ঢুকেছে, তখন আপনি কি বলবেন আমি নারী অধিকারে বিশ্বাসী, আপনি কি আপনার মাতাকে বোনকে অথবা কন্যাকে বলবেন যাও এবং চোরের সাথে যুদ্ধ কর? না, বরং স্বাভাবিকভাবে আপনি তার সাথে যুদ্ধ করবেন, যদি প্রয়োজন হয় তারা হয়তো আপনাকে সাহায্য করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ যেহেতু আপনাকে শারীরিকভাবে অধিক শক্তি দিয়েছেন, আপনাকেই সামনে অগ্রসর হতে হবে এবং চোরকে ঠেকাতে হবে। সুতরাং এখানে শারীরিক শক্তিতে পুরুষ নারীর চেয়ে এক ডিগ্রী ওপরে। আরেকটি দৃষ্টান্ত– যেখানে পিতা-মাতাকে সম্মান দেবার প্রশ্ন, যেখানে সন্তানদের মাতাকে পিতার ৩ গুণ সম্মান দিতে হবে। এখানে নারীদের পুরুষের চেয়ে ওপরে রাখা হয়েছে। অতএব গড়ে সমান। সুতরাং ইসলাম ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, সমরূপতায় নয়। ইসলামে গড়ে নর-নারী সমান।

এটাই সংক্ষেপে, বিস্তারিত নয়, যেমন বিচারপতি কাজী বলেছেন, সময় আমাকে বিস্তারিত বলার অনুমতি দিচ্ছে না। এগুলো তারই যার সংক্ষেপ এবং প্রধান কথা ইসলামে নারী অধিকারের।

এরপর মুসলিম সমাজ যা করছে তা ভিন্ন। অনেক মুসলিম সমাজ নারীদের তাদের অধিকার দিচ্ছে না এবং তারা কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছে। পশ্চিমা সমাজ বহুলাংশে এ জন্য দায়ী, পশ্চিমা সমাজগুলোর কারণেই অনেক মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে, তাদের সাবধানী ভূমিকার কারণে এবং একপেশে ও

কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছে। অন্য সীমাতিক্রম হয়েছে এভাবে যে, কিছু মুসলিম সমাজে নিজেদের পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোকে উন্নত করতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির অনুসরণ করছে।

আমি পশ্চিমা সমাজকে বলতে চাই যদি আপনারা ইসলামে নারীর অধিকারকে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন তাহলে আশা করি আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন এটা আধুনিক, মোটেও সেকেলে নয়।

অবশেষে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের যারা আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। যদি কেউ আমার এ অবস্থানে আসার পিছনে কোন কৃতিত্ব দাবি করতে চান, তিনি হলেন আমার মুহতারামা মা বেগম রোশান নাইক। এটা এ কারণে যে, তাঁর স্নেহ, যত্ন ও দিক নির্দেশনায় আজ আমি এখানে। আমি অবিচার করব যদি আমি আমার পিতা আব্দুল করিম নাইককে এবং একইভাবে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে আমার ভাই মুহাম্মাদ নাইককে অন্তর্ভুক্ত না করি।

সর্বশেষ তবে তুচ্ছ নয় আমার স্ত্রী, যিনি আমাকে এক বছর ৪ মাস যাবৎ আমাদের বিয়ের পর থেকে উৎসাহিত করে আসছেন। এভাবেই আমি এ ক্ষেত্রে কঠোরতর প্রচেষ্টা করতে পারছি।

প্রশ্নোত্তর

১. প্রশ্ন : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ইসলাম ধর্মে কোন নারী নবী আসেনি?

উত্তর : আমার বোন প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলামে নারী নবী আসেনি? যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন যে, এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী গ্রহণ করেন এবং যিনি মানব জাতির নেতা হিসেবে কাজ করেন। সেই অর্থে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ইসলামে আমরা কোন নারী নবী পাইনি এবং আমি মনে করি এটি সঠিক। কারণ যদি নারীকে নবী হতে হয় তবে সে সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরুষ হলো পরিবার প্রধান। সুতরাং যদি পুরুষ পরিবারের প্রধান হয়ে থাকে তবে কিভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দিবে? এবার দ্বিতীয় অংশে আসি— একজন নবীকে নামাজের জামায়াতে নেতৃত্ব দিতে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি নামাজে বেশ কিছু শারীরিক কসরত রয়েছে যেমন– কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাজে নেতৃত্ব দিত তবে জামায়াতের পিছনে যে সকল পুরুষ নামাজ পড়ে–তারা এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি বেশ বিব্রতকর হত।

এখানে আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন একজন নবীকে সকল সাধারণ মানুষের সাথে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়, এটা একজন মহিলা নবীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ ইসলাম নারী-পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।

যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি গর্ভবতী হতো, তবে তার পক্ষে কয়েক মাস নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না। যদি তার সন্তান হয় তবে তার পক্ষে এটা খুব কঠিন হয়ে যাবে সন্তান পালন করা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করা।

কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে পিতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলক সহজ।

কিন্তু যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন যে, এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পছন্দের এবং যিনি পবিত্র ও খাঁটি ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারীর উদাহরণ রয়েছে আমি এখানে উত্তম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব বিবি মরিয়াম (আ)-এর নাম। এটি সূরা মরিয়মে উল্লেখ রয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ৪২ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : যখন ফেরেশতা মরিয়মকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের উপর।' (সূরা আলে-ইমরান : ৪২)

যদি আপনি মনে করেন নবী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি মনোনীত এবং পরিশুদ্ধ, তবে আমরা বিবি মরিয়মকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যিনি ছিলেন যিশু খ্রিস্ট বা ঈশা (আ)-এর মাতা। আমাদের আরো উদাহরণ রয়েছে সূরা তাহরীমে। এখানে বলা হয়েছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরআওনের স্ত্রী (আছিয়া)-এর অবস্থা বর্ণনা করছেন। (সূরা তাহরীম : ১১)

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন–

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : হে আমার রব আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করে দিন, আর আমাকে ফেরআউন হতে এবং তার (কুফুরী) আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকজন হতে হেফাজত করুন। (সূরা তাহ্রীম : ১১)

একটু কল্পনা করুন, তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট ফারাও-এর স্ত্রী এবং তিনি আল্লাহর ভালবাসার জন্য স্বীয় সব আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চার জন মহিলা নবী এসেছেন। প্রকৃত অর্থে নবী নয়। তারা হলেন, বিবি মরিয়ম (আ), বিবি আছিয়া (আ), বিবি ফাতেমা (রা) ও বিবি খাদিজা (রা)। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

২. প্রশ্ন : আমার নাম সামির, আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল, ইসলামে একজন পুরুষকে সর্বাধিক চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ কেন ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন– এতে কি তাঁকে উচ্চ যৌন আকাঙ্ক্ষী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না?

উত্তর : আমি আপনার কথার সাথে একমত যে, পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যত্র তথা সূরা আহযাবে বলা হয়েছে যে–

لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا .

অর্থ : হে নবী আপনি এদের ব্যতীত অন্য কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য এও হালাল নয় যে, আপনি (বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন (অবশ্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা এদের কাউকে তালাক দেয়া না-জায়েজ নয়।) যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে ঐ সব মহিলা ব্যতীত যারা আপনার মালিকানাধীন। (সূরা আহযাব : ৫২)

এই আয়াত রাসূল ﷺ-কে অনুমতি দিয়েছে তার সমস্ত স্ত্রীগণকে রাখতে এবং একই সাথে তাকে নতুন কোন মহিলাকে বিয়ে না করতে, তবে তার অধিকারভুক্ত মহিলাগণ বাদ দিয়ে।

এখন যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেন মুহাম্মদ ﷺ-কে নতুন কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং কেন তার বর্তমান স্ত্রীদের ডিভোর্স দেয়ার কথা বলা হয়নি— তখন আপনি অন্য আয়াতে দেখবেন যেখানে বলা হয়েছে যে, নবীর স্ত্রীগণকে হয় তারা তালাকপ্রাপ্ত নয় বিধবা; কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না। কেননা তারা 'উম্মুল মুমেনিন' বা সকল মুমিনের মা।

সুতরাং কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না। আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে নবী করীম ﷺ তাদেরকে ডিভোর্স দিবেন না। যদি আপনি নবী করীম ﷺ-এর ১১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এগুলো হয় তিনি রাজনৈতিক কারণে, না হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে করেছেন; তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

তার প্রথম বিয়ে ছিল খাদিজা (রা)-এর সাথে। তখন খাদিজা (রা) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং নবীজি ছিলেন ২৫ বছর বয়স্ক।

তদুপরি তিনি ছিলেন দুবারের বিধবা। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি যৌন কামনা পূরণের জন্য বিয়ে করে থাকেন, তবে কেন তিনি পনেরো বছর বেশি বয়সের মহিলা বিয়ে করবেন? অধিকন্তু তিনি ছিলেন দুই বারের বিধবা।

আপনি আরো চিন্তা করুন, যতক্ষণ খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেন নি। যখন মুহাম্মদ ﷺ-এর বয়স ৫০ তখন বিবি খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন। কেবল ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ তার অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি অধিক কামাসক্ত থাকতেন তবে কি তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩/৫৬ বয়সে বিয়ে করতেন?

বিজ্ঞান আমাদের বলে 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের যৌন ক্ষমতাও কমে যায়।' সুতরাং এটি নির্দিধায় বলা যায়, অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীজির প্রতি এক ধরনের কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী করীম ﷺ-এর দুটি বিয়ে ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর তা হল– বিবি খাদিজা (রা) ও বিবি আয়েশা (রা)-এর সাথে। আর বাকি বিয়ে ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে– হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, নয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে। আপনি যদি আরো লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন যে, তার স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল দুই জনের বয়স ছিল ৩৬-এর নিচে। বাকি স্ত্রীদের বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

আমরা এখন প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলা যায় বিবি যোহায়রিয়া (রা) সম্পর্কে। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের, যেই গোত্র তৎকালীন আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এ গোত্রের সাথে মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল, কিছুকাল পর তারা ইসলামি বাহিনীর কাছে পদানত হয়। তার পরে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি বিবি যোহায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কিভাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর আত্মীয়দের বন্দী হিসেবে রাখি? তারপর সাহাবীরা তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই গোত্র বন্ধু হয়ে গেল।

বিবি মাইমুনা (রা) ছিলেন বনী নাজাদ গোত্রপ্রধানের স্ত্রীর বোন, যে ৭০ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে, যাদেরকে রাসূল ﷺ ইসলামি শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন রাসূল ﷺ মাইমুনা (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন বনু নাজাফ গোত্র মদিনার নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিল এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল।

একইভাবে তিনি বিয়ে করেন উম্মে হাবিবা (রা)-কে, যিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। আর এ বিয়ে মক্কা বিজয়ে বিশাল অবদান রেখেছিল।

বিবি সাফিয়া (রা) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদি নেতার কন্যা। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁকে বিয়ের ফলে তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মুহাম্মদ ﷺ বিয়ে করেছিলেন ওমরের কন্যা হাফসা (রা)-কে। তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে। তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো বোন জয়নবকে (রা)। যিনি ছিলেন তালাক প্রাপ্তা।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তাঁর প্রতিটি বিয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক সংস্কার বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর প্রত্যেকটি বিয়ের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোত্রে গোত্রে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা— যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

৩. প্রশ্ন : আমি হাসিনা ফারয়াজী। আমি আইনের ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হল- বহুবিবাহ কোন দিক থেকে মহিলাদের জন্য উপকারী?

উত্তর : তিনি প্রথম আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন ও কিভাবে বহুবিবাহ অর্থাৎ একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখা মহিলাদের জন্য উপকারী। উত্তরে বলব, যদি একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, তবে এটি মহিলাদের এভাবে উপকার করে যে, এটি মহিলাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে; কারণ যদি প্রত্যেক পুরুষ একটি মহিলা বিয়ে করে তবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে দুইটি পথ খোলা থাকবে আর তাহলো, হয় এমন একজনকে বিয়ে করবে যার এক বা একাধিক স্ত্রী আছে, না হয় তারা 'পাবলিক প্রোপার্টি' হয়ে যাবে। অর্থাৎ, হয় সতীনের সংসার করবে না হয় জনগণের সম্পত্তি বেশ্যা হয়ে থাকবে। তাই ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে- তাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের পাবলিক প্রোপার্টি বেশ্যা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

৪. প্রশ্ন : আমার নাম মো: আশরাফ। আমার প্রশ্ন হল- ইসলামে দত্তক নেয়া কি বৈধ?

উত্তর : যদি দত্তক নেয়া বলতে আমরা বুঝি আপনি একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছেন, যে কিনা গরিব শিশু এবং তাকে আপনার গৃহে থাকা, খাওয়া ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, তোমরা গরিব ও অভাবী মানুষদের সাহায্য কর।

আপনি এমনি একটি শিশুকে পিতার আদর দিয়ে আপনার ঘরে পালন করতে পারবেন। কিন্তু ইসলামে এক্ষেত্রে বাধা হলো আপনি আইনগতভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না। তার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করতে পারবেন না। আইনগত দত্তক নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, যদি কেউ এরকম দত্তক নেয় সেখানে বেশ কিছু জটিলতা থাকে। প্রথমত শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে তার পূর্ব পরিচিতি হারাবে। দ্বিতীয়ত, দত্তক নেয়ার পর আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে। তখন আপনি দত্তক শিশু থেকে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারেন। তৃতীয়ত, যদি আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং দত্তক শিশুটি আপনার নিজের শিশুর বিপরীত লিঙ্গের হয়, তখন তারা খোলাখোলিভাবে একই বাসায় থাকতে পারবে না। কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই বোন নয়।

যদি দত্তক শিশু মেয়ে হয় তাহলে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার বাবার সাথে পর্দা করতে হবে। কারণ সে তার রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়।

আর যদি দত্তক শিশু ছেলে হয় এবং সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার কথিত মায়ের পর্দা করতে হবে এবং সে ছেলে যদি বড় হয় এবং বিয়ে করে তবে তার স্ত্রী ও তার কথিত পিতার মাঝে পর্দা থাকতে হবে।

তাছাড়া আরো কতিপয় কারণ রয়েছে– যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।

যদি কারো পিতা মারা যায় তবে তার যতটুকু সম্পদই থাকুক না কেন, কুরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তা তাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মারা যান, তার সন্তানও থাকে এবং তার দত্তক সন্তানও থাকে, সেক্ষেত্রে তার সন্তানগণ সম্পত্তির অংশ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী, তার মা রেখে মারা যায় যার কোন সন্তান নেই, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি তার সন্তান থাকে তবে সে পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে তবে সে পাবে এক তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যদি তার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার ভাগের থেকে একটা অংশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই ধরনের জটিলতা নিরসনে ইসলাম আইনত সন্তান দত্তক নেয়া নিষিদ্ধ করেছে।

৫. প্রশ্ন : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার নাম সাবা, আমি একজন ছাত্রী। জাকির ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদেরকে 'হুর' হিসেবে পাবে। মেয়েরা জান্নাতে গেলে কি পাবে?

উত্তর : ড. জাকির : পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে চার জায়গায় 'হুর'-এর কথা বলা হয়েছে। 'হুর' এর কথা উল্লেখ আছে সূরা দুখানের ৫৪ নং আয়াতে, সূরা তূর এর ২০ নং আয়াতে, সূরা আর রাহমানের ৭২ নং আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে। অধিকাংশ অনুবাদে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় 'হুর'কে সুন্দরী কুমারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি 'হুর' এর অর্থ সুন্দরী কুমারী হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে, 'হুর' শব্দটি 'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন। 'আহওয়ার' পুরুষের জন্য প্রযোজ্য এবং 'হাওয়ার' মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আর 'হুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে 'হাওয়ার'-এর যা দ্বারা বুঝায় বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষত চোখের সাদা রং-কে বুঝায়।

আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'আয্‌ওয়াযুম মুতাহ্‌হারিন বলে একই কথা বুঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে ও সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ "আয্‌ওয়াজুম মুতাহ্‌হারা", অর্থ হল সঙ্গী, সাথী। মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন 'Spouse' বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন 'Companion' বা সঙ্গী হিসেবে।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল, সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী আর নারী পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ। আশা করি বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে।

৬. প্রশ্ন : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সুলতান কাজী, চাকরিজীবী। আমি জানতে চাই, সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিপরীতে দুই জন নারী কেন?

উত্তর : ড. জাকির : ভাই সুলতান কাজী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, কেন দুই জন মহিলার সাক্ষ্য এক জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। ইসলামে সব সময় দুই জন মহিলার সাক্ষ্য এক জন পুরুষের সমান নয়; শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে।

কুরআন শরীফে কমপক্ষে ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার উল্লেখ ছাড়াই সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে দুই জন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ـ

অর্থ : যখন তোমরা অর্থনৈতিক লেনদেন কর ভবিষ্যতের জন্য, তা লিখে রাখ এবং দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষ্য না পাও তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখ যেন তাদের (মহিলাদের) একজন ভুলে গেলে অন্যজন ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতটি কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ে। এতে বলা হয়েছে ২ জন পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য। কেবল দুইজন পুরুষ সাক্ষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন কেউ অপারেশন করতে চায়। সাধারণত সে দুইজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। যদি সে দুইজন সাধারণ দক্ষ সার্জন না পায়, তাহলে সে দুইজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের সহযোগিতাসহ একজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। কারণ একজন সার্জন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ। একইভাবে ইসলামে যেহেতু অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাঁধে দেয়া হয়েছে, তারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক দক্ষ। এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে এক জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে। আবার সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ـ

অর্থ : যদি কেউ উত্তরাধিকারের উইল লেখে তবে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে।

এখানেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অনেক বিচারক বলেন যে, যখন কোন মহিলা খুনের সাক্ষাৎকার দেন, তখন তার নারী প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনাটি নিয়ে ভীত থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।

কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দুটি ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ এর বিরোধিতা করে বলেন, যেহেতু কুরআনের সূরা বাকারার-২৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, সেহেতু সকল অবস্থায় সবসময়ই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। চলুন আমরা পবিত্র কুরআনকে সামগ্রিকভাবে দেখি। সূরা নূরের ৬ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ ـ

অর্থ : যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষী না পায় তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। চন্দ্র দেখার ব্যাপারেও একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিছু বিচারক বলেন, রমজানের শুরুতে একজন সাক্ষী এবং রমজানের শেষে দুইজন সাক্ষী দরকার, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোক না কেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আবার পুরুষের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়– কেবল মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন, একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার গোসলের সাক্ষ্য কেবল মহিলারাই দিতে পারে। কেবল খুব বেশি সংকটের সময় মৃত মহিলার স্বামী গোসল দিতে পারেন। এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

৭. প্রশ্ন : আমার নাম শায়লা। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামে বহুবিবাহের কেন অনুমতি দেয়া হল? একজন পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে?

উত্তর : ড. জাকির নায়েক : বোন জিজ্ঞেস করেছেন, কেন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বহুবিবাহ মানে হল একাধিক স্ত্রী বা স্বামীকে বিয়ে করা। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তাকে বলা হয় 'বহুপত্নীক' বিবাহ। আর যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে তাকে বলা হয় বহুপতি বিবাহ। বোন জিজ্ঞেস করেছেন, কেন ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? আমি উত্তর দেব, কেন ইসলামে 'বহুপত্নীক' বিবাহের অনুমতি দেয়া হল। কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে,

'কেবল একজনকে বিয়ে কর' অন্য এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যাতে বলা আছে 'কেবল একজনকে বিয়ে কর।' গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোথাও বলা হয়নি 'কেবল একজনকে বিয়ে কর', কেবল কুরআনেই আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়লে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল– রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের একাধিক স্ত্রী ছিল।

১১ শতাব্দীতে ইহুদি আইনে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বী গার্ডসাম বেঞ্জাহুদা একটি সিগ্‌নরড় (Signord) প্রস্তাবে বলেন, 'বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত।' ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে সেপট্রানিক ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খ্রিস্টান বাইবেল বহুপত্নীক বিবাহ অনুমতি দেয়। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে চার্চ এটি নিষিধ করে। হিন্দু আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। ১৯৫৪ সালে যখন হিন্দু আইন পাস হয় তখন একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এক কমিটির 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৫ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭) মুসলমানদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহের হার ৪.৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬। চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে আমরা আসল বিষয়ে আসি, কেন ইসলাম বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসার ৩নং আয়াতে আছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۔ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۔

অর্থ : তুমি তোমার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর। দুইটি, তিনটি অথবা চারটি কিন্তু তুমি যদি ন্যায়বিচার করতে না পার, তবে কেবল একজনকে বিয়ে কর।

'কেবল একজনকে' বক্তব্যটি কেবল কুরআন মজীদেই আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

ইসলামপূর্ব যুগের আরবে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। কিছু কিছু লোকের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল। ইসলাম একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে– সর্বোচ্চ চার। একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, দুইজন, তিনজন অথবা চার জনের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং সাম্য বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল একজন। সূরা নিসার ১২৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে। 'স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখা একজন পুরুষের জন্য খুবই কঠিন কাজ।' তাই বহুপত্নীক বিবাহ হলো ব্যতিক্রম। এটি কোন আইন নয়– যা অনেকে ভেবে থাকেন। ইসলামে পাঁচ প্রকারের আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে। প্রথম প্রকার হলো 'ফরয' বা 'আবশ্যকীয়'। দ্বিতীয় প্রকার হলো 'উৎসাহমূলক', তৃতীয় প্রকার হল

'অনুমোদনযোগ্য', চতুর্থ প্রকার হল 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ প্রকার হল 'নিষিদ্ধ'। বহুপত্নীক বিবাহ হল তৃতীয় প্রকারের 'অনুমোদনযোগ্য'। কুরআন অথবা হাদীসের কোথাও এরকম কথা নেই যে, যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেছে, সে যে একজনকে করেছে তার চেয়ে ভাল মুসলমান। চলুন, আমরা দেখি কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়?

প্রকৃতিগতভাবে ছেলে এবং মেয়ে সমানানুপাতে জন্ম নেয়। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মেয়ে ভ্রূণ ছেলে ভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী থাকে। ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু অধিক প্রতিরক্ষাশক্তি পায়– মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রায় পনেরো লাখ লোক নিহত হয়– যার অধিকাংশই পুরুষ। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দুর্ঘটনায় বেশি নিহত হয়।

মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি নিহত হয় সিগারেট সেবনের কারণে। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ভারতেও পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। প্রতিবছর এখানে ১০ লাখেরও বেশি মেয়েভ্রূণ হত্যা করা হয়, সে জন্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অন্যথায়, এই মেয়ে শিশুহত্যা বন্ধ করলে কয়েক দশকের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। কেবল নিউইয়র্কেই পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ মহিলা বেশি। সেখানে আড়াই কোটিরও বেশি সমকামী লোক রয়েছে। তার মানে তারা তাদের পুরুষ সঙ্গী পাচ্ছে না। শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। আল্লাহই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ এক জন করে মহিলা বিয়ে করে তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা বাকি থেকে যাবে, যারা বিয়ে করার মতো সঙ্গী পাবে না। ধরুন আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে এখনো কোন সঙ্গী পায়নি।

এখন তার যে উপায়গুলো আছে তা হলো হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা গণ-সম্পত্তিতে পরিণত হবে– তৃতীয় অন্য কোন উপায় নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এই প্রশ্নটি শত শত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায়টি বেছে নিয়েছে, একজনও ২য় টির পক্ষে রায় দেননি। কিছু লোক আছেন যারা বলেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাকেই ভাল মনে করব। বিশ্বাস করুন, চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, কোন পুরুষ অথবা মহিলা সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকতে পারে না। সারা জীবন অবৈধ

যৌন সংসর্গ ছাড়া কুমারী থাকতে পারে না। কারণ প্রতিদিন শরীরে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিসৃত হচ্ছে। যেসব সাধকেরা নিজেদের কুমার বলে দাবি করেন। পাহাড়ে, হিমালয়ে যাবার সময় পেছনে দেব-দেবীদের নিয়ে যান। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের চার্চের পাদ্রি এবং সন্ন্যাসিনীদের অধিকাংশই ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতোমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে অথবা সকলের গণসম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে।

৮. প্রশ্ন : কোন্ কোন্ অবস্থায় বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য? প্রশ্নটি করেছেন বোন সামিয়া।

উত্তর : ড. জাকির : কেবল একটি শর্ত রয়েছে যা পূরণ করলে কেউ একাধিক স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে। আর তা হলো তাকে দুই, তিন অথবা চার জন স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে হবে। যদি সক্ষম না হয় তবে কেবল একটি বিয়ে করা উচিত। কিন্তু কতকগুলো অবস্থা আছে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা একজন পুরুষের উচিত। যেমন একটি হলো অতিরিক্ত মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না তাদের নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য। আরো অনেক অবস্থা আছে, যেমন– একজন মহিলা বিয়ে করার পর দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। ফলে সে তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন স্বামীকে হয় প্রথম স্ত্রী রেখে আরেকটি বিয়ে করতে হবে অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে হবে।

ধরুন আপনার বোনের এরকম হলো এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেল– আপনি কোনটিকে গ্রহণ করবেন? আপনি কি আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে বিয়ে করবে– এটা চাবেন? নাকি তালাক দিয়ে বিয়ে করুক এটা চাবেন? ধরুন আপনার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার ফলে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারে না। এমতাবস্থায় এটাই ভাল যে, সে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সন্তুতি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, পরিচারিকা রাখলেইতো হয়। আমিও তাদের সাথে রাজি আছি যে, পরিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে দেখাশোনা করবে। কিন্তু আপনাকে দেখাশোনা করবে কে? তাই এটিই ভাল যে, আপনি আরেকটি বিয়ে করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সন্তানের জন্য আগ্রহী। স্ত্রী আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন এবং তারা সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, 'দত্তক গ্রহণ করলেইতো হয়'। অনেক কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহণে অনুমতি দেয় না– কারণগুলো (ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বিধায়) এখানে বলছি না। ফলে দুটি উপায় থাকে– হয় আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে। অথবা প্রথম স্ত্রীকে রেখেই আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে।

৯. প্রশ্ন : আমার নাম ইলিয়াস। মহিলারা কি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?

উত্তর : ড. জাকির : পবিত্র কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই যে, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। কিন্তু অনেক হাদীস আছে, যেমন একটি হাদীসে আছে, "যে সকল জনতা মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবে না।

কিছু চিন্তাবিদ বলেন, 'এটি শুধু একটি বিশেষ সময়কে বুঝিয়েছে যার সাথে হাদীসটি সম্পর্কিত। বিশেষত যখন পারস্য একজন রাণীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করছে।' অন্যরা বলেন, না, এটা সকল সময়কেই বুঝিয়েছে। চলুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা। যদি ইসলামি রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তবে তাকে নামাযের ইমামতি করতে হবে। যদি একজন মহিলা নামাযে ইমামতি করে তবে তাকে 'কিয়াম', 'রুকু' ও 'সিজ্‌দা' বা 'দাঁড়ানো', 'নত হওয়া' ও মাটিতে নত হওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের জামায়াতের সামনে কোন মহিলা এগুলো করে, আমি নিশ্চিত যে, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে। আজকের মতো আধুনিক সমাজে একজন মহিলা রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকে মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে, যেখানে পুরুষরাও উপস্থিত থাকে। অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না এবং ইসলাম কোন পুরুষের সাথে এরকম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না।

রাষ্ট্রপ্রধানকে অনেক সময় অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে– যাদের অধিকাংশই পুরুষ– ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, ছবি উঠাতে হয়, করমর্দন করতে হয়– যা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ জনগণের সাথে মিশতে হয়। তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, একজন মহিলার মাসিক রক্তস্রাব চলাকালীন সময়ে কতকগুলো আচরণগত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়– যৌন হরমোন ইস্টোজেন নিঃসরণের কারণে এবং এ পরিবর্তন তাকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান আরো বলে যে, মহিলাদের পুরুষের তুলনায় অধিক কণ্ঠ ও মৌখিক শক্তি রয়েছে এবং পুরুষের রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা করার শক্তি– যা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা তার মাতৃত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং তার কয়েকমাসের বিশ্রাম প্রয়োজন হতে পারে– এ সয়মটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কি হবে? মা হিসেবে সন্তানদের দেখাশোনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি একই সাথে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের পক্ষেই

তা করা অধিকতর সম্ভব– বাস্তবিক কারণেই। সুতরাং, আমিও সেসব বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলেন, 'মহিলাদের রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত নয়'। কিন্তু এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা (রা) রাসূল ﷺ-কে সমর্থন ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন– যখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সমস্যায় ছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

১০. প্রশ্ন : আমি ভিমলা দালাল। পেশায় আইনজীবী। ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

উত্তর : ড. জাকির নায়েক : আমি পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। কুরআনে 'হিজাবে'র কথা উল্লেখ আছে। সেখানে নারীদের 'হিজাবে'র কথা বলার পূর্বে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আছে যে, 'একজন বিশ্বাসীর উচিত দৃষ্টি অবনত রাখা এবং তার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।'

পরবর্তী আয়াতে আছে, 'বিশ্বাসী মহিলাদের বলুন, সে যেন তার চোখ অবনত রাখে। পবিত্রতা সংরক্ষণ করে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে– যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত এবং ওড়না দ্বারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে– বাবা, ছেলে এবং স্বামী ছাড়া এবং গাইরে মাহরামদের[১] একটি বড় তালিকা, হিজাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন এবং হাদীসে দেয়া আছে। এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য। ১ম, ব্যাপ্তি- যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জী ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে। ২য়, মহিলাদের কাপড় এরকম টাইট হওয়া যাবে না যার ফলে দেহকাঠামো বুঝা যায়। ৩য়, কাপড় স্বচ্ছ হওয়া যাবে না। ৪র্থ, এরকম আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। ৫ম, এরকম পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। ৬ষ্ঠ, সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরকম পোশাক পরা যাবে না, যা অবিশ্বাসীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। এ ছয়টি হল হিজাবের বৈশিষ্ট্য।

---

১. যে সকল নারীকে বিবাহ করা পুরুষদের জন্য চিরস্থায়ী অথবা সাময়িকভাবে হারাম তাদেরকে মাহরাম (مُحَرَّمَاتٌ) বলা হয়। নিম্নে উল্লেখিত ১৪ জন ব্যতীত সকলেই গায়েরে মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত।

মাহরামাত (مُحَرَّمَاتٌ) মহিলা ১৪ জন। হারাম মহিলা– ১. মা, ২. কন্যা, ৩. বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. ভাতিজী, ৭. ভাগ্নি, ৮. দুধ মা, ৯. দুধ বোন, ১০. শ্বাশুড়ী, ১১. স্ত্রীর পূর্বের কন্যা, ১২. ছেলে বউ, ১৩. দুই বোন একত্রে, ১৪. অন্যের স্ত্রী।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابِیْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ ـ

এখন প্রশ্নের উত্তরে আসছি- কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সে দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র। এফ. বি. আই (FBI) ১৯৯০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হল কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হল ৬,৪০,০০০ মহিলা যারা ধর্ষিতা হয়েছে। সংখ্যাটিকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিদিন ১৭৫৬ জন মহিলা আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ধর্ষিতা হয়। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) ১.৩ জন প্রতি মিনিটে ধর্ষিতা হয়। আপনি জানেন, কেন? আমেরিকা মহিলাদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যার ৫০%-কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হল ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন একশত বিশটি ধর্ষণ করলে ধরা পড়ার আকাঙ্ক্ষা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে একবার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না চেষ্টা করবে। আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আছে- 'ধর্ষণের জন্যে যাবৎজীবন কারাদণ্ড, যদি ১ম বার ধরা পড়ে তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।' এমনকি ভারতে, জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৯২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত) প্রতি ৫৪ মিনিটে ১টি ধর্ষণের মামলা নথিবদ্ধ করা হয়। প্রতি ২৬ মিনিটে উত্ত্যক্ত করার ১টি ঘটনা এবং প্রতি ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ১টি মামলা নথিবদ্ধ করা হয়।

আপনি যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসেব করেন, তাহলে প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি হয়ে দাঁড়াবে। আমি একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি যুক্তরাষ্ট্রের সকল মহিলা হিজাব পরে তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? যদি ভারতের সকল মহিলা হিজাব পরে, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা বাড়বে, কমবে, নাকি অপরিবর্তিত থাকবে? ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝা উচিত। যেখানে মহিলারা হিজাব পরতে এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং

এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডকে কি আপনি বর্বর আইন বলতে পারেন?

আমি অনেক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন আপনাকে বিচারক বানানো হল। ইসলামি আইন, ভারতীয় আইন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বাদ দিন, আপনি বিচারক হলে আপনার বোনের ধর্ষককে আপনি কি শাস্তি দিতেন? সবাই বলেছেন, 'মৃত্যুদণ্ড'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকব।' আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি ইসলামি শরিয়াহ আইন আমেরিকায় প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা হ্রাস পাবে, সমান থাকবে নাকি বৃদ্ধি পাবে? আসুন আমরা বাস্তবিকভাবে বিশ্লেষণ করি। যারা তত্ত্বীয়ভাবে মহিলাদের অধিকার দিয়েছে, তারা বাস্তবিকভাবে তাদেরকে পরিচারিকা ও উপপত্নীর সম্মান দিয়েছে। ধরুন, একই সৌন্দর্যের অধিকারী দুই বোন একজন হিজাব পরিহিতা অন্যজন শর্ট স্কার্ট পরিহিতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় বসা মাস্তানেরা কাকে টিজ করবে? নিঃসন্দেহে শর্ট স্কার্ট পরিহিতাকে। বাস্তবিকভাবেই হিজাব মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং পবিত্রতা সংরক্ষণ করে।

১১. প্রশ্ন : আমার নাম বিলাল লালা। আমার প্রশ্ন হল, কেন ইসলাম আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি মুসলিম পুরুষদের দিয়েছে। মুসলিম মহিলাদের কেন আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আহলে কিতাব মহিলারা কি মুশরিক নয়?

উত্তর : ড. জাকির : বিলাল ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, মুসলিম পুরুষদের যেহেতু আহলে কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর বিপরীত কেন দেয়া হয় নি? তিনি সঠিক বলেছেন, সূরা মায়েদার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

অর্থ : আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদেরকে তোমাদের জন্য বিয়ে করা বৈধ করা হয়েছে।

ইসলাম এ কারণে এ অনুমতি দিয়েছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের মহিলা কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের সম্পর্কে অপমানমূলক কিছু বলবে না বা করবে না। কারণ, মুসলিমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। যদি তাদের সম্প্রদায়ের কোন মহিলা আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্র হবে না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন মুসলিম মহিলা যদি তাদের পরিবারে যায় তবে সে উপহাসের পাত্র হবে। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আছে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ـ

অর্থ : অবিশ্বাসী মহিলা বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে।

সূরা মায়েদার ৭২নং আয়াতে আছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ : যারা বলে যে, মেরীর সন্তান খ্রিস্ট আল্লাহর সন্তান, তারা কুফরী করছে।

সুতরাং, কুরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের অনুসারীদের বিয়ে করতে পারেন। যারা বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাস করে না যে, খ্রিস্ট প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে কিন্তু যারা বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর দূত।

১২. প্রশ্ন : আমি আকিলা ফাতেরপেকার। আমার প্রশ্ন হল, ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে অনুমতি দেয় না– সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন।

উত্তর : ড. জাকির : ইসলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমীদের ১৩০০ বছর আগে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন নারীর, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, সম্পদের মালিক হওয়া বা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে কোন পরামর্শ ছাড়াই। ইসলাম তাকে দান (উইল) করার অধিকার দিয়েছে।

১৩. প্রশ্ন : আমার নাম রোসান রংওয়ালা। ডঃ জাকির আপনি বলেছেন, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে সমানাধিকার দিয়েছে। তাহলে কেন নারীদেরকেও ৪টি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কি ৪টি বিয়ে করতে পারে না?

উত্তর : ড. জাকির : প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক যৌনশক্তি সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ জৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মাসিকের সময় মহিলারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ ঝগড়া এই সময় হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের এক অপরাধ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেখানকার মহিলাদের অধিকাংশই এ সময়ে অপরাধ বেশি করে থাকে। ফলে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে সমন্বয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে যৌন রোগের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না। যদি কোন কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের পিতা এবং মাতা সনাক্ত করা খুবই সহজ। অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে আপনি কেবল মাকে সনাক্ত করতে পারবেন, বাবাকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যাবে। ইসলাম বাবার সনাক্তকরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোন সন্তান তার বাবার পরিচয় না পায় তাহলে সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বহুপতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার অনেক কারণ আছে, অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন দম্পতির সন্তান না থাকে তবে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করতে পারে? না−পারে না। কারণ, কোন ডাক্তারই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বামী বন্ধ্যা। এমনকি শুক্রকীটবাহী নাড়ীচ্ছেদ করলেও কোন ডাক্তার বলতে পারবে না যে, সে পিতা হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন স্বামী দুর্ঘটনায় পতিত হল অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হল তখন কি স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না? চলুন আমরা ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি। যদি স্বামী দুর্ঘটনায় পতিত হয় অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, সে তার দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ।

প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক− সে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে। প্রথমটির জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়টির জন্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, স্ত্রীর স্বামীর তুলনায় কমই সন্তুষ্টি আসে। কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক গ্রহণ করতে পারে। তালাক গ্রহণ উত্তম যদি সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। অন্যথায় যদি সে স্বাস্থ্যবতী না হয় অথবা, প্রতিবন্ধী হয়, তবে কে তাকে বিয়ে করবে?

১৪. প্রশ্ন : আমি সরদারি হাকিম। আমার প্রশ্ন হল, আপনি বলেছেন যে, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে। কিন্তু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কি সে নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারে?

উত্তর : ড. জাকির : কেন পারে না? বিয়ের পূর্বে তার ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইদের। যদি সে 'না' বলে, তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। সে খুব ভালভাবেই 'না' বলতে পারে।

১৫. প্রশ্ন : আমি প্রকাশ লাট। বিশ্বাসী লোকদেরকে ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন, সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভাল বিষয় আছে। কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা মানুষ নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রশ্ন হল, বই-এ যা লিখা আছে, বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তাতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কি লেখা আছে, ওই বইয়ে কি লেখা আছে তা বলার চেয়ে কি করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার।

উত্তর : ড. জাকির : ভাই খুব ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন– সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে, চলুন আমরা দেখি লোকজন কি চর্চা করে। আমাদেরকে তত্ত্বীয় কথাবার্তার চেয়ে অনুশীলনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে– আমিও তার সাথে একমত। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আমরা এখানে লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী হতে আহবান জানাচ্ছি। প্রশ্নের প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে। তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলা অনর্থক – আমি আপনার সাথে একমত নই। 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন যে, কোন্ ধর্ম অধিক মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আপনি যদি একমত হন যে, তত্ত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমাদেরকে এখন তা অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামের কিছু কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু কিছু দিক করছে না। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস থেকে দূরে সরে গেলেও সৌদি আরব ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদেরকে যা করতে হবে তা হল, ফৌজদারি শাস্তি বিধানের আইনের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি প্রয়োগযোগ্য হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামি আইনের প্রয়োগ আছে, সে সমাজ পরীক্ষা করতে হবে। যদি তা সর্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এখানে এটিই বুঝানোর জন্য একত্রিত হয়েছি যে, এ আইন হল সর্বোত্তম আইন, যদি আমরা এর অনুসরণ না করি তবে আমরা নিজেরা দোষী–

ধর্ম নয়। এজন্যই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং তার অনুশীলন করতে পারে। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

১৬. প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম, আমি কামার সাইদ। আপনি আপনার মূল্যবান বক্তৃতায় বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু যদি তারা সক্ষম না হয় তখন মেয়েটি কী করবে?

উত্তর : ড. নায়েক : বোন একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন যে, যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তখন স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করবে ইদ্দতকালীন পর্যন্ত, যে সময়টা হয় ৩ মাস বা তার বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ঐ সময়ের পর তাকে ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব তার পিতা বা ভাইয়ের দায়িত্বে। যদি তার বাবা বা ভাইদের সামর্থ্য না থাকে তবে তার নিকটাত্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা। যদি তাদেরও সামর্থ্য না থাকে তবে এ দায়িত্ব এসে বার্তায় মুসলিম উম্মাহর ওপর। তাই আমাদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে এটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা– সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এ জন্যই ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর আদায় করতে বলেছে, তবে তাকে এ ধরনের করুণ অবস্থায় পড়তে হবে না। ইসলাম নারীকে স্বাবলম্বী দেখতে চায়, তাই তাকে প্রাপ্য মোহর আদায় করার জন্য স্বামীকে তাগিদ দিয়েছে এবং যারা তা আদায় করবে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। – (অনুবাদক)

১৭. প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম। আমি সৈয়দ রিয়াজ। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনি যা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি বিশেষত উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

উত্তর : ড. নায়েক : ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি, ইসলামে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার সমান। সুতরাং কেন সে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হবে না। যেমন লোকেরা বলে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক পায়। এ প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ এবং ১২ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে, যেখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কিভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ
السُّدُسُ ۔

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়া) সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন– পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যা থাকে দুইয়ের অধিক, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে, আর পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি মৃতব্যক্তির কোন সন্তান থাকে। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।....

১২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ
امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ
ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۔

অর্থ : আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের স্ত্রীগণ রেখে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি ঐ পত্নীগণের কোন সন্তান থাকে তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি কোন সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত ওসিয়ত বা ঋণ আদায় করার পর। (সূরা নিসা : ১২)

সংক্ষেপে বলা যায়, অধিকাংশ সময়ে মহিলারা তার পুরুষ সমশ্রেণির বিপরীতে অর্ধেক সম্পত্তি পায় কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ বৈপিত্রেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক ষষ্ঠাংশ, যদি তার আপন ভাই না থাকে। যদি মৃতব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে তবে তার বাবা মা উভয়েই সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মহিলা মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক। তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এ থেকে বুঝা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাগণ তার সমশ্রেণির পুরুষ থেকে এমনকি দ্বিগুণ পায়। যেমন উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মাতা, পিতার চেয়ে দ্বিগুণ পায়। কিন্তু...আমি আপনার সাথে একমত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের অর্ধেক পায় যখন নারীটি স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই, যেহেতু পুরুষ পরিবারের আর্থিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু আল্লাহ্ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। অন্যথায় এখানে আমাদেরকে 'ইসলামে পুরুষদের অধিকার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো।

এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন একজন লোক মারা গেল এবং সে মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার এক ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হলো। যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ইসলামি শরীয়ার মতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ছেলের পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে এখন সংসারের জন্য ব্যয় করতে হবে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ, তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ বা ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু মেয়েটিকে তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য ১ টাকাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে পরিষ্কার যে, কেন ইসলামে পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দেয়া হয়েছে।

১৮. প্রশ্ন : আমি বিজয়, মুম্বাই আই আইটির ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো ইসলামে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ অনুমোদন করে না, এটি কি ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা?

উত্তর : যদি আপনি 'আধুনিকতা' বলতে বুঝেন আপনার স্ত্রী বা বোনকে আপনি বিক্রয় পণ্য করবেন যাতে তারা অন্যদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে অথবা আপনি তাকে 'মডেলিং' পেশায় নিয়োগ করবেন, সেক্ষেত্রে ইসলাম সেকেলে বলেই আমার কাছে মনে হয়। কারণ পাশ্চাত্য মিডিয়াতে নারীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে, তারা তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণই করেছে।

এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আমেরিকায় ৫০% নারী যারা ইউনিভার্সিটি কিংবা কর্মক্ষেত্রে যায়, তারা ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন ৫০%! কিন্তু কেন? কারণ হল ওখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এখন আপনি যদি মনে করেন একজন মহিলা ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিকতা' তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম 'সেকেলে'। আর যদি আপনি বলেন না, তবে ইসলাম অতি আধুনিক।

১৯. প্রশ্ন : আমি সুজাত। আমার প্রশ্ন হল, মহিলাগণ কি এয়ারহোস্টেস হিসেবে চাকরি করতে পারবে? যেহেতু এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

উত্তর : আমি আপনার সাথে একমত যে, এটি খুব উচ্চ বেতনের চাকরি। কিন্তু এটি শালীন চাকরি কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হবে। সাধারণত এয়ার হোস্টেস হিসেবে বাছাই করা হয় ঐ সব মহিলাদের যারা সুন্দরী। আপনি কখনো অসুন্দরী বা কদাকার মেয়ে সেখানে খুঁজে পাবেন না। তদুপরি তাদেরকে হতে হবে তরুণী ও আকর্ষণীয়া।

তাদেরকে পরতে হয় এমন পোশাক যা সাধারণত ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী। তাদেরকে অঙ্গাসজ্জা করতে হবে এমনভাবে যাতে যাত্রীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদেরকে তাদের যাত্রীদের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, সেখানে অধিকাংশ যাত্রীই হল পুরুষ–যেখানে তাদের মধ্যে নৈকট্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে এয়ার হোস্টেসদের সাথে গল্প করে, যদিও এয়ার হোস্টেস পছন্দ না করে তথাপি তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়, অন্যথায় তার চাকরি হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে 'ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আমার সিট বেল্ট বেঁধে দিন।' এক্ষেত্রে এয়ার হোস্টেসের কোন উপায় থাকে না, তাকে সিট বেল্ট বেঁধে দিতে হয়। তাহলে এভাবে কি ঘটতে যাচ্ছে?... এখানে বিপরীতমুখী দুই লিঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা নৈকট্য তৈরি হচ্ছে।

অনেক এয়ারলাইন্সে মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে এয়ার হোস্টেসদের। ইসলাম পুরুষ-মহিলা সবাইকে মদ সরবরাহ বা পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর এসব কাজের জন্যই কেবল নারীদেরকে এয়ার হোস্টেস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঐ বিমানে অন্য পুরুষ কর্মচারী থাকলেও তাদেরকে এসব কাজে ব্যবহার করা হয় না। তারা সাধারণত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে। প্লেনে এ ধরনের বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করুন, একটি বিমানও মহিলা কর্মচারী ছাড়া চলে না। এমনকি 'সৌদি এয়ারলাইন্স'ও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এটি শ্রেষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্র সৌদি আরব কর্তৃক পরিচালিত। কিন্তু যদিও সৌদি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না বা পাওয়া যায় না ফলে তাদেরকে

বিদেশ হতে বিমানবালা আমদানি করতে হয়। যদিও এটি সৌদি ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তথাপি তাদের কাছে কোন বিকল্প নেই।

বিমানচালনা একটি পেশা– যেখানে যাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়। বিমান চালনা সংস্থায় কতিপয় নিয়ম রয়েছে যা শুনলে আপনি হতভম্ব হবেন। উদাহরণস্বরূপ 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' বলে যে, 'এয়ার হোস্টেস নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না'। কিছু এয়ারলাইন্স বলে যে, 'তুমি যদি গর্ভবতী হও তবে তোমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে'। কল্পনা করুন! কিছু এয়ারলাইন্স বলে 'তোমার অবসর বয়সসীমা ৩৫ বছর'। কিন্তু কেন? কারণ তুমি আর তখন যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও। আপনি কি এটাকে শালীন চাকরি বলবেন?

২০. প্রশ্ন : আমি রশীদ শেখ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল ইসলামে সহশিক্ষার কি অনুমতি আছে?

ড. নায়েক : সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বোঝেন একই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়া। তবে প্রথমত আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি যেখানে ছেলে এবং মেয়ে একই স্কুলে পড়াশুনা করে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর। 'The World This Week' নামক একটি রিপোর্ট গত বছর প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে সহশিক্ষা ও একক শিক্ষা দানকারী স্কুলের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো এবং জরিপকারীরা বলেছেন একক শিক্ষা দানকারী স্কুল ও সহশিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক ভাল। যখন শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো তখন তারা বললেন, একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্রদের থেকে অনেক মনোযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু ছাত্ররা জানান তারা সহশিক্ষাই পছন্দ করে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এর কারণ কি? জরিপ থেকে স্পষ্টত দেখা যায় যে, সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে বিপরীত লিঙ্গের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার জন্য।

অধিকন্তু পড়াশুনায় মনোযোগ না থাকলেও ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তারা শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেয় খুব স্মার্টভাবে। তারা স্কুলে পড়াশুনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে। জরিপের সর্বশেষে দেখা যায় যে, U. K. সরকার অধিক হারে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছে। এরকম আমেরিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে– মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটের কাছ থেকে নিষিদ্ধ যৌন শিক্ষা বা কৌশল শিখতে বেশি সময় ব্যয় করে। ভারতেও অহরহভাবে এমন ঘটনা ঘটছে কম বা বেশি হারে।

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষা দানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ করি। এ রিপোর্টে স্কুল সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে ঐ একই কাজগুলো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও হয় তীব্র হারে। ১৯৮০ সালের ১৭ মার্চ 'নিউজ উইক' এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণে যৌন আক্রমণ হচ্ছে নারীদের ওপর। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে– আমি এ রিপোর্টের পুরো ঘটনা উল্লেখ করতে পারব না, কারণ সময় সীমিত। এর প্রধান দিক হল, "প্রফেসর এবং লেকচারাররা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল গ্রেড পয়েন্টের জন্য যৌন হয়রানি করে। ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। গত বছর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে যেটি পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে–আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে একটি মেয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪/৫ জন ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে। গত ২৬ আগস্ট 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে– যেটি 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত হয়েছে–এখানে বলা হয়েছে, আমেরিকার স্কুল ও ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে ২৫% ধর্ষিতা হয়।

আমার মূল প্রশ্ন হলো– আপনি কি আপনার সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য? নাকি তাদেরকে পাঠাবেন যৌন কৌশল শিক্ষার জন্য অথবা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য? যদি প্রথমটি হয় তবে আমি আপনাকে উপদেশ দেব সহশিক্ষায় ভর্তি না করানোর জন্য, আর যদি পরেরটি হয় তবে আপনিই ভাল বুঝবেন আপনি কি করবেন।

২১. প্রশ্ন : আমি জানতে চাই, কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যাদান করার মত কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তারা কত শতাংশ?

উত্তর : ডা. নায়েক : ভাইজান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর সময় এমন অনেক মহিলা ছিল যারা শুধু হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না তারা সেগুলো মুখস্থও করতেন। আয়েশা (রা) নিজে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখন প্রধান প্রশ্ন হল, বর্তমানে কতজন নারী 'আলেম' আছেন? এবং তিনি তার শতকরা হার জানতে চেয়েছেন। মুম্বাইতে অনেক মহিলা আলেম রয়েছেন এবং অনেক মুসলিম সংগঠনও রয়েছে, এমনকি দারুল উলুম নদওয়াতেও। অন্যান্য জায়গাতে যেমন মুম্বাইর 'ইসলাহ-উল-বানাত'-এ অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরি করেন। তাদের শতকরা হার আমি জানি না তবে সংখ্যায় তারা শত শত।

২২. প্রশ্ন : আমি জেনিফার – আমার প্রশ্ন হলো কেবল স্বামীই কি স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোন নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর : ভাইয়ের মূল প্রশ্ন হল : একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারে, কিন্তু একজন নারীও কি তার স্বামীকে ডিভোর্স বা তালাক দিতে পারে? একজন মহিলা তালাক দিতে পারে না। কারণ 'তালাক' শব্দটি আরবি যেটা 'ডিভোর্স' অর্থে ব্যবহার করা হয়– যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে, স্ত্রী-স্বামীকে দিতে পারবে না। ইসলামে ডিভোর্স পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথম : এ চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বলবে ব্যাস আমরা আর একসাথে ঘর করার মত উপযুক্ত নই– চলো, আমরা উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দেই।

দ্বিতীয় : এ প্রকার হল স্বামীর একক ইচ্ছায় একে তালাক বলে; যেখানে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রদেয় মোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদেয় উপহারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় : স্ত্রীর একক ইচ্ছায় ডিভোর্স দেয়া। যদি তার বিয়ের চুক্তিতে তথা তার নিকাহনামায় এটি উল্লেখ থাকে তবে এককভাবে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে– এটাকে বলা হয় 'ইসমা'। আমি কখনোই কাউকে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পদ্ধতি ইসমা সম্পর্কে বলতে শুনিনি।

চতুর্থ : এ পদ্ধতিটি হল, যদি স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার না দেয়, তখন তার 'কাজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং বিয়ে বাতিল করার আবেদন জানাতে পারবে। একে বলে 'নিকাহ-ই-ফাসেদ'। তখন কাজী তার ইচ্ছানুযায়ী স্বামীকে তার পুরো মোহর অথবা মোহরের অংশবিশেষ পরিশোধ করার জন্য বলবে এবং **পঞ্চম ও সর্বশেষটি** হল 'খোলা' – এক্ষেত্রে যদিও স্বামী সব দিক থেকে ভাল হয় এবং তার সম্পর্কে স্ত্রীর কোন অভিযোগ না থাকে তথাপি তার ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ করে না – তখন সে স্বামীকে অনুরোধ করতে পারে তাকে ডিভোর্স দেয়ার জন্য – আর এটাই হল 'খোলা'। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য, নারী যে স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার এ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বলে না। কিছু আলেম-ওলামা আছেন যারা এ পাঁচ ধরনের ডিভোর্সকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইসলামে তালাক পাঁচ প্রকার।

২৩. প্রশ্ন : ইসলামে নারীদের কেন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি?

উত্তর : ড. নায়েক : সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনার প্রশ্ন বেশ কঠিন। কুরআন এবং সহীহ হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নেই যাতে করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন যে,

মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, 'মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে বাড়িতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষে নামায পড়া অত্যধিক উত্তম।'

ঐসব লোকেরা কেবল একটি উৎস গ্রহণ করে অন্য সকল উৎস বাদ দিয়ে। আপনাকে এ হাদীসের প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। মুহাম্মদ ﷺ এটিও বলেছেন যে, 'মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের কাজ।' তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন হে নবী ﷺ! 'আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়...সুতরাং কিভাবে আমরা মসজিদে যাব?' তার উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন– যদি কোন মহিলা ঘরে নামায পড়ে তবে এটা তার জন্য উত্তম, মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে; ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার নিবিড় কক্ষে নামায পড়া আরো উত্তম।" যদি তার বাচ্চা থাকে অথবা তার কোন সমস্যা থাকে তবে ঘরে নামায আদায় করলেও তার সমান সওয়াব হবে। বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধা দেয় না। এরকম একটি হাদীস হল– 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদেরকে মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিও না।'

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– 'নবী করীম ﷺ স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে চায়, তবে তাদেরকে বাধা দিও না।' এরকম আরো কিছু হাদীস আছে আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাই না। বস্তুত ইসলাম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে– আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নই। আমরা নারী-পুরুষদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নই এ কারণে যে, ইসলাম যদি মসজিদে এ রকম করার সুযোগ দেয় তবে তাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে– তবে পুরুষরা তাদেরকে ইভ টিজিং ও কুনজর দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে, নামায পড়ার জন্য নয়। সুতরাং ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়। সেখানে পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বার থাকতে হবে, আলাদা ওজুর ব্যবস্থা থাকতে হবে– মহিলা ও পুরুষদের জন্য।

মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদাভাবে দাঁড়াতে হবে এবং মহিলাগণ পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে– কেননা যদি মহিলাদের পিছনে পুরুষরা দাঁড়ায় তবে সেখানে বাজে একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগের ঘাটতি হবে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই, আমাদের দাঁড়াতে হয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে – এক্ষেত্রে ডাক্তারগণ বলেন যে, মহিলাদের পুরুষদের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার

পাশে কোন মহিলা দাঁড়ায়, আপনি উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভব করবেন তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, মনোনিবেশ করবেন নারীটির প্রতি। আর এজন্যই নারীদেরকে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে তাদের পিছনে দাঁড়ানোর কথা বলেছে।

আপনি যদি সৌদি আরব যান, সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে, আপনি যদি লন্ডন বা আমেরিকা যান, সেখানেও দেখবেন নারীরা মসজিদে যাচ্ছে। এটি কেবল ভারত ও অন্য কতিপয় রাষ্ট্রে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। আপনি যদি মক্কার মসজিদে হারামে বা মদিনার মসজিদে নববীতে যান সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে আসছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভারতের কোন কোন মসজিদে এমনকি মুম্বাইয়েরও কিছু মসজিদে নারীদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি আশা করব এরকমভাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে।

২৪. প্রশ্ন : আমি প্রশ্ন করতে চাই আজকের এ সম্মেলনটি 'ইসলামে নারীর অধিকার' এর ওপর; কিন্তু মঞ্চে কেন একজনও নারী আলোচক নেই? কেন শুধু পুরুষ? যদি ব্যাপারটি এরকম হয় যে, এটি এখানকার মহিলা শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন?

উত্তর : ড. নায়েক : বোনটি প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মঞ্চে একজনও নারী আলোচক নেই– যেহেতু আজ কোন নারী আলোচক নেই। প্রতি শুক্রবার আমাদের সংগঠনের (IRF) কর্মসূচিতে মহিলা আলোচক থাকেন, যেখানে তারা বক্তৃতা করেন। এখানে আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছি। আমি একজন পুরুষ আলহামদুলিল্লাহ, আজকের প্রধান অতিথি এবং অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী সকলেই পুরুষ। এখানে আরো কর্মসূচি হবে যেখানে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি সকলেই মহিলা। ইনশাআল্লাহ যখন এরকম অনুষ্ঠান হবে আমরা আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করব।

২৫. প্রশ্ন : স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর : ড. নায়েক : এটি স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় যে, দ্বিতীয় বিয়ের সময় তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে– কেননা কুরআন বলেছে– 'তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে একটা মাত্র শর্তে যে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে (পূর্ণাঙ্গভাবে) ন্যায়বিচার করতে পার।'

কিন্তু এটি অবশ্যই উত্তম যে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং এটি তার কর্তব্য যে, সে তার দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীকে জানানো– কেননা ইসলাম বলে– 'যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে।'

কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিরাজ করবে। কিন্তু এটি আবশ্যকীয় নয়, তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। চুক্তিটি এরকম যে, 'তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না।' কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং ভাল।

২৬. প্রশ্ন : আমার নাম ইয়ার হোসাইন। ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তবে কিভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করত?

উত্তর : ড. নায়েক : আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, যদি ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে কিভাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে কাজ করেছে? আপনি যদি আমার বক্তব্য সঠিকভাবে শুনে থাকেন,...আমি সেখানে বলেছিলাম 'এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পর্দা করত, তবে সেখানে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে।'

আপনি যদি 'সহীহ বোখারী' পড়ে থাকেন, সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, অথচ স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকত। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ঘোড়ায় চড়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে, তখন তাদের খালি পা দেখা যেত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে পর্দার ক্ষেত্রে; তবে তার মানে এ নয় যে, ইসলাম তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে – যেরকম দেখা যায়, আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে। বরং তারা ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি পোশাক বজায় রেখে চলত।

২৭. প্রশ্ন : আমি মোহাম্মদ আসলাম গাজী। আমার প্রশ্ন হল, ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও সহ-শিক্ষা সংস্কৃতির কারণে বর্তমান সময়ে যৌন অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে– সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কি বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার ব্যাপার আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

উত্তর : ড. নায়েক : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বর্তমানে যৌনতার ওপর ভিত্তি করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কি সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার ওপর অনুমতি দেয়া যায়? জবাব হলো– আমি আপনাকে বলছি, পিতামাতা নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারে যে, কোথায় বা কাকে তারা বিয়ে করবে, কিন্তু তারা কোন বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। আপনি কি এটি বলতে পারেন যে, পিতামাতার পছন্দ সর্বদা সঠিক

হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের দিকনির্দেশনা দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোনরূপ বাধ্য করতে পারবে না, কারণ এটি নিশ্চিত যে, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে; পিতা-মাতাকে নয়।

২৮. প্রশ্ন : আস্সালামু আলাইকুম, আমি মিসেস রাজিয়া খান। আমার প্রশ্ন হলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক – কিন্তু কেন?

উত্তর : ড. নায়েক : ইসলাম কেবল পিতাকেই সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে– এটি ভুল কথা। ইসলামি শরিয়া মতে, সন্তানের জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি ৭ বছর বয়সে অথবা ৭ বছরের কম বয়সের সময় অভিভাবকত্ব মায়ের দিকেই থাকে। কারণ এ সময়ে মায়েরা সন্তানদের প্রতি বেশি দায়িত্বশীল– পিতার চেয়ে। তারপর অভিভাবকত্ব পিতার দিকেই চলে যায় এবং সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন এটা তার স্বাধীন ইচ্ছা যে, সে কার কাছে থাকবে। সে পিতা বা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

মিডিয়া এন্ড ইসলাম

MEDIA & ISLAM

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ
মোঃ মারুফ হাসান
বিবিএস (অনার্স) একাউনটিং
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ও
মাওলানা মোঃ শরিফুল ইসলাম
বিএ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মিডিয়া এন্ড ইসলাম

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা , আস্‌সালামু আলাইকুম। সবার ওপরে আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এখন দুবাই হলি কোরআন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে ভাই আরিফ জুলফারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। ভাই জুলফার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের শ্রদ্ধেয় বক্তা ডা. জাকির নায়েক, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এছাড়া আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখ মুহাম্মাদ বিন রশিদ আল-মাখদুমকে যিনি দুবাইয়ের যুবরাজ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। দুবাই হলি কোরআন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি আমন্ত্রণ জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথি ডা. জাকির নায়েককে। আজকের বক্তৃতার বিষয় হলো– 'মিডিয়া এন্ড ইসলাম' যুদ্ধ-নাকি শান্তি? প্রথমেই আমরা পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনব, তেলাওয়াত করবেন ছোট্ট বন্ধু 'ফারিক নায়েক' (ডা. জাকির নায়েকের পুত্র) আউযুবিল্লাহি মিনাস্ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সূরা ফজর (আয়াত ১ থেকে ৩০)

অর্থ : ১. শপথ উষার, ২. শপথ দশ রজনীর, ৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের, ৪. এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হয়, ৫. নিশ্চয় এতে শপথ রয়েছে বিবেকবানদের জন্য, ৬. তুমি কি দেখোনি তোমার রব কি করেছিলেন আ'দ বংশের সাথে? ৭. ইরামদের সঙ্গে যারা সুউচ্চ প্রাসাদের মালিক ছিল, ৮. যার সমতুল্য কোন দেশ নির্মিত হয় নি, ৯. এবং সামূদের প্রতি, যারা 'কুরা উপত্যকার' পাথর কেটে গৃহ বানিয়েছিল, ১০. এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি, ১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, ১২. এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল, ১৩. অত:পর তোমার রব ওদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন, ১৪. তোমার রব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ১৫. মানুষতো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন', ১৬. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন রিযিক সংকুচিত করে তখন সে বলে 'আমার রব আমাকে হীন করেছেন', ১৭. কখনই নয় বরং তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, ১৮. তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহ কর না, ১৯. এবং তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল, ২০.

এবং তোমরা ধনসম্পদ অতিশয় ভালবাস, ২১. এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, ২২. এবং যখন তোমার রব ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে কাছে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এ স্মরণ তার কোন কি কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে হায় ! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু সৎ কাজ করে রাখতাম, ২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি দেবার কেউ থাকবে না, ২৬. এবং তাঁর মত দৃঢ় বন্ধনে বন্ধন করার কেউ থাকবে না, ২৭. ওহে প্রশান্ত আত্মা!, ২৮. তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্টি ও সন্তোষভাজন হয়ে, ২৯. আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে এবার কিছু কথা বলি, তিনি পেশাগতভাবে একজন মেডিকেল ডাক্তার হলেও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের ওপর গবেষক ও একজন খ্যাতিমান বক্তা হিসেবে পরিচিত। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো দূর করেন ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কোরআন, মুহাম্মদ ﷺ এর হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে। এর পাশাপাশি যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। ডা. জাকির নায়েকের এখন বয়স ৪৪ বছর। ডা. জাকির নায়েক বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন অকাট্য ভাষ্য ও তার বিশেষ যুক্তির জন্যে, যখন লেকচার শেষে শ্রোতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ডা. জাকির নায়েক গত ১০ বছরে ১০০০-এর বেশি লেকচার দিয়েছেন। যেমন- ইউ.এস.এ, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক দেশে। এখন ডা. জাকির নায়েক তার আলোচ্য বিষয়ের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন।

ডা. জাকের নায়েক : আলহামদুলিল্লাহ্। শ্রদ্ধেয় গুরুজন, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের স্বাগত জানাই ইসলামিক নিয়মে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু' আল্লাহর দয়া, শান্তি এবং রহমত সবার ওপর বর্ষিত হোক। এটি আমার জন্য খুবই আনন্দ এবং সম্মানের ব্যাপার যে, 'দুবাই হলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড'-এর পক্ষ থেকে শেখ মুহাম্মদ রশিদ আল-মাকতুম আমাকে এখানে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'মিডিয়া এন্ড ইসলাম, যুদ্ধ নাকি শান্তি?' মিডিয়া-এর মানে হলো– যে মাধ্যমে জনগণের সাথে যোগাযোগ করা যায়। 'মিডিয়া' হলো জনসাধারণের কাছে তথ্য প্রচারের মাধ্যম। ইসলাম এসেছে আরবি শব্দ 'সালাম' থেকে। যার অর্থ : শান্তি। এটি এসেছে আরবি শব্দ 'সিলম' থেকে। যার অর্থ : নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। তাহলে এক কথায় ইসলাম মানে– নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।

মিডিয়ার প্রকারভেদ

তাহলে আজকের আলোচনার বিষয়টি হলো জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যম এবং আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা। যুদ্ধ নাকি শান্তি? আজকে আমাদের জানতে হবে যে, মিডিয়া এখনকার দিনে খুবই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, মিডিয়া এখানকার দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই মিডিয়া কালো জিনিসকে সাদা করে ফেলতে পারে। এই মিডিয়া রাতকে দিন বানাতে পারে। এই মিডিয়া হিরোকে ভিলেন এবং ভিলেনকে হিরো বানাতে পারে। এই মিডিয়া জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যমে, যে অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে মিডিয়াও তার সাথে সাথে উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়াকে মোটামুটিভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো– প্রিন্ট মিডিয়া। এটিকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– নিয়মিত এবং অনিয়মিত। অনিয়মিত মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে, যেমন– সাহিত্য অর্থাৎ প্রবন্ধ, বুকলেট, বই ইত্যাদি এবং নিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে– খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, যেগুলো ছাপানো হয় প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে বা তিন মাসে, প্রতি বছরে ইত্যাদি। এটি হলো মিডিয়ার প্রথম পদ্ধতি, দ্বিতীয় মিডিয়া হলো– অডিও মিডিয়া। এই অডিও মিডিয়া আমরা বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকি। যেমন– অডিও টেপ, যেটি এখনকার দিনে সেকেলে।

এছাড়াও আছে অডিও সিডি, Compact disk. তাছাড়াও বাজারে পাওয়া যায় ডিজিটাল অডিও টেপ। এই অডিও মিডিয়ার শ্রোতা হতে পারে একজন সাধারণ মানুষ। সে তার নিজের বাড়িতে, নিজের গাড়িতে কিংবা অফিসেও শুনতে পারে। একটি অডিও প্লেয়ার, হাঁটতে হাঁটতেও এগুলো শোনা যায় : যেমন– ওয়াকম্যান। অডিও মিডিয়ার শ্রোতা হতে পারে বেশ কয়েকজন মানুষ, যেমন– কোন অনুষ্ঠানে, পার্টিতে, বিয়েতে, এই রকমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অথবা শ্রোতা হতে পারে অনেক বেশি মানুষ রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে। ৩য় পদ্ধতির মিডিয়া হলো– ভিডিও মিডিয়া। এটাও বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়, যেমন– ভিএইচএস, ভিডিও হোম সিস্টেম ক্যাসেট। এটিও এখন সেকেলে হয়ে গেছে। এই পদ্ধতিটিও পুরোনো হয়ে গেছে।

তাছাড়াও আপনারা পাবেন ভিসিডি। এটিও এখন সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আপনারা ডিভিডিও মিডিয়া পাবেন। ডিভিডিতে রয়েছে ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক এবং এরপর যে নতুন প্রযুক্তিটি বাজারে এসেছে, সেটি হলো– এইচ.ডি.ডি.ভি.ডি.– হাই ডেফিনিশন ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক। এছাড়াও নতুন আরেকটি প্রযুক্তি হলো ব্লুরে। এই হলো ভিডিও মিডিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি। এখানেও দর্শক হতে পারে একজন। বাসায়, অফিসে কিংবা গাড়িতে, দর্শক হতে পারে কয়েকজন অথবা এখানে দর্শক

হতে পারে অনেক বেশি মানুষ। যেমন- বিভিন্ন টিভি স্টেশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, কেবল টি ভি, মিডিয়ার সর্বশেষ পদ্ধতিটি হলো কম্পিউটার মিডিয়া। আই. টি. ইনফরমেশন টেকনোলজি, এখানেও ব্যবহারকারী হতে পারে একজন, কয়েকজন অথবা অনেক বেশি মানুষ। অনেক বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারে, যেমন- ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এগুলো বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন- ডিস্কে, ভিসিডি, হার্ডডিস্ক ইত্যাদিতে। এক কথায় মিডিয়ার টাইপ হলো প্রধানত ৪টি। প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া, ভিডিও মিডিয়া এবং কম্পিউটার মিডিয়া।

প্রত্যেক মিডিয়াতেই কিছু বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মিডিয়ার কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। যেমন- প্রিন্ট মিডিয়ার কাজগুলো তুলনামূলকভাবে সহজে করা যায়। অডিও ও ভিডিও মিডিয়ার কাজগুলো বেশি কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সহজ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের বলে যে বিভিন্ন মিডিয়ায় মানুষের মনে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন রকম। যখন সাধারণ একজন মানুষ প্রিন্ট মিডিয়ার কোন কিছু পড়ে সে তার পড়ার আনুমানিক ১০% মনে রাখতে পারে। যখন একজন অডিও মিডিয়া শুনছে, একজন সাধারণ মানুষ সে যা শুনেছে তার আনুমানিক ২০% মনে রাখতে পারে। যখন একজন লোক নিজের চোখে কিছু দেখেছে, কোন ছবি কিংবা অন্য কিছু, একজন সাধারণ মানুষ সে যা দেখেছে তার আনুমানিক ৩০% মনে রাখতে পারে। তবে যখন একজন মানুষ একইভাবে দেখে এবং শুনে অর্থাৎ অডিও এবং ভিডিও একই সাথে, একজন সাধারণ মানুষ সে যা দেখেছে এবং শুনেছে তার আনুমানিক ৫০% মনে রাখতে পারে। তাহলে মনে রাখার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো হলো ভিডিও মিডিয়া।

মিডিয়ায় ইসলামের অপবাদ

আজকের দিনে আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, হোক সেটি প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া বা কম্পিউটার বা ইনফরমেশন টেকনোলজি। সেটি আন্তর্জাতিক খবরের কাগজ, আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন : রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন, ওয়েবসাইট অথবা টিভি স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমরা দেখছি যে এগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যার বোমা ফাটাচ্ছে। এছাড়াও দেখি আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল, তারা এমনটি বলছে যে যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিংবা কিছু আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল আছে তারা বলছে শান্তির জন্য যুদ্ধ। তারা এখানে যেটি করছে তা শান্তির জন্য যুদ্ধ নয় শান্তির সাথে যুদ্ধ। অন্য কথায় শান্তির ধর্মের সাথে যুদ্ধ। অর্থাৎ ইসলামের সাথে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামগ্রিকভাবে আমরা দেখি যে, তারা ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যেন এটি একটি সন্ত্রাসের ধর্ম। এটি এমন ধর্ম যেটি এই পৃথিবীতে শান্তি চায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে

মুসলিমরা, আমরা কেউ তাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করছি না। এই আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে তুলে ধরছে।

মিডিয়া ইসলামকে যেভাবে অপবাদ দেয় তার প্রথম কৌশলটি হলো, প্রায়ই দেখা যায় তারা যেটি করে মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গারকে তুলে ধরে। আর প্রচার করে যে এটাই হলো মুসলমানদের দৃষ্টান্ত। তারা এভাবে বলে যে ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম যা অন্যায়কে উৎসাহ দেয়। আমরাও মানি যে আমাদের মধ্যেও কুলাঙ্গার আছে। কিন্তু কিছু মুসলিম আছে যারা অন্যায় কাজ করে। মিডিয়া এই সব মুসলিমদের তুলে ধরে এবং প্রচার করে যে এরাই হলো ইসলামের দৃষ্টান্ত। প্রচার করে যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যারা এ সব অন্যায় কাজ করাকে উৎসাহ দেয় এবং এই কাজগুলো মানবতার বিরুদ্ধে। আমরা সবাই একথা জানি আন্তর্জাতিক মিডিয়া বলে যে ইসলামি মাদরাসাগুলো নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ তারা মানুষকে বদলে ফেলে তৈরি করে একজন সন্ত্রাসীকে। তারা এই পৃথিবীর শান্তিকে নষ্ট করে দেয়।

আল-হামদুলিল্লাহ আমি এরকম হাজারও লোককে চিনি যে লোকগুলো পাস করেছে ইসলামিক মাদরাসা থেকে। আমি এমন একজনকেও দেখিনি যে লোকটি পৃথিবীর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করে। তার মানে এই না, যারা মাদরাসা থেকে পাস করে বের হয় তারা অন্যায় কাজ করে না। কিছু লোক থাকতে পারে এরা সব মিলিয়ে ১%-এর বেশি হবে না। কিন্তু মিডিয়া প্রচার করে যে কুলাঙ্গারই হলো মুসলিমদের দৃষ্টান্ত এবং যে লোকটি কোন ইসলামিক মাদরাসা থেকে পাস করেছে সে এই পৃথিবীর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চায়। ইতিহাস আমাদের এই কথা বলে।

পৃথিবীর যে লোকটি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছে সে লোকটি কে? কে সেই লোক? তিনি হলেন 'হিটলার'। এইজন্য অবশ্য তিনি কোন পুরস্কার পাবেন না। এটা সবাই জানে। আমি প্রশ্ন করি হিটলার কোন মাদরাসা থেকে পাস করেছিলেন? হিটলার কোন মাদরাসার ডিগ্রি নিয়েছিলেন। তাছাড়াও ইতিহাস দেখেন, আর এক ঘৃণিত ব্যক্তি মুসোলিনি। মুসোলিনি কোন মাদরাসা থেকে পাস করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে?

আমরা আরো জানি যে 'মাফিয়া' কুখ্যাত ড্রাগ পাচারকারী তারা কোন মাদরাসার ডিগ্রিধারী। একটি লিস্ট করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধীদের লিস্ট। মিডিয়া যেভাবে বলে তেমন না। সত্যিই যদি কোন প্রমাণ থাকে আপনার কাছে যে, সে লোক অপরাধী। মিডিয়া কাকে সন্ত্রাসী নাম্বার এক বলে আমি তেমন বলছি না কোন প্রমাণ ছাড়া। যে লোকগুলো আসলেই অপরাধী, যেখানে অপরাধের প্রমাণ আছে যে

তারা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করেছে। তাদের পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে আপনি ১% লোকও পাবেন না, যারা মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে। তারা লেখাপড়া করেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমিও সেখান থেকে পাস করেছি। হোক সেটি দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য, আমিও তেমনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছি। মুম্বাই থেকে পাস করেছি, স্কুল পাস করার পর মেডিকেল কলেজে পড়েছি। যেভাবে একজন ডাক্তার পাস করে।

এভাবে মিডিয়ার মধ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গার তুলে ধরে বলে যে এরাই মুসলিমদের দৃষ্টান্ত। যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চায় তাহলে মুসলিমরা বা মুসলিম সমাজ কি করে সেটি বিচার করলে হবে না। আপনারা যদি ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চান আপনাদের ইসলামকে বিচার করতে হবে ইসলামের মূল ধর্ম গ্রন্থগুলো দিয়ে। ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থগুলো হলো পবিত্র কোরআন এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সহীহ হাদীস। আমি চ্যালেঞ্জ করছি মানুষের মধ্য থেকে যেকোন লোক যিনি একটি নীতি খুঁজে বের করেন পবিত্র কোরআন থেকে অথবা সহীহ হাদীস থেকে, যা স্বাভাবিকভাবে মানবজাতির কোন ক্ষতি করতে পারে।

মনে করেন আপনি একটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবেন গাড়িটি কতখানি ভাল এবং বাজারের সবচেয়ে নতুন গাড়িটি। হতে পারে মার্সিডিজ, সিক্সহানড্রেড,এসিএল, মার্কেটে নতুন এসেছে। এখন একজন লোক যে গাড়ি চালাতে জানে না স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসলো। তারপর গাড়ি নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালো। আপনি কাকে দোষ দিবেন। গাড়িকে না ড্রাইভারকে? দোষ নিশ্চয় গাড়িকে দিবেন না। যদি কেউ গাড়ি চালাতে না জানে আর সেটিকে নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় আপনারা গাড়িকে দোষ দিবেন না। যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান গাড়িটি কতখানি ভাল, এর পিকআপ কতো, নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কেমন, গাড়িটির স্পিড কত, গিয়ারের অবস্থা কি। তারপর বলতে পারেন গাড়িটি কতখানি ভাল। আর যদি গাড়িটি পরীক্ষা করে নিতে চান চালু করে, তাহলে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসান একজন দক্ষ চালককে।

একইভাবে যদি কোন মুসলিমকে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে ইসলাম কতখানি ভাল, এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ ﷺ। আমার দিকে তাকিয়ে আপনারা ইসলাম ধর্ম বিচার করবেন না। অন্য কোন মুসলিম কিংবা মুসলিম সমাজের কাজগুলো দেখবেন না। আপনারা দেখবেন একজন দক্ষ চালককে অর্থাৎ যিনি ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানেন এবং ভালভাবেই মানেন। আর যিনি সম্পূর্ণ ছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ﷺ। ইসলামের অপবাদ দিতে মিডিয়া আরো যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে সেটি হলো তারা স্থান, কাল, পাত্রভেদে প্রসঙ্গ ছাড়াই পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। আর পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত যেটি সমালোচকদের কাছে খুব বেশি পছন্দ সেটি

পবিত্র কোরআনের সূরা, সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত বলা হয়েছে–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ـ

অর্থ : যখন তোমরা কোন কাফিরদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে।

আর যদি কোরআন খুলেন এই আয়াতটি দেখবেন এবং অনুবাদটিও দেখবেন। 'যখনি তোমরা কাফিরদের দেখবে তাদেরকে মেরে ফেলবে'। তবে এটি প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। তারা কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয় কোন প্রসঙ্গ ছাড়া। হাদীসের উদ্ধৃতিও তারা দেয় প্রসঙ্গ ছাড়া। এর প্রসঙ্গটা এর প্রথমদিকের আয়াতে আছে, বলা হয়েছে যে, একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল সেখানকার মুসলিম আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে এবং মক্কার মুশরিকরাই সেই শান্তি চুক্তির শর্তগুলো ভেঙ্গেছিল। আর তখনি আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবার ৫নং আয়াত নাযিল করলেন, তিনি এখানে মুশরিকদের উদ্দেশ্য চূড়ান্ত প্রস্তাবটি দিয়েছেন, 'তোমরা আগামী ৪ মাসের মধ্যে সব ভুল শুধরে ফেল, না হলে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে' আর সেই যুদ্ধে আল্লাহ বলেছেন মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে, 'তোমরা ভয় পেও না, যুদ্ধ কর। যেখানেই তোমাদের শত্রুদের দেখবে মেরে ফেল।'

যেকোন আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদের মানোবল বাড়াতে স্বাভাবিকভাবেই একথা বলবেন– যদি শত্রুদের দেখ মেরে ফেল। একথা বলবেন না যে, যেখানে তোমরা শত্রুদের দেখবে সেখানে তোমরা মরে যাও। তাই এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন– 'শত্রুরা যখন তোমাদের আক্রমণ করতে আসবে তোমরা ভয় পেওনা, যুদ্ধ করো এবং তাদের দেখলেই মেরে ফেল'। চিন্তা করুন যদি এখনো আমেরিকা আর ভিয়েতনামের যুদ্ধটি চলতে থাকতো এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলতেন যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা কোন আর্মি জেনারেল সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে যে, তোমরা যেখানেই ভিয়েতনামীদের দেখবে মেরে ফেলবে। এটা হলো প্রসঙ্গ। কিন্তু যদি আমরা প্রসঙ্গ ছাড়া বলি যে আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে যে, যেখানেই তোমরা ভিয়েতনামীদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে। তাহলে লোকজন বলতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটা কসাই। এটাই প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি।

সকল সমালোচককেই দেখেছি হয়তো এখানেই শেষ করে, না হয় একটি আয়াত বাদ দিয়ে দেয়। আর অরুনশুরি ইসলামের একজন বিখ্যাত সমালোচক। ভারতে অর্থাৎ এই উপমহাদেশে তিনি তার বইতে লিখেছেন 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়াদ' তিনি সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের পর লাফ দিয়ে চলে গেছেন ৭ নং আয়াতে। কারণ এই ৬ নং আয়াতেই তার এ অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে। সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলছে, কাফিরদেরকেও অর্থাৎ শত্রুদের কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে

শুধু সাহায্য করলে হবে না; বলা হয়েছে তাদের নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দেবে, যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।'

একজন সবচেয়ে দয়াবান, সবচেয়ে দয়াবান আর্মি জেনারেল হয়তো এমনটি বলবেন যে, শত্রু যদি চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে চলে যেতে বল। কিন্তু কোরআন এমনটি বলছে না। কোরআন বলছে শত্রুরা যদি শান্তি চায় তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও এবং কোরআনের প্রায় সব আয়াতেই যেখানে বলা হয়েছে যুদ্ধের কথা বা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। তারপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, শান্তিই সবচেয়ে ভাল সব জায়গায়, কারণ ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামের অপবাদ দেয়ার জন্য তারা ৩য় কৌশলটি গ্রহণ করে, তা হলো তারা যে সমস্ত উদ্ধৃতি তার ভুল ব্যাখ্যা করে হোক সেটি পবিত্র কোরআন থেকে কিংবা মহানবী ﷺ এর হাদীস থেকে। আর ৪র্থ কৌশলটি হলো এমন অপবাদ যেটি ইসলামে নেই অর্থাৎ ইসলামে এর কোন উল্লেখও নেই, সেটিকে ইসলামের সাথে জড়ায়। মিডিয়ার ৫ম কৌশলটি হচ্ছে তারা ইসলামের আলোকে ঠিক ব্যাখ্যাই দেয়, তবে সেটিকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তারা ভাবে যে মানবজাতির জন্য এটি একটি সমস্যা। তারা বলতে চায় যে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সমস্যা। ইসলাম আসলে কোন সমস্যা নয় ইসলাম হলো মানবজাতির সমস্যার সমাধান। ইসলাম মানবজাতির জন্য কোন সমস্যা নয়।

এভাবেই বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মিডিয়া ইসলামের বদনাম করে। আর এখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখি যে মুসলিমদের বলছে মৌলবাদী, চরমপন্থী আর সন্ত্রাসী এবং বেশির ভাগ মুসলিমই অপরাধে ভোগে এবং বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে যে আসলে কিছু মুসলিম এসব কাজ করে থাকে কিন্তু আমি মৌলবাদী না, আমি চরমপন্থী না, বেশির ভাগ মুসলমানই অপরাধবোধে ভোগে। কিন্তু এখানে আমরাও উত্তর দিতে পারি। মুসলিমরা তারা হবে দাইয়ি। ইসলামের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে (সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ১১০) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যই তোমাদের পৃথিবীতে আবির্ভূত কম হয়েছে, কারণ তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেও, অসৎকাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'

আমাদের বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মত। কারণ আমরা সৎকাজের নির্দেশ দেই, অসৎ কাজের নিষেধ করি এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি। আমরা যদি সৎকাজের নির্দেশ না দেই, অসৎ কাজের নিষেধ না করি তখন আমাদের মুসলিম বলা যাবে না। বলা যাবে না শ্রেষ্ঠ উম্মত। মুসলিম হিসেবে আমাদের গর্ব করা উচিত। এখন আমাদের টেবিলটা উল্টে দিতে হবে। আমার মনে আছে, যখন মার্শাল আর্ট শিখতাম তরুণ

বয়সে, এখনো তরুণই আছি 'মাশ্আল্লাহ'। তখন আমি স্কুলে পড়তাম। আমরা শিখতাম মার্শাল আর্ট, হোক সেটি জুডু বা জুজুৎসু, সেখানে প্রতিপক্ষের শক্তি দিয়েই তাকে ঘায়েল করা হতো। বাধা দিয়ে নয়। কেউ আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, সে যদি আকারে বড় হয়। কিন্তু আমাকে তো আপনারা দেখছেন সাইজে আমি হালকা পাতলা। তারপরও আমি সামনে কোন কিছু রাখি না। এটাও মিডিয়ার কৌশল। তারা শরীরটাকে ঢেকে রাখে কিন্তু আমি চাই আমার বডি লেঙ্গুয়েজ সবই দেখেন। তাহলে বড়সড় কোন লোক যদি আমাকে ধাক্কা দেয়, তাকে বাধা না দিয়ে ঐ ধাক্কাকেই কাজে লাগিয়ে তাকে ফেলে দিতে হবে। যত বড় আকার তত সহজে ফেলা যাবে।

মৌলবাদের বিশ্লেষণ

মিডিয়া এখন মুসলিমদেরকে বলে মৌলবাদী। এই মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কী? মৌলবাদী শব্দের অর্থ হলো যেকোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মূলনীতিগুলো মেনে চলে। যেমন ধরুন, যদি কোন লোক সে হতে চায় একজন বিজ্ঞানী, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে। যদি সেই লোক বিজ্ঞানের বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, সে তাহলে ভাল বিজ্ঞানী হতে পারবে না। যদি একজন লোক গণিতজ্ঞ হতে চান, তাহলে তাকে গণিতের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। যদি সে লোক গণিতের বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, সে তাহলে ভাল গণিতজ্ঞ হতে পারবে না। আপনারা সব মৌলবাদীকেই এক কাঠিতে মাপতে পারবেন না যে তারা সবাই ভাল বা সবাই খারাপ।

মৌলবাদীরা যে যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী। সেটা দেখে তারপর আপনাদের বিচার করতে হবে। যেমন ধরুন, একজন মৌলবাদী ডাকাত তার কাজ ডাকাতি করা। সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং অন্যদিকে একজন লোক মৌলবাদী ডাক্তার যে লোক হাজারও মানুষের জীবন বাঁচায়। সে সমাজের জন্য উপকারী, সব মৌলবাদীকেই এক মাপকাঠিতে মাপতে পারবেন না। আপনাকে দেখতে হবে যে, কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী। তারপর বলবেন সে ভাল না খারাপ। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি একজন মুসলিম এবং আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত। কারণ আমি সব সময় ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি যে ইসলাম ধর্মে এমন কোন মূলনীতি নেই যা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে যায়। ইসলাম ধর্মের কিছু মূলনীতি আছে, সেগুলোকে অমুসলিমরা মনে করে মানবতার বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনি যদি সেই নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন, আর বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলেন, এমন একজনও নিরপেক্ষ লোকও পাবেন না, যে লোক ইসলাম ধর্মের একটিমাত্র মূলনীতি খুঁজে বের করবে, যেটি সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে যায়। এজন্য আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত।

ওয়েবস্টার ডিকশনারী পড়লে সেখানে দেখতে পাবেন এই মৌলবাদী শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টানদের বুঝাতে। আমেরিকাতে সেটি ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এর আগে খ্রিস্টান চার্চ বিশ্বাস করতো শুধু বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত। এই প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টানরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকাতে প্রতিবাদ করেছিল এই বাইবেলের আদেশগুলোই শুধু নয় বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রত্যেকটি অক্ষরই এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত এই আন্দোলনটি ভাল আন্দোলন এবং অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত নয়, এই আন্দোলনটি ভাল আন্দোলন নয়।

যদি আপনারা 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, সেখানে মৌলবাদী কথাটির একটি সংজ্ঞা দেয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে মৌলবাদী একজন ব্যক্তি যে ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলে। তবে আপনারা যদি 'অক্সফোর্ড ডিকশনারি' নতুন সংস্করণটি দেখেন তাতে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বলা হয়েছে যে মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি, যে ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করে, বিশেষ করে ইসলাম। এই বিশেষ করে ইসলাম এই কথাটি এখন জুড়ে দেয়া হয়েছে। যখনি আপনি মৌলবাদী কথাটি শুনবেন। আপনি কোন মুসলিমের কথা ভাববেন। সে চরমপন্থী, সে সন্ত্রাসী, মিডিয়া বলে বেড়ায় যে মুসলিমরা চরমপন্থী।

আমি তা স্বীকার করবো যে আমি চরমপন্থী, চরমভাবে দয়ালু, চরমভাবে ক্ষমাশীল, চরমভাবে সৎ, চরমভাবে ন্যায়বান। তবে কোন সমস্যা নেই যদি আমি হই চরম দয়ালু, চরম ন্যায়বান, চরম সৎ। অসুবিধা কোথায়? আপনারা কেউ কি বলতে পারবেন যে চরমভাবে সৎ হওয়াটা খারাপ? এমনভাবে কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে চরমভাবে ন্যায় হওয়া খারাপ দিক। কোরআন বলছে তোমরা চরম ন্যায়বান হও। আমরাতো আংশিকভাবে সৎ হবো না। যে লোক আমার বন্ধু তার কাছে সৎ থাকবো, আর যে আমার শত্রু তার কাছে সৎ থাকবো না। পবিত্র কোরআনের (সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে) বলা হয়েছে যে, ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ইসলামে প্রবেশ করো সর্বাত্মকভাবে। তাহলে চরমপন্থী হতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু আমাদের চরমপন্থী হতে হবে সঠিক নিয়মে। আমরা অন্যায় বা ভুল পথে চরমপন্থী হবো না। আমরা দয়া মায়াহীন হবো না। আমরা নিষ্ঠুর হবো না। আমরা চরমপন্থী হবো সঠিক উপায়ে এবং পবিত্র কোরআনও আমাদের সে কথাই বলছে।

সন্ত্রাসী শব্দের বিশ্লেষণ

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সব বিষয় এড়িয়ে যাই এবং বলি যে, না আমরা তো চরমপন্থী নই। আমরা তো মৌলবাদী নই। কিন্তু এই টেবিলটি আমাদের ঘুরিয়ে

দিতে হবে। মুসলিমদের এখন বলা হয় সন্ত্রাসী। কিন্তু আমি বলি সব মুসলমানেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। এখন সন্ত্রাসী শব্দের অর্থ কি? সন্ত্রাসী শব্দের অর্থ হলো যে লোক ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। যখন একজন ডাকাত কোন পুলিশকে দেখে তখন সে ভয় পায়। সুতরাং পুলিশ তখন ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী এবং একইভাবে যখন দেখবেন একজন ডাকাত বা ধর্ষণকারী বা সমাজের শত্রু কোন মুসলিমকে দেখবে সে ভয় পেয়ে যাবে। আমরা সমাজের শত্রুদের আতংকের মধ্যে রাখবো।

আর পবিত্র কোরআনের এ উল্লেখ আছে যে, 'যারা সমাজের শত্রু তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার কর।'

কিন্তু আমি জানি এখনকার দিনে সন্ত্রাসী কর্ম বলতে বুঝানো হয় এমন কাজ যেটি সাধারণ মানুষকে আতংকে রাখে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মুসলিমও নিরীহ মানুষের উপর সন্ত্রাস চালাবে না। একজন মুসলিম এখানে বাছাই করে সমাজের শত্রুদের সাথে এটি করতে পারেন। এখানে বাছাই করে চোর, ডাকাত, ধর্ষক এর সাথে করতে পারে। যখন কোন সমাজ বিরোধী লোক কোন মুসলমানদের দেখে ভয় পাবে এবং তখনই আমরা এই পৃথিবীতে শান্তি পাব। প্রায়ই দেখা যায় একটি মানুষের একটি কাজকে দুটো আলাদা আলাদা লেবেল দেয়া হয়। ৬০-৭০ বছর আগে ইন্ডিয়ায় স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে, আমার দেশ ইন্ডিয়া বৃটিশ শাসন করতো। অনেক ইন্ডিয়ানই তখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো। এই লোকগুলোকে বৃটিশ সরকার তখন বলতো সন্ত্রাসী। কিন্তু আমরা সাধারণ লোকেরা তাদের বলি মুক্তিযোদ্ধা, দেশ প্রেমিক।

একই লোক একই কাজ কিন্তু দুটি আলাদা লেবেল। আপনারা যদি বৃটিশ সরকারের সাথে একমত হোন যে, ভারতকে শাসন করার অধিকার তাদের আছে, তাহলে আপনিও ঐ লোকগুলোকে বলবেন সন্ত্রাসী। কিন্তু যদি আপনি সাধারণ ভারতীয়দের সাথে একমত হন যে, বৃটিশরা ভারতে এসেছে ব্যবসা করার জন্য, আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই, তাহলে আপনি ঐ লোকগুলোকে বলবেন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। একই লোক একই কাজ কিন্তু লেবেল দুটি এবং এরকম উদাহরণ আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক খুঁজে পাবেন। একজন দাইয়্যিই বুঝবেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত থাকলে যে কোনটি কোথায় ব্যবহার করতে হবে, যেন লোকেরা বুঝতে পারে, কারণ পবিত্র কোরআনের (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৬৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .

অর্থ : এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক।

ভারতীয়রা মুসলিমদের সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করলে আমি এই ব্যাখ্যাটি দেই, তখন তারা ভাল করে বুঝতে পারে।

দুই মাস আগে আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম সেই বোম ব্লাস্টের পরে অর্থাৎ ৭ জুলাই-এর পরে। একটি কনফারেন্সে আমি লেকচার দিয়েছিলাম। সেখানে টনি ব্লেয়ারের আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আসতে পারে নি। তবে পুলিশ প্রধান সেখানে ছিলেন, মেয়রও ছিলেন। সেখানেও আমি উদাহরণ দিয়েছি সেটি ছিল অন্যরকম। বলেছিলাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন বৃটিশরা আমেরিকা শাসন করতো। অনেক আমেরিকানই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল। ১৭৭৬ সালে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। আর তখনকার উচ্চপদস্থ নেতা ফ্রাংলিন, জর্জ ওয়াশিংটনকে বৃটিশ সরকার ১ নম্বর সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করতো। যে লোক ছিল ১ নম্বর সন্ত্রাসী অর্থাৎ জর্জ ওয়াশিংটন পরবর্তীতে তিনিই হলেন ইউএস-এর প্রেসিডেন্ট।

একটু চিন্তা করে দেখেন ১ নং সন্ত্রাসী হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর তিনি হলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট যাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, এমনকি জর্জ বুশও। এই হচ্ছে মিডিয়া। ১ নং সন্ত্রাসী পরবর্তীতে হয়ে গেলেন আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত রাষ্ট্র। আর সে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন সন্ত্রাসী। এছাড়াও বলতে পারেন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা, বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বে, সেখানকার ক্ষমতায় ছিল শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকার। এই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে ২৫ বছর ধরে আটকে রেখেছিল রোবেন সাইলেন্ডে। তখন তাকে বলা হতো ১ নম্বর সন্ত্রাসী।

পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বর্ণবাদী সরকার থেকে মুক্ত হলো তখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এরপর নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর তিনি নতুন কোন কাজের জন্য শান্তি পুরস্কার পান নি। এমন নয় যে, তিনি পূর্বে সন্ত্রাসী ছিলেন পরে ভাল হয়ে গেছেন। একজন খারাপ লোক ভাল হয়ে গেল এরকম না। সেই একই কাজ যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে, কয়েক বছর পরে তার জন্যই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এটি খুবই অদ্ভুদ। একই কাজ যার কারণে তিনি ২৫ বছর জেলখানায় ছিলেন, যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হলো, সেই কাজের জন্যই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

আর ঠিক এইভাবেই মিডিয়া দিনকে রাত বানিয়ে বদলে দেয়, কালোকে সাদা বানায়, হিরোকে ভিলেন বানায় আর ভিলেনকে হিরো। এক কথায় যার কাছে ক্ষমতা থাকে সে তখন যা বলে সেই কথাটিই সত্যি হয়ে যায়। আমরা জানি যে হিটলার যখনই ইউরোপ আক্রমণ করে অনেক দেশ তখন বাধা দিয়েছিল, এমনকি ফ্রান্সও বাধা দিয়েছিল। সেই ফরাসি লোকদের তখন জার্মান বলতো সন্ত্রাসী। আর এভাবেই মিডিয়া খবর তুলে ধরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মুসলিমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। আমাদের জানতে হবে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়।

জিহাদ কী?

বর্তমানে ইসলামের যে শব্দটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা আছে, সেই শব্দটি হলো 'জিহাদ'। এ ব্যাপারে শুধু যে অমুসলিমদেরই ভুল ধারণা আছে তাই নয়। এই জিহাদ শব্দটিকে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করে। অনেক লোকই ভাবে, কোন যুদ্ধ যদি মুসলিমরা মনে করে থাকে, কোন কারণে হোক সে ক্ষমতার জন্য, হোক সে নিজস্ব লাভের জন্য, হোক সেটি টাকার জন্য সেটিই হচ্ছে জিহাদ।

মুসলিমরা যে যুদ্ধে অংশ নেয়– হোক সেটি নিজের লাভের জন্য কিংবা ক্ষমতার জন্য সেগুলো জিহাদ নয়। জিহাদ একটি আরবি শব্দ। যেটি এসেছে যাহদুন থেকে। যার অর্থ চেষ্টা করা; সংগ্রাম করা; ইসলাম ধর্মে জিহাদ মানে নিজের বিভিন্ন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া। এর অর্থ সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া, এর অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা আর সংগ্রাম করে যাওয়া, আরেকটি অর্থ অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা এবং সংগ্রাম করা, যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যায়, তার অর্থ সে জিহাদ করছে। তাহলে জিহাদের অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করে যাওয়া। অনেক অমুসলিম আছেন যারা জিহাদের বাংলা অনুবাদ করে বলে থাকেন পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও অনেক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ মুসলিম আছেন যারা জিহাদের বাংলাকে পবিত্র যুদ্ধ বলে থাকেন। তারাও বলে থাকেন জিহাদ হলো পবিত্র সংগ্রাম। যদি আপনি পবিত্র যুদ্ধের আরবি করেন তাহলে হবে 'হারবুম মুকাদ্দাছা' এই 'হারবুম মুকাদ্দাছা' শব্দটি পবিত্র কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ এর কোন সহীহ্ হাদীসেও এর উল্লেখ নেই।

এই পবিত্র যুদ্ধ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ক্রুসেডারদের বুঝাতে। যখন এই ক্রুসেডারেরা খ্রিস্টান ধর্মের নামে হাজারও মানুষকে হত্যা করতো। তখন তারাই এর নাম দিয়েছিল পবিত্র যুদ্ধ। এখন তারা এই শব্দটি ব্যবহার করছে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। তাহলে এই হলো মিডিয়া। প্রথম তারা মৌলবাদী বলতে বুঝাতো খ্রিস্টানদের এখন তারা বুঝাচ্ছে মুসলিমদের। পবিত্র যুদ্ধ বলতে বুঝাতো খ্রিস্টানদের ক্রুসেডকে, এখন তারা বুঝায় মুসলিমদের যে জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। প্রত্যেক মুসলিমেরই দাইয়্যি হওয়া উচিত।

আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, 'প্রচার কর যদি একটি আয়াতও জান।' কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যেদিন আমি আহমেদ দিদাত-এর মতো হবো, সেদিনই আমি দায়াত দেওয়া শুরু করবো, কিন্তু সে সময় হয়তো আপনি কোনদিনই পাবেন না। যদি আপনি ইসলাম সম্পর্কে একটি আয়াতও জানেন এবং

যদি সঠিকভাবে জানেন তাহলে আপনি ইসলাম প্রচার করবেন। প্রত্যেক মুসলিমই দা'য়ী হওয়া উচিত। আমরা আসলে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলছি না এবং এ কারণেই আমরা পিছিয়ে আছি। আল্লাহ বলেছেন তিনি তাদের সাহায্য করবেন না, যারা নিজেদের সাহায্য করে না। এখানে দোষ আমাদের। আমরাই এখানে দোষী। ৯/১১-এর পরে ইসলাম সম্পর্কে অপবাদটি অনেক বেড়ে গেছে।

আমি ২ বছর পূর্বে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। লসএঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। আর আমার পরনে ছিল কোর্ট-টাই, মাথায় টুপি এবং দাড়ি। আর আমি প্রস্তুত ছিলাম যে তারা আমাকে প্রশ্ন করবেই। দা'য়ীকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমি যখন ইমিগ্রেশনে গেলাম তারা আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ধনকুয়ারিতে পাঠালো। আমি প্রস্তুত ছিলাম। তারা আমাকে বললো আপনি কেন এসেছেন? আমি বললাম একটি পুরস্কার নিতে। তারা বললো কিসের পুরস্কার? বললাম মানবতার জন্য পুরস্কার। লস্এঞ্জেলস-এর একটি সংস্থা, তারা আমাকে পুরস্কারটি দিবে। তারা বললো আপনি কি করেছেন? আমি বললাম আমি সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আপনাদের যীশু বলেছেন– তোমরা সত্যকে খুঁজে বেড়াও, আর সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে (গজপেল অব জন- অধ্যায়-৮ম অনুচ্ছেদ-৩২)। আমিও সেইভাবে সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আমি মিথ্যে বলি নি। আমি একজন দা'য়ী, আমি সত্যের ধর্মকে ছড়িয়ে দেই। তারপর তারা আমাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন শুরু করলো। কাস্টমসে যাওয়ার পর তারা আমার ব্যাগ খুলল। সেখানে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখলো 'জিহাদ এন্ড টেরিরিজম'। তারপর প্রশ্ন করলো আপনি কি জিহাদে বিশ্বাস করেন? আমি বললাম হ্যাঁ। এমনকি যিশুখ্রিস্ট, নিজের জিহাদে বিশ্বাস করতেন, তিনিও চেষ্টার কথা বলতেন আমিও চেষ্টায় বিশ্বাস করি। যিশু যা বলেছেন আমি সেই চেষ্টায় বিশ্বাস করি এবং সবাইকে তা বিশ্বাস করতে হবে। আপনি কি যুদ্ধ করায় বিশ্বাস করেন? আমি বললাম একথা বাইবেলেই উল্লেখ আছে। (বুক অব এক্সোডাজ, অধ্যায়ে ২২, অনু-২০)-এ বলা হয়েছে যে, আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। (বুক অব এক্সোডাজ অধ্যায়-৩২, অনু-২৭-২৮) আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। (বুক অব নাম্বারস্, অধ্যায়-৩১, অনু-১-১৯)।

তাছাড়া যিশুখ্রিস্ট নিজের মুখেই বলেছেন, বুক অব লুক, অধ্যায়- ২২, অনু-৩৬) তরবারী নিয়ে তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু তখন খ্রিস্টান কাস্টমস অফিসাররা বললো সেটি আত্মরক্ষার জন্য। আমি বললাম আমিও সে জন্য করি। তারা বললো স্যার আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি? আমি বললাম কোন সমস্যা নেই। তখন আমি আমার হোস্টকে বললাম– এখানে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, কোন সমস্যা নেই, চিন্তা করবেন না। আমি দা'য়ীর কথা বলি, দা'য়ীরা কখনো সত্যকে ভয় পায় না। আমি আলোচনার শুরুতে সূরা ইসরার একটি আয়াত পড়েছিলাম ৮১নং আয়াতে

উল্লেখ করা হয়েছে, 'যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাঁড়ায় তখন মিথ্যা বিলুপ্তি হয়ে যায়।' মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্তি হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ ৯/১১-এর পরে নিয়মনীতির অনেক বেশি শক্ত হয়েছে, তবে আলহামদুলিল্লাহ ৯/১১-এর পরে আমি গিয়েছি আমেরিকায়, কানাডা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায়, মালয়েশিয়ায়, সিংগাপুরে। আমার কাছে দশ বছরের আমেরিকার ভিসা আছে, ইংল্যান্ডের ৫ বছর, কানাডার ২ বছরের ভিসা, 'আলহামদুলিল্লাহ' তারপরও আমি স্পষ্ট ভাষাতেই কথা বলি। যদি বক্তৃতা দিতে যাই- বলি বক্তৃতা দিতে এসেছি, সত্য প্রচার করতে যাই- বলি সত্য প্রচার করতে এসেছি। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই উত্তর দেই। পবিত্র কোরআন (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৬৪)তে বলা হয়েছে যে-

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থ : এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক।

অনেকেই হয়তো তখন এদেশের বর্তমান অবস্থা জানেন। সেখানে দাওয়াতের কাজটি খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমি যেখানে থাকি মুম্বাই শহরে। যে সব স্থানে দাওয়াতের কাজটি সবচেয়ে কঠিন তার মধ্যে একটি হলো মুম্বাই। তবে 'রাখে আল্লাহ মারে কে' মুম্বাইতেও আমি লেকচার দিয়েছি। লেকচার দিয়েছি বেদের ওপর। দিয়েছি ভগবত গীতার ওপর। উপনিষদের ওপর বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু সেখানে বলার ধরনটি একটু অন্য রকম।

যুদ্ধ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থসমূহ

এমন অনেক ভারতীয় আছে যে তারা বলে মুসলিমরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। তারা বলে যে তোমাদের কোরআন যুদ্ধ করার কথা বলে। এটি তাহলে কোন ধরনের ধর্মগ্রন্থ? আমি বললাম আপনারা কি মহাভারত পড়েছেন? মহাভারত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর একটি। যদি আপনারা বলেন যুদ্ধ করা খুবই খারাপ কাজ কিন্তু আপনাদের মহাভারতেই অনেক বেশি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুরা হয়তো বলবে এটা আসলে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ। আমি বলি কোরআনেও একই ধরনের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাহলে কোরআন নিয়ে কোন সমস্যা নেই। হিন্দুদের যে ধর্ম গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি পড়া হয় সেটি হলো 'ভগবত গীতা'। এই ভগবত গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছে, হিন্দুদের মহান ঈশ্বর অর্জুনকে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-১, অনু-৪৩-৪৬) যে, অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অস্ত্র মাটিতে রেখে বললো, আমি এখানে নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাব কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করবো না। মহাভারতে আত্মীয়দের মধ্যে যুদ্ধের একটি ঘটনা আছে, পাণ্ডবদের ৫ ভাইয়ের মধ্যে কৌরবদের ১০০ ভাইয়ের যুদ্ধ।

আর ভগবত গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ ২৫টি অধ্যায় নিয়ে। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন (ভগবত গীতা অধ্যায়-১, অনু-৪৩-৪৬) যে, অর্জুন নিরস্ত্র অবস্থায় মরতে চায়, কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করে নয়। এরপরে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-২, অনু-২) যে কৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন তোমার মনে এমন চিন্তা কিভাবে এলো? কিভাবে তুমি এতোটা শক্তিহীন হলে?' মহান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে শক্তিহীন 'তুমি তো স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।'

আর ভগবত গীতার পুরোটাতেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্জুনকে বলছে, তোমাদের আত্মীয়দের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া আরো আছে (ভগবত গীতা অধ্যায়-২, অনু-৩১, ৩৩) যে 'হে অর্জুন তুমি একজন ক্ষত্রিয়, ধর্মের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে তোমার দায়িত্ব। যদি যুদ্ধ না কর তবে পাপ হবে। যদি যুদ্ধ কর তাহলে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। আর সেই ক্ষত্রিয়রাই ভাগ্যবান যারা যুদ্ধ করার সুযোগ পায়।' ভেবে দেখেন যদি আমি একথা হিন্দুদের বলি যে আপনাদের ঈশ্বর অর্জুনকে বাধ্য করছে তার আত্মীয়দের হত্যা করতে, তারা বলবে এটা ঠিক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ যেটি করেছেন, তিনি অর্জুনকে বলেছেন যদি সত্যের জন্য আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে তুমি যুদ্ধ কর এবং পবিত্র কোরআনেও একথা এসেছে। (সূরা নিসা-আয়াত নং-১৩৫) যে–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا .

অর্থ : হে মুমিনগণ! ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, সেটি তোমাদের নিজেদের ও পিতামাতার বিরুদ্ধে যায়, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়, হোক সে ধনী বা গরিব। আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একই কথা। প্রায়ই দেখা যায় একটি হাদীসের কথা বলা হয়ে থাকে, ইসলামকে অপবাদ দিয়ে সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীস (বুক অব জিহাদ, খণ্ড-৪, অধ্যায়-২, হাদীস নং-৪৫) যে, 'যদি কোন মুজাহিদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যায় সে বেহেশতে যাবে। যদি বেঁচে ফিরে আসে তাহলে পৃথিবীর সম্পদ পাবে।' সমালোচকরা এই কথাটির উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। তারা ইসলামের সমালোচনা করে হাদিসের এই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন– যেমন, ভারতের অরুণশুরী। আমি তাদের বলি যে আপনারা কি আপনাদের ভগবত গীতা পড়েন নি? সেখানে উল্লেখ আছে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-২, অনু-৩৭) যে, শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের মহান ঈশ্বর তিনি অর্জুনকে বলছেন "হে অর্জুন যাও যুদ্ধ কর, যদি মারা যাও তাহলে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে, যদি ফিরে আস তাহলে যুদ্ধের লুণ্ঠিত অর্থ তুমি পাবে।

আত্মঘাতী বোমা হামলা ও ইসলাম

এই একই কথা আছে সহীহ বুখারীতে, আমি তাদের বলি আপনারা কি আপনাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েন নি, যে এখন কোরআন ও হাদীসের ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আমি আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মেনেই চলি 'এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক।' তাই মুসলিমদের এটা জানতে হবে কিভাবে দাওয়াত দিতে হয় এবং কিভাবে টেবিল ঘুরিয়ে দেয়া যায়। আমি পূর্বেও বলেছি, যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, তারা মুসলিমদের নিয়ে অনেক কথা বলছে। যেমন– আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে নিরীহ লোকদের হত্যা করছে। একটি বই আছে, লিখেছেন এসোসিয়েট প্রফেসর রবার্ট পেপ (ইউনিভার্সিটি অব সিকাগো) তিনি একটি বই লিখেছেন যেটির নাম 'ডাইং টু উইন' (Dying to Win) তিনি একজন আত্মঘাতী বোমা হামলার বিশেষজ্ঞ। আত্মঘাতী সন্ত্রাস আমেরিকাতে এক নম্বর। তিনি লিখেছেন আত্মঘাতী বোমা হামলা এটি ইসলাম ধর্মে ছিল না।

যদি আপনারা ইসলামের ইতিহাস দেখেন, কোরআন হাদীস পড়েন, সেখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা খুঁজে পাবেন না। একেবারে প্রথমে যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে তারা হলো 'তামিল টাইগারস্' পরবর্তীতে শুরু করলো মার্কসবাদী আর লেলিনবাদীরা। রবার্ট পেপ লিখেছেন ইরাকে আমেরিকানরা আসার পূর্বে আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল না।

আমেরিকা ইরাকে আসতে লাগলো আর বোমা হামলা শুরু হয়ে গেল। এই কথাটি যিনি বলেছেন তিনি একজন অমুসলিম, একজন খ্রিস্টান এবং আমেরিকান। রবার্ট পেপ আত্মঘাতী বোমা হামলার একজন বিশেষজ্ঞ এবং আমেরিকান অমুসলিমদের লেখা এই বই নিয়েই একটি লেকচার দেয়া যেতে পারে। আমার জানতে হবে কিভাবে ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই সত্যের ধর্মকে। আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ডে আয়ারের সমস্যা বেশ পুরানো। এটিকে বলা যেতে পারে কেথলিক টেরিরিজম। কিন্তু তারা এটিকে কেথলিক টেরিরিজম বলে না কেন? কোন মুসলিম জড়িত থাকলে এটি ইসলামিক টেরিরিজম। কিন্তু অমুসলিম যদি জড়িত থাকে তাহলে তারা এলাকার নাম বলে ধর্মের নাম বলে না কিন্তু কেন? এবং ঠিক এভাবেই মিডিয়া প্রচার করে এবং ভুল ব্যাখ্যা করে।

বিভিন্ন অপবাদের সম্মুখীন ইসলাম

এই মিডিয়া মনে করে যদি ভারতের মিডিয়ায় আসে যে, ৫০ বছরের একজন আরব লোক ভারতে আসলো এবং ১৬ বছরের একটি মেয়ে বিয়ে করলো। তাহলে এটি খবরের হেড লাইন হিসেবে ছাপা হয়। কিন্তু ৫০ বছরের একটি অমুসলিম যদি ৬ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে এটি তাহলে ছাপানো হয় ছোট করে। যদিও বিয়ের সময় বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে

মেয়েটিও রাজি আছে এবং তাকে যথাযথ অধিকার দেয়া হয়েছে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? কিন্তু ৫০ বছরের কোন পুরুষ যদি ৬ বছরের কোন মেয়েকে ধর্ষণ করে তাহলে ছোট খবর হয়। ওকলাহোমা বোম্বিং-এর কথা সবাই শুনেছেন যে 'মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র, মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র' এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকলো, কিন্তু যখন জানল যে হামলাকারী একজন আমেরিকান সৈনিক তখনই খবরটি হারিয়ে গেল। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যে মিডিয়া আমাদের নিয়ে খেলা করছে এবং এখন তারা বলে যে ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে। এ বিষয়ে সুন্দর বলেছেন ডিলেসি ওলেরী (ইসলাম অন দ্য ক্রস রোডের ৮নং পৃষ্ঠা) যে "ইতিহাসে এটি পরিষ্কার যে হাতে তরবারি নিয়ে মুসলিমরা ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং বিভিন্ন দেশ জয় করার এই আজগুবি গল্পটি একটি অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় যেটি বারবার করে বলা হয়ে থাকে।

ডিলেসী ওলেরী তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাস আমাদের বলে যে আমরা মুসলিমরা স্পেনে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। আমরা আমাদের কাজ করি নি, আমরা মানুষকে দাওয়াত দেই নি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা আসলো, স্পেন দখল করলো এবং তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে আযান দিতে পারে নি। আমরা মুসলিমরা আরব দেশগুলোতে শাসন করছি গত ১৪০০ বছর থেকে, কিছুদিন বৃটিশরা শাসন করেছিল, কিছুদিন করেছিল ফরাসিরা, মুসলিমরা এই সময়টি বাদ দিয়ে গত ১৪০০ বছর থেকে আরব দেশ শাসন করেছে। কিন্তু এখনো পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় আরব দেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষ 'কপটিক' 'খ্রিস্টান'। 'কপটিক খ্রিস্টান' মানে যারা বংশগতভাবে খ্রিস্টান। যদি আমরা চাইতাম তাহলে আরবদের সবাইকে তরবারির জোরে ইসলামে বাধ্য করতাম। কিন্তু আমরা তা করি নি। এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টানই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার হয় নি।

মুসলমান শাসক মুঘলরা ভারত শাসন করেছিল প্রায় ১০০০ বছর। কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮০% লোক অমুসলিম। মুসলমানই যদি চাইতাম তবে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির জোরে বাধ্য করতাম ইসলাম গ্রহণে। কিন্তু আমরা তা করি নি। কারণ ইসলাম আমাদের সেই অনুমতি দেয় নি। ভারতের এই ৮০% লোক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ভারতে ইসলাম তরবারি দিয়ে প্রসার হয় নি। কোন মুসলিম আর্মি অফিসার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? কোন মুসলিম আর্মি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল যে দেশের মুসলিমদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কোন মুসলমান আর্মি গিয়েছিল? মালয়েশিয়ায় যেখানে ৫০%-এর বেশি লোক মুসলমান? কোন তরবারি গিয়েছিল সেখানে? এটি হলো বুদ্ধির তরবারি। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে (সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহ্বান করো হিকমত আর সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।

আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানদের ইসলাম গ্রহণ

একবার একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল 'রিডাস্ ডায়জিস্ট এ্যালবাম ইয়ার বুক' ১৯৮৬ সালে এবং ম্যাগাজিনেও পরে ছাপানো হয়েছিল। একটি জরিপ চালানো হয়েছিল প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীদের নিয়ে। সেখানে ৫০ বছরের হিসাব ছিল (১৯৩৪–১৯৮৪) পর্যন্ত। যে ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছিল তা হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যার পরিমাণ ছিল ৩৫%, খ্রিস্টান ধর্মের হার ছিল মাত্র ৪৭%। এখন আমার প্রশ্ন হলো সেই ৫০ বছরের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (১৯৩৪–১৯৮৪) যার কারণে লাখ লাখ মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমি প্রশ্ন করি কোন যুদ্ধের মাধ্যমে সেটা হয়েছিল? আজকের দিনে ইসলাম ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি। আমেরিকাতে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটি হলো ইসলাম। ইউরোপে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটিও ইসলাম।

আমি তাদের প্রশ্ন করি কে এই আমেরিকানদের এবং ইউরোপীয়ানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছে? ৯/১১-এর পূর্বে ইসলামের নামে মিডিয়া যে অপবাদ দিত সেটি হলো যে ইসলাম নারীদের কোন অধিকার দেয় না। আপনারা হয়তো জানেন যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমেরিকা এবং ইউরোপে, তাদের মধ্যে ২/৩ অংশ হচ্ছে নারী। যদি ইসলাম তাদের অধিকার না দিতো তবে কেন এই আমেরিকান এবং ইউরোপের মহিলারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? মিডিয়া বলছে ইসলাম নাকি মহিলাদেরকে ছোট করে, তাহলে কেন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? কারণ ইসলাম মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বিশেষ করে নারীদের জন্য। তারা ইসলামে নিরাপদ বোধ করে। ইউহান রেডলি এর নাম হয়তো শুনেছেন। তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তালেবানদের উপরে গোয়েন্দাগিরি করতে। সেখানে ধরা পড়ে ৭ দিন ছিলেন। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তিনি মুগ্ধ। এখানে আমি সংক্ষেপে বলছি।

অনেকে হয়তো জানেন তিনি কোরআন পড়ার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। লোকেরা প্রশ্ন করলো যে তালেবানরা কেমন ব্যবহার করেছিল? তিনি বললেন তারা মেহমানদের মতোই আপ্যায়ন করেছে। তারা যথেষ্ট সম্মান করেছে। তিনি বললেন তারা যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছে। তার মনোভাব বদলে গেছে। একজন বৃটিশ

রিপোর্টার আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য এবং আলহামদুলিল্লাহ তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ৯/১১-এর পরে আমি যখনই আমেরিকা কিংবা ইউরোপে বক্তৃতা দিতে যাই পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি অমুসলিম আমার বক্তৃতা শুনতে আসে। আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ান তারা সবাই আসে। পবিত্র কোরআনে আছে (সূরা আলে ইমরান আয়াত নং-৫৪)

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : যে তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

৯/১১-এর পরে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে আমেরিকাতেই শুধু ৩৪ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইউহান রেডলীর কথা অনুযায়ী ২০ হাজার ইউরোপীয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা যতই আক্রমণ করছে ইসলাম ততই উপরে উঠছে। কিন্তু আমরা কিছুই করছি না। আমাদের কারণে এগুলো হচ্ছে না। দায়িত্বটা আমরা পালন করছি না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনটি আলাদা সূরায়। (সূরা সাফ্-আয়াত নং ৯; সূরা তাওবা-আয়াত নং-৩৩; সূরা ফাতহ্ আয়াত নং-২৮) বলা হয়েছে যে–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন পথ নির্দেশক এবং সত্যের দ্বীনসহ যাতে এটি সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী থাকে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

এই সত্যের ধর্মটি, এই শান্তির ধর্মটি অন্য সকল ধর্মের উপরে থাকবে এবং আল্লাহই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট থাকবেন। হয়তো অমুসলিমরা এটি অপছন্দ করবে। হয়তো মুশরিকরা এটি অপছন্দ করবে।

ইসলাম অন্যান্য সব ধর্মের উপরে অবস্থান করবে। ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ নিজেই তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সুযোগ করে দিয়েছেন দায়িত্ব পালন করার আর তার কাছে পুরস্কার পাওয়ার। তিনি আমাদের দাওয়াত দেয়ার একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সত্যের ধর্ম টিকে থাকবে। এই সত্যের ধর্ম (দ্বীন-উল-হক্ব) এই শান্তির ধর্ম অবশ্যই টিকে থাকবে। এডাম পিয়ার সন একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, যারা ভয় পায় যে পারমাণবিক বোমা হয়তো আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটি বুঝতে পারে

না যে ইসলামের আসল বোমাটি আসলে অনেক আগেই এই পৃথিবীতে পড়েছে, বোমাটি পড়েছে যেদিন মুহাম্মদ ﷺ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইসলামের বিপক্ষে মিডিয়ার অবস্থান

আসুন এবার দেখি ইসলামের বিপক্ষে মিডিয়া কি বলে। আমরা সব রকমের মিডিয়াকেই এক নজরে দেখবো। প্রথমেই প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বলা যায়। টাইম ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল ১৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালের দিকের কথা। এ ছিল একজন খ্রিস্টান ধর্মের লোক। তিনি লিখেছেন যে "ইসলামের বিপক্ষে গত ১৫০ বছরে ৬০,০০০ -এর বেশি বই লেখা হয়েছে (১৮০০-১৯৫০) সালের ভেতরে। যদি হিসেব করে দেখেন গড়ে একটি করে বই লেখা হয়েছে প্রতিদিন। প্রতিদিন একের বেশি বই লেখা হয়েছে নবীজির বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ৯/১১ -এর পরে এই প্রবণতা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। নবীজির বিরুদ্ধে এখানে প্রতিদিন অনেক বই লেখা হচ্ছে। এদিকে আমরা মুসলিম কি করছি? খ্রিস্টান মিশনারী তাদের ধর্মকে প্রচার করছে, তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তারা ছাপাচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্য। সেগুলো বিলি করে যাচ্ছে।

আমি একদিন প্লেনে যাওয়ার সময় এক আরবকে একটি নমুনা দেখালাম, বললাম এটি কি দেখুন তো। তিনি বললেন 'আল্লাহ্ মুহাম্মদ'। কিন্তু যদি একটু ভাল করে দেখেন এটি আসলে আল্লাহ্ মুহাম্মদ নয়, এটি হলো 'আল্লাহ্ মুহাব্বা।' যার অর্থ হলো 'ঈশ্বরই প্রেম' এটি আসলে বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি। (প্রথম এপিস্টল অব জন, অধ্যায়-৪, অনু-১৬) ঈশ্বরই প্রেম। তারপরে উল্লেখ আছে "যে প্রেম নিয়ে থাকে সে ঈশ্বরের সাথে থাকে। ঈশ্বরও তার মধ্যে থাকেন।" বাইবেলের উদ্ধৃতি। এটি যদি মুসলিমদের দেই তাহলে কি করবে? বেশির ভাগ মুসলমানই এটি চুমু দিয়ে পকেটে রেখে দেবে। যখনই তারা আরবি দেখে সেটি আল্লাহর কালাম মনে করে পকেটে রেখে দেয়।

ভারত, পাকিস্তান কিংবা অন্যান্য অনারব মুসলিমরা যদি আরবিতে লেখা কিছু দেখে তখন চুমু খেয়ে তা পকেটে রেখে দেয়। যেন এটি আল্লাহর কালাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাপ। এখন এমন অনেক পোস্টার আছে। এখানে সবার কথা বলছি না। যখন তারা পড়ে 'রাব্বানা'। যখন 'রাব্বানা' দেখলেন তারপরে আছে 'আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও' এভাবে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এটি ছিল আব্বানা, রাব্বানা নয়। এটি হলো পিতা যিনি স্বর্গে থাকেন তার রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ। তারা এগুলো মুসলিমদের মাঝে বিলি করে। আর আমরা কি করি? সুন্দর ছাপানো দেখে বাড়ি নিয়ে যাই। আর আমরা মুসলমানরা এভাবেই প্রতারিত হচ্ছি। তারা প্রতারণা করে আমাদের ঘরে ঢুকাচ্ছে।

আমি একটি লেকচার দিয়েছিলাম 'খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকদের প্রতারণা' এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দেয়া যায় কিন্তু আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যেহেতু আমি অনেক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের 'গ্রাহকবার'। আমি খুব সুন্দর ক্যালেন্ডার পাই। একদিন এক আলেম যিনি আরবি জানেন তিনি আমার বাসায় এলেন। তাকে একটি ক্যালেন্ডার দেখিয়ে বললাম– ক্যালেন্ডারটি কেমন? তিনি বললেন যে, খুবই সুন্দর ক্যালেন্ডার, তিনি বললেন আমি কি এটি বাসায় নিয়ে যেতে পারি? আমি বললাম নিয়ে যান। তিনি এটিকে কয়েক সপ্তাহ রাখলেন। পরে আমি তাকে আবারও বললাম কেমন লেগেছে ক্যালেন্ডারটি? তিনি বললেন জাকির ভাই এটি খুবই সুন্দর। আমি বললাম নিয়ে আসুন এটিকে। তিনি বললেন কেন? আমি বললাম ওটা নিয়ে আসেন। যখন তিনি আসলেন তখন তাকে বললাম এবার ভাল করে পড়ে দেখেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে বাইবেলের কথা আরবিতে লেখা।

খ্রিস্টানরা এখন বাইবেল লিখছে অন্যান্য ধর্মের সাথে সাদৃশ্য রেখে। আর বাইবেল পড়ে দেখেন লেখা আছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। তারা কোরআনের আয়াত ধার করে সামান্য বদলে দিয়ে তুলে দিচ্ছে আরবদের কাছে। তারাও মনে করছে কোরআনের অংশ। কিন্তু সেগুলো আসলে বাইবেল। খ্রিস্টানরা এখন এই সমস্ত কৌশল অবলম্বন করছে। আমি আবারো বলছি বিস্তারিত বলতে পারছি না। আমি ভারত থেকে এসেছি। সেখানে লোক সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে (১৬-১৮) কোটি লোক হচ্ছে মুসলিম। সেখানে অনেক ইসলামি ম্যাগাজিন বের হয় দাওয়াত দেয়ার জন্য। ভারতে এই ম্যাগাজিনগুলোর কত কপি ছাপানো হয়? কতগুলো হবে? ৪০০০, ৫০০০, ৮০০০, এক নম্বর দাওয়া ম্যাগাজিন ইংরেজিতে 'ইসলামিক ভয়েস' ছাপানো হয় ১৫,০০০। কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম এর পূর্বে আরেকবার। একটি সারভে করেছিলাম। সবচেয়ে বেশি চলে যে দাওয়া ম্যাগাজিন বের করে 'ইস্‌মা' দি মেসেজ। এটি ছাপানো হয় ৫০,০০০ কপি।

খ্রিস্টানদের ম্যাগাজিনে তাদের ধর্মের প্রচার ও ব্যয়

আপনারা জানেন যে খ্রিস্টান ধর্মে ছোট একটি সংগঠন আছে এদের নাম 'জেহবাজ উইননেসেস্।' এরা মূলধারার খ্রিস্টান না এরা আলাদা। 'ওয়াচ টাওয়ার' নামে তারা একটি ম্যাগাজিন ছাপায়। তার কত কপি ছাপানো হয় ধারণা করতে পারেন আপনারা। মাসে কতগুলো কপি ছাপানো হয় জানেন কি আপনারা? আপনাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবেন আমাদের পত্রিকা বেশি হলে ৫০.০০০ কপি

ছাপানো হয় আমেরিকাতে কিন্তু তাদের কতগুলো কপি ছাপানো হয়? কেউ বলতে পারবেন? কোন পয়সা লাগবে না। একজন বলল ১০ লক্ষ। কেউ বললেন ১ লক্ষ। কিন্তু আমি বলি ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার কপি ছাপানো হয়। আমরা এতোগুলো ছাপাতেও তো পারি না। এমনকি কল্পনাও করতে পারি না। ছাপানো তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারি না। খ্রিস্টানদের মধ্যে ছোট একটি সম্প্রদায় তারা দুটো ম্যাগাজিন ছাপায়, তার মধ্যে একটি হলো 'ওয়াচ টাওয়ার' এটি তারা মাসে দুইবার ছাপায়। মাসে একবার নয়। প্রতি মাসে দুইবার প্রতিবার তারা ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০,০০০ কপি ছাপায়। দুই কোটির বেশি ছাপানো হয় ১৩০টি ভাষায়। প্রতিমাসে দুইবার করে ম্যাগাজিনটি ছাপানো হয়। প্রতিবার ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০,০০০ হাজার কপি। প্রত্যেক মাসে ৪ কোটিরও বেশি ম্যাগাজিন ছাপানো হয়।

তাদের অন্য একটি ম্যাগাজিন 'অ্যাওএক' (AWAKE) ১ কোটি ৬০ লক্ষ কপি, মাসে দুইবার ছাপানো হয় এটি। তার মানে মাসে ৩ কোটিরও বেশি ছাপানো হয়। তারা এগুলো চার রংয়ে ছাপায় এবং বিনা পয়সায় দিয়ে থাকে। আমরা মুসলিমরা তো ছাপানোর কথা চিন্তাও করতে পারি না। চিন্তার জন্য কোন টাকা পয়সা খরচ হতো না। একজন বলেছেন ৫০ লক্ষ। তারা ছাপায় প্রতিমাসে ৪ কোটি, চিন্তাও করতে পারি না। সেগুলো বিনা পয়সায় দেয়। কোন কোন জায়গায় সামান্য মূল্য নেয়। যেমন ভারতে দুই রুপি, 'ষোল হালালা' ষোল হালালা আবার কি? তারা সবাইকে সব সময় এই ম্যাগাজিনগুলো বিনামূল্যে দিয়ে দেয়। ওয়াচ টাওয়ার বের হয় ১৩০টি ভাষায় এবং এ্যাওয়েক ৮০টি ভাষায়। এভাবেই তারা ধর্মের প্রচার করে এবং বক্তৃতা দেয়ার মাধ্যমেও ধর্মের প্রচার করা যায়। আমরা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে লেকচারের ব্যবস্থা করি মুম্বাইতে। মুম্বাইতে একটি লেকচার দিয়েছিলাম আমি, সেটি ছিল আহযাদময়দানে এবং এই অনুষ্ঠানটি খুব ভাল হয়েছিল তুলনামূলকভাবে।

মুম্বাইতে অনেক মানুষ বসবাস করে, কিন্তু এখানে লোকজন জড়ো করাটা খুব কঠিন। যদি ২০০ লোক জড়ো করতে পারেন ইংরেজিতে লেকচার শোনার জন্য তাহলেই আমি বেশ সফল, তার মানে হবে আপনি দারুণ কাজ করেছেন। কেননা মুম্বাই খুব ব্যস্ত শহর। লোকজনের হাতে এতো সময় নেই। সেই লেকচারেও প্রেসের কথা অনুযায়ী দুই লক্ষ লোক এসেছিল। তবে আমাদের মতে আমরা জানি যে, ২০ হাজারের মতো লোক এসেছিল, প্রেস একটু বাড়িয়েই বলে কিন্তু আমি জানি কারণ আমরাই আয়োজন করেছিলাম। আমার লেকচারের বিষয় ছিল হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য। অনুষ্ঠানটি ভালভাবেই হয়েছিল প্রায় ২০,০০০ মত লোক হয়েছিল। জিনিসপত্রও আনা হয়েছিল বড়টি ছোটটি নয়। ৯টি ক্যামেরা ছিল, বেশ প্রফেশনালভাবেই করেছিলাম।

অনেক মুসলিমই বলেছিল এরা নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করেছে। অনেকে বলেছে যে ৯-১০ লক্ষ টাকাতো হবেই। প্রায় ১০ লক্ষ টাকাই খরচ করে ফেলেছে। অর্থাৎ ৮০, ০০০ দিরহামের মতো প্রায়। কমপক্ষে হয়তো ২০,০০০ ডলার খরচ করেছি অনেকের মতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি কত টাকা খরচ করেছি। আমাদের খরচ হয়েছে ২৮.৩০ লক্ষ টাকা এর বেশি নয়। লোকেরা যা ভেবেছে তার তিন গুণ খরচ করেছি। ৬০,০০০ ডলার খরচ করেছি আমরা। প্রায় আড়াই লক্ষ দিরহাম। একথা কেন বলেছি জানেন আমার লেকচারের প্রায় ২ সপ্তাহ পরেই বেনিহীন নামক খ্রিস্টান সেখানে লেকচার দিয়েছিল। বেনিহীনের নাম শুনেছেন আপনারা। দেখা গেল অনুষ্ঠানের মধ্যে মাত্র কয়েকজন চেনেন প্রায় ৮-১০ হাজার মানুষের মধ্যে। কেউ চিনেন না কিন্তু খুব জনপ্রিয়।

আমিও তাকে চিনতাম না মুম্বাইতে আসার পূর্বে। আমার লেকচারের ২ সপ্তাহ পরে তিনি আসলেন। তিনি তিনটি লেকচার দিয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা করে শুক্র, শনি এবং রোববার দিন। শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার মাত্র তিন ঘণ্টা করে। কিন্তু কত খরচ হয়েছে জানেন কি? লোকেরা বলে যে জাকির ভাই ২০,০০০ ডলার খরচ করেছেন। কিন্তু আমরা আসলে ৬০,০০০ ডলার খরচ করেছিলাম। এটি জানলে লোকজন হয়তো অবাক হবেন। বেনিহীন কত খরচ করেছিল জানেন? এবার কিন্তু সবাই চুপ। তিনি খরচ করেছিলেন ৫০,০০০ লক্ষ ডলার। তিনি মাত্র নয় (৯) ঘণ্টার জন্য এটা করেছেন। মুম্বাইতে খরচ করেছেন ৫০ লক্ষ ডলার। তাদের বাজেট দেখেছেন? ৫০ লাখ ডলার। প্রেস বলেছে ২০ লাখেরও বেশি লোক হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১ লক্ষেরও কম লোক হয়েছিল।

কিন্তু তারপরও মুম্বাইর মতো ব্যস্ত শহরে ১লাখ লোক জড়ো করা খুবই কঠিন। যাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি খ্রিস্টান না। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্র ছিল সেখানেও কিন্তু তারা এনেছিল একেবারে আমেরিকা থেকে। তারা এনেছিল ৯টি। আমেরিকান লোক ১ মাস পূর্ব থেকেই মুম্বাইতে এসেছিল। তারা ১ মাস যাবত ফাইভ স্টার হোটেলে ছিল। এরা ছিল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। ৩ দিন পূর্বে লোকজন আসলো সিস্টেম ঠিক করার জন্য, ৩২টির মতো স্ক্রীন ছিল। আমাদের অনুষ্ঠানে ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক ছিল বলে আমরা মহা খুশি ছিলাম। কিন্তু তাদের ছিল ৭,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। ভারতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৩% এর কম হবে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩% হবে না খ্রিস্টানদের সংখ্যা। প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ কোটি রুপি। তারা ২০ কোটিরও বেশি রুপি খরচ করেছে। একটু ভেবে দেখেন তারা প্লেনে করে এসেছে মাত্র ১টি অনুষ্ঠানের জন্য। ৩ ঘণ্টা করে ৩টি লেকচার দিয়ে তারা সবাই চলে গেল।

আপনারা যদি এই সমস্ত খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের বাজেট সম্পর্কে জানেন তাহলে অবাক হবেন। প্রতিদিন তাদের গড় বাজেট ১০ লক্ষ ডলারের উপরে একেকটি প্রতিষ্ঠানের

জন্য। জিমি সোয়াগার্ড একবার আহমেদ দিদাতের সাথে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। জিমি সোয়াগার্ড ধর্ম প্রচারের জন্য প্রতি বছর কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করতো। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলারেরও বেশি। কিন্তু আমরা এমন কিছুই না। আমার জানামতে এমন কোন ইসলামি দাওয়া প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে অন্ততপক্ষে এর ১০% বাজেট আছে। আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়াই কিন্তু এমন দাওয়াতি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাই নি। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রফেশনালিজম আছে। এই খ্রিস্টান মিশনারীদের সবাই ট্রেনিং প্রাপ্ত। তারা লেকচার দেয়ার ট্রেনিং পেয়ে থাকে। এমন ইসলামি দাওয়া প্রতিষ্ঠান কমই আছে যারা দাওয়ার ওপর ট্রেনিং দেয়।

ধর্ম প্রচারের কিছু মাধ্যম

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যখন কোন লোক জনসভায় স্টেজে উঠে লেকচার দেয়, লেকচারের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব মাত্র ৭%। বাকি অর্থাৎ ৯৩% হলো উপস্থাপন কৌশল। তিনি কেমন করে কথা বলবেন, দর্শকদের দিকে কিভাবে তাকাবেন। তাই আমি আমার সামনে কোন পডিয়াম রাখি না। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল এমনটি নয়। আপনারা যেন আমার শারীরিক ভাষা দেখেন। আমার শরীরও কথা বলছে। মুম্বাইতে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে আমরা মুসলিমদের ট্রেনিং দিয়ে থাকি। কিভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হবে। আমরা শুধু ভারতীয়দেরই ট্রেনিং দেই না বিদেশীদেরও দিয়ে থাকি। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছে আমেরিকা থেকে, বৃটেন থেকে, সিংগাপুর থেকে, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বিশেষজ্ঞরা। আমরা তাদের ট্রেনিং দিয়েছি কিভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করবেন। এমন কতগুলো মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে? চিন্তা করে দেখুন একজন দা'য়ী কিভাবে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে।

আমার যদি সাউন্ড সিস্টেম ভাল না হয় তবে লড়াই করবো কিভাবে? আর এটাইতো আমার অস্ত্র। কিন্তু যখন বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ করে তখন তারা আমাকে পাঁচতারা হোটেলে রাখে। কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম নিম্নমানের। যখন কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় আমি তখন তাদের বলি সাউন্ড সিস্টেম ভাল হতে হবে। আমার কোন পাঁচতারা হোটেলের প্রয়োজন নেই। আমি মেঝেতে ঘুমোব প্রয়োজনে। আমি একজন দা'য়ী। আমি মেঝেতেও ঘুমোতে পারবো। তবে আমাকে ভাল সাউন্ড সিস্টেম দেন তাদের বলে থাকি। কারণ খরচ তো খুব বেশি না। তবে ভাল একটি সাউন্ড সিস্টেম খরচ কিন্তু খুব বেশি নয়। আসলেই অনেক কম, পাঁচতারা হোটেলের অনেক কম খরচে হয়, তারা ভাল একটি সাউন্ড সিস্টেমের গুরুত্ব বুঝে না কিন্তু পাঁচতারা হোটেলে রাখে।

আমাদের মুসলমানদের এই কাজটি করা উচিত। কাজটি কি? মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ট্রেনিং নেয়া। এখানে বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। লেকচার দেয়া

এক ধরনের বিশেষত্ব, সাউন্ড মিডিয়ার আরেক ধরনের বিশেষত্ব, প্রিন্ট মিডিয়ায় এক ধরনের এবং ভিডিও মিডিয়ার জন্য অন্যরকম বিশেষত্ব। আমাদের বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। এখনকার দিনে আমাদের রেডিও স্টেশন আছে, কিন্তু কতজন মুসলিম তাদের দায়িত্ব পালন করছে? এখনকার দিনে কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট আছে। ইন্টারনেটের প্রথম দিকে ইসলামের পক্ষে যত কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইসলামের বিপক্ষে। কিন্তু এখন মুসলিমরাও তাদের মতামত ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ'। তবে খ্রিস্টানরা অনেক এগিয়ে আছে। মুসলমানরা যখন তাদের মন্তব্য পেশ করে; খ্রিস্টানরাও পাল্টা জবাব দেয়।

ইন্টারনেটে অনেক সাইট আছে। কিন্তু নাম প্রকাশ করে তাদের আমি জনপ্রিয় করতে চাই না। কিছু সাইট দেখে মনে করবেন সেগুলো ইসলামিক সাইট। সে সমস্ত সাইটে ঢুকে দেখবেন সেখানেও ঘরের ভেতর সাপ। তারা যে ম্যাগাজিনগুলো ছাপায়– ভারতে এর একটি নাম 'দারুণ নিজাত' আরবি নাম! এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টকে বলে সুলতান। সুলতান হচ্ছেন পোপ জন পল। 'নিদায়ে উম্মির' এগুলো খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান। নাম দেখে ভুলবেন না। এই সমস্ত সাইটগুলোর নাম আর আমি বলতে চাই না। কেননা এগুলোর নাম শুনে আপনারা সেখানে ঢুকবেন এবং ভুল জিনিসগুলো শিখবেন। তারা সেখানে এমন সব কথা বলে যেগুলো দেখে সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝবে। তারা পবিত্র কোরআনের সমালোচনা করে থাকে নির্দিষ্ট কিছু আয়াত বেছে নিয়ে।

এখন আমি আপনাদের বলছি যে এই মিডিয়া একই সাথে ভাল এবং মন্দ দুটিই। এটি একই সাথে পজেটিভ এবং নেগেটিভ। যেমন একটি ছুরি, এটি দিয়ে ভাল কাজও করা যায় এবং অনেক অনেক খারাপ কাজও করা যায়। একইভাবে কিছু সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে। মিডিয়ার কিছু নেগেটিভ এবং কিছু পজেটিভ দিকও আছে। সেখানে ভাল জিনিসও আছে এবং খারাপ জিনিসও আছে। এখন আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ব্যবহার করে টেবিলটিকে উল্টে দিতে হবে। মিডিয়াকে ব্যবহার করবো ভাল কাজের জন্য। বর্তমানে বেশির ভাগ মিডিয়াই ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ কারণেই বেশির ভাগ আলেম এবং শায়েখ মিডিয়া থেকে সবাইকে দূরে থাকার জন্য বলে থাকে। আমিও তাদের সাথে একমত। আমিও তাদের পক্ষে, বিপক্ষে নই। কারণ স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে আপনাদের ঘরে যা ঢুকছে তাদের বেশির ভাগই ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। সেগুলো ইসলামের কাছে নিয়ে আসবে না।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে ১ নম্বর মিডিয়া হলো টেলিভিশন মিডিয়া। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বর্তমানে পৃথিবীতে ২০,০০০ টিভি স্টেশন আছে এবং এদের দর্শক পৃথিবীর প্রায় ৫ শত কোটি মানুষ। বর্তমানে টেলিভিশনের আওতার মধ্যে আছে পৃথিবীর প্রায় ৮০% মানুষ। আমাদের বেশির

ভাগ মানুষই টেলিভিশন মিডিয়ার আওতার মধ্যে আছি পরিসংখ্যান তাই বলে। সম্পূর্ণ পৃথিবীর ৮০% লোক বর্তমানে টেলিভিশন মিডিয়ার আওতার মধ্যে ডুবে আছে। অর্থাৎ ৫ শত কোটি মানুষ। এই সমস্ত মিডিয়ার পিছনে বর্তমানে বাজেট কতো তা জেনে আপনারা অবাক হবেন। প্রায় ৪০,০০০ কোটি ডলার, লোকজন এই মিডিয়াতে বিনিয়োগ করেছে ৪০০ মিলিয়ন ডলার এবং দুই হাতে টাকা আয় করছে। এর বেশির ভাগই ৯৮% এরও বেশি, ৯৯% এরও বেশি হচ্ছে হারাম। অশ্লীলতা এবং ভুল তথ্য দিয়ে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যাটা ৯৯% এরও বেশি।

এখানে আমাদের এই মিডিয়াকে ব্যবহার করে টেবিলকে উল্টে দিতে হবে। একবার চিন্তা করে দেখেন ৪০.০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ শুধু টিভি মিডিয়াতে। খ্রিস্টানদের ৫০টি থেকে ১০০টি চ্যানেল আছে। খোদ আমেরিকাতেই ১,৬৭৩টি চ্যানেল আছে। তাদের মধ্যে ৮৩টি চ্যানেল হচ্ছে ধর্মীয় চ্যানেল। চ্যানেলগুলোর বেশিরভাগই খ্রিস্টান চ্যানেল। পুরো পৃথিবীতে শতশত খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। তাদের মধ্যে হিন্দু চ্যানেল আছে, জৈন চ্যানেল আছে, কিন্তু মুসলিম কয়টি আছে? ভারতে অনেক চ্যানেল আছে, হিন্দু চ্যানেল রয়েছে, খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। ভারতে খ্রিস্টান চ্যানেল আছে একেবারে সেই এলাকার ভাষায়। ইংরেজিতে অনেক খ্রিস্টান চ্যানেল আছে এবং এখানে দক্ষিণ ভারতের চ্যানেল যার অল্প কিছু মানুষ। বিশেষ লক্ষ্যে, পৃথিবীতে খ্রিস্টান চ্যানেল আছে কয়েকশত। তাদের মধ্যে 'গড্ টিভি' হলো ১ নম্বর।

আপনারা অনেকেই হয়তো গড টিভির নাম শুনেছেন। গড টিভির সম্প্রচার শুরু হয় প্রায় ১০ বছর আগে। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা একজন বৃটিশ। কিন্তু সম্প্রচারিত হয় ইসরাঈল থেকে। বর্তমানে ১৫টি স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রসারিত হয়। পৃথিবীর ২০০টিরও বেশি দেশে ২৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এই গড্ টিভির আওতায় আছে। ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ দর্শক তাদের হাতের মধ্যে। তারা মোট ১৫টি স্যাটেলাইট ভাড়া করেছে ২০০টি দেশে। গড টিভি একটিই কিন্তু অঞ্চলভেদে আলাদা যেমন এশিয়াতে একরকম, ইউরোপে আরেক রকম। আমেরিকাতে অন্যরকম, ভারতে আরেক রকম, বিশেষভাবে তৈরি। যেমন ধরুন, বিবিসি। বিবিসি ওয়ার্ল্ড একরকম, বিবিসি এশিয়া আরেক রকম। বিবিসি ইউরোপ আলাদা। কিন্তু কেন? অনুষ্ঠানগুলো একই প্রায় ৯০% এর মতো।

তারা এখানে আসলে প্রধান সময়ের (প্রাইম টাইমের) সুযোগ নিয়ে থাকে, ইংল্যান্ডের প্রধান টাইম এবং আরব আমিরাতের প্রধান সময় এক নয়। মুম্বাইর প্রধান সময়ও আলাদা, এভাবেই তারা একেক দেশের প্রধান সময়গুলোকে কাজে লাগায় এবং এজন্য অন্যান্য স্যাটেলাইট ভাড়া করে। খ্রিস্টান মিশনারী চ্যানেলগুলোর মধ্যে গড টিভি অন্যতম এবং এটি খুবই জনপ্রিয়। এরকম আরো

কয়েকশ খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। কিন্তু ইসলামি টিভি এরকম কয়টি আছে? আমার জানামতে অনেকেই অর্থাৎ অনেক মুসলিমই বিনোদন চ্যানেলের মালিক, অনেকে ৫টি ১০টির মালিক আমি নাম বলছি না আপনারা হয়তো জানেন। এরকম অনেক চ্যানেল আছে কিন্তু কতগুলো ইসলামিক চ্যানেল আছে দাওয়ার কাজ পরিচালনার জন্য। ১ম যেটি শুরু করে সেটি কাদিয়ানীদের। এম,টিভি এ অর্থাৎ মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া। তারা মুসলিম না। মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া এটি এখন দুবাইতেও আছে।

মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া সাধারণ মানুষ এটা দেখে ভাববে যে, এটি মুসলিম চ্যানেল। নামটি মুসলিম কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে প্রথাসিদ্ধ মুসলিম নয়, তারা মুসলিম না। 'আলহামদুলিল্লাহ' প্রায় ৮ বছর আগে প্রথম মুসলিম চ্যানেল 'ইকরা' টিভির সম্প্রচার শুরু হয়। তবে এটি আরবি ভাষায়, তারপর আসে 'ফজর' টিভি, তবে এই সকল চ্যানেলগুলো প্রচারিত হয় আরবি ভাষায়। পুরো পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে নয়। তাদের লক্ষ্যস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্যে। এই চ্যানেলগুলো ইসলামি চ্যানেল কিন্তু 'দাওয়া' চ্যানেল নয়। তারা মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে কিন্তু অমুসলিমদের জন্য প্রচার করছে না'। আরো কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো ধর্মীয় এবং শুধু ইউরোপীয়দের জন্য।

এখন আমাদের যে জিনিসটি করতে হবে দিনরাত ২৪ ঘণ্টার একটি দাওয়া চ্যানেল, যারা ইসলামিক অনুষ্ঠান প্রচার করবে এবং ভুলগুলো দূর করবে, যা অন্যান্য মিডিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে। আমি কয়েক বছর পূর্বে দুবাইয়ে এসেছিলাম 'হলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড'এর আমন্ত্রণে। আর তখন খবরের কাগজে হেডলাইন এসেছিল যে, ডা. জাকির নায়েক ইসলামি টিভি চালুর কথা বলেছেন। দুবাইয়ের দৈনিক 'খালিদ টাইমস'। তখন লেকচার দিয়েছিলাম আল ভূমে। বিষয় আলাদা ছিল, কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলাম মুসলিমদের জন্য প্রয়োজন এখন একটি ২৪ ঘণ্টার দাওয়া চ্যানেল। যেটি হবে ইংরেজি ভাষায়। কারণ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা! ইসলামিক নিউজ পেপার আছে যেগুলো ছাপা হয় উর্দু ভাষায়, কিন্তু এগুলো কারা পড়ে শুধু ভারত কিংবা পাকিস্তানের মুসলিমরা।

আরবি ভাষায় খবরের কাগজ আছে যেগুলো পড়ে শুধু আরবরা। আমি এমন বলছি না যে এটি ভুল। তবে আমাদের এখন প্রয়োজন দাওয়ার জন্য খবরের কাগজ, দাওয়ার জন্য টিভি চ্যানেল। 'আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই এই দর্শনে বিশ্বাস করি। সামনে যত কাজই থাকুক অপেক্ষা করবেন না যদি কাজ একটু বেশিই হয়। আপনার ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। কাজ যদিও বেশি হয় আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে শুরু করেন, যদি আপনার কাছে মাত্র এক হাজার দিনার কিংবা এক হাজার রিয়াল আছে, তাই দিয়ে শুরু করেন, ইনশাআল্লাহ

আপনি সফল হবেন। আজ থেকে ৮ বছর পূর্বে মুসলিমরা স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করেছিল। তবে 'আলহামদু- লিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ' আমরাও চেষ্টা করছি প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টার অনুষ্ঠান ৬টি আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচার করতে। প্রতিদিন ৬টিতে। অনুষ্ঠানগুলো শুধু মুসলিমদের জন্য নয় যেমন– ইকরা টিভি, কিউ টিভি, এ আর ওয়াই, ডিজিটাল ইসলামিক চ্যানেল।

আমরা অমুসলিমদের জন্যও করি, সিনেমার গানের চ্যানেল, যেমন– ই. টি. সি. ২৪ ঘণ্টার সিনেমার গান প্রচার করে যা হারাম। অন্তত আধা ঘণ্টার জন্য তা হালাল হচ্ছে। তারা দেখছে একজন লোক জোকারের মত লোক। মাথায় টুপি, পরনে কোর্ট, টাই। আর অন্য একজন প্রশ্ন করছে যে ইসলামে কেন একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়? তারা ভাবে যে খুব মজা হবে। কিন্তু যখন উত্তর শুনে তখন তারা মেনে নেয়। তাই আমরা যা করি আমরা অনুষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে দিয়ে দেই, টাকার দরকার নেই, কারণ আমরা যদি বলি এই অনুষ্ঠানগুলো করতে আমাদের কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়েছে। যদি আমরা এগুলোর জন্য অর্থ গ্রহণ করি, তবে এরা হয়তো একটি মাত্র অনুষ্ঠান দেখাবে। তাই আমরা এগুলো বিনা পয়সায় দিয়ে থাকি। আর মাশাআল্লাহ্ অনেক চ্যানেল এগুলো প্রতিদিন দেখায়, কারণ এগুলো বিনামূল্যে দিচ্ছি। তবে আমরা আখিরাতে পুরস্কার পাব 'ইনশাআল্লাহ'।

কয়েক বছর পূর্বে আমি আলবুমে বলেছিলাম যে আমাদের ইসলামি দাওয়া চ্যানেল প্রয়োজন। তবে আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ। আপনার ও জেনে খুশি হবেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটি চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি একটি ইসলামি দাওয়া চ্যানেল। চ্যানেলটির নাম হবে পিস্ টিভি। আমাদের বাজেট খ্রিস্টানদের মতো এতো বেশি না। আমাদের এত বেশি টাকা নেই। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের যা আছে ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলটির নাম দিয়েছি পিস টিভি। মিডিয়া যেখানে যুদ্ধ করছে ইসলামের সাথে। কিন্তু আমরা শান্তি চাই মানবতার জন্য। 'পিস' এর আরবি হলো 'সালাম'। আরো একটি হলো 'ইসলাম' এবং ইনশাআল্লাহ্ এটি হবে ইসলামিক দাওয়া চ্যানেল। এর সম্প্রচার হবে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমাদের এশিয়াতে, প্রচারিত হবে প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে 'ইনশাআল্লাহ' আমরা আমেরিকাতে যাব।

তারপর আশা রাখি পুরো পৃথিবীকে আমাদের আওতার মধ্যে আনবো 'ইনশাআল্লাহ'। এটি হবে প্রধানত ইংরেজি স্যাটেলাইট চ্যানেল। তবে যে সময়টিতে প্রাইম টাইম না কাজে লাগাতে চাই সে সময়টাকেও। যে সময়টি ইউরোপ বা ইংরেজি দেশের প্রধান সময় না, ভারত এবং পাকিস্তানের প্রধান সময় তখন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হবে হিন্দি এবং উর্দুতে। যাতে করে

ভারতের অমুসলিমদের আমরা অনুষ্ঠানগুলো দেখাতে পারি। তাহলে ২৫% অনুষ্ঠান হবে হিন্দি আর উর্দুতে এবং বাকি অর্থাৎ ৭৫% হবে ইংরেজিতে ইনশাআল্লাহ্।

ইসলামি পোশাক ও সানিয়া মির্জা

আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো দোয়া করতে আমাদের জন্য। যেন এই 'পিস' টিভির মাধ্যমে আমাদের শান্তির ধর্মকে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি 'ইনশাআল্লাহ'। মুসলিমদের এটি জানতে হবে যে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। আমার লেকচার শেষ করার পূর্বে আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনারা যারা ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসী তারা হয়তো এ খবরটি গত কয়েকমাস ধরে শুনে থাকবেন, সানিয়া মির্জার কথা। এখন অবশ্য এটি আন্তর্জাতিক খবর, কারণ হলো মিডিয়া। সবাই সানিয়া মির্জাকে চেনে, কিভাবে কারণ মিডিয়া তাকে চিনিয়েছে। এই মিডিয়াই তাকে দিয়েছে পরিচিতি। এই কারণটি জানেন? কারণটি হলো সে একজন মুসলিম।

শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য না, মুসলমান হয়ে সে এমন পোশাক পরেছে যে স্কার্ট এবং শর্টস। তারপরে টাইম ম্যাগাজিনে সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা প্রথম সপ্তাহে তার ছবি প্রচ্ছদে আসে ২০০৫ সালে। সে স্কার্ট এবং শর্টস পরে টেনিস খেলছে কেন? কারণ আমরা সবাই জানি গত কয়েক মাস ধরে মিডিয়ায় একটি নতুন খবর এসেছে যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে, সানিয়া মির্জা যে পোশাক পরে ছোট স্কার্ট সেটি হারাম। এটি নিষিদ্ধ। তখন এটিকে নিয়ে সব দিকে হইচই পড়ে গেল। মিডিয়ার লোকেরা আলেমদের কাছে গেল। জানতে চাইল সানিয়া মির্জা যে পোশাক পরে তা ঠিক না ভুল। তখন তারা বললো এটি হারাম-হারাম-হারাম। তখন খবরটি ছড়িয়ে পড়লো। মিডিয়া ঠিক এই কাজটিই করে। তথ্য জোগাড় করার পরে যেভাবে তারা প্রচার করে তখন তা অমুসলিমরা ভাববে এটা আবার কোন ধরনের ধর্ম। একজন মহিলা খেলাধুলা করছে আর ধর্ম তাতে বাধা দিচ্ছে? ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন আমরা বদলাতে পারবো না। কারণ যেটি ভুল সেটি ভুলই। কিন্তু কিভাবে উপস্থাপন করবেন সেটিই আসল কথা, আল্লাহ পবিত্র কোরআনের (সূরা নাহালের আয়াত নং-১২৫) উল্লেখ করেছেন যে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : তোমরা প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো এবং যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

আমি সাধারণত মিডিয়ার সামনে কথা বলি না। তার কারণটি আমি পরে বলছি। মুম্বাইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে লেকচারের আয়োজন করি সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকে, সেই লেকচারে কয়েকশো মানুষ এসেছিল। একজন আমাকে সানিয়া মির্জার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আমি বলেছিলাম আমাদের জানা উচিত কিভাবে মিডিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। প্রথমেই প্রশ্নটি করতে চাই আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে, আপনারা কেন এই প্রশ্নটি করছেন মুসলিম আলেমদের, মুসলিম শিখদের এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞদের যে সানিয়া মির্জা যে পোশাকটি পরেছে সেটি ঠিক না ভুল। সানিয়া মির্জা তো র‍্যাংকিং-এ ৩৪-এ অবস্থান করছে। আপনারা কেন এই প্রশ্নটি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে করছেন না? সেরেনা উইলিয়ামের ব্যাপারে। সেরেনা উইলিয়াম তো র‍্যাংকিং-এ ১ নম্বর। কেন আপনারা এই প্রশ্নটি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে করছেন না? সেরেনা উইলিয়ামস্ যে পোশাকটি পরে তা ঠিক না ভুল?

আপনারা তাদের কাছে প্রশ্ন করেন। আপনারা ভ্যাটিকান সিটির পোপের কাছে প্রশ্ন করেন? সেরেনা উইলিয়ামস্ কিংবা সানিয়া মির্জার পূর্বে যারা অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খ্রিস্টান। আপনারা খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং পোপের কাছে প্রশ্ন করেন যে তাদের পোশাক ঠিক কিনা? আপনারা যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন যে বাইবেলের (বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-২২, অনুচ্ছেদ-৫) যে "মহিলারা এমন পোশাক পরবে না যা পুরুষের মতো এবং পুরুষরাও মহিলাদের পোশাক পরবে না। যারা এমনটি করবে তারা প্রভুর ঘৃণার পাত্র হবে।" (ফার্স্ট টিমোথি অধ্যায়-২, অনু-৫) তে বলা আছে যে, মহিলারা পোশাক পরবে শালীনতার সাথে, সংযমের সাথে, তারা কোন রকম অলংকৃত চুল পরবে না। অথবা স্বর্ণ, মুক্তা কিংবা দামি পোশাক পরবে না" একজন খ্রিস্টান মহিলারও শরীর ঢেকে রাখা উচিত।

আপনারা খ্রিস্টান 'নানদের' ঠিক সেভাবেই দেখে থাকবেন। আপনারা নান্‌দের কেমন দেখেছেন? তাদেরকে মুসলিম মহিলাদের মতোই দেখায়। কখনো যদি মাদার মেরির ছবি দেখে থাকেন, আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুক, তার শরীর ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। শুধু মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা। আপনারা এখন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক কিংবা পোপকে জিজ্ঞেস করুন, একজন নান্ যদি হিজাব ছেড়ে দিয়ে মিনি স্কার্ট পরে তখন তিনি কোন ফতোয়া দেবেন? তিনি তখন কি বলবেন? আমাদের ধর্মে প্রত্যেক মুসলিম নারী প্রত্যেক মুসলিম নারীই ধার্মিক। খ্রিস্টানদের ধর্মে নান্‌রা যেমন ধার্মিক। তারা সবাই শালীন। মিডিয়াকে ঠিক এভাবেই উত্তর দিতে হবে। এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যেও দু'টি ভালো ছিল বেশির

ভাগ ওলামা এবং শায়েখরাই বলেছেন এটি ভুল এবং কেউ কেউ তখনি ফতোয়া জারি করে দিলেন। কিন্তু তথাকথিত কিছু আধুনিক মুসলিম তারা কী বলেছিল? তারা বলেছিল যে খেলাধুলার মধ্যে ইসলাম নাক গলাচ্ছে কেন?

একজন মুসলিম রাজনীতিবিদ বলেছেন এই ওলামা এবং শায়েখরা চুপ থাকলেই ভাল। কেননা তারা খেলাধুলা সম্পর্কে কিছু জানে না। কিন্তু আমি সেই রাজনীতিবিদকে বলছি আপনি চুপ থাকেন। আপনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেন না। একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছেন, "সানিয়া মির্জা আমাদের দেশের গর্ব"। সে দেশদ্রোহী যে লোক সানিয়া মির্জার বিরুদ্ধে কথা বলে সে দেশকে ভালবাসে না।" তিনি সরাসরি বলে উঠলেন সে দেশকে ভালবাসে না। কিন্তু আমি বলেছিলাম যে লোক সানিয়া মির্জার পোশাকে সমর্থন করছে সে 'বেদ' এর বিরুদ্ধে বলছে। কেননা হিন্দুদের 'বেদ' বলছে যে (ঋগবেদ-গ্রন্থ নং ১০, অনুচ্ছেদ-৮৫, পরিচ্ছেদ-৩০) 'মহিলারা পুরুষদের মতো পোশাক পরবে না এবং পুরুষরাও তাদের স্ত্রীর পোশাক পরবে না।'

এরপর (ঋগবেদে আছে গ্রন্থ নং-৮, অনু-৩৩, পরিচ্ছেদ-১৯) বলা হয়েছে যে 'ব্রহ্মা' মহান ঈশ্বর তোমাদের নারী বানিয়েছেন, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখ এবং পর্দার আড়ালে থাক। তাহলে হিন্দু ধর্মও বলছে যে স্কার্ট পরা হারাম। যেসব লোক তাহলে স্কার্ট পরা সমর্থন করে তাদের আমি বলছি যে ঐ হিন্দু রাজনীতিবিদ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং এভাবেই টেবিলটিকে উল্টে দেন। গুলিটি কেন আমাদের দিকে ছোঁড়া হয়? হিন্দুদের জিজ্ঞেস করেন যে এটি কী আমাদের অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি কিনা? তাছাড়াও অন্য একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছিলেন টেনিস হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তারা সবাই আসলে এক হোক হিন্দু কিংবা মুসলিম রাজনৈতিক, তাদের বেশির ভাগই নিজেদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করে চলে।

হিন্দু রাজনৈতিক তিনি বলেছেন যে, এটি হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তাই তাকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী পোশাক পরতে হবে। মানুষজন জানে না যে তারা যে পোশাকটি পরে তাতে করে তাদের পারফরমেন্স ভাল হয়। তবে ঠিক আছে মেনে নিলাম। মেনে নিলাম যে এই পোশাকটি পরলে পারফরমেন্স ভাল হয় কিন্তু কতখানি ভাল হয় $\frac{১}{২}$%, ১% মেনে নিচ্ছি তর্ক করবো না। কিন্তু যদি ইতিহাস দেখেন ১৫ বছর পূর্বে ২০ বছর পূর্বে মহিলারা যখন বেডমিন্টন জাতীয় কিছু খেলতো তাদের পুরো শরীর ঢাকা থাকতো। এমনকি এখন পর্যন্ত ইরানের মহিলারা তাদের পুরো শরীর ঢেকে স্কার্ফ পরে খেলাধুলা করছে। যদি আপনার কথা মেনেও নেই যে পারফরমেন্স ভাল হয় এই পোশাক পরলে।

কিন্তু আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি আগামীকাল যদি বিচ্ ভলিবল আন্তর্জাতিক খেলা হয় আপনার মেয়েকে কী বিকিনি পরিয়ে সেখানে খেলতে পাঠাবেন? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি কি এরকম অনুমতি দেয় কিনা? এরপর তারা বলে যে সাঁতারে মহিলারা কম পোশাক পরে ভাল করে সাঁতার কাটার জন্য। এ কারণে পুরুষেরা শুধু ব্রিফ পরে এবং মহিলারা বিকিনি পরে। কিন্তু আপনাদের এটি বুঝতে হবে যে যদি তারা পোশাক না পরে তাহলে তাদের পারফরমেন্স আরো ভাল হবে। তবে কি মহিলাদের আপনারা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে বলবেন? তখন তারা হয়তো বলবে এটি অশালীন। কিন্তু এই দ্বিমুখী নীতি কেন? আপনাদের শালীনতার লেভেল অনেক নিচে এবং আমাদের শালীনতার লেভেল অনেক উপরে।

আপনাদের এই বিষয়টি বুঝতে হবে। তাদের কাছে যেটি শালীন আমাদের কাছে সেটি অশালীন। আপনারা এ নিয়মটি কেন চালু করছেন না যে, পুরুষ এবং মহিলারা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে পারবে। তাহলে তাদের পারফরমেন্স আরো ভাল হবে। কিন্তু তারা তা করবে না। তাদের শালীনতার লেভেল এখানেই। তাই এভাবেই আমাদের টেবিলটাকে উল্টে দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা চুপচাপ বসে থাকি। আমরা নিজেদের মিডিয়ার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছি। প্রশ্নটির বিষয়ে আলেমদের কিভাবে উত্তর দিতে হবে? আমি সকল আলেমের বিপক্ষে নই। প্রকৃত অর্থে তারা মিডিয়ায় কথা বলতে অভ্যস্ত নন। আমাকে কেউ যদি প্রশ্নটি করে থাকে সানিয়া মির্জার পোশাকের বিষয়ে ইসলাম কী বলে? এটি ঠিক না ভুল সানিয়া মির্জা মুসলমান হয়ে যে পোশাক পরে আমি তাদের বলতাম সানিয়া মির্জার পোশাক সম্পর্কে বলার পূর্বে আমি অন্য একটি কথা বলতে চাই। অনেক মুসলিম পুরুষ আছেন যারা ক্রিকেট খেলে থাকেন। ভারতীয় দলে কিংবা অন্যান্য দলেও মুসলিম পুরুষ আছেন। কিন্তু তাদের অনেকেই নামাজ আদায় করে না।

সহীহ্ মুসলিম অনুযায়ী (বুক অব সালাত) যে 'ঈমান এবং কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো 'সালাত' সালাত হলো তাওহীদের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। 'শিরক' এরপর সবচেয়ে বড় পাপ হলো সালাত কায়েম না করা। তাই আমার মতানুযায়ী যে সব মুসলিম অর্থাৎ ক্রিকেট খেলোয়াররা সালাত আদায় করেন না, তারা সানিয়া মির্জার চাইতেও বড় পাপী। কারণ সানিয়া মির্জা সালাত আদায় করে। মুসলিম অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা তারা শির্ক করছে। পর্দায় তারা সবচেয়ে বড় গুনাহগার। আমি সানিয়া মির্জার পক্ষে কথা বলছি না। কিন্তু একথা বলছি যে, সানিয়া মির্জা যে পোশাকটি পরে সেটি ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী বৈধ নয় 'হারাম'। কিন্তু একথা বলার আগে পরিবেশটি বদলিয়ে নিলাম এবং এটাই 'হিক্মা'।

এভাবেই পরিস্থিতি বদলে দিতে হবে। যখনি বলছি খ্রিস্টান ধর্মে এটার বিরুদ্ধে তখন তারা চুপ; হিন্দুধর্ম এটির বিরুদ্ধে তারা চুপ হয়ে যায়। আমি ক্রিকেট এবং সাঁতার সম্পর্কে বলেছি। যখন বললাম যে এটি 'হারাম' তখন এটি তাদের গলা দিয়ে ঢুকবে। তা না হলে উত্তরটি তারা'হজম' করতে পারবে না। আমি বলেছি সানিয়া মির্জা অন্তত সেই সব ক্রিকেটারদের চাইতে ভাল যারা সালাত আদায় করে না। কারণ সে সালাত আদায় করে সে কম গুনাহগার তাদের চাইতে। ক্রিকেটাররা ৪ দিন ৫ দিন পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে সালাতের কোন খবর নেই।

আল্লাহ্ আমাদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সানিয়া মির্জা হয়তো একদিন 'হারাম' পোশাক বাদ দিয়ে 'হালাল' অর্থাৎ শালীন পোশাক পরবেন ইনশাআল্লাহ্। তারপর সে পুরুষের সাথে খেলতে পারবে কি পারবে না সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু আমি এমন কোন ফতোয়া দিচ্ছি না যে এটি ঠিক। আমাদের মুসলিমদের এখন জানতে হবে যে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। হিক্‌মার সাথে কিভাবে উত্তর দেয়া যায় এবং যদি এভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন তবে তাদের আপনি চুপ করাতে পারবেন। দুর্ভাগ্যজনক আমরা নিজেদের মিডিয়ার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত করছি। কেন আমি সাধারণত মিডিয়ার কাছে কোন সাক্ষাৎকার দেই না। যদি আমি কোন ৫ মিনিটের জন্য আলোচনা করি তাহলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা এটি সম্পাদনা করে বদলে দেয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে মাঝে মাঝে তা ছোট করে দেয় এবং বাক্যটিকে বদলে দেয় না বুঝেই। ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় হোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এমন করে থাকে। উত্তরটি যদি ঠিকমত হয় তারা তা কেটে দেয় এবং তারপর উত্তরটি শুনলে অন্যরকম মনে হবে। অথবা না বুঝে আমার উত্তরটি ছোট করতে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। তাই ইচ্ছা করেই তাদের আমি এড়িয়ে চলি।

যদিও অনেক মিডিয়া থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়া থেকে আমাকে ডাকা হয় সাক্ষাতের জন্য। বেশির ভাগ সময়েই তাদের আমি এড়িয়ে চলি। কিন্তু যখন আমাদের চ্যানেল হবে 'ইনশাআল্লাহ্' তখন সঠিক তথ্যটি তুলে ধরতে পারব। আমাদের টেপের কপি দেব তাদের যদি দেখতে চান এটি দেখেন। যদি আপনারা সম্পাদনাও করে থাকেন আমাদের চ্যানেলে পুরোটি দেখানো হবে 'ইনশাআল্লাহ্'। একটি চ্যানেল চালু করা অবশ্যই অনেক কঠিন কাজ। চালুর পরে সেটি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চালানো আরো অনেক কঠিন কাজ। তবে 'ইনশাআল্লাহ্' আপনারা দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি যেন সঠিক পথে চলতে পারি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে পারি। এভাবে ইসলামকে ছড়াতে পারি। আমার আলোচনা শেষ করার পূর্বে পবিত্র কোরআনের একটি উদ্ধৃতি

দিচ্ছি। আয়াত (সূরা ইসরা- আয়াত নং ৮১ আরবি দিন যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাঁড়ায় মিথ্যা বিলুপ্তি হয়ে যায়। মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্তি হয়ে যাবে– 'ওয়া আখিরিদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।'

আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমাদের বক্তা ডা. জাকির নায়েককে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন। তার এই তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ আপনাদের পুরস্কৃত করবেন। এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সেশন উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। তবে তার পূর্বে আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই যে আপনারা কী ভাবছেন যে, ডা. জাকির নায়েক মানবজাতির জন্য শান্তি চায়? আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি সব প্রশ্নই আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনবো। তারপর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। আমরা আসলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চাই। মানবজাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চাই। যেমন ডা. জাকির নায়েক আজকে বললেন। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল মিডিয়া এবং ইসলাম, যুদ্ধ নাকি শান্তি? আমি এবারে সংক্ষেপে বলছি, শান্তির জন্য যুদ্ধ এই শ্লোগান দিয়ে অনেক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে কিন্তু শান্তি মানবজীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তবে ইসলাম শান্তি চায়। ইসলাম শান্তির ধর্ম ভেতর বাইরে সব দিক থেকেই। আমরা ইহকাল এবং পরকালের শান্তির জন্য ইসলামের প্রচার চালিয়ে যাব। আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন ডা. জাকির নায়েক। যিনি একজন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে। তার লেকচারের মাধ্যমে সেই কথাগুলোই এতক্ষণ আপনারা জানলেন। তবে আমি প্রশ্নোত্তর শুরু করার পূর্বে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের বলবো তারা যেন আগে অমুসলিম ভাইদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন এবং তাদের মধ্যে যারা সাংবাদিক আছেন তাদের বলতে দেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১. ভাই আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। পেশায় আমি ইঞ্জিনিয়ার। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কোরআনে (সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ৪৭-এ) বলা হয়েছে, 'তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান', এছাড়া (সূরা সাজদাহ, আয়াত নং ৫-এ) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের প্রতিপালকের একদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসেবে হাজারের বছরের সমান।' এরপর (সূরা মা'রিজ, আয়াত নং ৪) উল্লেখ আছে যে, 'ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পার্থিব ৫০,০০০ বছর। তাহলে একদিন সমান কত হবে? পঞ্চাশ হাজার বছর না এক হাজার বছর আল্লাহর কাছে ?

উত্তর : আপনার নামতো রাহুল তাইনা? জি, হ্যাঁ। আপনিই তো গতকাল সৃষ্টির ৬ দিন নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। 'মাশাআল্লাহ' আপনাকে ভালবাসি। আমিও আপনাকে ভালবাসি– সে বলল। আমি এখন আপনাকে বলি এগুলো বর্তমানে ইন্টারনেটে কমন প্রশ্ন। আপনাকে এগুলো জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। আপনি ইন্টারনেটে চলে যান। আপনি চলে যান ইসলামবিরোধী সাইটগুলোতে এরকম আরো অনেক কিছুই পাবেন। আমার অবশ্যই মনে হয় যে ভাই রাহুল আপনি পুরো কোরআন পড়েন নি। সে বলল পুরোটি পড়ি নি কিন্তু আমার আরো প্রশ্ন আছে। আমি আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আগে এর উত্তরটি জানতে চাই।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি সত্যটি জানতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে আসল উৎসটি পড়ে দেখতে হবে। যদি আপনি খ্রিস্টান সম্পর্কে জানতে চান এবং শুধু খ্রিস্টানদের বই পড়েন তাহলে আপনি একপেশে হয়ে যাবেন। তাই আমি আপনাকে বলছি প্রথমে ভাল সাইটগুলো দেখেন, পবিত্র কোরআন পড়েন, তারপর দু'টি না, দু'শত প্রশ্ন করেন আমাকে। আমি ইনশাআল্লাহ্ উত্তর দিব। তবে এখনো উত্তর দিচ্ছি। যেহেতু আমি দাওয়ার কাজে নিয়োজিত, আমি বুঝি যে লোকজন প্রথমে ইসলামবিরোধী সাইটগুলো দেখে এবং মেনে নিয়ে ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে ভাল সাইটগুলোতে যান। এমন সাইটে যাবেন না যেমন আনসারিং ইসলাম। লোকটি বলছে যে আমি এখানে আধা ঘণ্টা ধরে আপনাদের কথা শুনছি আমি এখানে একেবারেই নিরপেক্ষ।

আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি– এটি কোন নতুন প্রশ্ন নয় আমার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেও দিয়েছি আমি। সব কিছুরই রেফারেন্স আমি দিতে পারি 'মাশাআল্লাহ্' ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে কোরআনের দুটি জায়গায় আল্লাহ

বলেছেন যে একদিনের সমান হলো একহাজার বছর। আর অন্য জায়গায় সূরা মায়া'রিজে উল্লেখ আছে যে, একদিনের সমান হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। কথাগুলো কি পরস্পর বিরোধী নয়? এক জায়গায় বলা হচ্ছে ১০০০ বছর অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ৫০,০০০ বছর। আরবি ভাষায় এই শব্দটি হলো 'ইয়াওম', এখন এই ইয়াওমের দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো 'দিন' যেমন ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন এবং অন্য অর্থটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। একটি যুগ। এটি যেকোন একটি সময়কাল হতে পারে। তাহলে ইয়াওমের একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'দিন' অন্যটি হচ্ছে সময়কাল। তাহলে সঠিক করে কোরআন পড়েন একটি আয়াত বলছে যে, একদিন সবকিছু আল্লাহ্ তায়ালার কাছে উপরে চলে যাবে। যে দিনের পরিমাণ হবে ১০০০ বছর, তোমাদের হিসেবে। একটি দিন একটি সময়কাল তোমাদের দিনের হিসেবে এক হাজার বছর। অন্য জায়গায় সূরা মায়া'রিজ, আয়াত নং ৪-এ উল্লেখ আছে যে 'ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এসময় যে সময়টি লাগে সেটি পার্থিব বছরের ৫০,০০০ বছরের সমান।'

আমি একটি উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরেন যদি আমি দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে চাই তাহলে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। আর যদি দুবাই থেকে আমেরিকা যেতে চাই সমগতিসম্পন্ন প্লেনে, তাহলে সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা এবং দুবাই থেকে নিউইয়র্ক যেতে আমার সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। এটি পরস্পর বিরোধী কথা নয়। কারণ এখানে দুটি বিষয়ই প্রকৃত অর্থে আলাদা। আল্লাহ বলেছেন একদিন সবকিছু তার কাছে যাবে, সেটির সময় আলাদা এবং অন্য জায়গায় ফেরেশতাগণ তার কাছে যাবেন সেটির সময়ও আলাদা। এগুলো পরস্পর বিরোধী নয় এখানে বিষয়ই আলাদা। তাই এখানে সময়ের হিসাবটিও ভিন্ন। যদি অনুবাদ করেন ২৪ ঘণ্টার ১ দিন তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে এবং যদি অনুবাদ করেন এটি একটি সময়কাল, যেমন আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি এই পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন মোট ৬ দিনে অর্থাৎ ৬টি আইয়ামে। এটি কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ১ দিন নয়, তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে।

এই ৬টি সময়কাল ৬টি যুগ বিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও ইয়াওমের অর্থ একটি সময়কাল। তবে এই উত্তরগুলোর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে– www.irp.net ইনশাআল্লাহ বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই সেখানে পাবেন। আশা করি আপনার উত্তরটি বুঝে নিয়েছেন। লোকটির জিজ্ঞাসা– স্যার তাহলে এখানে দুটি জিনিস ভিন্ন? হ্যাঁ, তাই। লোকটি বললো চমৎকার। এখানে ইয়াওমের বহুবচন হলো আইয়াম। এখানে একটি সময়কালকে বুঝাচ্ছে, যা হতে পারে ১ বছর, ১ হাজার বছর, ১ কোটি বছর যেকোন সময়কাল হতে পারে।

প্রশ্ন : ২. রাহুল : আমি এখন যে প্রশ্নটি করবো সেটি হলো, আপনি একটি লেকচারে বলেছিলেন যে, এক জায়গায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন– "তোমরা আমার কোন প্রতিমা তৈরি করবে না। এমন রূপক বানাবে না যেটি আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পাতালে। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" এখন আপনার কি এটি মনে হয় না যে, অথবা এটি খুব হাস্যকর মনে হয় না? যে ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিহিংসা আছে? অথবা তিনি ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন? আমার ধারণা ছিল এই অনুভূতিগুলো শুধু আদম সন্তানেরই থাকে। ঈশ্বর হিংসা করছে, ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন, আমার মনে হয় না যে ঈশ্বর এভাবে কখনো চিন্তা করে থাকেন।

উত্তর ঃ ভাই রাহুল, আপনি আবারও সুন্দর একটি প্রশ্ন করলেন এবং আমিও আপনার সাথে একমত। এই কথাটি বলা হচ্ছে কী? বলে যে ঈশ্বর কেন হিংসা করবেন। বাইবেল আসমানী গ্রন্থ আমি একথা বলছি না এবং আমি এ কথাও মানি না যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী।

রাহুল : আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করবো না। না হলে ঈশ্বর রেগে যাবেন। ভাই রাহুল যদি প্রশ্ন করে থাকেন তবে দয়া করে আমাকে উত্তর দিতে দেন।

ডা: জাকির নায়েক : আমি দুঃখিত। যদি এটি বিতর্ক হতো আমিও বিতর্ক করতে পারি কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এখন প্রশ্নোত্তর চলছে। আপনার প্রশ্নটি করেন তারপর আমার উত্তর শুনেন। যদি আপনি আমার কথার ওপর কথা বলেন, আমি কিন্তু মনে না করলেও সেটা হবে বিতর্ক। তবে পরে সেটি এক সময় করা যাবে। আপনার আরো প্রশ্ন থাকলে আমি শুনব কিন্তু কথা বলতে থাকলে সেটি হয়ে যায় অনেকটা বিতর্কের মতো। কিন্তু বিতর্কে সময় থাকে ১৫ মিনিট করে উভয়পক্ষে। আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যেখানে বলা আছে যে, তোমরা আমার কোন প্রতিকৃতি তৈরি করবে না। যা আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পৃথিবীর নিচে। তোমরা এমন কাউকে উপাসনা করবে না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর এবং খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।" কিন্তু এ কথাটির রয়েছে (বুক অব এক্সোডাজ, অধ্যায়-২০, অনু ৩ থেকে ৫) অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টে। তাছাড়াও (বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-৫, অনু-৭-৯) এবং এটি হচ্ছে বাইবেলের উদ্ধৃতি।

আমি এ কথা বলি নি যে পুরোটাই ঈশ্বরের বাণী। এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশের সাথে আমি একমত যে ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি নেই। কিন্তু ২য় অংশে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ আমি এ কথা স্বীকার করি না। তাই এই প্রশ্নটি

করবেন একজন খ্রিস্টানকে। আমি এখানে বাইবেলের সবকিছু সমর্থন করছি না। যদি কোরআনের সাথে মিল থাকে তাহলে সমর্থন করি কিন্তু মিল না থাকলে সমর্থন করি না। তাই আমি এখানে আপনার সাথে একমত যে, ঈশ্বর ওখানে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন এবং আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

রাহুল : তবে মানতে হবে যে এখানে কাউকে ঈশ্বরের সাথে শরিক করা যাবে না এবং এটাই সবচেয়ে বড় পাপ। হে, এই কথাগুলো আমি পূর্বেও বলেছি। আমি বলেছিলাম যে ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় পাপ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৩. জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক পিনাই-ডু। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা মানবজাতির আশীর্বাদ। কিন্তু এখানে অমুসলিমদের কি হবে? যারা জন্ম থেকেই অমুসলিম। জীবনের কোন পর্যায়ে তারা ইসলামকে বুঝবে?

উত্তর : উনি বলেছেন যে, মুসলিমরা মানবজাতির আশীর্বাদ। 'আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তবে একজন অমুসলিম যিনি জন্ম থেকে মুসলিম নন। জীবনের কোন পর্যায়ে সে ইসলামকে বুঝবে। উত্তর দেয়ার আগে আমি একটি বিষয়ে বলতে চাই যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই দ্বীন-উল-ফিতর' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'দ্বীন-উল-ফিতর' অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রভাবিত হয় মা, বাবা, গুরুজন, শিক্ষক ইত্যাদি জন দ্বারা। তারপর তারা শুরু করে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং এভাবেই সে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক শিশুই ইসলাম অনুযায়ী মুসলিম হয়ে জন্মায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্থন করার জন্য। পরবর্তীতে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই যখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এখানে শব্দটি আসলে 'কনভার্ট' হবে না। কনভার্ট হলো এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা, এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে। কিন্তু এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট'। রিভার্ট মানে সে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ছিল এবং তারপর অমুসলিম হয়েছিল এবং আবার ইসলামে ফিরে এসেছে। সে জন্য এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট'। প্রত্যেক মানুষই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে কিন্তু পরবর্তীতে সে ভুল পথে চলে যায়।

এবার প্রশ্নটিতে আসি। যারা অমুসলিম হয়ে যায়, তারা কিন্তু অমুসলিম হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক মানুষই মুসলিম হয়ে জন্মায়। যারা তাদের বাবা, মা অথবা পরিবেশের কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তারা জীবনে কখন ইসলামকে বুঝতে পারবে? একেক সময়ে একেক মানুষ এটি বুঝতে পারবে। যেমন– যে মুসলিম পরিবারে জন্মায় সে হয়তো জীবনের প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারবে। আবার মুসলিম পরিবারে জন্মানোর পরও অনেকে সেটি বুঝতে পারে না এবং পরে হয়তো বুঝতে

পারবে। কেউ হয়তো প্রথম দিন থেকেই বুঝবে কেউ ১ বছর পর, কেউ ২ বছর পর কিংবা ৫ বছর পর বা ১০ বছর পর বুঝতে পারে, তবে কতদিন লাগবে সেটি আপনিই ভাল জানেন। কিছু লোক অমুসলিম পরিবারে জন্মায় সেখানে সে বড় হয়। তারা হয়তো একেবারে ছোটবেলায় বুঝবে কিংবা স্কুলে পড়ার সময় অথবা কলেজে পড়ার সময়ও বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একেকজন মানুষ একেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বুঝে থাকে। কোন মুসলিম সেই অমুসলিমকে বোঝাক বা না বোঝাক আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন (সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত নং-৫৩-এ) "আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো। নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো এই বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হবে এটাই সত্যি।" তাহলে কোন মুসলিম অমুসলিমদের বোঝাক বা না বোঝাক। আল্লাহ্ এই কথাটি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'তিনি নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবেন এই বিশ্ব জগতে যতক্ষণ না সেটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হবে।'

আমি যদি কোন কথা তাদের বলি সে হয়তো নাও বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন বলেন সেটা নিশ্চিত করেন যে, সেটা তারা অর্থাৎ অমুসলিমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে, এটাই হলো সত্যি। এটাই হচ্ছে হক্ব। কিন্তু পরবর্তীতে এই সত্যটি জানার পরে সে হয়তো মানবে কিংবা মানবে না সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত কারণে স্বীকার করতে পারে– আবার নাও স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে মারা যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে নিদর্শন দেখাবেন। কিন্তু কবে কখন সেটি তিনি অর্থাৎ আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মারা যাওয়ার পূর্বে এবং রোজ কিয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো আল্লাহর কাছে কোন অভিযোগ করতে পারবে না যে, সে কোন নিদর্শন পায় নি। কেন তাকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে? তারা শুধু বলবে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ভুল করেছি। কারণ তারা জানে যে তারা নিদর্শন দেখেছে কিন্তু গ্রহণ করে নি। তারা তখন বলবে যে তাদের আরেকবার সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ্ তাদের নিদর্শন দেখাবেন সে মারা যাওয়ার পূর্বে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৪. আমার নাম মহেশ। আজকেও আপনি একটি খুব সুন্দর লেকচার দিলেন। আমার প্রশ্নটি হলো– পবিত্র কোরআনে একটি সূরা আছে, নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, "তৃষ্ণা তখন চলে যায় সন্ধ্যায় রোজা ভাঙ্গার পরে। তৃষ্ণা যখন চলে যায় এবং শিরায় তখন রক্ত সঞ্চালিত হয়। এটি একটি দোয়া আপনি কি এটির ব্যাখ্যা দিবেন?

উত্তর : 'মাশাআল্লাহ' ভাই আপনি একটি অনুবাদ পড়ে শুনালেন একটি দোয়ার, যেটি দিয়ে ইফতার করা হয় এবং আমি আপনাকে বলতে চাই যে, মাশাআল্লাহ

আপনি ধীরে ধীরে বুঝার চেষ্টা করছেন শান্তির ধর্মকে, এই সত্যের ধর্মকে আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করেন। ভাই প্রশ্ন করলেন ইফতারের সময় আমরা যে দোয়াটি পড়ি সেটার অর্থ বা ব্যাখ্যাটি কি? ইফতারের সময় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তৃষ্ণা তখন চলে গেছে ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়েছে। আমরা যখন ইফতার করি তখন প্রার্থনা করি আমাদের ইফতারের সময় আমাদের তৃষ্ণা চলে গেছে এবং আমরা তখন বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। পানি পান করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, আমরা রোজা রাখতে পেরেছি এখন রোজা ভাঙ্গার সময় হয়েছে এবং তৃষ্ণা দূর হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষুধা মিটে যাচ্ছে। এটিই হলো দোয়া। আমরা বলে থাকি যে আমাদের তৃষ্ণা চলে গেছে রোজা ভাঙ্গার মাধ্যমে। ইফতারের পূর্বে আমরা এই দোয়াটি পড়ে থাকি। আশা করি উত্তরটি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : ৫. আমার নাম দেবাশীশ গাঙ্গুলী। পেশাগতভাবে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাংবাদিক। এই অনুষ্ঠান নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবো। আমি আপনাকে বেশ কতগুলো প্রশ্ন করতে চাই। আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে, আপনার দেশ নিয়ে কি আপনি গর্বিত?

উত্তর : সাধারণত সাংবাদিকরা একটি প্রশ্ন করে সেটির উত্তর দেয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হয় ফাঁদ। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি আসলে বলতে চাই যে বেশির ভাগ সাংবাদিকই এ রকম করে থাকেন। আমি বলছি না যে আপনিও এ রকম। আপনি হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন। তবে বেশির ভাগ সাংবাদিকই। এখানে আপনারা একটা জিনিস ভাল করে দেখেন আমি লাইনেই আছি। যদি কোন লোক একটি প্রশ্ন করতে চায় তাহলে প্রশ্নটি করেই চলে যায়। কিন্তু উনি দুটি প্রশ্ন করবেন। উনি প্রথম উত্তরটি শুনতে চান, আমি প্রথম উত্তরটি দেয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হবে ফাঁদ। কিন্তু যদি ২টি প্রশ্ন করেন এক সাথে সেটি ফাঁদ নয়। তবে কোন সমস্যা নেই আমার উত্তর একই হবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আপনি যতই প্রশ্ন করেন আমি একথাই বলবো। পৃথিবীর মধ্যে খুব কম ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ যেখানে অধিকার দেয় যে তার দেশের নাগরিকগণ তার নিজের ধর্মকে প্রচারও করতে পারবে, পালনও করতে পারবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আমি আমার দেশ নিয়ে অনেকভাবেই গর্বিত।

দেবাশীশ : আমি আমার ২য় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৬. জনৈক অমুসলিম মহিলা। আপনি বলেছেন যে, মুসলিমদের মধ্যে কিছু কুলাঙ্গার আছে, তারা খারাপ কাজ করে থাকে এবং মিডিয়াও তাদের তুলে ধরে। এই সব মুসলিমরা কি ধর্মের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? এবং এতে করে অমুসলিমরাও কী ভুল বুঝছে না?

উত্তর : একজন অমুসলিম বোন এই প্রশ্নটি করেছেন এবং এটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। যে, মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। এই কুলাঙ্গাররাই কি ইসলামের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? আসলে এই কুলাঙ্গাররা তো কোন মুসলমানই নয়। একজন মুসলিম কখনো এই রকম ভুল কাজ করবে না। মুসলিম শব্দটার অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্থন করে। এই কুলাঙ্গাররা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নামধারী নকল মুসলিম। তবে তাদের নাম হয়ে থাকে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, সুলতান, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু নাম দিয়ে আপনি মুসলিম হতে পারবেন না। মুসলমান হতে হলে কথা ও কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলেই আপনি মুসলিম হবেন। তাহলে এ সব লোকজন প্রকৃত মুসলমান নয় তবে তাদের নামগুলো শুধু মুসলমানদের।

তাই তারা মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না তারা তা নিয়ে ভাবে না। কারণ তারা তো তাদের নিজের ধর্মের দিকেই কোন খেয়াল নেই। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে মোটেও চিন্তা করে না। তারা তাদের ধর্ম নিয়েও ভাবে না। মিডিয়া কি করছে তা নিয়েও চিন্তা করে না। কিন্তু আমি মিডিয়ার দোষ দিতে চাই। তারা কেন অল্প কিছু মানুষকে তুলে ধরছে? যদি মুসলমানদের বেশির ভাগই এ সব কাজ করতো। তখন ইসলামকে অপবাদ দিলে আমি নিজেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু তারা অর্থাৎ মিডিয়া অল্প কিছু মানুষকে বেছে নিচ্ছে। যদি আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল এই জন্য কি আমি খ্রিস্টানদের দায়ী করবো? হিটলার যে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে খুন করলো, সবাইকে সে পুড়িয়ে মারলো, এই জন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দোষ দিতে পারবো? কিন্তু কখনো নয়। কারণ বাইবেলের কোথাও লেখা নেই যে তোমরা ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করবে। এমন কিছু বলাটা খুবই ভুল।

তাই আমি মিডিয়াকেই বেশি দোষ দিতে চাই এ সব কুলাঙ্গারের চাইতে। প্রত্যেক ধর্ম গোত্রেই আপনারা কিছু কুলাঙ্গার খুঁজে পাবেন এবং আমি আমার অনেক আলোচনাতেই এ সব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে বলেছি। মিডিয়ার উচিত এমন সব খবর প্রচার করা যেগুলো সত্যি। মিডিয়া এ সব লোকদের দেখিয়ে বলতে চায় এরাই হচ্ছে আসল মুসলিম। কিন্তু তারা এভাবে বলতে পারে যে কিছু মুসলিম চুরি করে তাদের সংখ্যা মাত্র ১ জন, ৫ জন, ১০ জন এবং মুসলমানদের সংখ্যা ১ শত কোটিরও বেশি। এভাবে বলা হলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু তারা বলতে চায় যে সব মুসলিমই ভুল কাজ করছে। যদি কোন নামধারী মুসলমান মাদক নিয়ে ধরা পড়ে মিডিয়া এমন ভাব করে যেন সব মুসলিমই মাদক নিয়ে ব্যবসায় করছে। কিন্তু মিডিয়ার উচিত সত্য কথা প্রচার করা এবং আমিও তাই চাই। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭. ডা. জাকির নায়েক আপনাকে আমি আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পিস্ টিভির কার্যক্রম শুরু করার জন্য। আমি সবাইকে তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্মে 'খৎনা' দেয়া বাধ্যতামূলক কেন?

উত্তর : এক ভাই প্রশ্ন করলেন যে, খৎনা করা ইসলাম ধর্মে 'ফরয' অর্থাৎ আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক কিনা? ভাই প্রথমে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এটি ইসলামে 'ফরয' না, এটি হলো 'সুন্নাত'। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি করলে ভাল। এ বিধানটি হলো 'মুস্তাহাব'। ইসলামে খৎনা দেয়া হলো সুন্নাত, এটি 'ফরয' না। কিন্তু খৎনা দেয়ার অনেক কারণ আছে। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে এই খৎনার উপরে পুরা একটি লেকচার দিতে পারি। তবে যেহেতু এটি প্রশ্নোত্তর পর্ব, তাই আমি সংক্ষেপে বলছি। আজকের বিজ্ঞান আমাদের বলে যদি কোন লোক খৎনা করে তাহলে তার লিঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম। খৎনা করা থাকলে সম্ভাবনা খুবই কম। যদি খৎনা দেয়া না থাকে তাহলে সম্ভাবনা বেশি। বেশ কিছু রোগ আছে যেগুলো প্রতিরোধ করা যায় যদি খৎনা দেয়া থাকে।

খৎনা দেয়ার সময় লিঙ্গের উপরের স্ক্রিনটি কেটে ফেলে দেয়া হয়। যদি খৎনা দেয়া না থাকে, তাহলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর তার উপরের চামড়ায় কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব থেকে যায়, যা থেকে অনেক রোগ হতে পারে। এ থেকে যে সবরোগ হতে পারে। যেমন– চুলকানি হতে পারে, শরীরের ত্বকে প্রদাহ হতে পারে। হতে পারে পেপলোসাইটিস। খৎনা করা থাকলে এসব রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া প্রস্রাব করার পর আমরা পানি দিয়ে ধুয়ে নেই এবং এভাবেই বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করে থাকি। আজকে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, সে লোক অধিক যৌন তৃপ্তি পাবে যার খৎনা দেয়া থাকে।

তাছাড়াও খৎনা দেয়া থাকলে ত্বকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, যার খৎনা দেয়া থাকে তার 'এইডস' রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। যদি খৎনা করা না থাকে তাহলে এইডস ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে থাকে। এ রকম আরো অনেক রোগবালাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় যদি খৎনা দেয়া থাকে। এ জন্যই আপনারা দেখে থাকবেন যে, আমেরিকাতে এখনকার দিনে ৫০% এর বেশি শিশুকে তার বাবা-মায়েরা খৎনা দিয়ে থাকে। তারা তো মুসলিম না। এমনকি আমেরিকার খ্রিস্টানরাও অর্থাৎ ডাক্তার, বাবা-মাকে বলে থাকেন আপনারা কি আপনার ছেলের খৎনা দিতে চান কি না? এবং তাদের মধ্যে ৫০%-এর বেশি ছেলেদেরকে খৎনা দেয়া হয়। ইসলামে আছে বলেই সে জন্য তারা করে না। তার কারণ হলো তারা জানে যে, খৎনা করানো হলে তার ছেলেদেরই উপকার হবে।

প্রশ্ন : ৮. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইমরান মুহাম্মদ। আমি একজন আইটি ম্যানেজার। আমার প্রশ্নটি হলো ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার ষড়যন্ত্র নিয়ে, কিভাবে মুসলমানরা এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করে থাকবে? যেভাবে আমেরিকা পুরো পৃথিবীকে আপন করতে চায় এবং ইসলামকে ধাবিয়ে রাখতে চায় ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় যে এ সব ক্ষেত্রে যে সব মুসলিম তাদের ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তারা মিডিয়ার সেই সমস্ত মিথ্যা রটনাগুলো বেশি করে বিশ্বাস করে থাকে। কিভাবে মুসলমানদের এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কিভাবে একজন মুসলিম প্রতিবাদ করবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রচার করে থাকে এবং আমরাও বুঝতে পারি না যে আমাদের কি করতে হবে। তবে প্রথমে যা করতে হবে সেটি হলো– আগে আমাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বেশিরভাগ মুসলমানই তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। তাই আমরা এই সমস্ত সমস্যায় পড়ে থাকি। যদি নিজের ধর্মকে ভাল করে জানি, তবে মিডিয়া এই মিথ্যা রটনা করতে পারবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানি না। এ কারণেই আমরা লজ্জিত হই যখন মিডিয়া বিভিন্ন খবর প্রচার করে এবং তাদের কথাগুলো মেনে নেই।

আমি একটি উদাহরণ দেই। একবার এক ধার্মিক মুসলিম তিনি একদিন আমাকে বললেন ভাই জাকির আপনি কী জানেন এই তালেবানরা খুবই নিষ্ঠুর খারাপ মানুষ? আমি বললাম কেন? কারণ কি? কারণ তারা মহিলাদের মারে। আমি বললাম কে বলেছে? তিনি বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোথায় দেখেছেন? আমি বিবিসি-তে দেখেছি। তালেবানদের পক্ষে আমি এখানে বলছি না। তারা আমার বন্ধুও না এবং শত্রুও না। আমি তাদের পক্ষে বলছি না। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। একবার মালয়েশিয়াতে লেকচার দিচ্ছিলাম। এক দম্পত্তি তারা দু'জনেই ডাক্তার। একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অন্যজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। তারা আফগানিস্তানে ছিলেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে তারা আহত লোকদের চিকিৎসা করছিলেন। সেই মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন– "তালেবানরা এক মহিলাকে মারছে" ভিডিওটি যে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে তারা তালেবান না? আমি বললাম আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন আমি তালেবানদের সাথে ছিলাম, আমি জানি তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধে। যেমন আমরা আরব নই, তাই আমরা বুঝতে পারব না পাগড়ি বাঁধার কতগুলো নিয়ম আছে আরবদের মধ্যে। তবে তারা জানে যে আরব আমিরাতে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম

একরকম, সৌদি আরবে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম আরেক রকম এবং কুয়েতে অন্য রকম। তারা তা জানে কিন্তু আমরা তা জানি না। সেই মহিলাটি তালেবানদের সাথে ছিলেন। তাই তিনি জানেন তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধেন। কিন্তু ভিডিওতে দেখানো তালেবানরা সেভাবে পাগড়ি বাঁধে না। এখানে বলতে চাচ্ছি, ভিডিওতে যে তালেবানের দেখানো হয়, তারা প্রকৃত তালেবান নন। তারা নকল তালেবান।

ভিডিওতে দেখানো শ্যুটিংটি হলিউড কিংবা অন্য যেকোনখানেই হোক, তারা ঠিকমতো শ্যুটিং করতে পারে নি। এভাবে মিডিয়া সব কিছু বদলে দিতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে জর্জ বুশ ভাল না খারাপ মানুষ? আপনি বললেন ভাল মানুষ না। আমি এখানে না শব্দটি সম্পাদনা করে মুছে দেব। তারপর আপনারা শুনবেন সে ভাল মানুষ এবং যখন আপনাকে ভিডিওটি দেখানো হবে তখন আপনি বলবেন হয়তো মুখ দিয়ে ভাল শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। আপনি ভাল মানুষ বলেন নি। আপনি বলেছেন ভাল না কিন্তু আমি না শব্দটি কেটে দিয়েছি। তারপর আপনাকে দেখালাম যে দেখেন আপনি ভাল মানুষ বলেছেন। তখন আপনি বলবেন আমি মুখ ফসকে হয়তো বলে ফেলেছি আমি ভুল করে বলেছি।

কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি বলেছেন ভাল মানুষ না। কিন্তু আমি না কথাটি বাদ দিয়ে দিলাম এবং শুনে মনে হবে সে ভাল। এভাবে মিডিয়া বিভিন্নভাবে খেলা করে থাকে। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের যেটি করা উচিত তা হলো আমাদের নিজ ধর্মটিকে আরো অনেক ভাল করে জানতে হবে। আমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভাল করে জানতে হবে এবং মিডিয়া যখন এগুলো প্রচার করবে সেগুলো শুনে আমরা কখনোই প্রভাবিত হবো না। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান তাহলে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেখতে হবে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস। একজন মুসলিম এবং মুসলিম সমাজ কি করলো সেটি দেখলে চলবে না। ইসলামকে বিচার করতে চাইলে আমরা দেখাবো না যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা আফগানিস্তানের মুসলিমরা কি করে। আমাদের ইসলামকে বিচার করতে হবে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো দিয়ে। অর্থাৎ আল-কোরআন ও নবীজির হাদীসের আলোকে।

কোরআন এবং সহীহ হাদীস দেখতে হবে এবং আমরা এগুলো মেনে চলবো এবং মিডিয়ার এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জানতে হবে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। যেমন– সে সাংবাদিক ভাই দুটো প্রশ্ন করার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন করেছেন একটি। কারণ তিনি সেটা আশা করেন নি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম। তিনি আশা করেন নি যে আমি বলবো "আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত।" তিনি ভেবেছিলেন আমি দেশকে নিয়ে গর্বিত না। আমি কোন মিথ্যে কথা বলছি না যে আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত।

আমি ভারতকে নিয়ে গর্বিত এবং ভারত বর্ষ হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা হলাম মুজাহিদ, 'জিহাদ' আমরা সবাই চেষ্টা করছি এবং নাম আমার নায়েক। সংস্কৃতিতে 'নায়েক' মানে যোদ্ধা। একজন বীর। তাহলে নাম দিয়েও আমি একজন মুজাহিদ। এ যুদ্ধের ময়দানে আমাকে থাকতে হবে। আমার কাজ আমাকে করতে হবে এবং সেই জন্য আমি মুম্বাইতে থাকতে চাই। কিন্তু লোকজন আমাকে অন্য জায়গায় থাকতে বলে। অনেক লোক আমাকে আবার অন্য কোন দেশে থাকতে বলে। তারা বলে আপনার জীবনতো হুমকির মধ্যে আপনি কেন এই যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন? আমি দেশকে অনেক কারণেই ভালবাসি এবং এখানেই আমার যুদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক কারণে আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। তাই মিডিয়ার এ সমস্ত মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে আমাদের জানতে হবে টেবিলটিকে কিভাবে উল্টে দেয়া যায়।

প্রশ্ন : ৯. আসসালামু আলাইকুম। আমি যেহেতু মিডিয়ায় কাজ করছি। তাই প্রশ্নটা প্রায়ই আমার মাথায় আসে। আমি দুবাইয়ের একটা ট্রেড জার্নালের এডিটর। আমার প্রশ্নটা মূলত আল কায়েদা ও উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আমরা সবাই জানি যে উসামা বিন লাদেন যখন রাশিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তখন আফগানিস্তানের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন নায়েক। আর তার অনেক বছর পরে এই নায়কই একদিন হয়ে গেলেন রাক্ষস। এটা আমরা সবাই জানি। তো এখন আমার কথা হলো যে, সাংবাদিকতার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট মানুষের সামনে তুলে কোন উপসংহার টানা বা মন্তব্য করা উচিত না। আর পশ্চিমা মিডিয়া তারা বিভিন্ন নিয়ম বানাচ্ছে। আর নিজেরাই সে নিয়ম ভাঙ্গছে। এখনকার দিনে এটাই ঘটছে। আর আপনি এতক্ষণ যে লেকচার দিয়েছেন, সেখানেও একই কথা বলেছেন।

তারা ইচ্ছেমত নিয়ম বানাচ্ছে আর ভাঙ্গছে। আমরা মুসলিমরা কিভাবে পৃথিবীর মানুষকে এ ঘটনাগুলো জানাতে পারি। আপনাকে আমি উদাহরণ হিসেবে বলি। পৃথিবীতে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তারা বলছে এগুলোর জন্য দায়ী আল কায়েদা। আর এখন অনেক রাষ্ট্র থেকে বলা হচ্ছে যে অমুক অমুক ঘটনা ঘটছে দায়ী হল আল কায়েদা। আমরা শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা কিভাবে এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারি। আমি আবারও সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুনের কথা বলছি। একটা ঘটনা ঘটছে তার মন্তব্য করা হচ্ছে। এ দুটো আলাদা থাকা উচিত। অথচ তারা ঘটনা, মন্তব্য- এ দুটো একত্র করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। তারা আসলে পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, ইসলাম আসলে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। এ ব্যাপারে কোন হাদীস আছে, অথবা অন্য কিছু। যেটা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

উত্তর : আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আর আপনি সাংবাদিকতা পেশায় আছেন। আপনি বললেন যে, যখন উসামা বিন লাদেন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছিল, তিনি তখন হিরো। আর উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকাই তৈরি করেছে। পরে যখন সে আমেরিকার বিরুদ্ধে গেল, তখন তাকে বলা হলো সন্ত্রাসী। আর আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সাংবাদিকদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সাংবাদিকদের কোন মন্তব্য করা উচিত না। যেগুলো করে থাকেন সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা, সাংবাদিকরা নয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তবে নিয়ম বানানো হয়, ভাঙ্গার জন্যেই। আমেরিকায় নাকি কথা বলার স্বাধীনতা আছে। আমার মতে আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। ততক্ষণ বলতে পারবেন যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগবে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বললে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারবেন। তবে বিরুদ্ধে কিছু বললে সি. আই. আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

আমার মতে পুরো ব্যাপারটাই একটা নাটক। লোক দেখানো কথা বলার স্বাধীনতা। আপনার প্রশ্নে আসি। আমরা কিভাবে জবাব দিব। উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে আর কোন হাদীস আছে কিনা ইত্যাদি। এ প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক বছর আগে পার্থে। আমেরিকার কনসাল জেনারেল আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। আমার লেকচারের ট্রপিক ছিল টেররিজম এন্ড জিহাদ। তিনি আমাকে বললেন ভাই জাকির আপনি কি জানেন যে, উসামা বিন লাদেন একজন টেররিস্ট। এটা প্রথম প্রশ্ন। আমি তখন তাকে বললাম যে, উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যদি বলতে হয় প্রথমে আমি তাকে চিনি না। কখনও তাকে দেখিও নি। আমি তার বন্ধু না বা তার শত্রুও না। আমি আসলে জানি না। টিভি চ্যানেলের নিউজগুলো শুনে আমি এর উত্তর দিতে পারব না। বিবিসি, আর সিএনএন। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا
ۢبِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে না ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হতে হয়।

মিডিয়া বিবিসি, আর সিএনএনএ যে নিউজ দেখানো হয়, সে নিউজ দেখে আমি বলতে পারব না যে, আপনার কথা ঠিক। কারণ আমি যা জানি খবরগুলো বানানো। যদি না বুঝি যে খবরটা আসলেই সত্যি। আর ইউহানড্রেডলি যখন আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আল কায়দা সম্পর্কে

আপনার মতামত কি? তিনি বলেছিলেন আমার সন্দেহ হয় আসলে আল কায়দা আছে কি-না। তাহলে সিএনএন আর বিবিসিতে প্রচারিত নিউজগুলোর ওপর নির্ভর করে আমি এর উত্তর দিতে পারব না।

আল্লাহ্ জানেন আসল ঘটনা কি? তবে সিএনএন-কে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা। এখানে জানতে পারি যে, তারা হাজার হাজার আফগানিকে হত্যা করেছে। ইরাক আক্রমণ করেছে এ চ্যানেলগুলোই বলে। এই চ্যানেলগুলোর মালিক যারা তারাই যখন বলছে আর গর্ব করছে, তাহলে এখবরটা নিশ্চিত। তাহলে এখন বলেন কে এক নাম্বার টেররিস্ট। আমার মতে জর্জ বুশ। এই খবরটা পরের দিন হেড লাইনে আসল যে, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি একজন মৌলবাদী আর বুশ একজন টেররিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার নিউজ পেপারে হেড লাইন হয়েছিল। জানেন কিছু দিন আগে একট জরিপ করা হয়েছিল আমেরিকার শিকাগোতে একটা সার্ভে করা হয়েছিল। আর সেই জরিপে টেররিস্ট হিসেবে নাম দেয়া হয়েছিল তিনজনকে ১. উসামা বিন লাদেন ২. সাদ্দাম হোসেন ৩. জর্জ বুশ।

এ জরিপ শিকাগোর বিভিন্ন শহরের লোকজনের ওপর করা হয়েছিল। আপনাদের কি মনে হয় মুসলিম অমুসলিম সবাই। অমুসলিমরা ও আপনারা কাকে এক নম্বর টেররিস্ট মনে করেন? উত্তরগুলো সব একই, সবাই বলেছে যে জর্জ বুশ সবচেয়ে কম ছিল ৭৫%। ৭৪% লোক বলেছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। সবচেয়ে বেশি ৭৮% লোক বলেছে তাদের মধ্যে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। আমি না। তবে লোকজন আসলে এসব কথা বলতে চায় না। মানুষ এসব কথা বলতে ভয় পায়। একটা হাদীস আছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যদি কোন অন্যায় হতে দেখ, হাত দিয়ে সেটা থামাও। যদি হাত দিয়ে সেটা থামাতে না পার তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি মুখ দিয়েও থামাতে না পার তবে তুমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর তখন তুমি হবে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মুমিন।

তাই আমি স্পষ্ট করে বলি, আমি সত্য কথা বলি। আল্লাহ্ কিছু মানুষকে হাত দিয়ে থামানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা না থামালে আল্লাহ্ তাদের প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ্ অন্তত কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। তাই আমি কথা বলে যাচ্ছি। এ কথাটা আমি ইংল্যান্ডেও বলেছি। সেখানকার পুলিশ চাপের সামনে। সেখানকার মেয়রের সামনে। এমনকি আমেরিকায় বলেছি, অস্ট্রেলিয়ায় বলেছি, মালয়শিয়ায় বলেছি। তবে আমি বলেছি হিকমার সাথে। আল্লাহ্ আমাকে কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। যদি আমি না বলি তাহলে আল্লাহ্ আমার এ ক্ষমতা কেড়ে নিবেন। আর মুসলিমরা একথা বলেছে জাকির নায়েকের কথা বাদ দাও। আমেরিকার বেশির ভাগ অমুসলিমরাই ইউনির্ভাসিটি অব শিকাগোর একটা জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকাতেই তারা বলছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট।

আপনারা যদি ইন্টারনেটে যান এমন কথাও দেখবেন। আমি বলছি না সেটা ঠিক না ভুল। তারা বলছে যে ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই দুর্ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল। আর কয়েক জন তো বলেছে যে বুশ নিজেই এ কাজটা করিয়েছে। এবার আমি বলি মুসলিমরা কিভাবে জবাব দিবে। লন্ডনে সেই ৭ জুলাই বোমা বিস্ফোরণের পর কি হয়েছিল। আমেরিকার প্রায় বেশির ভাগ মুসলিম এক জায়গায় একত্রিত হয়ে নিন্দা করলেন। ইংল্যান্ডেও তাই। ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা। আমি তাদের নাম বলছি না। আমি তাদের অনেককেই চিনি। তারা নিন্দা করলেন যা ঘটেছে ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এটা হারাম, এটা ভুল। আমরা এটার নিন্দা করছি ৭ জুলাই যা ঘটেছে লন্ডনে। এতে ৫০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে। ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে। আমরা তার নিন্দা করছি, ফুলস্টপ। তারা যা বলেছে ঠিক কথাই বলেছে। আমি তাতে একমত। পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।

তাই আমিও এ কাজের নিন্দা করি। যদি ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। সেটাকে নিন্দা করাই উচিত। লন্ডনে ৫০ জনেরও বেশি লোক মারা যাওয়াটাও নিন্দনীয়। তবে এখানেই থেমে যাওয়া যাবে না। এটাকেও নিন্দা করব যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার লোক মারা গেছে এটাও নিন্দনীয়। ইরাকে যে হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা গেছে, এটাও নিন্দনীয়। বসনিয়ায় যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এটারও নিন্দা করব আমরা। ফিলিস্তিনে যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, এটাকেও নিন্দা করতে হবে। আমরা ভয় পাব কেন? তবে আমেরিকানদের প্রশ্ন করলে তারা বলে না, আসলে আমেরিকা দেশটা একটু আলাদা যদি বেশি কথা বলি তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব। আমি বললাম কেন? আমেরিকা তো সেই দেশ যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি ইন্ডিয়ায় লেকচার দিয়েছি যারা মুম্বাই সম্পর্কে জানেন, মুম্বাইর পরিবেশ পরিস্থিতি বেশি ভাল নয়।

আমেরিকা আর ইংল্যান্ডে তাও কিছু কথা বলার স্বাধীনতা আছে। লোকজন আমাকে বলে ভাই জাকির। কেউ আপনাকে হুমকি দেয় না? আমি বললাম এটা

আমার পেশার নিত্যসঙ্গী। নবীজি ﷺ -কে হুমকি দেয়া হত না? আমরা তো নবীজির পথ অনুসরণ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করবেন। তবে যখন কথা বলব তখন হিকমার সাথে বলব। তাহলে যখন কথা বলব তখন বলব নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয়। আমরা মানি ১১ সেপ্টেম্বর যে তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা গেল, সেটা অন্যায়। আমরা মানি লন্ডনে যা ঘটেছে তা অন্যায়। তবে অন্যসব অন্যায়গুলোরও প্রতিবাদ করতে হবে। যখন একজন লোক শরীরে বোমা বাঁধে, সেটার বিস্ফোরণ ঘটায়, সাথে বিশ ত্রিশজন নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে তখন বলা হয় টেররিস্ট। তবে যখন কেউ প্লেইন থেকে নিচে বোমা মারে, আর এভাবে হাজারো আফগানিকে মেরে ফেলে, তখন তাকে বলা হয় সাহসী আমেরিকান।

এতে সাহসের কি আছে? একে বলা হয় চুরি করে যুদ্ধ। উপর থেকে বোমা ফেলছে আর এটাতে কাজ হচ্ছে পঞ্চাশটি বোমার সমান। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম হলো সত্যের ধর্ম, আর আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিব। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : বল, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১০. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নোমান। আমি ইন্টারনেট ট্রাভেল আর মার্কেটিং এর ওপর কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হলো এখনকার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াকে নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন সিনেমা। আর এ সিনেমাগুলো বানাচ্ছে হলিউড, বলিউড, ললিউড, আর এখন সম্ভবত ডলিউড অর্থাৎ দুবাইতে।

আর এ সিনেমার মাধ্যমে তাদের কথাগুলো পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। Pation of crise এরকম একটি সিনেমা। যেখানে যিশুখ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে। সিনেমার ডায়লগগুলো হিব্রুতে। এখন আমার প্রশ্নটা হলো খ্রিস্টান ধর্মে যা প্রচার করে তার সাথে এর এটুকু মিল আছে। আর কোরআনের সাথে এর কতখানি মিল আছে। অবশ্যই কখনও পুরোপুরি মিলবে না। তবে লোকজন পৃথিবীজুড়ে এই সিনেমাটা দেখছে আর এটা তাদের মনে গেঁথে গেছে। এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো মুসলমানরা কিভাবে এই সিনেমা মিডিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। যাতে করে মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন ধরেন, একটা সিনেমা

বানিয়েছিল। he Messages এটা দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। যাযাকাল্লাহু।

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সিনেমার মাধ্যমেও আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। ধর্ম প্রচার করতে পারি। হলিউড, বলিউড, আর এখন ডলিউড। এটা নতুন শব্দ এর মানে দুবাই মিডিয়া সিটি। আর আপনি Pation of crise এর কথা বললেন। এইসব সিনেমা সম্পর্কে আমার মতামত কি? ভাই আমি Pation of crise দেখি না। যদিও আমার দেখার ইচ্ছে আছে। সাধারণত আমি সিনেমা দেখি না। তবে এর উপরে রিপোর্ট পড়েছি। এই সিনেমাটা বানিয়ে ছিল মেল গিবসন। সেই সিনেমাটা অরিজিনাল ল্যাংগুয়েজে বানিয়েছে। এটা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। এটা যেভাবে বানিয়েছে, আর সিনেমাটা কিছুটা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ছিল। এসব ব্যাপারে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। তবে এই সিনেমাটা নেগেটিভ সেন্সে জনপ্রিয়ও হয়েছে। যেহেতু নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে এটা বক্স অফিসে হিট করেছিল।

সিনেমাটা অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছিল। মেল গিবসন অনেক টাকার ঝুঁকি নিয়ে ছিল। সিনেমাটায় অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছিল। সেটা ফ্লপ হলে তখন তার অনেক টাকা লোকসান হত। সিনেমাটা হিট করেছিল আর সিনেমাতে অনেক সঠিক জিনিস ছিল। অনেক কিছু ভাল। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে আবার অনেক কিছু মিলেও না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো The Messages সিনেমা নিয়ে। আমি এটা দেখেছি। এটা বানিয়ে ছিল মস্তুফা আকতার ইনথুনি কুইন, অভিনয় করেছিল হামযা হিসেবে। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। সিনেমাটা তখন বানানো হয়েছিল অনেক সুন্দরভাবে। আর বলব যে ইসলামিক লাইনে সিনেমার মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সিনেমা। আলহামদুলিল্লাহ। সিনেমার হিরোকে না দেখিয়ে, নবীজি মুহাম্মদ ﷺ -কে না দেখিয়ে, তার কোন ছবি না দেখিয়ে, তার কণ্ঠস্বর না শুনিয়ে, আলহামদু লিল্লাহ সিনেমার সব ঘটনা মুহাম্মদ ﷺ-কে ঘিরেই হচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখানো হচ্ছে না। আর তার কণ্ঠস্বর শুনানো হচ্ছে না।

একবার শুধু তার উট আর লাঠি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে ক্যামেরা যে এঙ্গেলে ধরা হয়েছে যে যখন নবীজি ﷺ ঘুরে অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন তখন ক্যামেরার এঙ্গেলটাও সেদিকে যাচ্ছে। ডিরেকশন অসাধারণ, এটা একটা মাস্টার পিস। আর এরকম ভাল সিনেমা আমাদের আরো প্রয়োজন। এই সব সিনেমার বাজেট অনেক। কয়েক মিলিয়ন ডলার লাগে, লক্ষ লক্ষ ডলার। এই বাজেটের ব্যাপারটা আছে। কিন্তু সিনেমাটার ব্যবসা সফল হয়েছিল। মস্তুফা আকতার তারপরে আরেকটা বানিয়ে ছিলেন। নাম ছিল 'ওমর মুকতার'। এটা ঠিক ইসলামের কথা বলছে না। একজন মুসলিমের কথা বলছে। আর এই সিনেমাটাও

বক্স অফিসে হিট করেছিল। এ রকম সিনেমা আরো দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শরিয়াহ মেনে হয়। কোরআন আর সুন্নাহ মেনে হয়। যেমন আমি মনে করি যে The Messages সবকিছুই ঠিক। সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল। কিছু ভুল জিনিসও দেখানো হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল। সামগ্রিকভাবে এটা ভাল।

আমাদেরকে ইসলামি শরিয়াহ মেনে এরকম সিনেমা বানাতে হবে। কোরআন আর হাদীসের বিরুদ্ধে যাব না। শরিয়াহ মেনেই বানাব। শুধু সিনেমাই নয়; আমাদের নাটক বানাতে হবে, সিরিয়াল বানাতে হবে, ডকুমেন্টারিও বানাতে হবে, আর মিডিয়া জিনিসটা আসলে একটা সাদা হাতি, সাদা হাতি, সাদা হাতি। আপনারা হয়তো 'কৌন বানেগা ক্রোড় পতি'র নাম শুনেছেন। আসল অনুষ্ঠানটা হুবহু ওয়ান স্টফিয়া মিলিয়ন প্রতি অনুষ্ঠানে এক মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মাত্র একটি টিস ওয়াটে চার কোটিরও বেশি রূপি খরচ করে। মাত্র একটা পিস ওয়াটে। ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট। মুম্বাইতে লেবার কস্ট অনেক কম, তবে অমিতাভ বচ্চন এক্সপেনসিভ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে বাজেটে বাধা আছে। যাদের এসব খরচ বহনের সামর্থ্য আছে তারা যদি স্পন্সর করেন তাহলে এমন ফিল্ম বানিয়ে আমরা ইসলামকে প্রচার করতে পারি। এটা আমি বিশ্বাস করি

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। (সূরা আলে ইমরান ৫৪নং আয়াত)

হলিউডে একটা সিনেমা বানানো হয়েছে The Rindom of Haven. সিনেমা বানিয়েছেন খুবই বিখ্যাত একজন ডিরেক্টর। আর তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রুসেডেররা আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল। আর তারপর সালাউদ্দীন হিরো। তিনি আসলেন, তাকে হিরো দেখানো হয়েছে, এ ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ায় খুবই হৈচৈ হয়েছিল যে, এমন সিনেমা কিভাবে বানাল। সে একজন খ্রিস্টান। সে তার সিনেমায় আসল সত্যি কথা তুলে ধরেছে। তবে এ ব্যাপারটা পশ্চিমারা হজম করতে পারে নি। খুবই হৈচৈ হয়েছিল। তবে যেহেতু সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন খুবই বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ এতে করে খুব বেশি একটা ক্ষতি হয় নি। তাহলে একজন অমুসলিম এমন সিনেমা বানিয়েছেন। আমি যদিও সিনেমাটা দেখি নি, তবে নিউজ রিপোর্ট পড়েছি। সিনেমাটা খুব সুন্দর। এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক সত্যি বলা হয়েছে। এমন সিনেমাকে উৎসাহিত করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১১. আসসালামু আলাইকুম। এই প্রশ্নটা আমার বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব ফিল্ম মিডিয়াকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলবেন? বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোকে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে।

উত্তর : প্রশ্ন করলেন আমার ছোট এক ভাই তার বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে। যে, মুসলিম মিডিয়াকে ফিল্ম কিভাবে সাহায্য করতে পারে। মুসলিম বিশ্ব আজ অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই মুসলিম বিশ্ব ইসলামিক কৃষ্টি কালচার অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের আলোকে ফিল্ম তৈরি করে মিডিয়াকে সাহায্য করতে পারে। আমি আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলব, বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোতে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে। দেখবেন সময়ের সাথে সাথে আমাদের পরিস্থিতিও বদলে যায়। মাত্র কয়েক দশক আগেও আরবরা ইন্ডিয়ায় আসত ব্যবসা করার জন্য।

ইন্ডিয়া তখন সমৃদ্ধ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সবার উপরে। আর মাশাআল্লাহ ইন্ডিয়ানদের অনেকেই তখন যাকাত দিত। তাতে আরবদের অনেক উপকার হয়েছিল। এখন অনেক দামি সম্পদ খনিজ তৈল আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। এখন তারা অনেক ধনী। তাই দেখা যায় ইন্ডিয়ানরাই আরব বিশ্বে চাকরি করতে আসে, ব্যবসা করতে আসে। সৌদি আরবে আসে। আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে পারি যে মুসলিমদের কথাটা যদি বলতেই হয় সে কথাটা আমি আগেও বলেছি যে, সব মুসলিমেরই দায়িত্ব ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে অনেক বেশি সম্পদ দিয়েছেন। তাই কিয়ামতের দিন আপনাদেরকেই বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাদের সম্পদ দিয়েছিলাম তা দিয়ে তোমরা কি করেছ? আমিও বলব, আল্লাহ আপনাদেরকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আপনারা এখন খনিজ সম্পদের মালিক। তাই ইসলাম ধর্ম প্রচারে এই সম্পদ ব্যবহার করুন। শুধু ইন্ডিয়াই নয়। অন্যখানেও এ সম্পদ ব্যবহার করুন, ইন্ডিয়ায় অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা নাই এ কথা বলব না। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরাই নিজেদের ব্যাপারগুলো দেখব। কিন্তু অন্যদের প্রয়োজন আছে।

ইন্ডিয়ায় যেমন অনেক এতিম শিশু আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়ও তেমনি এতিম শিশু আছে। মানুষ তাদের সাহায্য করছে। আলহামদুলিল্লাহ, কোন সমস্যা নেই। তবে সামগ্রিকভাবে, আরবদের উদ্দেশ্যে আমি একথা বলব। যেহেতু আল্লাহ তাদের তেল ও স্বর্ণ দিয়েছেন। তাদের উচিত হবে সত্যের ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক আরবদের চিনি। তাদের পকেটে যে টাকা থাকে, সে টাকা দিয়ে পাঁচ-দশটা চ্যানেল খুলতে পারে। পকেট মানি দিয়েই। পাঁচ থেকে দশটা চ্যানেল। আল্লাহ তাদের দিয়েছেন এই অগাধ সম্পদ। তাই আমি তাদের অনুরোধ করব। তারা যেন সম্পদের সৎ ব্যবহার করেন। ভাল

কাজের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্যে। যাতে করে আখিরাতে তারা উপকৃত হয়। এ উপকার সৃষ্টিকর্তার কোন লাভ লোকসান হবে না। এটা আমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন- اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তাহলে ইনশাআল্লাহ রোজ কিয়ামতের দিন এই সওয়াব তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ১২. আসসালামু আলাইকুম। আমি নেওয়াজ রহমান। আমি কাজ করি আল কাদা ট্রেডিং-এ। আল কায়েদা নয়, আল কাদা ট্রেডিং। স্যালসমেন। মিউজিক হারাম। এটা সব মুসলিমই জানে। আমার প্রশ্নটা হলো আপনারা পিস টিভি চালু করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মিডিয়ায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞাপন। এখন এ বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার করা হয়, বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার হালাল নাকি হারাম?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সব মুসলিমই জানে যে মিউজিক হলো হারাম। তবে যেহেতু চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি। সেখানে বিজ্ঞাপন থাকবেই। এখন এ বিজ্ঞাপনের মিউজিক হালাল নাকি হারাম। দেখেন যেটা হারাম সেটা হারামই। যেটা সৌদি আরবে হারাম সেটা আরব আমিরাতেও হারাম। আমেরিকাতেও হারাম। আবার ইন্ডিয়াতেও হারাম। তবে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয়। আর এলকোহলই আপনাকে বাঁচাতে পারে। তবে ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে এটা পান করতে পাররেন, ওষুধ হিসেবে। এটাই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। যদি জীবন বিপন্ন হয়। কোন বিজ্ঞাপন না থাকলেও ইনশাআল্লাহ আমাদের চ্যানেল বিপদে পড়বে না।

এজন্যই আমি বলছিলাম একটি চ্যানেল চালানো কঠিন। ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালানো আরো কঠিন। সে জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আমরা যেন শরিয়াহ মেনে চালাতে পারি। যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালাতে না পারি, তাহলে চ্যানেল বন্ধ করে দিব ইনশাআল্লাহ। কারণ ইসলামিক শরিয়াহ মেনে চলাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেল চালু রাখাটা নয়। আপস করা যাবে না। আমরা হারাম উপায়ে সত্যকে প্রচার করতে পারব না। যেটা হারাম, সেটা হারামই। আমরা এসব কিছুকে হালাল কিছু দিয়ে বদলে দিতে পারি। যেটা হারাম সেটা বাদ দিয়ে হালাল জিনিস আনব। যেমন ধরেন, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম। জাফের অনুমতি আছে। প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন– পানি পড়ার শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, কোরআন তেলাওয়াত।

যদি আয়ারাতের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন, অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনারা শুনবেন, আপনাদের মনে হবে না যে কোন মিউজিক নেই। যদিও আমরা মিউজিক ব্যবহার

করি না। তবে এ প্রাকৃতিক শব্দগুলো সেই সব অনুষ্ঠানে যেভাবে শুনবেন। আলহামদুলিল্লাহ এই শব্দগুলো একই রকম না। কিন্তু শুনতে মিউজিকের মত। তবে প্রভাব ভাল, এটা আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এটা আপনাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসবে। তাহলে প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করা যায়। এমন কোন বিজ্ঞাপন দেখাব না যেটা হারাম। কোন হারাম বিজ্ঞাপন দেখাব না। যেমন কোন এলকোহল নিয়ে বিজ্ঞাপন; অথবা সুদ নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানি বা ব্যাংক বা যে সব বিজ্ঞাপনে মহিলাদের শরীর দেখানো হয়ে থাকে। যদি আমাদের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিতে চান হালাল বিজ্ঞাপন। তাহলে স্বাগতম জানাই। তা না হলে বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের আল্লাহরই সাহায্য প্রয়োজন। আর সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৩. ভাই আমি আরেকটা প্রশ্ন করব। কুরআনে সূরা আলাকে বলা হয়েছে– আল্লাহ মানুষকে একটা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমি এই কয়েক দিন আগে পবিত্র কোরআনের এই সূরাটির উর্দু অনুবাদ শুনেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল যে রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। আমরা এটা জানি। মানে এখন এটা সবাই জানে, আমরা মানুষ জাতি জন্মাই কোন রক্তপিণ্ড থেকে না, শুক্রাণু থেকে। আর আমি এরকম একটা অনুবাদও পড়েছি। অন্য আরেকটা আয়াতে আছে পরে আমি এই বিন্দুকে (শুক্রাণু) পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। তারপর এই রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। আমার মনে হয় না যে, এ সময় এটা রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়। আপনি একজন ডাক্তার। আপনি বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আমি শিউর।

উত্তর : জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো। আমি খুব বেশি জানি না। তবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আল হামদুলিল্লাহ। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র। আর সামান্য একজন ডাক্তার এমবিবিএস। তবে এই বিষয়ে জানি। একই যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। আমি একবার তার সাথে বিতর্ক করেছিলাম। তিনি একজন ডাক্তার। আর কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে তিনি পিএইচডি করেছিলেন। তার বইতে লিখেছিলেন যে কোরআনে ৩০টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। আট বছরে কোন মুসলিম উত্তর দেয় নি। আমেরিকান ছাত্ররা আমাকে একটা বিতর্কের জন্যে ডাকল। তারপর আমি আমেরিকার শিকাগোতে গেলাম, কয়েক বছর আগে। বিতর্কের বিষয় ছিল কোরআন এবং বাইবেল বিজ্ঞানের আলোকে। আর তার একটা যুক্তিও ছিল একই যেটা আপনি বললেন। কোরআনের যে আয়াতটা প্রথমে নাযিল হয়েছিল। সূরা আলাক বা সূরা ইকরা ১ ও ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে অর্থাৎ জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে।

তার মতে কোরআনের এই কথাগুলো হচ্ছে নকল করা। গ্রিকরা এভাবে ভাবত যে মানুষ তৈরি হয় রক্ত থেকে। এটা একটা পুরানো Theory যেটা ভুল বলে প্রমাণিত। আর মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে আমিও এটা জানি, মানুষ কোন রক্তপিণ্ড থেকে জন্ম নেয় না। তাহলে ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মতে আমাদের নবীজি ﷺ অমুক অমুক জায়গা থেকে এগুলো নকল করেছেন। বড় একটা লিস্ট রিসার্চ। আর তিনি বললেন যে, আমাদের নবীজি ﷺ (নাউজুবিল্লাহ) তিনি নকল করেছেন সিরিয়ানদের গ্রিকদের কেন? এগুলো তিনি নাকি রিসার্চ করে জেনে ছিলেন পিইচডি করতে গিয়ে। তিনি পিইচডি ড. আচার মেডিকেল ড. এরপর তিনি আরো বললেন আপনারা যেসব অনুবাদ পড়েন, বলা হয়েছে রক্ত, রক্ত, রক্ত। তবে ইদানীং কিছু মুসলিম অনুবাদ করেছে আলাক, আলাক, আলাক। অর্থাৎ জোঁকের মত কিছু একটা। তিনি এটা জানতেন, আমি জানতাম না। তবে তখন তিনি বলেছিলেন। আমাদের সেই অর্থটা নিতে হবে কোরআন নাযিলের সময়ে তখনকার লোকেরা যে অর্থটা বুঝত। এখনকার সময়ের কোন অর্থ আমরা নিতে পারি না।

কোরআন নাযিলের সময় কোন লোক / মানুষই এটাকে জোঁক বলে মনে করে নি। একথা ঠিক। এজন্য আপনারা আগেরকার যে তাফসিরগুলো পড়বেন সবাই বলেছে রক্ত। একথা কেউ বলছে না যে আলাক জোঁকের মত কিছু আর আমিও একমত। আলাক শব্দটার তিনটা অর্থ আছে– জমাট বাঁধা, রক্তপিণ্ড, ঝুলে থাকে। আর জোঁকের মত কোন জিনিস। প্রফেসর কিতমুরকে কোরআনের এই আয়াতটা দেখান হয়েছিল। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে তিনি বললেন আমি জানিনা, এটা জোঁকের মত দেখায় কি না। তিনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর জোঁকের একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন। আর দুটির মধ্যে মিল দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন।

আজকের মেডিকেল সাইন্স বলছে যে ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মত। কিন্তু তার যুক্তি ছিল সে সময় যে অর্থটা করা হত সেটা নিতে হবে, আজকেরটা না। আর তিনি উদাহরণ দিলেন যে কোরআন বলছে আর বাইবেলও বলছে যে শূকরের মাংস খেয়ো না। কিন্তু এখন আমেরিকায় একজন পুলিশ অফিসারকেও বুঝায়। তাহলে কি বলবেন কোরআন বলছে কোন পুলিশ খেয়ো না। আর লোকজন সবাই হাসতে লাগল। উনি কথা বলছিলেন তাই কিছু বলি নি। আমাকে নিয়ম মানতে হবে। তারপরও আমি যখন লেকচার দিতে গেলাম তখন বললাম ড. উইলিয়াম

ক্যাম্পবেল যা বললেন, সেই কথাগুলো শুধু পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ইনজীল নাযিল হয়েছিল সেই সময়ের একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য। তাই বাইবেলের জন্য সেই সময়ের অর্থটাই নিতে হবে। তবে পবিত্র কোরআন শুধু মুসলিমদের, আরবদের বা সেই সময়ের জন্য নাযিল হয় নি। কোরআন নাযিল হয়েছে মানুষ জাতির জন্য। চিরস্থায়ী ধর্ম। তাই এখানে সব অর্থই নিতে হবে।

নাযিল হওয়ার সময় থেকে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত সব অর্থকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, একটা সঠিক হতে পারে আবার সবই সঠিক হতে পারে। আর ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল মরোকেবায় Practise করেছিলেন। আর তিনি আরবিতে কথাও বলতে পারতেন। তাহলে ড. মেডিকেল ড. M.D আর আমি সামান্য MBBS তিনি আমার চেয়ে উপরে M.D কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে পিইচডি করেছেন। আরবিতে কথা বলতে পারেন আর আমি পারি না। আমরা বিতর্ক করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আপনি যদি বাইবেলের কথা বলেন ঠিক আছে। বাইবেলের ক্ষেত্রে সে সময়ের অর্থটা নিতে হবে। কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে সব অর্থই নিতে হবে।

আর এখন যে অর্থটা করা হয় তার কোন আপত্তি নেই। কারণ প্রফেসর কিতমুর, যিনি এ ব্যাপারে বিখ্যাত ভ্রূণ বিদ্যার, বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ; তিনি বলেছেন, আর তার বইতেও তিনি লিখেছেন ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতই, তাই আপত্তি করা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে দ্বিতীয় অর্থটা ঝুলে থাকে। এটা ঝুলে থাকে সেটাও ঠিক। কারণ ভ্রূণ মায়ের পেটের ভেতরে ঝুলে থাকে। একেবারে Latest রিসার্চ-এ বলা হয়েছে যে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। তখন রক্ত পিণ্ডের মত দেখায়। তাহলে রক্তপিণ্ড বলাও সঠিক। এটা বিজ্ঞান সেদিন আবিষ্কার করল।

পবিত্র কোরআন আমাদের বলেছে যে, সৃষ্টি করেছেন রক্ত পিণ্ড থেকে। দেখতে সে, সে রকম একটা জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডের মত। কাজের দিক থেকে ভ্রূণ মায়ের পেটে ঝুলে থাকে। আর আকৃতিতে এটা দেখতে জোঁকের মত। তাহলে আলহামদু লিল্লাহ। তিনটা অর্থই সঠিক। এমনকি রক্তপিণ্ডও সঠিক। সেটা ঝুলে থাকলে এ অর্থটাও সঠিক। জোঁকের মত সেটাও ঠিক।

প্রশ্ন : ১৪. আসসালামু আলাইকুম। ভাই জাকির। আমার নাম হেমা। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। প্রথমে বলি আমি দুবাইতে আছি ১৮ বছর। এই প্রথম বারের মত কারো কাছে জিহাদের সত্যিকারের অর্থটা জানলাম, আর আমি বলব বেশির ভাগ মুসলিমই এটা জানে না। আই এম স্যরি। আমার প্রশ্নটা হলো পবিত্র কুরআনে জিহাদ সম্বন্ধে এমন কোন সীমারেখার কথা কি

বলা হয়েছে যে, এই পর্যন্ত যেতে পারবেন? যদি আপনি জিহাদ করতে চান।

উত্তর : বোন হেমা, মাশাআল্লাহ। আপনি মুসলিম হয়েছেন। শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আপনি বললেন যে, জিহাদের আসল অর্থটা জানতেন না। যেটা আজকে জানলেন। আলহামদুলিল্লাহ। আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, এমন কোন সীমারেখার কথা কি বলা আছে যে জিহাদ করলে এই পর্যন্ত যেতে পারবেন। বোন জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদ আন নফস। সর্বোচ্চ লেভেল। আর আপনি যেকোন সীমারেখা পর্যন্ত যেতে পারেন যতক্ষণ কোরআন অনুমতি দিচ্ছে। আপনি শরিয়াহ ভাঙ্গতে পারবেন না। আপনি যেকোন সীমা পর্যন্ত যেতে পারবেন। তবে সেটা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী হতে হবে। আপনি এখানে ইসলামি শরিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

আমরা আমাদের নবীজি ﷺ এর একটা হাদীসের দৃষ্টান্ত দেখি। পবিত্র কোরআনে কিছু সূরা নাযিল হয়েছিল। যখন নবীজি ﷺ মক্কায় ছিলেন। এগুলো হলো মক্কী সূরা, মদিনায় নাযিল হয়েছিল মাদানী সূরাগুলো। এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : মক্কী সূরায় বলা হয়েছে কিভাবে ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে। আর মাদানী সূরায় বলা হয়েছে কিভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইকামাতে দ্বীন অর্থাৎ জিহাদ। আমরা জানি যে মুসলিমরা মদিনায় এসে আগের চেয়ে তাদের অবস্থা শক্তিশালী হয়েছিল। তখন বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। তাই এসব সূরায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কিতালের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধ। তবে মক্কা থাকার সময় জিহাদ কেমন ছিল। যখন মক্কা শহরের অমুসলিমরা তারা বেশ কিছু মুসলিমকে নির্যাতিত করে মেরে ফেলছিল তখন অনেকেই লড়াই করতে চেয়েছিলেন। যেমন হামযা, উমর (রা) তার প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। তারা ছিলেন যোদ্ধা। নবীজি ﷺ বললেন ধৈর্য ধারণ কর। সবর বা ধৈর্য ধারণ করাই ছিল জিহাদ। যদি সামর্থ্য থাকে আর পাল্টা আক্রমণ করেন সেটা ভাল। আপনার আক্রমণ করার সামর্থ্য আছে তারপরও সবর করছেন, আক্রমণ করলেন না, এটা আসলে অনেক বড় জিহাদ।

হামযা (রা) তখন বললেন, আমার ভাইদেরকে কারা হত্যা করল? আমি হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। তাকে বলা হত মরুভূমির সিংহ। লোকজন তাকে ভয় পেত। কিন্তু নবীজি ﷺ বলছিলেন এটা করা যাবে না। তাহলে তার জিহাদ ছিল নিজেকে কন্ট্রোল করা, সবর করা। একেক সময় জিহাদ একেক রকমের হয়। জিহাদের অর্থ শুধু শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা নয়। সবর এক ধরনের জিহাদ। আর

আয়েশা (রা) নবীজির স্ত্রী। তিনি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন আমরাও কি জিহাদ করব? তিনি সেখানে যুদ্ধের কথা বলছিলেন। হাদীসটা সহীহ্ বুখারীতে আছে চতুর্থ খণ্ডের ২৭৮৪ নাম্বার হাদীস। নবীজি বলেছেন তোমার জন্য জিহাদ হলো একদম সঠিকভাবে হজ্জ পালন করা। আয়েশা (রা)-এর জন্য হজ্জই ছিল শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

এছাড়াও আরেকটি হাদীস আছে সহীহ্ বুখারীতে। এক লোক নবীজি ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আমরাও কি জিহাদে যাব? এখানে জিহাদ অর্থে কিতালের কথা বলা হচ্ছে যুদ্ধ। নবীজি বললেন, তোমার কি বাবা-মা আছে? সে বলল– হ্যাঁ। তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে তোমার বাবা-মা'র সেবা করা। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে জিহাদ একেক সময় একেক রকম হয়। এছাড়াও সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে নবীজি ﷺ বলেছেন কোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কথা বলাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। তার মানে এই নয় যে, সবার জন্যই বাবা-মাকে সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

নবীজি জানতেন যে, সে লোকের বাবা-মায়ের সেবা প্রয়োজন। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে একেক সময় জিহাদ একেক রকম হয়। এখানে আপনি কতদূর যেতে পারবেন। সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারেন। এরকম একটা জিহাদ বা কিতালের সময় নবীজি সাহাবীগণকে বললেন– তোমাদের সম্পদের যতখানি দিতে পার দান কর কিতালের জন্য। এটা একটা সহীহ্ হাদীস। উমর (রা) তিনি খুব ধনী ছিলেন। তার অনেক সম্পদ ছিল। তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন। নবীজি ﷺ এর হাতে তুলে দিলেন। আর বললেন যে মাশাআল্লাহ আমার সম্পদের অর্ধেক দান করেছি। তিনি ভেবে ছিলেন তিনিই সবার উপরে। তার অর্থ তিনি সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটা পাবেন। তিনিই সবার উপরে আছেন।

নবীজি ﷺ তখন বললেন, আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি তাঁর পুরো সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি উমর (রা)-এর চেয়ে বড় পুরস্কার পাবেন। পরিমাণের মাপকাঠিতে আবু বকর (রা) যা দান করলেন তার তুলনায় উমর (রা)-এর দান করা সম্পদ অনেক বেশি। কিন্তু আবু বকর (রা) তাঁর ১০০% সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি উমর (রা)-এর চেয়ে অনেক বেশি সওয়াব পাবেন। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। যেহেতু পুরো সম্পত্তি দান করেছেন। তিনি বড় পুরস্কারটি পাবেন। অর্থাৎ নিজের ভোগের জন্য সম্পত্তির কোন অংশ রাখেননি। তাই আল্লাহ শরিয়াহ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন সেই সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন। যদি জিহাদ করতে চান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৫. আমার নাম রেজাউল আলী খান। আমার প্রশ্নটা হল, আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে, এই জিনিসটাকে ইসলামের আলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : যদি আত্মঘাতী বোমা হামলার কথা বলা হয় তবে আত্মঘাতী সম্পর্কে এখানে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই শেখ নাসির উদ্দীন আলবানী, শেখ বিন বাজ, শেখ হুদায়মী তিন জনই খুব বড় বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ্ তাদের শান্তিতে রাখুন। তারা এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে আত্মঘাতী বোমা হামলা করা হারাম। তবে আরো বিশেষজ্ঞ আছেন যেমন শেখ জাফর আলী হাওয়ালী, শেখ সালমান আওদা তাদের মতামত আলাদা। তবে আমাদের আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করা হারাম এ ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এটি স্পষ্ট। তবে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত নয়। তাদের মতে আত্মঘাতী শব্দটা এখানে সঠিক নয়। এটা সঠিক শব্দ নয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন তার জীবন সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তার জীবনটা শেষ করে দিতে চায়। আর এখানে তাদের মতে এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। এখানে উদ্দেশ্য হলো- শত্রু পক্ষের ক্ষতি সাধন করা। আর এটা করতে গিয়ে এই সম্ভাবনাই বেশি যে তারা মারা যাবে। সে জন্য এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ সালমান আওদা বলেন- এটা সঠিক। তবে এর মানে এই নয় যে, একজন মুসলিম ইচ্ছে করলেই শরীরে বোমা বেঁধে হামলা করতে পারবে না।

এসব ক্ষেত্রে সালমান আওদা, জাফর হাওয়ালী বলেন- এটা হারাম। আমি আগেই বলেছি যে, আত্মঘাতীর এই কালসার ইসলাম ধর্মে ছিল না। এটা ইসলামে আগে ছিল না। তবে কিছু মুসলিম আছে ফিলিস্তিনে অথবা ইরাকে তারা এমন করেছে। তবে তাদের মতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবেই এমনটা করেছে তারা। এসব জায়গায় অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে অন্য প্রভাবে। তখন তারা চেয়েছিল যে, আমরা একাই মরব না; সঙ্গে আরো কিছু লোক নিয়ে মরব। আর উদ্দেশ্য হলো শত্রু পক্ষের ক্ষতি করা। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নিরূপায় হয়ে শেষ অস্ত্র হিসেবে এটা করা যেতে পারে।

আমিও আমার লেকচারে বলেছিলাম যে ইরাকে আমেরিকার সৈন্যরা আসার আগে আত্মঘাতী হামলা ছিল না। রবার্ট পেপের কথা অনুযায়ী। তিনি আত্মঘাতীর উপরে বিশেষজ্ঞ, তার মতে বেশির ভাগ আত্মঘাতীর হামলার কারণটা হলো সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশ থেকে আগ্রাসী সামরিক সরকার সরানোর জন্য। তাহলে এ কথাটা বলেছেন, রবার্ট পেপে তার লেখা বই

ডাইরিং টু ইউইনে। তবে আত্মঘাতী হামলাকে যেসব বিশেষজ্ঞ অনুমতি দিয়েছে তারাও একথা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সব নির্দেশনা দিবেন। সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন কেউ যিনি ইসলামি শরিয়াহ ভালভাবে জানেন। নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে পারবেন না। ইসলামে এটা হারাম। আর সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল।

সব কিছু বিবেচনা করে বললে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এটার অনুমতি আছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৬. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুহাম্মদ ফিদা। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা একজন অমুসলিমকে নিয়ে। আসলে সে একজন নাস্তিক। সে কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না। সে আমাকে একটা প্রশ্ন করেছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিব?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, একজন অমুসলিম নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছেন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে এভাবে বলা যায় যে আমার বন্ধু তার নাম জন, তার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জন আমাকে বলল যে, আমার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আর একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। ঐ বাচ্চাটা ছেলে নাকি মেয়ে বলতে পারেন? আমি আসলে জানি না। হ্যাঁ আপনি জানেন না। ছেলে না মেয়ে। একজন পুরুষ কি কখনও বাচ্চা জন্ম দিতে পারে? জ্যাক একজন পুরুষ সে জনের ভাই। সে হাতপাতালে ভর্তি হয়েছে। একটা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। ছেলে না মেয়ে। প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। একজন পুরুষ বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। একইভাবে আল্লাহর কথা যদি বলি– আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেন নি। তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এ প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যদি আমি বলি অমুক আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে সে তাহলে আল্লাহ নয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে উল্লেখ আছে–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : তার সমতুল্য কেউই নেই।

তাই আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা হলো তাকে কেউ সৃষ্টি করেন নি।

তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এ প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যখনই আল্লাহকে সৃষ্টি করার কথা বলছি সে তখন আল্লাহ হবে না। আল্লাহ তায়ালাকে কেউ সৃষ্টি করেন নি। তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি কোন কিছুর ওপর নির্ভর করেন না। এখন একজন নাস্তিককে কিভাবে আপনি বুঝাবেন। আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন 'Is the Quran Gods Word' এ প্রশ্নের উত্তরটা জানবেন। এছাড়াও জানতে পারবেন কিভাবে একজন নাস্তিককে বুঝাতে হবে। এই ভিডিওটা দেখে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন নাস্তিককে কিভাবে বোঝাবেন।

প্রশ্ন : ১৭. এবারের প্রশ্ন স্লিপ থেকে। এখনকার মিডিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি কোন ভূমিকা পালন করছে?

উত্তর : এক ভাই প্রশ্ন করেছেন– এখনকার মিডিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা পালন করছে কি-না। এটা গোপনীয় কিছু না। মিডিয়া আমাদের বলছে যে, আনুমানিক ১৩ জুন আরবদেশীয় লোক তারা একটা প্লেন নিয়ে World trad center cross করেছিল। এটা কিভাবে জানল? তারা সেখানে একটি পাসপোর্ট পেয়েছিল। চিন্তা করেন দুই হাজার ডিগ্রির তাপমাত্রা, কৌতুক করে বলা হয়েছিল যে, এখন থেকে আমেরিকার সৈন্যদের ইউনিফরম বানানো হবে সেই পাসপোর্ট দিয়ে। সব পুড়ে গেল শুধু পাসপোর্টটাই রয়ে গেল। খবরে বলা হল এই মুসলিম আরবরা। তারা সেই প্লেনে উঠার আগের দিন। তাদের দোকানে গিয়ে নাকি মদ খেয়েছিল। চিন্তা করেন, তারা পরের দিনই মারা যাবে। তারা সবাই সে কথা জানে। আর তারা মদের দোকানে গেল মুসলিম হওয়ার পরও। তারা এসব ইনফরমেশন কোথা থেকে পায়? এটা পরিষ্কারভাবে অপবাদ দেয়া।

এটা কে করেছে? উসামা বিন লাদেন করেছে? চিন্তা করেন, C.I.A তারা বছরে কয়েক শ কোটি ডলার খরচ করে পেন্টাগনের ওপর একটা পাখিও নজরদারি ছাড়া উড়ে না। আর একটা প্লেন এসে সোজা পেন্টাগন ক্রস করল। এরপর অনেক Theoryও বলা হয়েছে, এগুলোকে Theory বলছি। কারণ এগুলো প্রমাণিত নয়। তাহলে কিভাবে হয়েছে? বিশেষজ্ঞরা পরে পেন্টাগনে পরীক্ষা করে বলেছেন এই বিস্ফোরণ কোন এ্যারোপ্লেনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এসব খবরের উদ্দেশ্য ছিল,

মুসলমানদের নামে অপবাদ দেয়া। মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এসব প্রচার করেছে। আর এছাড়াও কয়েকটা Theory এমন বলেছে যে, এই কাজটা ভেতরের কেউ করেছে। যেভাবে World trad centerটা ভেঙ্গে পড়েছে। সেটা প্লেনের আঘাতে হতে পারে না। ভেতর থেকে কেউ করেছে। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে যাই ঘটুক। তারা ইসলামকে যতই আক্রমণ করুন–

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহই কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। (সূরা আলে ইমরান : ৫৪ আয়াত)

এত কিছু সত্ত্বেও মিডিয়া ইসলামকে আক্রমণ করেছে। তারপরও পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রসার এখনও বেশি। এমনকি আমেরিকা, ইউরোপেও আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : ১৮. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ডা. খান। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো– ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিলারা কি মিডিয়ার সামনে আসতে পারেন? অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞই মহিলাদের Audio Record করার অনুমতি দেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য পুরুষ তার কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবেন। এটার কি অনুমতি আছে? আর তাহলে কিভাবে সেটা বুঝাব? ধন্যবাদ।

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মুসলিম নারীরা মিডিয়ার সামনে আসতে পারবেন কি-না? সত্য প্রচারের জন্য বা ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করতে। আর কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা হারাম। এখানে কিছু ব্যাপার অবশ্যই হালাল। আপনি Article লিখতে পারবেন, সেটাকে কোন বিশেষজ্ঞই হারাম বলতে পারবে না। হয়ত খবরের কাগজে অথবা ইন্টারনেটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশ নিতে পারেন। আর Audio Meadia এর কথা যদি বলি, এটা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। কেউ বলবেন পারবেন, কেউ বলেন পারবেন না। সাধারণত কণ্ঠস্বর নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের তেমন কিছু বলেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর সাধারণ থাকতে হবে। Audio Meadia এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনার কণ্ঠস্বর যেন বেশি উঠানামা না করে। সে সময় বেশি হাসাহাসিও করবেন না। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এমন ক্ষেত্রে অনুমতি দেন। এবার টিভির সামনে আসা নিয়ে বলি।

এখানেও বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে যে, বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন, মহিলারা যদি হিজাব পরিধান করে। যদি শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখে, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি

পর্যন্ত হাত খোলা রাখে এবং কণ্ঠস্বরে যদি উত্তেজক কিছু না থাকে, আর যদি শরিয়ার অন্য নিয়মগুলোও মানে, তাকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন না, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। কারণ পবিত্র কোরআনে সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে –

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ

অর্থ : মুমিনদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।

এই আয়াতটা এবং বেশ কিছু হাদীস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে এই গত বছরে একজন বিখ্যাত সালাত বিশেষজ্ঞ যেমন নাসির আল আওয়াদ। আমি সৌদি আরবে এটা শুনেছিলাম, তিনি এটার অনুমতি দিয়েছেন যে, মহিলারা যদি ঠিকমত পোশাক পরে, যদি তার মুখে নেকাপ নাও থাকে। কারণ নেকাপ দেয়াটা ফরয নয়। যদিও অনেকে বলেন ফরজ। তবে শেখ নেসার আলবানীর মতে আরো কয়েকজনের মতে নেকাপ যেটা দিয়ে মুখ ঢাকে এটা ইসলামে ফরজ না। তবে এখন অনেক বিশেষজ্ঞ বেশির ভাগই না তারা অল্প কয়েকজন, সংখ্যায় হয়তো বেশি কিন্তু প্রাকটিসে অনেক কম।

সৌদি আরবের নাসির আল আওয়াদ বলেন যে, মিডিয়ার গুরুত্বের কারণে আমরা মহিলাদের টিভিতে আসার অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু এমনকি আজকেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। এখনও বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে মহিলারা টিভি-র সামনে আসতে পারবেন না। কারণ সেটা কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করবে। মহিলাদের যদি টিভিতে দেখানো হয় সেখানে অন্য পুরুষেরা তাদের দেখতে পাবে। এজন্য মহিলাদের অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। তবে আপনি আপনার পছন্দমত একটা বেছে নিতে পারেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৯. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রহমতুল্লাহ। আমার প্রশ্নটা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে, এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে আমার কি করা উচিত?

উত্তর : ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করতে গেলে আপনাকে যেটা প্রথমে করতে হবে। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আপনাকে ভালভাবে জানতে হবে। আর উত্তর দেয়ার সময় হীনমন্যতায় ভোগবেন না। একথা আমি আগেও বলেছি। উত্তর দিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করুন। খেয়াল রাখবেন যেন ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কার থাকে। আর আপনি সেটা ঠিকভাবে পালন

করবেন। যদি আপনি সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করবেন। সেজন্য প্রথমে আপনি সঠিকভাবে পালন করবেন। কোরআন এবং হাদীস মেনে নেন। আর আপনার অমুসলিম বন্ধুরা যদি প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের উত্তর না জানলে কোরআন বলছে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন; ইন্টারনেটে দেখুন এবং সঠিক উত্তর বের করুন। অথবা বিশেষজ্ঞ কারো কাছে জিজ্ঞেস করুন। তারপর উত্তর দিন। হীনমন্যতায় ভোগবেন না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিন। আপনার উত্তরটা দিন হিকমার সাথে, বিজ্ঞানের আলোকে, কোরআন এবং হাদীস মেনে উত্তরগুলো দিন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শোয়েব খান। আমি একজন ছাত্র। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে, শুধু মুসলিমরাই নয়, এখানে সবাই আপনাকে নিয়ে গর্বিত। এখন স্যার আমার প্রশ্নটা হলো কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান News চ্যানেলে একটা সংবাদ দেখিয়েছেন যে, এক মহিলাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছেন। সে একজন মুসলিম। তখন হুজুররা তাকে ফতোয়া দিল মহিলা এখন তার শ্বশুরকে বিয়ে করবে। তার স্বামী এখন তার জন্য হারাম। এ ব্যাপার নিয়ে এখন কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ ভাই, এ ব্যাপারটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মিডিয়ার কাছে। আর আপনারা হয়তো জানেন যে কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়াতে ইমরানা নামে একজন গৃহবধূকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। তখন বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান উলামাই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, যেহেতু মেয়েটাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সেহেতু সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। আর মিডিয়া যখনই দেখল যে এ খবরটা দিয়ে ইসলামের নিন্দা করা যায় তখনই সেটা তারা লোফে নেয়। তারপর খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যেন ইসলাম ধর্মে এই ইস্যুটা ছাড়া আর কোন ইস্যু নেই। আর ইন্ডিয়ান প্রেস তারা কি করেছে বেশির ভাগ চ্যানেলে এ খবরটা দেখানো হয়েছে। যে ইসলাম ধর্মের উলামা-মাশায়েখ তারা বলে একটা মেয়েকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সে একজন ভিক্টিম। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কি বলেছে, ইসলাম তাকে সাহায্য না করে উল্টো আরো তার নামে বলছে যে, মেয়েটা তার স্বামীর কাছে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম।

মিডিয়া তারপর এই খবরটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি আজকেও ছড়াচ্ছে। তবে আমি সব সময় বলি, যদি আপনি মিডিয়ার সামনে কথা বলতে না জানেন আপনাকে ট্রেনিং দিতে হবে। আর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই অন্য কয়েকজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বলেন না, না, মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম নয়।

সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা ভুল বলেছে। তারপর তারা এ ব্যাপারটা নিয়ে অমুসলিমদের সামনে তর্কযুদ্ধ শুরু করল। আমরা এভাবে আমাদের দুর্বলতাগুলো অন্যদের সামনে তুলে ধরছি। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের দুটো দলই তাদের ফতোয়া দেয়ার জন্য পবিত্র কোরআনের একই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা সূরা নিসার একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। সূরা নিসার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ۔

অর্থ : নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।

এখন আরবি ভাষায় নিকাহ্ শব্দটার দুটো অর্থ আছে। একটা হল বিয়ে আরেকটা হল সহবাস। আর আরবি ভাষা সম্পর্কে যারা ভাল জানেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন যে নিকাহ্ শব্দটার দু'টো অর্থ আছে একটা বিয়ে আর অন্যটা সহবাস। আর বিশেষজ্ঞদের প্রথম দলটা তারাই সংখ্যায় বেশি। তারা হলেন দারুল উলুমের বিশেষ লোক। তারা নিকাহ শব্দটার অর্থ করেছেন সহবাস। নিকাহ শব্দটার অর্থটা যদি ধরেন সহবাস তাহলে কোরআনের এ আয়াত বলেছে তোমরা সহবাস করতে পারবে না, তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং তোমরা সহবাস করতে পারবে না সে মহিলার সাথে, যে সহবাস করেছে তোমাদের বাবার সাথে। এটার ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন ছেলেটার বাবা এই মেয়ের সাথে সহবাস করেছে। এখন এই মেয়ে তার ছেলের সাথে সহবাস করতে পারবে না। সে জন্য মেয়েটার স্বামী তার জন্য হারাম।

অন্য আরেক দল বলল : না, এটার অর্থ বিয়ে। এ নিয়ে তারা তর্ক করতে লাগল। আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে হিকমার সাথে। এক নাম্বার পয়েন্ট ইমরানা নামের এই মেয়েটার সাথে যা হয়েছিল। সেটা সহবাস ছিল না। সেটা ছিল জিনা-বিল জবর অর্থাৎ ধর্ষণ। ধর্ষণ আর সহবাস দুটো আসলে এক কথা নয়। আর ধর্ষণকে আরবিতে নিকাহ্ বলা হয় না। এক নাম্বার পয়েন্ট আপনি শব্দ নিয়ে খেলা করছেন। এটা সহবাস এতে সমস্যা নেই। দেখেন আমি আগেই বলেছি যদি কেউ ভুল কোন কিছু বলে বিতর্ক করার একটা টেকনিক আছে। যদি কেউ বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি তর্ক না করে বলব এই নিন এখানে দুই লক্ষ দিরহাম। আরো দুই লক্ষ দিরহাম। এবার আমাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম দেন। সে তখন বলবে না, না। টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিন। আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন আমি বলছিলাম।

আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে নিকাহ্ অর্থ সহবাস। তাহলে কোরআনের এ আয়াতটা বলছে যে তোমরা সহবাস করবে না তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং সেই মহিলার সাথে যে তোমার বাবার সাথে সহবাস করেছেন। তার মানে কি কোরআন অনুমতি দিচ্ছে প্রতিবেশী মহিলার সাথে সহবাস করতে। অথবা অন্য কোন মহিলার সাথে। তারা বলে না, না। আমি বললাম কেন? যদি বলেন যে নিকাহ্ অর্থ সহবাস। তাহলে কোরআন বলছে তোমরা সহবাস করবে না তোমাদের বোনদের সাথে। ফুফুর সাথে, খালার সাথে, আর যে মহিলার সাথে তোমার বাবা সহবাস করেছে। কিন্তু সহবাস করতে পারবে প্রতিবেশী মহিলার সাথে, অন্য যেকোন মহিলার সাথে তারা বলল না। তাহলে সঠিক অর্থটা হচ্ছে নিকাহ্ মানে বিয়ে অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করবে না তোমাদের বোনকে, ফুফুকে, খালাকে এবং বিয়ে করবে না সেই মহিলাকে যাকে বিয়ে করেছে তোমার বাবা। তবে আপনি বিয়ে করতে পারেন প্রতিবেশী মহিলাকে অথবা অন্য যেকোন মহিলাকে।

তাই আপনারা লড়াই না করে হিকমা দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিন। আর কোন বিশেষজ্ঞই বলবে না যে, আপনারা যিনা করতে পারেন। প্রতিবেশী মহিলার সাথে অথবা অন্য যেকোন মহিলার সাথে। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেরাই তর্ক করছি। একে অন্যের সাথে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে সবার সামনে হাস্যকর বানিয়ে ফেলছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২১. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সামিউল্লাহ্। আমি একটা ইলেকটিক্যাল স্যালস এক্সিকিউটিভ। আমার প্রশ্নটা হল– মিডিয়াকে সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কিছুটা প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রে সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে আরবরা বসবাস করে। আমি সেখানে একথা শুনেছি। এখানে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই মুসলিমদের জন্য দেখানো হয়। এখন এইসব দেশের শাসকরা কিভাবে মুসলিম মিডিয়ার অবস্থানকে উন্নত করতে পারে?

উত্তর : আমি আমার লেকচারে বলেছি কিছু মুসলিম চ্যানেল আছে। একেবারেই নেই বলি নি। তবে তাদের অনুষ্ঠান শুধু মুসলিমদের জন্যই। ইরানে তো উর্দু চ্যানেল আছে, শুধু মুসলিমদের জন্য, পাকিস্তানেও মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান হয়। আরবি ভাষাতেও দেখতে পারবেন আরবি চ্যানেল আছে। অনেক ভাল, খারাপ অনেক। তবে তাদের অনুষ্ঠানগুলো শুধু আরবদের জন্য। এটা ঠিক আছে আরবি ভাষায় যদি ভাল অনুষ্ঠান হয় সেটা ঠিক আছে। আমি বলছি না সেটা ভুল। যদি

চ্যানেলগুলো ভাল হয়, যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চলে। যেমন মাযাব চ্যানেল ইত্যাদি। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আমার কথা হল এমন একটা চ্যানেল শুরু করতে হবে যেখানে ভাষাটা হতে হবে আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা যাতে বদলে দিতে পারি। পুরো পৃথিবীর মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারি। শুধু আরবদের সাথে ইসলামের ভাল কথাগুলো বলছেন, এটা অবশ্য ভাল কাজ। আমাদের এমন একটা চ্যানেল দরকার যেটার ভাষা হবে আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এখানে বলব যে ঠিক আছে। আপনারা আরবের বিভিন্ন দেশ শাসন করছেন। তবে কেন আপনারা ইংরেজিতে ইসলামিক চ্যানেল চালু করছেন না? যেটা ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই। যেটা যাবে আমেরিকাতে, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়াতে মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়ার সব জায়গায়। এতে করে মানুষের মনোভাব বদলাতে পারব। একই সাথে ইসলাম ধর্মকে প্রচার করতে পারব। যেটা ইসলাম অনুযায়ী ফরয।

প্রশ্ন : ২২. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম কায়সার রহমান। আমার প্রশ্নটা হলো—একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা পৃথিবীর মুসলিমরা আমরা এখনও রুটি-রুজির জন্যই যুদ্ধ করে যাচ্ছি। তবে এ কথা কি বলবেন, আমাদের কেন বিবিসি বা সিএনএন-এর মত কোন টিভি চ্যানেল নেই?

উত্তর : আমি এখানে লেকচার দিলাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আর আপনি এখন প্রশ্ন করলেন কেন? যেন আমি আপনাকে রোমিও জুলিয়েটের পুরো গল্পটা বললাম। আর আপনি প্রশ্ন করলেন রোমিও কি ছেলে না মেয়ে। ভাই আমি এতক্ষণ কথাই বললাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের দোষেই। এটার উপরই এতক্ষণ লেকচার দিলাম। সম্ভবত আমার লেকচার শুরুর আগে প্রশ্নটা লেখা হয়েছিল। এজন্যই আমি বলি সরাসরি প্রশ্ন করুন। অনেকের মাথায় একটা প্রশ্ন থাকে সেটা লিখে ফেলে। তারপর আমি যে কথাই বলি সেটা জমা দিয়ে দেয়া পুরো ক্যাসেটটা এ বিষয় নিয়ে। যদি আবার শুনতে চান তাহলে ক্যাসেটটা নিয়ে যতবার খুশি শুনতে থাকুন।

প্রশ্ন : ২৩. আসসালামু আলাইকুম ডা.। আমার নাম জিসান জাফর আহমেদ। আমার প্রশ্নটা হল টিভিতে কার্টুন দেখা যাবে কিনা?

উত্তর : ভাই তুমি আসলে সত্যিই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছ। আমাদের এ কার্টুন দেখার অনুমতি আছে কি-না। বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল জরিপ আমাকে বলেছে শিশুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে যে জিনিসটা সেটা স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমেরিকাতে একটা শিশু প্রতিদিন প্রায় গড়ে সাত ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে। স্কুলে এর চাইতে কম সময় থাকে। বেশির ভাগ চ্যানেলই তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমনকি কার্টুন চ্যানেলগুলো। বেশির ভাগ

চ্যানেলই। আপনারা চ্যানেলগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স দেখবেন। আর একজন যদি প্রতিদিন ভায়োলেন্ট অনুষ্ঠানগুলো দেখে হোক সে কার্টুন ভিত্তিক সিমেনা। তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া হলে সে বাবার পিস্তল নিয়ে বন্ধুকে গুলি করে মারে। মুম্বাইতে একটা সিরিয়াল দেখানো হতো বাচ্চাদের জন্য।

অনেকটা কার্টুনের মতই ছিল। নাম ছিল শক্তিমান। অনেকটা ঠিক সুপারম্যানের মতই। একটা বাচ্চা বাসা থেকে লাফ দিল উঁচু দালান থেকে। ভাবল যে শক্তিমান বা সুপারম্যান তাকে বাঁচাবে। কেউ তাকে বাঁচাল না। সে মারা গেল। যখন বাচ্চার বাবার সাথে কথা বলা হল তখন তিনি বললেন আমি ভাবতেই পারি না আমার বাচ্চা লাফ দিবে। হয়তোবা আগামীকাল আপনার বা আমার বাচ্চা লাফ দিবে। তাহলে এই মিডিয়ার প্রভাব এখন এতটাই বেশি যে এটা মানুষকে অন্ধ বানায়। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতি হয় বাচ্চাদের। সে জন্য আমি মুম্বাইতে একটা স্কুল চালু করেছি; যার নাম ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই স্কুলে ভর্তি হবার একটা শর্ত হলো আপনার বাড়িতে ক্যাবল টিভি থাকতে পারবে না। স্যাটেলাইট টিভি থাকবে না। এটা শয়তান, এটা শয়তান। লোকে আমাকে বলে তাহলে আমরা পিস টিভি কিভাবে চালাব। এক নাম্বার কথা হলো পিস টিভি দেখার জন্য যদি আপনার ঘরে কয়েকশ শয়তানকে জায়গা দিতে হয়; কিছুই দেখা লাগবে না। সেটাই ভাল। বড় কোন ক্ষতির চেয়ে ছোট ক্ষতি ভাল। কিন্তু যদি আপনার বড় কোন ডিস থাকে আর ডিসে আপনি শুধু পিস টিভি দেখতে চান। অন্য কোন চ্যানেল না। আমরা চেষ্টা করব। যাতে মধ্যপ্রাচ্যও আপনারা দেখতে পারেন। একটা ডিসক দিয়ে, খরচ হবে মাত্র কয়েকশ রুপি বা কয়েকশ দিরহাম। মাসে মাসে দিতে হবে না। অন্য চ্যানেলগুলোতে যেভাবে দেন। হয়তো মাসে মাসে দুই বা আড়াইশ রুপি, খরচ করুন। আর বিল্ডিং এর সব বাসাতেই যেন দেখে। একটা ডিকোভার নেন সেটা দিয়ে শুধু পিস টিভি দেখবেন। অন্য কোন চ্যানেল দেখবেন না। বর্তমানে যা আছে সেটাকে বাদ দিবেন না। যে এটা হালাল এটা হারাম। একটা সাবস্টিটিডট থাকতে হবে।

আমরা বলি যে আমাদের স্কুলের অভিভাবকগণ ক্যাবল টিভি দেখেন না। তবে আমাদের কাছে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর পাঁচ হাজার ভিডিও ক্যাসেট আছে। যদি প্রতিদিন একটা করে দেখেন প্রায় তিন ঘণ্টা করে সব দেখে শেষ করতে আপনার প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার ছেলে বা মেয়ে স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবে। যদি প্রতিদিন একটা করে দেখেন আমাদের লাইব্রেরিতে আরো নতুন ভিডিও ক্যাসেট আসবে। তের বছরে আরো পাঁচ হাজার নতুন ভিডিও থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ইসলামি ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের জন্য কার্টুনও রয়েছে। তবে এগুলো ইসলামিক লাইনের। সেজন্য ভাই তোমাকে বলছি, তোমরা এমন কাটুন দেখবে যেগুলো

ইসলামের বিষয়ের ওপর তৈরি করা, যেখানে কোরআনের কথা আছে। নবীজির হাদীসের কথা আছে। এমন অনেক কার্টুন আমাদের কাছে আছে। এই কার্টুনগুলো আমাদেরকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে আসবে। ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এছাড়া যে কার্টুন আছে টমএন্ডজেরী, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান এগুলোর মধ্যে কোন নীতি কথাই নেই।

এগুলো আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স থাকে। এজন্য ইসলামিক কার্টুন দেখবেন। যেমন মুসলিম স্কাউট, এরকম আরো অনেক কার্টুন। যেমন ফতে সুলতান, যেগুলোতে একটা নৈতিক গল্প আছে। আর এগুলো আপনাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবে। ভাই যদি তুমি কার্টুন দেখতে চাও তাহলে ইসলামিক কার্টুন দেখবে। যেটা তোমাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসবে। তবে এমন কার্টুন দেখবে না, যেটা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : ২৪. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে আসাদ। আমার প্রশ্নটা হলো- আমাদের নবী করীম ﷺ-এর সময়ে কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর প্রচার করত। যেগুলোতে পরে ইসলামের উপকারই হয়েছে। আপনার মনে হয় না এমনকি এবারও একই ঘটনা ঘটবে?

উত্তর : ভাই আপনি বললেন যে, আমাদের নবী করীম ﷺ এর সময়ে অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিল। তাতে ইসলামের উপকারই হয়েছে। এটা সত্যি।

আর আমরাও সব সময় সেটাই চাই। আমার মনে আছে, একবার আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম টেররিজম এবং জিহাদের ওপর একটা লেকচার দিয়েছিলাম। আর স্বাভাবিকভাবে উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রশ্নও ছিল। সেখানে উত্তরে আমি বলছিলাম যে, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ। একজন তরুণ যুবক, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর বলল জর্জ বুশের মৃত্যু হোক। সবাই হাত তালি দিল। এখন একজন দায়ী হিসেবে সেখানে আমি অমুসলিমদের বোঝাতে গিয়েছি হিকমার সাথে। আর বিশ্বাস করুন আমার সব চেষ্টা বিফলে চলে গেল। আমি একজন দায়ী সবাই হাত তালি দিল। আর আমি যখন উঠলাম তখন বললাম আমাদের নবীজি ﷺ-এর সময়ে দু'জন উমর ছিলেন। তারা দুজনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর নবীজি ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, অন্ততপক্ষে একজন ওমরকে হেদায়াত কর। আর উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তিনি মুসলিম

হলেন। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব জর্জ বুশকে তুমি হেদায়েত দান কর। আমরা কেন জর্জ বুশের মৃত্যু কামনা করব?

যদি সে ইসলামের ঘোর শত্রুও হয়; আর আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। তাহলে সে ইসলামের পক্ষ নিয়েই লড়াই করবে। তাই আমরা দোয়া করব, আল্লাহ তায়ালার কাছে জর্জ বুশকে হেদায়েত কর, তুমি নির্দেশনা দাও। আর যখন একথাটা বললাম, কোন মিডিয়াই বলতে পারল না, আমি যা বলেছি সেটা ভুল। তাই হিকমার সাথে উত্তর দিব। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করব তিনি যেন এ লোকগুলোকে হেদায়েত দান করেন। আমিন। এভাবে ইসলাম ধর্ম সব সময়ই সবার উপরেই থাকবে।

প্রশ্ন : ২৫. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম খালেক হোসেন। আর আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। আমার প্রশ্নটা হল– ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? কারণ নবীজি ﷺ -এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। একথা আপনি বললেন, তাই আপনি কি কোরআনের কোন সূরার উদ্ধৃতি দিবেন অথবা কোন হাদীস?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে নবীজি ﷺ -এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। তাহলে ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? আর কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি আছে কি-না। ভাই একটা কথা বলি, ইবাদতের কথা যদি বলতে হয় সেটা বলা হয়েছে, যেটা ফরয সেটা হল ইসলামি শরিয়াহ। অন্যান্য ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো হারাম। বাদ বাকিগুলো হালাল। যেমন ধরুন, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম, মদ খাওয়া হারাম। এমন কথা না বলা হলে হালাল। ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করি কোরআন বা হাদীসে এমন কোন কথা বলা আছে যে আম খাওয়া হালাল? তাহলে কি আপনি বলবেন যে আম খাওয়া হারাম। তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ফরয। এটা শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে। আর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো বাদে বাকিগুলো হালাল। তা না হলে হয়ত আপনি বলবেন ভাই জাকির আপনি আম খাচ্ছেন কেন? আমি আম পছন্দ করি। কারণ আমি ভারত থেকে এসেছি।

আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত। আর আমার দেশের আম সেটা নিয়েও গর্বিত। এখন আপনি আমাকে পবিত্র কোরআন বা হাদীসের উদ্ধৃতি দেখান যে মিডিয়া হারাম। কিন্তু না। আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি। নবী করীম ﷺ কি করেছিলেন? তিনি চিঠি লিখেছিলেন অমুসলিম রাজাদের উদ্দেশ্যে। যেমন

আবিসিনিয়ার রাজাকে এবং ইয়ামেনের রাজাকে ও পারস্যের রাজাকে। নবীজি ﷺ সেই চিঠিগুলোতে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত উল্লেখ করেছিলেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম।

নবীজি ﷺ চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন। তারপর ঘোড়ায় করে দূত মারফত পাঠিয়েছিলেন। আজকের দিনের মার্সিডিজ গাড়ি অথবা আর কি বলতে পারেন জেট প্লেন। বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেটাই ছিল সেই সময়ের মিডিয়া। চিন্তা করেন চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন তারপর ঘোড়ায় করে সেগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন। নবীজি ﷺ তার সময়ের মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন যদি আজকের দিনে নবীজি ﷺ বেঁচে থাকতেন। আমার ধারণা তিনিও আজকের এই মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করতেন, তবে সেটা ইসলামের শরিয়াহ মেনেই হত। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করতে হত না। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। হালাল উপায়ে হবে। যেমন একটা ছুরি ব্যবহার হয় ভাল কাজে আবার খারাপ কাজেও। ছুরি ব্যবহার করা হারাম না।

তাই মিডিয়া আসলে হারাম না। যদি বেশির ভাগ লোক ভাবে যে মিডিয়া হারাম। আমরা এখন এই মিডিয়াকে হালাল কাজে ব্যবহার করব। টেবিলটাকে উল্টে দিব। ইসলামিক শরিয়ার নিয়মগুলো মেনে হালাল উপায়ে ব্যবহার করব। তখন হয়তো আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার কাছে বলতে পারব। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইসলাম প্রচার করার জন্য। কারণ আমাদের কাজ হল ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ বলেছেন (ফাজাক্কির ওয়া মুজাক্কির) আমাদের কাজ ইসলাম প্রচার করা। আর মানুষকে হেদায়েত করা, সেটা আল্লাহ তায়ালার হাতে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২৬. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোঃ তানভীর খান। আমার প্রশ্নটা হল– হিন্দু অথবা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল ইত্যাদি পড়া উচিত?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, হিন্দু বা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল পড়া উচিত? এটা আসলে ইসলামে ঠিক ফরয না। এটা হল মুস্তাহাব। আপনি পড়তে পারেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমিও এ আয়াতটার কথা বলেছি আগের প্রশ্নের উত্তরে।

সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .

অর্থ : তুমি বল হে আহলে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।

এখন আমরা এক কথায় কিভাবে আসব। যদি আমরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো না পড়ি এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। তবে ফরয না। আমি বলব এটা মুস্তাহাব। এই কৌশলের কথা বলছেন আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের নবীজি ﷺ। আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন মাত্র একটা আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। এটা সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস।

এরপর আরো বলা হয়েছে আহলে কিতাবী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও কোন সমস্যা নেই। তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়া হল একটা কৌশল। যেটা দেখিয়েছেন আমাদের নবীজি ﷺ। আর পবিত্র কোরআনেও আছে, যদি এমনটা করতে পারেন তাহলে ভাল। খুবই ভাল। তবে এখানে আপনাকে বাইবেলের হাফেজ হতে হবে না। বেদের হাফেজ হতে হবে না। আপনাকে জানতে হবে দাওয়াহর জন্য কোন অনুচ্ছেদগুলো লাগবে। এত সময় দেয়া লাগবে না। যেটা কুরআনের পিছনে দেন। সময় নষ্ট করবেন না। এমনকি আমিও বাইবেলের হাফেজ নই। কোরআনেরও হাফেজ নই। কোরআনের হাফেজ হতে চাই। তবে এখনই নয়। বেদের হাফেজ নই বা ভগবত গীতারও হাফেজ নই। তবে আমি বেদের সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগে। বাইবেলেরও সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো মিশনারীরা বলে। ভাবতে পারেন আমি মিশনারীদের চাইতেও বেশি জানি। ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি। আমি আসলে এই কৌশলটা শিখেছি শেখ আহমদিনেজাদের কাছ থেকে মাশাআল্লাহ। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করুন। তিনি হাজারও মুসলিম তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমনকি আমাকেও। তাই আপনি সময় নষ্ট করবেন না। তবে আপনি সেই অনুচ্ছেদগুলো পড়বেন যেগুলো দাওয়ার কাজে

লাগবে। আর তাদের কাছে বলবেন ইসলাম ধর্মের বাণী কোরআন যে বলেছে আমাদের সাদৃশ্যের কথা تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এভাবে আপনি কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আপনি সহজে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শাকিল আহমেদ। আমার প্রশ্নটা হল– দয়া করে বলবেন আপনাদের টিভি চ্যানেলে কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা উচিত।

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কত টাকা দিবেন। পিস টিভি চালাতে গেলে কত টাকা ইনভেস্ট করবেন। তখন সময়ের অভাবে গড চ্যানেল সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারি নি। লেকচারে যখন আমি গড চ্যানেল সম্পর্কে বলছিলাম তখন আমি সংক্ষেপে বলছিলাম এই গড চ্যানেল হল খ্রিস্টান চ্যানেলগুলোর সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল। এরা প্রচার করে আপনি যদি এক পাউন্ড দেন প্রতি বছর সেটা দিয়ে তারা পাঁচটি ভাষায় গড চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। তার মানে আপনি যদি বিশ পাউন্ড দেন। তাহলে কথাটি দাঁড়ায় প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে আপনি যদি দেন দুইশ পাউন্ড তাহলে প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে। যদি আপনি এক হাজার ডলার দেন তাহলে তারা পাঁচ হাজার ভাষায় প্রচার করবে। এভাবে তারা প্রচার করে। আর গড চ্যানেল ভালভাবেই চলছে।

এখন পিস টিভির কথা যদি বলতে হয় মুসলিমরা এক সাথে এমন অনেক কাজ করে যেখানে তারা টাকা ইনভেস্ট করে, তারপর সেখানে তারা লাভ করে এবং লাভের টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। তবে পিস টিভির কথা যদি বলি এই চ্যানেলটা কোন কমার্শিয়াল না। আপনারা কিছু দিবেন সেটার প্রতিদান পাবেন আখেরাতে। ইনশাআল্লাহ কয়েক গুণ বেশি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে বলেছেন –

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

অর্থ : যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

তার মানে শত গুণ বেশি লাভ। ব্যবসার ভাষায় বললে ৭০,০০০% লাভে। আল্লাহ তায়ালা এখানে আরো বলেছেন তিনি বেশিও দিতে পারেন। তাহলে আপনারা যারা

সাহায্য করবেন, ইনশাআল্লাহ আখেরাতে আরো বেশি পাবেন। আপনারা যাই দেন সবাইকে স্বাগতম জানাই। আল্লাহ্ এটা দেখবেন না যে আপনি কত দিয়েছেন। তিনি দেখবেন আপনি কত পারসেন্ট দিয়েছেন। একজন ধনী লোক যদি আমাকে অনেক টাকা দেয় এবং এক লক্ষ ডলার বা এক মিলিয়ন ডলার। এই ধনী লোকের কাছে হয়তো তার এই টাকাটা তার সম্পদের এক পারসেন্টেরও কম। কোন গরিব লোক দশ ডলার দিল। যেটা তার সম্পদের অর্ধেক। তাহলে সে বেশি সাওয়াব পাবে। আমাদের চ্যানেলটা চলবে আসলে আল্লাহর সাহায্যে। আমি যদি নাও দেই। আমি কিন্তু নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি না। বিশ্বাস করুন আমি তোতলা ছিলাম। যারা আমাকে ছোট বেলা থেকে চিনেন তারাও জানেন আমি তোতলা ছিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে তোমার নাম কি? আমি বলতাম জা জা জাকির। এ অবস্থা ছিল। আমি অবশ্য মুসা নবীর দোয়াটা পড়ি। তিনি তোতলা ছিলেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ . وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ .

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা : ২৫ আয়াত)

তাই আল্লাহই সাহায্য করবেন। আমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবি না। তাই এখানেও আসলে আমাদের আল্লাহর সাহায্য দরকার। আল্লাহ্ বিভিন্ন উপায়ে তার বান্দাকে সাহায্য করেন; আপনারা যত টাকা দেন না কেন? এখানে আমি আবারও বলব আল্লাহ্ সেটার পারসেন্টিস দেখেন। আমি আপনাদের বলব। আপনারা টাকার পরিমাণ দেখবেন না। আপনি ঠিক করবেন যে, ইনশাআল্লাহ যাকাত দেই তার পাশাপাশি আমার প্রতিমাসের ইনকামের ২০% দিব পিস টিভিকে। ২৫%, ২০%, ৩০%। কেউ যদি গরিব হয়ে থাকে সে হয়ত বলবে যে আমি সম্পত্তি দিয়ে দিব ২০%, সেটার পরিমাণ হতে পারে ১০০ ডলার। কিন্তু সে বিলিয়নার হলে সেই ২০% হতে পারে বিলিয়ন ডলার, তখন তার হার্ট ঠিক ঠিক এত টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে, কুফরী করার জন্য আপনার কাছে আরো ৮০% আছে। একজন ভাল ব্যবসায়ী এই পার্সেন্টিস বাড়াবে।

তাই আমি ধনী লোকদের সব সময় বলি, যখন আপনি দান করেছেন। তখন আপনার ইনকামের একটা পার্সেন্টি সেখানে দান করুন। এটা করলে আখিরাতে আপনাদের জন্য সুসংবাদ থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে কখনই ঠকাবেন না। আপনি সেরা পুরস্কারটাই পাবেন। তাই আপনারাই ঠিক করুন ২০%, ২৫%,

৩০% যত ইনকাম করব, তার এত পার্সেন্টিস যাকাতের পাশাপাশি আল্লাহর পথে খরচ করব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দেবেন এই জীবনে এবং আখিরাতে। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ২৮. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রিয়াজ আহমেদ। সেলস এন্ড মার্কেটিং এর চাকরি করি। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল, আমরা সবাই এটা জানি যে পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম আর মুসলিম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এটা সবাই জানি। তবে এটার চাইতেও খারাপ ব্যাপার হল, কিছু মুসলিম দেশেও আমরা দেখি, এমনকি এই মধ্যপ্রাচ্যেও আমরা এমনটা দেখি। এখানকার মিডিয়াতেও একই কথা বলা হচ্ছে। এখানেও মুসলিমদেরকে টেররিস্ট বলা হচ্ছে। হরহামেশা মুসলিমদেরকে কেন এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মিডিয়ায় ইসলামকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে কেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম দেশে তাদের চ্যানেল ও শব্দ ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সেই সব মুসলিমদের প্রশ্ন করুন। আমাকে না। সেইগুলোকে জিজ্ঞেস করুন। আর কিছু মুসলিম এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানে না বলে এই অভিযোগগুলো মেনে নেয়। যেমন ধরুন, এক মুসলিম আমাকে একবার বলেছিল তালেবানরা খারাপ। আসলে তিনি কিন্তু তালেবানদের শত্রু ছিলেন না। তাই মাঝে মধ্যে এখন মিডিয়া অনুষ্ঠানের মাঝে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে আমরা যা শুনি, আমরা যা দেখি তার সবকিছুই বিশ্বাস করি।

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমরা যেটা করব আমরা সেইসব মুসলিমদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ জানাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা যুক্তি দিয়ে কথা বলব। এমন কথা বলব না যে আমরাই ঠিক বলছি। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাব যে, ইসলাম হল সত্যের ধর্ম, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। আর শুধু ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলাম ছাড়া আর কোন পথ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হল ইসলাম। যার অর্থ নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন : ২৯. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আমিনুল্লাহ শরীফ। আমি পেশায় একজন একাউনটেন্ট। আমি গর্বিত যে, আমরা স্বদেশী, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। জিহাদের ওপর আপনার লেকচারটা খুবই সুন্দর। আর শিক্ষণীয় ছিল। আমার প্রশ্নটা হল আমার ধারণা এখানের বেশির ভাগ

লোকই এমনটা মনে করেন যে, উসামা বিন লাদেন আসলেই জিহাদ করেছেন। আমার অনেক সহকর্মী আর অন্যান্য লোকজন তারা প্রশ্ন করে যে, এটা আসলে জিহাদ কিনা? এখন এসব ব্যাপারে আমরা জানি না। তাহলে তাদেরকে কিভাবে বুঝাব। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল– এটা যদি জিহাদ না হয় তাহলে এটাকে কি বলা যায়? ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ করেছে কিনা? ভাই উনার সাথে আমার কখনও দেখা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে চিনিও না। সিএনএন আর বিবিসি এর খবরের ওপর ভিত্তি করে আমি উত্তরটা দিতে পারব না। সেজন্য কোন মন্তব্য করব না। আমার সাথে কখনও তার দেখা হয় নি। অনেক খবরই জানি। অনেকের সাথে দেখা হয় নি। জর্জ ডব্লিউ বুশের সাথেও কখনও দেখা হয় নি। কিন্তু সিএনএন এর খবর দেখেছি। খবরগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি, তারা যে খবরটা দেখাচ্ছে সেটা সঠিক। তবে একথাটা বলতে পারি আমি জিহাদ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি জিহাদ করছি। আমি সংগ্রাম করছি। জিহাদ অর্থ সংগ্রাম করা, চেষ্টা করা। আমি আমেরিকান পুলিশদেরও একই কথা বলেছিলাম যে, আমি জিহাদ করছি, আমি সংগ্রাম করছি। সে জিহাদ করছে কিনা সেটা আমি জানি না। তার সাথে কখনও দেখা হয় নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রশ্ন করবেন না যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ করেছে কিনা।

প্রশ্ন : ৩০. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার নাম ড. ফেরদৌস। আমার প্রশ্নটা হল– রাসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে আমরা দাজ্জালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। এমন বেশ কিছু হাদীস আমাদের বলে যে, দাজ্জাল পৃথিবীর সব বাড়িতেই যাবে। সে তোমাকে এমন পানি দেখাবে, যেটা পান করতে পারবে না। এমন আগুন দেখাবে যেটাতে যেটাতে তুমি পুড়বে না। আমরা কি টেলিভিশনকে এমন একটা দাজ্জাল বলতে পারি না?

উত্তর : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, একটা সহীহ হাদিসে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, আর আপনিও একথা বললেন যে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, এই টেলিভিশনখানা আদ দাজ্জাল, এক চোখের দাজ্জাল। Screen হল এর একটা চোখ। তাই টিভি দাজ্জাল। এখন এই টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কিনা? আমরা আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে টিভিই হল দাজ্জাল। এখানে আমি কি করতে পারি।

আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে কোন ফাঁকা জায়গা রেখো না। ফাঁকা জায়গা পূরণ করো। যাতে করে শয়তান সেখানে দাঁড়াতে

না পারে। সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল আযান-এর ৭৫ নং অধ্যায়ের ৬৯২ নং হাদীস। এই হাদীসটা ছাড়াও আছে সেটা সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাত ২৪৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৬৬। যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা পূরণ কর। যাতে শয়তান ঢুকতে না পারে। যদি আপনি মনে করেও থাকেন টিভি একটা দাজ্জাল, তাহলে সে দাজ্জালকে মুসলিম বানিয়ে নিন। এই মিডিয়ার আকৃতি পাল্টে দিয়ে। এটা দিয়ে ইসলাম প্রচার করা শুরু করে দিন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে টিভি একটা দাজ্জাল। তবে আপনি যদি টিভি দাজ্জাল মনে করেও থাকেন, তাহলে আমরা কি করব। আমরা এই মিডিয়াকে ব্যবহার করব সত্য প্রচারের কাজে। যাতে করে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমরা বলতে পারি যে আমরা ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই পৃথিবীতে ইসলামের বাণী ছড়ানোর চেষ্টা করেছি। পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআন ও বাইবেল

QURAN & BIBLE IN THE LIGHT OF SCIENCE

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আঃ কুদ্দুস

বি.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.এম. (অল ফার্স্ট ক্লাস অ্যান্ড স্কলারস)

বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস. (অর্থনীতি), ঢা.বি.

সূচিপত্র

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআন ও বাইবেল

বক্তা, প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের অভিনন্দন জানানোর পর, ডা. সাবীল আহমদ সভাপতি স্যামুয়েল নামানকে প্রথম বক্তা ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনা উপস্থাপন করতে আহ্বান জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। বক্তাকে সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় এবং সময়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়। এরপর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এভাবে বলা শুরু করলেন–

ডা. জাকির নায়েক, সাবীল আহমেদ, মোহাম্মদ নায়েক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের আলোচনাটি হচ্ছে 'চূড়ান্ত আলোচনা' সাথে সাথে এটি একটি ভালো অ্যাডভার্টাইজিংও বটে। আমি এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তা প্রভুকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন।

আমি 'বাণী' সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমেই শুরু করতে চাচ্ছি। আজকে আমরা 'বাইবেলের বাণী' এবং 'কোরআনের বাণী' সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ আমাদেরকে বলেছেন একটি বাণী, একটি বাগধারা কিংবা একটি বাক্য অর্থ হচ্ছে বক্তা তাকে কী অর্থে ব্যবহার করেন তাই, এবং যেসব ব্যক্তি বা সমষ্টিগত লোকেরা তা শোনে তারা কী বুঝছেন তাই। কোরআনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ﷺ কী বুঝাতে চেয়েছেন এবং উপস্থিত লোকেরা কী বুঝেছেন সেটাই এর বাণীর মর্মার্থ। বাইবেলের ক্ষেত্রে ঈসা (আ) কী বুঝাতে চেয়েছেন এবং উপস্থিত লোকেরা কী বুঝেছেন সেটাই এর বাণীর মর্মার্থ। এটা নিরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে বাইবেল কিংবা কোরআনের সকল ব্যবহারকারীদের ভাষ্য বুঝতে হবে।

'পিগ্' তথা 'শূকর' শব্দের বিভিন্ন অর্থ

যদি আমরা সত্যকে অনুসরণ করতে যাই, তাহলে আমরা নতুন অর্থ বানাতে পারি না। যদি আমরা সত্যের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হই, তাহলে মিথ্যার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে পারি না। আমি যে ব্যাপারে কথা বলছি সে বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমাদের প্রথম দৃশ্য এখানে উপস্থাপন করছি। এ দৃশ্যটি আমার বাড়িতে থাকা দুটি অভিধান সম্পর্কে কথা বলে। যার একটি ১৯৫১ এবং অপরটি

১৯৯১ সালের। এ অভিধান দুটিতে 'পিগ' শব্দের প্রথম অর্থ হচ্ছে 'বিপরীত লিঙ্গের যুবক শূকর।' দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে 'যেকোনো ধরনের শূকর কিংবা খাসি করা শূকর।' 'যেকোনো বন্য কিংবা গৃহপালিত শূকর'– এটা একই অর্থ প্রকাশ করছে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে– 'শূকরের মাংস'– এটাও সমান অর্থ প্রকাশ করছে। এরপর এ নির্দিষ্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে– 'এমন ব্যক্তি বা প্রাণী যার শূকরের মতো অভ্যাস রয়েছে।' এ অর্থটি হচ্ছে 'অতিভোজনে পটু ব্যক্তি'– অর্থের সমান। আর এ অর্থটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে, 'গলিত ধাতব পদার্থকে মাটির গর্তে ঢালাই না করা লৌহপিণ্ডের জন্য ঢেলে দেয়া।' কিন্তু এখানে 'পিগ' শব্দটির একটি নতুন অর্থ দাঁড়িয়েছে যা হচ্ছে 'একজন পুলিশ কর্মকর্তা।' আমরা বলি 'পুলিশ অফিসারের পিগ'।

আমাদের এসব নতুন কোনো অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম শতাব্দীতে শব্দটির যে অর্থ বাইবেল, গসপেল এবং প্রথম হিজরি শতাব্দীতে কোরআনে গ্রহণ করা হয়েছিল তাই গ্রহণ করা উচিত।

ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে 'আলাক' তথা জমাট রক্ত শব্দটির মর্মার্থ

এখন আমাদের একটু চিন্তা করে দেখা উচিত যে, পবিত্র কোরআন ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কী বলেছে। হ্যাঁ, দুঃখিত। আমি একটি ভুল বিষয় সম্পর্কে কথা বলছি। এটা বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক তত্ত্বে যে ভ্রূণের কথা বলা হয় তা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে উন্নতি বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আর কোরআন পূর্বাহ্ণেই আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের স্তরসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। ডা. কেইথ মুর তাঁর Highghts of Human Embryology (মানব ভ্রূণতত্ত্বের প্রকাশ) বইতে দাবি করেছেন, এ স্তরসমূহের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জনের বিষয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্লেষণের জন্য আলোচনা পর্যন্ত হয় নি। 'প্রথমত, আমরা তার এ দাবি পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত 'আলাক' শব্দটির অর্থ বিবেচনায় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করব। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি অবতীর্ণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তাও যাচাই করে দেখব।

আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই 'আলাক' শব্দটির দিকে লক্ষ করেই শুরু করব। আরবি শব্দ 'আলাক' একবচন। অথবা 'আলাক' শব্দটি বহুবচন এবং এটা ছয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনের 'সূরা কিয়ামা'-এর ৩৫–৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে–

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ـ

অর্থ : আর মানুষ কি নির্গত হওয়া শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে 'আলাক' তথা জমাট রক্তে পরিণত হয় এবং আল্লাহ্ তাকে সুন্দর আকৃতিতে রূপ দান করেছেন। এরপর তা থেকে তিনি স্ত্রী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।'

পবিত্র কোরআনের সূরা মু'মিনের ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

অর্থ : 'তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে অতঃপর 'আলাক' তথা জমাট রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শিশু হিসেবে বের করেছেন।'

পবিত্র কোরআনের সূরা হাজ্জের ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ـ

অর্থ : হে মানবমণ্ডলি! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাক তাহলে জেনে রাখ যে, আমি তোমাদেরকে মাটির নির্যাস থেকে অতঃপর শুক্রকীট থেকে, অতঃপর 'আলাক' তথা জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর আকৃতি বিশিষ্ট এবং আকৃতিবিহীন ছোট গোশতের টুকরা থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারি।

আর পবিত্র কোরআনের ২৩তম সূরা, সূরায়ে মু'মিনুনের ১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে চূড়ান্তভাবে এই কথাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ـ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ـ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মাটির আর্দ্রতা বা ভেজা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমি নিরাপদ বেষ্টনির ভেতরে শুক্রাণুরূপে রেখেছি। তারপর ঐ শুক্রাণুকে 'আলাক' তথা জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর ঐ জমাট রক্তপিণ্ডকে গোশতের টুকরায় এবং ঐ গোশতের টুকরাকে হাড়ে এবং ঐ হাড়কে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর ঐ সৃষ্টিকে আমি অন্যরূপে সৃষ্টি করব।

আর পবিত্র কোরআনের এ সর্বশেষ বর্ণনা থেকে আপনি পবিত্র কোরআনের বর্ণনানুযায়ী মানব সৃষ্টির স্তরসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন নুতফা (শুক্রাণু), আলাকা (রক্তপুঞ্জ), মুদগা (গোশতের টুকরা), ইযাম (হাড়) এবং পঞ্চম স্তর হচ্ছে 'হাড়কে গোশতের দ্বারা আবৃত করা'।

গত শতাব্দীর শুরু থেকে আরো বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত 'আলাকা' শব্দটির এ অনুবাদ করা হয়েছে :

'আলাকা' শব্দটির দশটি অর্থ রয়েছে। আমি এখানে সব উল্লেখ চাচ্ছি না। এদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে ফরাসি ভাষায় যেমন, রক্তপিণ্ড। ইংরেজি ভাষায় এর ৩ থেকে ৫টি পরিভাষা রয়েছে যাতে এর অর্থ হয়তো রক্তপিণ্ড নতুবা জোঁকের মতো লেগে থাকা রক্তপিণ্ড। ইন্দোনেশীয় ভাষায়, একটি পরিভাষা রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে রক্তমাংস অথবা রক্তের জমাট এবং শেষ পরিভাষাটি হচ্ছে ফারসি যার অর্থ হচ্ছে– রক্তের একটি জমাট পিণ্ড।

যারা মানবের জন্মবৃত্তান্ত অধ্যয়ন বা গবেষণা করেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে, ভ্রূণ গঠনকালীন 'জমাট রক্তপিণ্ড' নামের কোনো স্তরের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এটা একটি বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক সমস্যা। অভিধানে এটা এমন একটি শব্দ যা শুধু 'আলাকা' শব্দের মর্মার্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীবাচক 'আলাকা' শব্দের একবচনের অর্থ হচ্ছে Clot এবং Leech। উত্তর আফ্রিকায় এ দুটো অর্থই এখনো ব্যবহৃত হয়।

কয়েকজন রোগী আমার নিকট এসে কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়া জমাট রক্ত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। আর কয়েকজন মহিলা আমার নিকট এসে অভিযোগ করেছিল যে, তাদের মাসিক স্রাব আসছে না কেন? তখন আমি তাদের বলেছিলাম যে, 'আমি দুঃখিত, আমি আপনার স্রাব নির্গত করার ওষুধ দিতে পারব না। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, আপনার পেটে বাচ্চা রয়েছে।' তারা বলল যে, 'এটা তো এখনো রক্ত মাত্র। সুতরাং তাদের একথা থেকে বুঝা গেল যে, তারা পবিত্র কোরআনের ধারণাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।'

পরিশেষে আমরা প্রথম আয়াতটি সম্পর্কে বিবেচনা করব, যা মহানবী ﷺ -এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ আয়াতটি পবিত্র কোরআনের ৯৬তম সূরা, সূরায় আলাকে সংযোজিত আছে। এ আয়াতটি নিম্নরূপ –

اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে 'আলাকা' তথা জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে শব্দটি সমষ্টিবাচক রূপে আছে। শব্দটির এ রূপটি অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ, 'আলাকা' শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'আলাকা' শব্দটি থেকেও উৎপত্তি হতে পারে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সাধারণত এভাবে ব্যবহৃত হয় যে, 'সাঁতার কাটা একটি কৌতুক।' অতএব আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, 'আলাকা' শব্দটির অর্থ ঝুলানো বা দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা কিংবা বিচ্যুত না হওয়া। কিন্তু উপরোল্লিখিত দশটি অনুবাদেই এ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'জমাট রক্তপিণ্ড।'

সংখ্যা এবং যোগ্যতার বিচার সত্ত্বেও এসব অনুবাদ যারা ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের ড. মরিস বুকাইলি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এর অর্থ 'জমাট রক্ত' নয়। তিনি লিখেছেন... পাঠকদের এর চেয়ে খারাপ ধারণা দেয়া আর কি হতে পারে যে, এ শব্দটির অনুবাদ এর দ্বারা করা? অধিকাংশ অনুবাদেই একথা বলা হয়েছে অর্থাৎ, মানুষের গঠন হয়েছে জমাট রক্ত থেকে। এ ধরনের বর্ণনা এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নিকট সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। এখন দেখা যাচ্ছে, একটি সংগঠনের জন্যে ভাষাবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে যেসব মতপার্থক্য রয়েছে তার জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানব জন্মের বৃত্তান্ত সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনার মর্মার্থ উপলব্ধি করা জরুরি।

এবার অন্যদের কথায় আসা যাক, যেমন বুকাইলি বলেছেন, 'আমি ছাড়া কেউ কোরআনের এ শব্দটির যথার্থ অনুবাদ করে নি।' কত সুন্দর করে এ শব্দটির অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আলাকা' শব্দটির অনুবাদ 'জমাট রক্তের' পরিবর্তে 'যা কিছু এঁটে থাকে'। অর্থাৎ গর্ভবতী অবস্থায় নারীর জরায়ুর ভেতরে যে ভ্রূণ এঁটে থাকে। কিন্তু আপনি যেভাবে বললেন, যেসব মহিলা গর্ভবতী হন, তাদের গর্ভে যা এঁটে থাকে তা একইভাবে থাকে না বরং তা চর্বিত গোশতের টুকরার মতো হয়ে যায়। তাই এর দ্বারা গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভে ৮ মাস কিংবা সাড়ে ৮ মাস ধরে যে বস্তু এঁটে থাকে তা হওয়াকে বুঝায় না। তৃতীয়ত এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'চর্বিত গোশত ধীরে ধীরে হাড়ে পরিণত হয় এবং তখন ঐ হাড় মাংসপেশী দ্বারা ক্রমান্বয়ে আবৃত হয়ে যায়।'

এসব আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, প্রথম অবস্থায় কঙ্কাল তৈরি হয় এবং এরপরে এটাকে মাংসের দ্বারা আবৃত করা হয়। আর ড. বুকাইলি অত্যন্ত সুচারুরূপে বুঝেছেন যে, এটা সত্য নয়। মাংসপেশী এবং উপাস্থি একই সময়ে সংগঠন প্রক্রিয়া শুরু করে। ৮ সপ্তাহ শেষে, ঘনীভূত হয়ে কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে একত্রীভূত হতে শুরু করে। কিন্তু ভ্রূণ ইতোমধ্যে মাংসপেশীর মতো নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।

ভ্রূণতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং'Langman's Medical Embryology' বইয়ের লেখক ড. টি. ডব্লিউ. স্যাডলার একটি ব্যক্তিগত পত্রে

লিখেছেন, 'আট সপ্তাহ শেষ হলে ভ্রূণগুলো উপাস্থিতে পরিণত হয় আর তখন হাড় বা মাংসপেশীর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।' আর এ সময়েই ঐগুলো শক্ত হওয়া শুরু করে। ৮ম সপ্তাহ পরে মাংসপেশি কিছুটা নড়াচড়া করতে শুরু করে। সব সময় দু জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তাই আমরা ড. কেইথ মুর তাঁর'The Developing Human' গ্রন্থে মানুষের অস্থি এবং মাংসপেশির উন্নয়ন সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিরীক্ষা করে দেখব।

উক্ত বইয়ের ১৫তম এবং ১৭তম অধ্যায় অধ্যয়ন করে আমরা যেসব তথ্য পাই তা নিম্নে উল্লেখ করছি :

ড. স্যালডার এবং ড. মুর এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে, চূর্ণীভূত হাড় গঠনের এবং তার চারদিকে গোশতের আবরণ সৃষ্টি হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী চূর্ণীভূত হাড় গঠিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই সেখানে গোশতের অস্তিত্ব থাকে। আর তাই হাড়ের চারদিকে গোশতের আবরণ সৃষ্টির কথা যথার্থ নয়। কোরআন এ বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল তথ্য প্রদান করেছে। সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজ নয়।

আমাদেরকে 'আলাকা' শব্দের দিকে ফিরে আসা উচিত। ড. মুরও এ ব্যাপারে একটি সমাধান দিয়ে বলেছেন, ... অন্য আয়াতে, কোরআন নির্দেশনা দিয়েছে যে, 'আলাকা' শব্দের অর্থ জোঁকের মতো লেগে থাকা তথা দৃশ্যমান কোনো কিছু এবং চর্বিত বস্তু যেমনটা মানবীয়, রূপান্তরের একটি স্তরে ঘটে থাকে। এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে ড. মুর একটু আগ বাড়িয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, ২৩-৩০ দিন ধরে অর্থাৎ ২৩ দিনের একটি শুক্রাণু ৩ মিলিমিটার দীর্ঘ অর্থাৎ $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি শুক্রাণু আমি সেখানে আমার আঙ্গুলি স্পর্শ ছাড়া রাখতে পারি না বললেই চলে। এটা হচ্ছে ড. মুর কর্তৃক রচিত বইয়ের কভারে প্রদর্শিত স্তরসমূহের ১০ম স্তর। এটাই শুরু এবং এখান থেকে শুক্রাণু ডিম্বাণুর ভেতর প্রবেশ করে। সুতরাং এটাই প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় সপ্তাহে সেখান থেকে ৬ষ্ঠ স্তরে নেমে আসে এবং এখন তৃতীয় সপ্তাহে। আর এখানে ১ম স্তর হচ্ছে ১০ম স্তর এবং এটা হচ্ছে ২৩ দিনের ঘটনা। এটাকেই ড. মুর 'জোঁকের মতো লেগে থাকা' কথার মাধ্যম বুঝাতে চেয়েছেন। যদি আমরা এক্স-রে এর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, ২২ দিন ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং মেরুদণ্ডটি এখন পর্যন্ত খোলা। আর যদি ২৩ দিনের দিন আমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে মেরুদণ্ড এবং মাথার উভয়ই খোলা। এটাকে দেখতে কোনোক্রমেই জোঁকের লেগে থাকার মতো নয়। আর যদি তুমি এর চিত্রের দিকে খেয়াল করো তবে দেখতে পাবে যে, এর মাথাটি খোলা এবং এটি একটি ২০ দিনের শুক্রাণু। এটি ডিমের কুসুমের স্থলীর রূপ পরিগ্রহ করে। এটি মাতৃজঠরে ভ্রূণের নাভির সাথে মায়ের ফুলের সংযোজক নালীর রূপ পরিগ্রহ করে।

এটি কোনো ক্রমেই জোঁকের মতো লেগে থাকার ন্যায় নয়। এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে 'আলাকা' শব্দটির অর্থ নির্ণয়ে। কেননা এ শব্দের কোনো গ্রহণযোগ্য উপমা অন্য কোনো আরবি শব্দ দ্বারা দেয়া সম্ভব নয়।

হিজরি সালের প্রথম শতাব্দীতে, এ শব্দটির অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পবিত্র কোরআনের সূরা মুমিনুনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ـ

অর্থ : অতঃপর বীর্যকে নিরাপদ স্থানে স্থির করে দিয়েছি। অতঃপর বীর্যকে জমাট রক্ত পিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করেছি। পরিশেষে হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি।

এখানে 'আলাকা' শব্দের অর্থ হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। অপরদিকে সূরা হাজ্জের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ـ

অর্থ : হে মানব গোষ্ঠী, যদি তোমরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর। তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, যাতে তোমাদের নিকট সৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে পারি।

সুতরাং এখান থেকে একটি প্রশ্ন সহজেই উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি মক্কা ও মদিনার নারী ও পুরুষদের নিকট 'আলাকা' শব্দের অর্থ পরিষ্কার না-ই থাকে তাহলে কোন্ বিষয়টি তাদেরকে পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করেছিল? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, 'আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবীরা ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কী ভাবতেন তা খতিয়ে দেখার জন্য।'

বাইবেলে বর্ণিত ভ্রূণ তত্ত্বের স্তরসমূহ

আমরা যিশুখ্রিস্টের কথা দিয়ে শুরু করছি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি গ্রিক দ্বীপের 'কুশ' নামক জায়গায় ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মগ্রহণের সময় তিনি কতকগুলো স্তর পার হয়ে এসেছেন। তাঁর স্তরগুলো ছিল : শুক্রাণু একটি উৎপাদিত বস্তু যা প্রত্যেক মাতা-পিতার সমস্ত শরীর থেকে আসে। দুর্বল শুক্রাণু আসে দুর্বল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে আর শক্তিশালী শুক্রাণু আসে শক্তিশালী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। এরপর তিনি একটু সামনে এগিয়ে বলেছেন যে, এটা মায়ের রক্তে ঘনীভূত হয়। এখন শুক্রবীজ ঝিল্লিতে পরিণত হয়। অধিকন্তু, এটা মায়ের রক্তের কারণে বৃদ্ধি পায় এটা পরবর্তীতে গর্ভে পরিণত হয়। যদি কোনো মহিলা একবার গর্ভধারণ করে তাহলে তার হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা Old Testament সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী যিশুখ্রিস্ট গ্রিস দ্বীপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর তাঁর জন্মের ক্ষেত্রেও স্তরসমূহ তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তার জন্মের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত স্তরসমূহ বিদ্যমান ছিল :

শুক্র ও বীর্য হচ্ছে একটি উৎপাদ, যা পিতা-মাতার সমগ্র শরীর থেকে উৎপাদিত হয়– দুর্বল বীর্য শরীরের দুর্বল অংশ থেকে উৎপাদিত হয় এবং শক্তিশালী বীর্য শরীরের শক্তিশালী অংশ থেকে উৎপাদিত হয়। অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মায়ের রক্তের ঘনীভূত সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। বীজ শুক্রাণু তখন ঝিল্লিতে আশ্রয় নেয়। অধিকন্তু এটি বেড়ে ওঠে কারণ, এটা মায়ের রক্ত, ডিম্বাশয়ের ভেতরে অবতরণ করেছে। যদি একবার কোনো মহিলা গর্ভধারণ করে, তাহলে সে আর ঋতুবতী হতে পারে না।

এরপর মাংসপিণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এ স্তরে, মায়ের ঘনীভূত রক্ত নির্গত হওয়ার ফলে, মাংসপিণ্ডের গঠন শুরু হয়, নাড়ী সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষে হাড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, 'মাংসপিণ্ড যেহেতু গড়ে ওঠে, তাই এটা আলাদাভাবে শ্বাস গ্রহণের জন্য নতুন সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, হাড় শক্ত হয়ে ওঠে এবং গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে।'

ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি

পরবর্তীতে আমরা বিশ্বসেরা দার্শননিক এরিস্টটলের বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে। প্রাণীর উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁর বইতে তিনি ৩৫০ খ্রিস্টপূর্ব সালে ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন এবং একইভাবে তিনি প্রথম বীর্য এবং 'ঋতুকালীন রক্ত' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এরিস্টটল পুরুষদের বীর্য সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা প্রকৃত অবস্থায়ই থাকে। এটা মহিলাদের বীর্য পুরুষদের বীর্যের প্রতি কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তারই অনুসরণ করে থাকে এবং কার্যপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্য কথায়, বীর্য ঋতুস্রাবের রক্তকে জমাট বাধতে সহায়তা করে এবং এটা ধীরে ধীরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তিনি বলেছেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মেই সবচেয়ে পবিত্র শুক্রাণুই এ মাংসের আকারে আঁশের ন্যায় পাতলা তন্তু দ্বারা সংযোজিত হয়, বেড়ে ওঠে এবং মাংস ও হাড়ের অংশের স্নেহবন্ধন রচিত হয়। পরিষ্কারভাবে পবিত্র কোরআনও এই একই বক্তব্যের

সমর্থক। ঋতুস্রাবের রক্ত শক্ত হয়েই মাংসপিণ্ডের জন্ম হয়, যেটা মাংস গঠন করে। এরপরে, হাড় গঠিত হয় এবং পরিশেষে হাড়ের চারদিক মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রূণের স্তরসমূহ

এখন আমরা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব। শারাকাতার-১২৩ খ্রিস্টাব্দ সালের এবং শুশ্রূষার মতামত হচ্ছে, মহিলা এবং পুরুষ উভয়ই বীর্যপাত করে থাকে। পুরুষের বীর্যকে বলা হয় 'শুক্রকীট'। আর মহিলাদের বীর্যপাতকে বলা হয় 'আর্তযা রক্ত'। আর এসব নির্গত হয় শরীরের রক্ত থেকে, যে রক্ত উৎপাদিত হয় গৃহীত খাদ্যদ্রব্য থেকে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে, এ ধারণাই পোষণ করা হয় যে, শিশুর শরীর বীর্য এবং রক্ত থেকে গঠিত হয়।

ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে গ্যালেনের মতামত

এখন আমরা গ্যালেনের দিকে দৃষ্টিপাত করব, যিনি ১৩১ খ্রিস্টপূর্ব সালে বার্গামামে জন্মগ্রহণ করেন। বার্গামামের বর্তমান নাম হচ্ছে তুরস্ক। গ্যালেন বলেছেন, বীর্য, সারাংশ যা হতে শুক্রাণু গঠিত হয়– এটা আসলে ঋতুস্রাবের রক্ত থেকে হয় না, যা ইতিপূর্বে এরিস্টটল বলেছেন। আসলে তা গঠিত হয় ঋতুস্রাবের রক্ত এবং দুটি শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে।

পবিত্র কোরআন এখানে গ্যালনের কথার সাথে একমত হয়েছে। যেমন ৭৬ নং সূরার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থ : আমি মানুষকে মিশ্রিত বীর্যের ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি।

এখন আমরা গ্যালেনের দেয়া শুক্রাণুর স্তর সম্পর্কে আলোকপাত করব। গ্যালেনও বলেছেন যে, ভ্রূণ কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে উন্নতি লাভ করে। প্রথমটি হচ্ছে বীর্যের রূপ পরিগ্রহকরণ। পরবর্তী স্তরগুলো হচ্ছে বীর্যের রক্তে পরিণত হওয়া, আর হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং পরিপাকতন্ত্রের অগঠিত অবস্থায় থাকা। এ স্তরটিকে হিপোক্রাটাস 'ফেটাস' বলে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র কোরআনের ২২তম সূরার ৫ নং আয়াতে উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ـ

অর্থ : তারপর আলাকা হতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করবার জন্য .... আংশিকভাবে রূপ দেয়া হয়েছে।

আমরা উপরে দেখলাম যে, পবিত্র কোরআন এ স্তরের সাথে একমত পোষণ করেছে। পবিত্র কোরআনের ২৩তম সূরার ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ـ

অর্থ : অতঃপর আলাকাকে পরিণত করি পিণ্ডে, তারপর পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, আমি হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করে দিয়েছি।

চতুর্থ এবং চূড়ান্ত স্তরটি হচ্ছে যখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আলাদাভাবে সুসংগঠিত রূপে প্রকাশ পায়। গ্যালেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে, চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর প্রভৃতি স্থানের বারজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে স্কুলে গ্যালেনের ১৬টি বইকে পাঠ্য হিসেবে নিয়ে তার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এটা ১৩ শতাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছিল।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, এসব বছরগুলোতে ভ্রূণতত্ত্বের ওপর কোরআনের আয়াতগুলো ঘোষণা করেছে যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এক বিন্দু শুক্রাণু থেকে, যেটা ধীরে ধীরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, এ বক্তব্যটি বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা হিজরি ১ম শতাব্দীতে কোরআন বলে দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তখন দেখি হিপোক্রাটাস ভুল করেছেন, এরিস্টটল ভুল করেছেন, গ্যালন ভুল করেছেন– এরা সকলেই ভুল করেছেন।

'মুনীর' হচ্ছে ধারকৃত আলো অথচ 'নূর' হচ্ছে আলোর একটি প্রতিফলন

এখন আমরা 'চাঁদের আলো' সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে চাই। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছে, চাঁদকে সূর্যের আলো থেকে একটু প্রতিফলিত আলো দেয়া হয়েছে। যেমন : পবিত্র কোরআনের ৭১তম সূরার ১৫–১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ـ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

অর্থ : তোমরা কি দেখ না, কীভাবে আল্লাহ্ সপ্ত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন? আর তিনি তাদের মধ্যে চাঁদকে করেছেন 'নূর' বা জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন 'সিরাজ বা বাতি' চাঁদকে বলা হয়েছে 'একটি জ্যোতি বা আলো। ... আরবি শব্দ 'নূর' এবং সূর্যকে বলা হয়েছে বাতি বা সিরাজ।'

কোনো কোনো মুসলমান দাবি করেন যে, যেহেতু কোরআন ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেছে, অতএব, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সূর্য হচ্ছে আলোর উৎস আর চাঁদ হচ্ছে কেবল আলোর প্রতিফলন। এ দাবিটি অত্যন্ত জোরালোভাবে ধরা হয়েছে সাব্বির আলী প্রণীত'Science in the Quran' শীর্ষক গ্রন্থে-একই কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ডা. জাকির নায়েকের আলোকচিত্রে 'Is the Quran God's Word?' শীর্ষক আলোচনায়- যা আপনি এখন ইচ্ছে করলেই দেখে নিতে পারেন।

'মুনীর' হচ্ছে ধারকৃত আলো অথচ 'নূর' হচ্ছে আলোর প্রতিফলন। আমরা ইতিপূর্বে জানতাম চাঁদের আলো তার নিজস্ব। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন আমরা জানি যে, চাঁদের আলো এর নিজস্ব নয়, বরং এটা সূর্যের আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র। আমি তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের ২৫তম সূরা, সূরায় ফোরকানের ৬১নং আয়াতে। যেমন-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ : বরকতময় সেই সত্তা যিনি আকাশে কক্ষপথ স্থাপন করেছেন, আর তাতে সিরাজ এবং উজ্জ্বল চাঁদকে স্থাপন করেছেন।

আরবিতে চাঁদকে বলা হয় 'ক্বামার' এবং তাতে যে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলা হয় 'মুনীর'। এটা হচ্ছে ধারকৃত আলো কিংবা 'নূর'-যার অর্থ হচ্ছে 'আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র'। পবিত্র কোরআন বলেছে যে, চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। আপনারা বলবেন যে, আপনারা আজকে এটা আবিষ্কার করেছেন? কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজ থেকে ১৪০০ শত বছর পূর্বে কীভাবে কোরআন তা বলে দিয়েছিল? তিনি কিছুটা সময়ের জন্য নীরব রইলেন- তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর দিলেন না। আর এরপর তিনি বলতে পারতেন......'হতে পারে, হতে পারে এটি একটি অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত কোনো কিছু। এ ব্যাপারে আমি তার কাছে কোনো আপত্তি উত্থাপন করব না।'

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন, ভিডিওর শেষ পর্যায়, আমরা শুনলাম তা জাকির নায়েক 'চাঁদ' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন 'ক্বামার' এবং এতে যে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলেছেন 'মুনীর' যার অর্থ ধারকৃত আলো কিংবা 'নূর' যার অর্থ আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র। দয়া করে তিনি যা বলেছেন তা ভুলে যাবেন না- 'মুনীর' হচ্ছে ধারকৃত আলো এবং 'নূর' হচ্ছে 'আলোর প্রতিফলন'। এটা শুধু বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য

নয়, বরং এ বক্তব্য বৈজ্ঞানিকভাবে অলৌকিক প্রমাণিত হতে পারে। কারণ, এটা সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত একটি তুলনামূলক ও ধারণামূলক সত্য মাত্র।

চাঁদ তার নিজস্ব আলো নির্গত করতে পারে না

এটা সঠিক যে, চাঁদ তার নিজস্ব আলোকে প্রেরণ করতে পারে না, বরং শুধু সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ চাঁদের নিজস্ব আলো নেই বরং এটা সূর্যের আলোতে আলোকিত হতে পারে। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক এ বিষয়টি ঘোষিত হয়েছিল। এরিস্টটল ৩৬০ খ্রিস্টপূর্ব সালে বলেছিলেন, 'পৃথিবী গোলাকার, তবে এক্ষেত্রে তিনি চাঁদের ওপর পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি দেখে একথা বলতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু পৃথিবীর ছবিকে চাঁদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছিলেন বলে এমনটি সহজেই বলতে পারতেন। যদিও তিনি জানতেন না যে, চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয়।

যদি আপনি এখনো জোর করে বলতে চান যে, এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি যাদু তাহলে আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করব, 'পবিত্র কোরআনের শব্দগুলো কি এ দাবির সত্যতা প্রমাণ করে?' সর্বপ্রথম আমরা দৃষ্টি দিব 'সিরাজ' শব্দের দিকে। সূরায় নূরে এর অর্থ তাই যা ওপরে বলা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে, তার স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে 'বাতি' যা দ্বারা সূর্যকে বুঝায়।

সূরা নাবার ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে "সিরাজ ওয়াহহাজা' যার অর্থ হচ্ছে, চোখ ধাধানো বাতি' এটা দ্বারাও সূর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবি শব্দ 'নূর' এবং 'মুনীর' একই আরবি শব্দমূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'মুনীর' শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৬ বার এসেছে। এর মধ্যে সূরা আলে ইমরানে ৪ বার (১৮৪ নং আয়াতে) সূরা হাজ্জে ১ বার (৮ নং আয়াতে), সূরা লোকমানে ১ বার (২০ নং আয়াতে) এবং সূরা ফাতিরে ১ বার (৩৫ নং আয়াতে)।

'কিতাবুল মুনীর' শব্দাংশের অনুবাদ করতে গিয়ে ইউসুফ আলী বলেছেন, 'আলোর পুস্তক' এবং পিকথল বলেছেন, 'এমন ধর্মগ্রন্থ যা আলো প্রদান করে।' এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা এমন পুস্তককে ইঙ্গিত করছে যা জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করে। 'প্রতিফলন' বলতে 'নূর' শব্দের ব্যবহার সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনূসের ৫নং আয়াতে বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا .

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন আলোকিত এবং চন্দ্রকে করেছেন উজ্জ্বল।

এভাবে, আমরা দেখতে পাই, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে যে, চাঁদ একটি আলো। আর এটি কখনোই বলে নি যে, চাঁদ আলোর প্রতিফলন ঘটায়।

অধিকন্তু অন্যান্য আয়াতে পবিত্র কোরআন বলেছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন নূরের আঁধার। যেমন, সূরা নূরের ৩৫নং আয়াতে পবিত্র কোরআন সুন্দর করে বলেছে–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

অর্থ : আল্লাহ পৃথিবী ও আসমানের নূর বা জ্যোতি।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 'নূর' শব্দটি 'আল্লাহ' এবং 'চাঁদ' উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা কি এটা বলতে চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ প্রতিফলিত আলোতে নিঃসৃত। আমার মনে হয়, এটা সঠিক নয়। কিন্তু যদি আপনি ধারবাহিকভাবে একথা বলতে চান যে, 'নূর' শব্দটি যখন চাঁদকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হবে 'ধারকৃত' বা 'প্রতিফলিত আলো'। আর আমরা দেখলাম যে, 'আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর। "তাহলে এ আলোর উৎস কী? 'সিরাজ' বলতে বুঝায় আল্লাহ্র শুধু একটি প্রতিফলনকে। এ সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। যদি আল্লাহ্র নাম 'নূর' 'তথা' প্রতিফলিত আলো' হয় তাহলে 'সিরাজ' কী বা কে?

ভালো কথা! পবিত্র কোরআন আমাদেরকে বলেছে কে এই 'সিরাজ'? কিন্তু উত্তরটি আপনাকে আহত করবে। সূরা আহযাবের ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

অর্থ : হে নবী ﷺ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রত্যক্ষদর্শী, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলোর বিচ্ছুরণকারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।

এখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আলোর বিচ্ছুরণকারী একটি প্রদীপ। আরবিতে একে বলে 'সিরাজুম মুনীরা'। শাব্দিক বিশ্লেষণ এবং অভ্যন্তরীণ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানেই পর্যালোচনাটি শেষ। । শাব্দিক দিক দিয়ে 'সিরাজ' এবং বিশ্লেষণ 'মুনীরা' এখানে একত্রে একটি উজ্জ্বল জিনিসকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ﷺ। এটি পরিষ্কার যে, এ আয়াতে 'মুনীর' শব্দের অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' নয়। এর অর্থ হচ্ছে 'আলো দানকারী'।

মুহাম্মদ ﷺ এর সমসাময়িক জনগণ একথা বুঝতেন যে, চাঁদ আলো দানকারী এবং এ ব্যাপারে তারা সঠিক ছিল। ঠিক একইভাবে মূসা (আ)-এর সমসাময়িক জনগণও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সূর্য বৃহত্তর আলো এবং চন্দ্র ক্ষুদ্রতর আলো এবং এ ব্যাপারে তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যদি আপনি আরবি শব্দ নূর এবং 'মুনীর' শব্দ, যার অর্থ প্রতিফলিত আলো শব্দটি ধরেন তাহলে পবিত্র কোরআনের ব্যবহারবিধি অনুসারে মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন সূর্যের ন্যায় এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন চন্দ্রের ন্যায়। ডা. জাকির নায়েক প্রকৃতপক্ষেই কি একথা বলতে যাচ্ছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ আলোর উৎস এবং আল্লাহ হচ্ছেন তার প্রতিফলন মাত্র? কেন এ ধরনের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দাবি উত্থাপিত হয়েছে, যা কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না, যদি সে তার নিজ ধর্মগ্রন্থ কোরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে।

পানিচক্রের চারটি স্তর

আজকের রাতের ন্যায় একটি জলসার আয়োজন করা অত্যন্ত কঠিন, বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। আমরা এখন পানিচক্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

কিছু মুসলিম লেখক দাবি করেছেন যে, পবিত্র কোরআন পানিচক্রের প্রাক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। পানিচক্র কী? এ পর্বে আপনি চারটি স্তর দেখতে পাবেন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে বাষ্পীভবন। পানি সমুদ্র এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভূত হয়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে এটা মেঘে পরিণত হয়। তৃতীয় স্তর এ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং চতুর্থ স্তরটি হচ্ছে এ বৃষ্টির কারণে গাছপালা জন্মায়। এ সকল প্রকারই অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং প্রত্যেকেই ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ প্রকার সম্পর্কে জানেন। এমনকি যদি কেউ শহরেও বসবাস করেন, তাহলে জানেন যে, মেঘমালা আসার ফলে বৃষ্টিপাত হয় এবং ফুল ফোটে। কিন্তু প্রথম প্রকার সম্পর্কে কি তারা চিন্তা করে দেখেছেন। আমরা এ বিষয়টি ভেবে দেখি নি। এটা অত্যন্ত কঠিন। আর কোরআন প্রথম স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করে নি। এখন আমরা বাইবেলে বর্ণিত একজন নবীর ব্যাপারে আলোচনা করব যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন নবী অ্যাসোস। তিনি লিখেছেন, 'তিনি সেই সত্তা যিনি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং আদমসূরত নামের নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, যিনি অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভব ঘটান, এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, অতঃপর সমুদ্রের পানিকে তলব করেন।' ---- এটাই প্রথম স্তর। এ পানিকে তিনি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর প্রবাহিত করে দেন। তৃতীয় স্তর প্রভু (ইয়াহইয়া) হচ্ছে তার নাম। তিনি হিজরি সাল প্রবর্তনের কমপক্ষে এক হাজার বছর পূর্বে জন্মেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'প্রভু কতই না বড়–আমাদের উপলব্ধির বাইরে। তাঁর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।'

প্রথম স্তর : তিনি পানির ঐ বিন্দু যা ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলীয় বাষ্প থেকে বৃষ্টির ন্যায় ঝরে পড়ে তার দিকে দৃষ্টি করেছেন। এটা তৃতীয় স্তর। এরপর মেঘমালার স্তর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এটা দ্বিতীয় স্তর যাতে আর্দ্রতা এবং প্রচুর পরিমাণ পানির ঝরনা মানুষের ওপর ঝরে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে বাইবেলে প্রথম স্তরটি সম্পর্কে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার এক হাজার বছর পূর্বে বর্ণনা করেছে।

প্রভু স্থির এবং নিশ্চল পর্বতমালাকে জমিনের ওপর স্থাপন করেছেন

এবার আমরা পর্বতের দিকে দৃষ্টি দিব। পবিত্র কোরআনে এক ডজনের বেশি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্থির এবং নিশ্চল পর্বতমালাকে পৃথিবীর ওপর স্থাপন করেছেন। এসব আয়াতের অধিকাংশ জায়গাতেই পর্বতমালাকে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন হিসেবে অথবা বেঈমানদের সতর্ক করার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ কোরআনের ৩১তম সূরা, সূরায়ে লোকমানের ১০ এবং ১১ নং আয়াতে পাঁচটি সতর্কবাণীর অন্যতম একটি হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ـ

অর্থ : তিনি আকাশকে খুঁটিবিহীন সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা অবলোকন করে থাক আর জমিনে নিশ্চল পর্বতশৃঙ্গ স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে আন্দোলিত না করতে পারে আর চতুষ্পদ প্রাণী তাতে প্রসারিত হয়।

সূরা আম্বিয়ার ৩১নং আয়াতে সাতটি সর্তবাণীর অন্যতম একটি হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তাতে তোমাদেরকে আন্দোলিত না করতে পারে এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

পরিশেষে সূরা নাহলের ১৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা তোমাদেরকে আন্দোলিত না করতে পারে এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এর মাধ্যমে একটি বিরাট কাজ সম্পাদন করেছেন তিনি পর্বতমালাকে নিশ্চলভাবে স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে না পারে। অতএব আমরা অবশ্যই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব– তারা কি বুঝছে।

পরবর্তী দুই আয়াতে অন্য দৃশ্যটি অবতারণা করা হয়েছে। সূরা নাবার ৬-৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি ভূ-পৃষ্ঠকে সম্প্রসারিত করি নি? আর পর্বতমালাকে খুঁটি হিসেবে তৈরি করি নি।

এরপর সূরা গাসিয়ার ১৭-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ـ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ـ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ـ

অর্থ : তারা কি উষ্ট্রীকে প্রত্যক্ষ করেছে যে তাকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে তাকে কত উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে? আর পবর্তমালার দিকে তাকে কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

এখানে মানুষকে বলা হয়েছে যে, পর্বতকে স্থাপন করা হয়েছে তাবুর খুঁটির ন্যায় যা তাবুকে স্থির রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং পুনরায় এ ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, পর্বতমালাকে পৃথিবীতে স্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যাতে তা কম্পিত হতে না পারে।

পর্বতমালার গঠনভেদের কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়

তৃতীয় দৃশ্যটি অবতারণা করা হয়েছে رَوَاسِىَ (রওয়াসা) শব্দটির মধ্যে যার অর্থ পর্বতমালা। এ শব্দটি আরবি শব্দ 'আর্য়সা' আর এই একই শব্দমূলটি 'নোঙর' শব্দটি বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ 'নোঙর' ফেলার মাধ্যমে জাহাজকে একই স্থানে স্থির রাখা হয়।' আর আল্লাহর বাণী– 'আমি পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে পৃথিবী কম্পন হতে রক্ষা পায়।' এ দৃশ্য থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পর্বতমালাকে তাঁবুর খুঁটির ন্যায় স্থাপন করা হয়েছে যাতে সে তাঁবুকে টেনে রেখে স্থির রাখতে

পারে। যেমনিভাবে নোঙর জাহাজকে একটি নির্দিষ্টস্থানে স্থির করে রাখে ঠিক একইভাবে পবর্তও পৃথিবীকে ভূ-কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে স্থির করে দেয়। আসলে এ ধারণাটা ভুল।

পর্বতমালার গঠনভেদই ভূমিকম্পের কারণ। সুতরাং এসব আয়াত একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ড. মরিস বুকাইলি এটা স্বীকার করেছেন এবং বিষয়টি 'The Bible, the Quran and Science' বইতে আলোচনা করেছেন। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদগণ পৃথিবীতে একটি ভুল তথ্য প্রদান করে চলছেন, পর্বতমালার স্থাপন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীর স্থিরতা প্রদান সংক্রান্ত এসব ভুলের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে।'

এ সম্পর্কে ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ড. ডেভিড এ. ইয়ংকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'যখন একথা সত্য যে, কিছু কিছু পর্বত ভাঁজ করা শিলাখণ্ডের দ্বারা গঠিত এবং এ ভাঁজের পরিমাণ বেশি আকারে হতে পারে। আর এটা সত্য নয় যে, ভাঁজটা স্থির উপরিভাগকে পলস্তার করেছে। ভাঁজের সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি দেখা যায় তার উপরিভাগের অস্থিরতার মাধ্যমে।' অন্য কথায় পর্বতমালা পৃথিবীকে কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না বরং এদের গঠন বা রূপান্তরের কারণেই অতীতে এবং বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে কম্পন অনুভূত হয়।

ভূ-তত্ত্বের আধুনিক তত্ত্বসমূহ বলেছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শক্ত অংশকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং স্তর দ্বারা গঠন করা হয়েছে, যেগুলো একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক আকার ধারণ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, স্তরগুলোর গঠন একটি থেকে অন্যটি আলাদা যেমন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভূ-গঠন ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভূ-গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার মাঝে মাঝে এটাও দেখা যায় যে, ভূ-তত্ত্বের স্তরগুলো একই রকম এবং এরা একের পর এক পিছলে যায় আবার এরা একের পর এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলে। আর এভাবে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পর্বতের গঠনের উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায় যেখানে আরবের ভূভাগ ইরানের ভূ-ভাগের দিকে টার্ন করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যদি কোনো পর্যটক রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করে তাহলে সে দেখতে পাবে যে, পাহাড়ের পাদদেশের মাটি সমতল ভূমির নিকট থেকে ত্রিভুজাকৃতির ন্যায় উপরে উঠে গেছে। এমন স্থানে শুরুতে ভূমি আনুভূমিক এবং ক্রমান্বয়ে ৭৫ ডিগ্রী উপরে উঠে গেছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপিত হয় এবং এ কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় পর্বতমালার গঠনভেদের জন্যে। মাঝে মাঝে মাটির স্তরগুলো একটির সাথে অন্যটির ধাক্কা লেগে লাফিয়ে চলা শুরু করে। এ অবস্থায় বড় ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়। যখন এ শক্তির ঘর্ষণ শেষ হয়ে যায়, তখন স্তরের টুকরাটি সেখানে আঘাত হানে, সামনের দিকে একপাশে ছিটকে পড়ে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয় আর হঠাৎ করে এটি বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ভূমিকম্পের সময়, এটা দেখা গেছে যে, ভূমিকম্পে স্তরটি ৪ মিটার সামনে পড়েছে। ভালো কথা, যদি আপনার বাড়িটি হঠাৎ করে ৩ মিটার দূরে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে আকস্মিক ভূমিকম্প বা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। অন্য আরেক ধরনের পর্বতমালা রয়েছে, যেগুলোর গঠন হয়েছে অগ্নিগিরির দ্বারা। লাভা এবং ছাই নির্গত হয়ে উঁচু পর্বতমালা গঠিত হয়। এমনকি সমুদ্রের তলদেশেও এমন পর্বতমালার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। আর এ ধরনের পর্বতের অস্তিত্ব আমরা বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবিতে দেখতে পারি। আমি আশা করি, আপনি এটা দেখে থাকতেন– এটি কি আপনার নিকট পরিষ্কার নয়। যেখানে উপমহাদেশীয় প্রান্তিক সীমা শেষ হয়ে মহাদেশীয় প্রান্তীয় সীমা শুরু হয়েছে সেখানে এ ধরনের পর্বতমালা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এসব এলাকায়, আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এজন্যেই এখানে পর্বতমালা গঠন হয়েছে। আর এতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

পর্বতকে প্রকৃতপক্ষেই কম্পন এবং ঝাঁকুনির জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে

উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, পর্বতমালাকে প্রকৃতপক্ষেই কম্পন এবং ঝাঁকুনি সৃষ্টির জন্যে তৈরি করা হয়েছে এবং আজ অবধি এ একই অবস্থা রয়েছে। আর ভূমিকম্পও পর্বতের গঠনের কারণেই হয়ে থাকে। যখন মাটির একটি স্তর অন্যটির ওপর আঁছড়ে পড়ে তখনই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। যখন অগ্নিগিরির লাভা নিঃসরণ করে, তখনো ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। যা হোক, এটি পরিষ্কর যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারীরা এসব আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলেন আর তাই তারা বলেছিলেন, আল্লাহ পর্বতমালাকে তাঁবুর, খুঁটির ন্যায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীকে কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। পর্বতমালাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এটা নিয়ে কবিতা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্যে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে– একথা বলা বেশ কঠিন, যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে খাপ খায় না।

এখন আমরা সূর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। পবিত্র কোরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۔

অর্থ : অতঃপর যখন যুলকারনাইন সূর্যাস্তের জায়গায় পৌছালেন তখন তিনি সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন পানির গভীরে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।

কোরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে–

আমাদের বিশ্লেষণ করা দরকার যে, কোরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, না অসঙ্গতিপূর্ণ? বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া, এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আপনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মহিমান্বিত কোরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইঙ্গিতের বই। এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই। আর এতে ৬০০০-এর অধিক আয়াত রয়েছে যার মধ্য থেকে ১০০০ হাজারের অধিক আয়াতই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। কোরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় আমি কেবল বৈজ্ঞানিক এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি বৈজ্ঞানিক সূত্র কিংবা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব না। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি। এছাড়া আমরা জানি, বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, যিনি ড. মুরিস বুকাইলির 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কোরআন' শীর্ষক বইয়ের উত্তর লিখেছেন তিনি তার লেখায় বলেছেন, উপস্থাপনার দুটি বিশেষ রীতি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি, যার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি ধর্মগ্রন্থ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করেন। অপরটি হচ্ছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি। যার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি ধর্মগ্রন্থ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে অসঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করে, যেভাবে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল খুব ভালোভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল অভিযোগ করেছেন যে, পবিত্র কোরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে, আর আমি এসব অভিযোগের জবাব দিতে চাই। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রথম বক্তব্য রেখেছেন, তাই আমি আমার আলোচনায় কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করেত চাই। আমি তার বক্তৃতার অধিকাংশেরই উত্তর উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে তার ভ্রূণতত্ত্ব এবং ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত অভিযোগগুলোর জবাব দিতে চাই। অবশিষ্টগুলোর জবাব দেয়ার জন্যে আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমাকে উভয়টি করতে হবে আমি বিষয়টির প্রতি অবিচার করতে পারব না। বিষয়টি হচ্ছে– 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কোরআন।' আমি কেবল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলব না। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বাইবেল সম্পর্কে খুব বেশি হলে একটি কিংবা দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর জবাব আমি দিব ইনশাআল্লাহ। যেহেতু বিষয়টির প্রতি আমি সুবিচার করতে চাই, তাই আমি উভয়টি নিয়েই আলোচনা করব।

পবিত্র কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে যতদূর সংশ্লিষ্ট, বিজ্ঞানীরা এবং জ্যোতির্বিদরা কয়েক দশক পূর্বে যেভাবে বিশ্ব বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন তারা একে বলেছিলেন 'বিগ ব্যাং'। তখন তারা বলেছিলেন 'প্রাথমিক পর্যায়ে একটি প্রাথমিক নেবুলা ছিল, যা পরবর্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করে বিগ ব্যাং-এ পরিণত হয়েছিল, যার ফলে ছায়াপথ, নক্ষত্র, সূর্য এবং আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।' এ তথ্যটি সংক্ষেপে পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা সূরায়ে আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে−

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একত্রে ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছি।

চিন্তা করুন, এ তথ্যটি আমাদের কাছে বিজ্ঞান বিছুদিন পূর্বে দিলেও পবিত্র কোরআন কিন্তু তা ১৪০০ বছর পূর্বেই পরিবেশন করেছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান পবিত্র কোরআনের বর্ণনাকে নিশ্চিত করেছে

যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন শিখেছিলাম যে, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে স্থির। পৃথিবী এবং চাঁদ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে কিন্তু সূর্য স্থির। কিন্তু যখন আমি কোরআনের একটি আয়াত পড়ি অর্থাৎ সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতটি পড়ি, তখন দেখি যে, এতে বলা হয়েছে−

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۔

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি দিন ও রাত এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। আর এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব কক্ষপথে নিজ গতিতে সদা প্রবহমান।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের বর্ণনাকে নিশ্চিত করেছে।

পবিত্র কোরআন বলেছে যে, সূর্য ও পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কিত যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে يَسْبَحُوْنَ (ইয়াসবাহুন) যার অর্থ একটি প্রবহমান বস্তুর গতিপথ, যখন এর দ্বারা কোন সৌরজগতীয় বস্তুকে বুঝাবে, তখন এর অর্থ হবে এটি নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে।' সুতরাং পবিত্র কোরআন বলেছে যে, 'সূর্য এবং পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে।' আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে, সূর্য প্রায় ২৫ দিনে একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। ইবদিন হুবেল আবিষ্কার করেছেন যে, জগৎ ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পবিত্র কোরআনে ৫১তম সূরার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ

অর্থ : আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

আয়তনে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ জগৎ। আরবি শব্দ 'মুসিউনা' অর্থ হচ্ছে 'প্রসারমান' – প্রসারমান জগৎ। এ ক্ষেত্রে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জ্যোতির্বিদ্যার যে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, আমি তার জবাব দিব ইনশাআল্লাহ।

পানিচক্র সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বেশ কয়েকটি পয়েন্ট আউট করেছেন। পবিত্র কোরআনে বিস্তৃতভাবে পানিচক্রের বিবরণ দিয়েছেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল চারটি স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নেই, যেখানে বাষ্পীভবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ৮৬ নং সূরা, সূরায়ে ত্বারিকের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ـ

অর্থ : আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।

আর প্রায় সকল মুফাসসিরগণই বলেছেন যে, সূরায়ে ত্বারেকের এ আয়াতটি দ্বারা আকাশের ঐ সামঞ্জস্যকে বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা তা বারবার বৃষ্টি বর্ষণ করাতে সক্ষম। অর্থাৎ বাষ্পীভবন ক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যিনি আরবি জানেন, হয়তো বলবেন... কেন আল্লাহু ছুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষভাবে বিষয়টি বর্ণনা করলেন না?

এখন, আমরা জানব, কেন আল্লাহ তাআলা তা স্বীয় স্বর্গীয় প্রজ্ঞাময় বাণীতে করলেন না। কারণ আজকে আমরা এছাড়া আরো অধিক কিছু সম্পর্কে জানি। যেমন: ওজোনস্তর পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত ছাড়া, আকাশ আরো কতিপয় উপকারী বিষয় এবং পৃথিবীর শক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যেগুলো মানবজীবনের জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এটি শুধু বৃষ্টিকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, বরং আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এটি টেলিযোগাযোগ, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রের তরঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যার দ্বারা আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি, দূরে বসে অন্যের সাথে যোগাযোগ করি এবং রেডিও শুনতে পাই। এগুলো ছাড়া আকাশ বহির্জগতের ক্ষতিকর রশ্মিও ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন : সূর্যের ক্ষতিক্ষর বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Ray) আয়োনোস্ফিয়ার কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়। যদি তা বাধাগ্রস্ত না হতো, পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে

পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা অধিক উৎকৃষ্ট এবং অধিক যথার্থ, যখন তিনি ঘোষণা দেন–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ـ

অর্থ : আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ যা তিনি এ আয়াত দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন তা জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখুন।

পবিত্র কোরআন বিস্তৃতভাবে পানিচক্রের বিবরণ দিয়েছেন। বাইবেলে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তিনি চারটি স্তরে বিভক্ত করে তার স্লাইড শোতে দেখিয়েছেন। যেখানে মেঘের কোনো বর্ণনা তিনি দেন নি।

কোরআন পানিচক্রের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, প্রথমটি হচ্ছে, তার মতে বাষ্পীভবন, যার সাথে আমরা একমত পোষণ করি। আমরা বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রীতির ব্যাপারে কোনো রূপ মনে ব্যথা নিব না.... বৃষ্টি পতিত হয়, এবং অতঃপর মেঘমালা গঠিত হয়। – এটা কিন্তু পরিপূর্ণ পানিচক্রের বর্ণনা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন এর বেশ কয়েকটি জায়গায়, পানিচক্রের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতে বলা হয়েছে কীভাবে পানি উপরে ওঠে, বাষ্পীভূত হয়, এবং মেঘের রূপ ধারণ করে এবং মেঘগুলো এক্ষেত্রে ভেসে চলে, এতে কীভাবে গর্জন এবং তড়িত সৃষ্টি হয়, পানি নেমে আসে, মেঘমালা সীমান্তপানে ভেসে চলে, তারা বৃষ্টির আকারে নেমে আসে, রংধনু সৃষ্টি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে পানিচক্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে–

১. ২৪তম সূরা, সূরায়ে নূহের ৪৩তম আয়াত,

২. ৩০তম সূরা সূরায়ে রূমের ৪৮তম আয়াত;

৩. ৩৯তম সূরা, সূরায়ে যুমারের ২১তম আয়াত;

৪. ২৩তম সূরা, সূরায়ে মুমিনুনের ১৮তম আয়াত;

৫. ৩০তম সূরা, সূরায়ে রূমের ২৪তম আয়াত

৬. ১৫তম সূরা, সূরায়ে হিজরের ২২তম আয়াত;

৭. ৭ম সূরা, সূরায়ে আ'রাফের ৫৭তম আয়াত;

৮. ১৩তম সূরা, সূরায়ে রাদের ১৭তম আয়াত;

৯. ২৫তম সূরা, সূরায়ে ফোরক্বানের ৪৮তম আয়াত;

১০. ৩৫তম সূরা, সূরায়ে ফাতিরের ৯ম আয়াত;

১১. ৩৬তম সূরা, সূরায়ে ইয়াসীনের ৩৪তম আয়াত;

১২. ৪৫তম সূরা, সূরায়ে জাছিয়ার ৫ম আয়াত;

১৩. ৫০তম সূরা, সূরায়ে ক্বাহফের ৯ম আয়াত;

১৪. ৫৬তম সূরা, সূরায়ে ওয়াক্বিয়ার ৬৮তম এবং ৭০তম আয়াত;

১৫. ৬৭তম সূরা, সূরায়ে মূলকের ৩০তম আয়াত।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার অধিক সময়ই ব্যয় করেছেন ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনা নিয়ে। অল্প কিছু আলোচনা ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে এবং ৬টি বিষয় স্পর্শ করেছেন মাত্র, যেগুলো আমি লিখে এনেছি। ভূ-তত্ত্বের আলোচনায়, আমরা ভূ-তত্ত্ববিদদের নিকট থেকে জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩,৭৫০ মাইল এবং এর ভূগর্ভস্থ অংশ উষ্ণ এবং তরল এবং এতে জীবন বাঁচতে পারে না। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ শক্ত, যার ওপর আমরা বসবাস করি আর এ অংশ খুবই পাতলা, ১ থেকে ৩০ মাইলের মতো। কিছু অংশ এর চেয়েও পাতলা, তবে অধিকাংশই ১ থেকে ৩০ মাইলের মত পুরু। যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ কম পাতলা যেখানে ভূ-কম্পন সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে 'ভাঁজতত্ত্ব'। আর এ তত্ত্বের কারণে কোথাও কোথাও পাহাড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো পৃথিবীকে স্থিরতা প্রদান করেছে।

কোরআন বলে নি যে, পাহাড়গুলো খুঁটি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে

পবিত্র কোরআন-এর ৭৮তম সূরা, সূরায়ে নাবার ৬-৭ নং আয়াতে বলেছে,–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃতরূপে এবং পাহাড়কে খুঁটি হিসেবে সৃষ্টি করি নি?

পবিত্র কোরআন বলে নি যে, পাহাড়গুলোকে খুঁটি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। আরবি শব্দ "اَوْتَادًا"-এর অর্থ হচ্ছে খুঁটিসমূহ অর্থাৎ তাবুর খুঁটি। আর আজকে আমরা আধুনিক ভূ-তত্ত্ব পাঠ করে জানতে পারি যে, পাহাড়ের মূল মাটির অনেক গভীরে। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জানা গেছে। আর পাহাড়ের যে উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ। গভীরের অংশ অনেক বড়, ঠিক যেভাবে একটি খুঁটির অধিকাংশই মাটির গভীরে প্রোথিত হয়।

আপনি মাথার অংশটুকুই দেখতে পান আর অধিকাংশই মাটির নিচে গাঁথা থাকে যেমন : শিলাখণ্ড। আপনি দেখবেন যে, বরফের শিলাখণ্ডের ৯০%ই পানির নিচে থাকে, কেবল উপরের ১০% পানির উপরে থাকে। পবিত্র কোরআন এর ৮৮তম

সূরা, সূরায়ে গাশিয়ার ১৯তম আয়াতে ৭৯তম সূরা সূরায়ে নাযিয়াতের ৩২নং আয়াতে বলেছে–

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۔

অর্থ : আর তিনি পাহাড়কে পৃথিবীর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।

আজকে আধুনিক ভূ-তত্ত্বের ব্যাপক উন্নতির পর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, প্লেটেকটনিকসের তত্ত্বের দ্বারা ১৯৬০ সালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়ের এলাকার উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আজকের ভূ-তত্ত্ববিদরা বলছে যে, পাহাড়গুলো পৃথিবীর স্থিরতা বৃদ্ধি করে। সকল ভূ-তত্ত্ববিদরা এ দাবি করে নি বরং অনেকেই একথা বলেছে। আমি কোনো একটি ভূগোলের বই পড়ি নি, আর আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে, ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একটি মাত্র বই পড়ে, তা থেকেই জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন এটা কোনো ভূগোলবিদের মতামত মাত্র। আর তাই এটা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল ডা. কেইথমুরের সঙ্গে এটা প্রমাণিত আর আপনি যদি The Earth (পৃথিবী) নামক বইটি পড়েন, যে বইটি পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগেই পড়ানো হয়, যে বইটির অন্যতম একজন লেখক হলেন ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের একজন উপদেষ্টা ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সায়েন্স একাডেমির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তার বইতে লিখেছেন যে, পাহাড়গুলো কীলকাকার– 'এদের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত।' তিনি আরো বলেছেন যে, 'পাহাড়ের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে স্থির করা।' আর পবিত্র কোরআন এর সূরা আম্বিয়ার ৩১নং আয়াত সূরা লোকমানের ১০ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ১৫নং আয়াতে বলেছে যে–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۔

অর্থ : আমি জমিনে পাহাড় সৃষ্টি করেছি যাতে তা পৃথিবীকে স্থির রাখে, আর যাতে পৃথিবী তোমাকে এবং তাদেরকে নিয়ে কেঁপে না উঠতে পারে।

কোরআন কোথাও বলে নি যে, পাহাড়সমূহ ভূমিকম্প রোধ করে

পাহাড়ের কাজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, এটা পৃথিবীকে দোলার হাত থেকে রক্ষা করে। কোরআন কোথাও বলে নি যে পাহাড়সমূহ ভূমিকম্প রোধ করে। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন এমনকি তিনি তার বইয়ে লিখেছেন এবং আলোচনায় বলেছেন যে, ... আপনি দেখতে পাবেন যে, পাহাড়ি এলাকায়ও বিভিন্ন সময় ভূ-কম্পন হয় এবং পাহাড়গুলোই ভূমিকম্পের কারণ,

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হচ্ছে কোরআন কোথায়ও বলে নি, পাহাড়গুলো ভূমিকম্প রোধ করে।

ভূমিকম্পের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে زِلْزَالٌ (যিলযাল) বা زَلْزَلَةٌ (যালযালাহ) যে সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জানেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত তিনটি আয়াতেই যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে تَمِيْدَ (তামিদা) যার অর্থ হচ্ছে ঝাঁকুনি দেয়া, দোলা বা দোলানো। আল-কোরআন -এর ৩১তম সূরা, সূরায়ে লোক্বমানের ১০ নং আয়াতে বলেছে যে–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ـ

অর্থ : আমি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করেছি, যাতে তা পৃথিবীকে স্থির রাখে আর যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোলা না দেয়।

এখানে বলা হয়েছে تَمِيْدَ بِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদেরকে দোলা দেয়'। এ বর্ণনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যদি পৃথিবীতে পাহাড় না থাকত, আর তুমি যদি তাতে চলাফেরা করতে তাহলে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে দুলতো– যদি তুমি আন্দোলিত করতে, তাহলে পৃথিবী তোমাকে নিয়ে আন্দোলিত করতে। আর আমরা জানি যে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন পৃথিবীতে হাঁটি এটা দোলে না। এ না দোলার কারণ সম্পর্কে ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস এবং সৌদি আরবের বিখ্যাত ভূগোল লেখক ডা. নাজ্জাত একই বর্ণনা দিয়েছেন। ডা. নাজ্জাত একটি বই লিখেছেন, যাতে তিনি পবিত্র কোরআনের ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের যতগুলো অভিযোগ আছে সবগুলোরই উত্তর দিয়েছেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইতে লিখেছেন যে, যদি পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন।'

আমি বলেছিলাম, পবিত্র কোরআন কোথাও বলে নি, পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে। ভূমিকম্প-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে زِلْزَالٌ (যিলযাল) আর আপনি যদি Oxford Dictionary–তে ভূমিকম্পের সংজ্ঞাটি দেখেন, তাহলে দেখবেন এটি বলছে "ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শক্ত আবরণের বিধ্বংসী আলোড়ন।" পবিত্র কোরআনও যিলযাল সম্পর্কে ৯৯তম সূরা যিলযালের ১নং আয়াতে বলেছে–

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ

অর্থ : পৃথিবীকে যখন প্রকম্পিত করা হবে প্রকম্পনের ন্যায়।

কিন্তু এখানে বলা হয়েছে تَمِيْدَ بِكُمْ অর্থাৎ 'পৃথিবীকে তোমাদের নিয়ে দোল থেকে বিরত রাখার জন্য'। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথা 'পাহাড় যদি ভূমিকম্প

রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন'– এর জবাবে আমি বলতে চাই যদি আমি বলি যে, মেডিক্যাল ডাক্তার মানুষের রোগ ও অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি কীভাবে অধিক পরিমাণে অসুস্থ ও রোগীকে হাসপাতালে দেখতে পান যেখানে বাড়ির চেয়ে অধিক পরিমাণে ডাক্তার থাকে।'

সমুদ্রবিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন-এর ২৫তম সূরার ৫৩ নম্বর আয়াতে বলেছে–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন যার একটি হচ্ছে মিষ্টি ও সুস্বাদু এবং অপরটি হচ্ছে লবণাক্ত দরিয়া খর যদিও তারা মিলিত হয় কিন্তু তাদের পানি একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। আর এতদুভয়ের মাঝে তিনি একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা অতিক্রম করা যায় না।

পবিত্র কোরআনের ৫৫তম সূরা সূরায়ে আর রাহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ যিনি দুটি পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন। যদিও এরা মিলিত হয়, কিন্তু এদের পানি একটি অপরটির সাথে মিলিত হয় না। এতদুভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে , যা অনতিক্রম্য।

কোরআন 'বারযাখ'-এর বিবরণ দিয়েছে

অতীতে পবিত্র কোরআনের তাফসীরকারকগণ বিস্মিত হয়েছিলেন কোরআন কী বুঝাতে চাচ্ছে? আমরা মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি সম্পর্কে জানি, কিন্তু এদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে–যদিও তারা মিলিত হয়, কিন্তু তাদের পানি একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির পর আমরা জানতে পেরেছি যে, যখন এক ধরনের পানি অপর ধরনের পানির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে এটা নিজস্ব উপাদান হারিয়ে ফেলে এবং যে পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার সাথে একাকার হয়ে যায়। এখানে এমন একটি ঢালু এলাকা রয়েছে, যেখানে উভয় পানি একাকার হয়ে যায়। আর পবিত্র কোরআন এটাকেই 'বারযাখ' বা অদৃশ্য প্রতিবন্ধক বলে অভিহিত করেছে। আর অনেক বিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, এদের মধ্যে আমেরিকার সমুদ্রবিজ্ঞানী ডা. হেইও রয়েছেন।

আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইয়ে লিখেছেন যে, এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিষয়। তৎকালীন জেলেরা জানত যে, দুধরনের পানি রয়েছে, মিষ্টি ও লবণাক্ত। সুতরাং নবী, মুহাম্মদ ﷺ সিরিয়া ভ্রমণের সময় সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন অথবা ঐসব জেলেদের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন। মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানি একটি পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা– এ কথার সাথে আমি একমত, কিন্তু লোকেরা জানত না যে, সেখানে এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিবন্ধক রয়েছে, এমনকি এখনো অনেকে এটা জানে না। এখানে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে 'বারযাখ' বলতে মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানিকে বুঝায় না।

ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার আলোচনার প্রায় অর্ধেকটা সময় ব্যয় করেছেন। সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের জবাব দেয়া সম্ভব হবে না– যেসব বিষয় একান্তই অযৌক্তিক। আমি সংক্ষেপে এর জবাব দিব, যা সন্তোষজনক হবে ইনশাআল্লাহ। আর অধিক বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন 'কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান' এবং অন্য আর একটি ভিডিও ক্যাসেট হচ্ছে– 'কোরআন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।'

প্রফেসর কেইথ মূরের মতে কোরআনের অধিকাংশ আয়াত এবং হাদীসই আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সাথে যথার্থভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ

আরবের এক শ্রেণির পণ্ডিত ব্যক্তি পবিত্র কোরআনে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত যেসব তথ্য প্রদান করা হয়েছে যা সংগ্রহ করেছেন। তারা এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোও সংগ্রহ করেছেন। এরপর তারা ঐসব তথ্য প্রফেসর কেইথ মূরের নিকট উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে প্রফেসর কেইথ মূর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান। তিনি ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ পড়ার পর তাকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করার জন্যে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের অধিকাংশ ভাষ্যই আধুনিক ভ্রূণ বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে যথাযথভাবে সাম স্যপূর্ণ।' তবে এমন কিছু ভাষ্য রয়েছে যেগুলোকে আমি সঠিকও বলতে চাই না, আবার এগুলোকে ভুলও বলতে চাই না। কারণ আমি নিজেই এ সম্পর্কে জানি না। আর এমন দুটো আয়াত হচ্ছে প্রথম নাযিলকৃত ৯৬তম সূরা সূরায়ে আলাকের ১ এবং ২ নং আয়াত, যাতে বলা হয়েছে –

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'আলাক, শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণে, আমাদের দেখতে হবে অবতীর্ণ হওয়ার সময় এর কী অর্থ ছিল কিংবা তখন এর কী অর্থ ছিল যখন এ বইটি লেখা হয়েছিল। আর সে যথার্থভাবেই বলেছিল যে, শব্দটির সঠিক অর্থ বিশ্লেষণ করতে চাইলে এ শব্দটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং তৎকালীন জনগণ এর দ্বারা কী বুঝেছিল তাই জানা দরকার।

বাইবেল নয়, কোরআনই সকল মানুষ এবং চিরকালের জন্যে বোঝা সহজ

ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১০ম অধ্যায়ের ৫ এবং ৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যিশু খ্রিস্ট (আ) তাঁর অনুসারীদের বলেছেন, 'ইহুদি নয় এমন ব্যক্তির নিকট বসো না।' ইহুদি নয় এমন ব্যক্তি কারা? এরা হচ্ছে ইহুদি ব্যতীত, হিন্দু, মুসলমান। বরং তোমরা ইসরাঈলীদের বাড়ির হারানো মেষের কাছে যাও।' ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১৫তম অধ্যায়ের ২৪ নং ধারায় যিশুখ্রিস্ট (আ) বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হই নি, কিন্তু ইসরাঈলীদের বাড়ির হারানো মেষের নিকট।' সুতরাং যিশুখ্রিস্ট এবং বাইবেল কেবল ইসরাঈলী শিশুদের দ্বারা বোধগম্য করা সম্ভব ছিল। যেহেতু এটা কেবল দ্বারাই বোঝা সম্ভব ছিল, সুতরাং আপনি সেসব শব্দার্থই ব্যবহার করবেন যেগুলো ঐ সময় তারা ব্যবহার করত। কিন্তু কোরআন শুধু তৎকালীন আরবের কিংবা শুধু মুসলমানদের দ্বারাই বোঝা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআন সমগ্র মানবজাতি এবং সর্বকালেই বোঝা সম্ভব।

অন্য সব নবী নন, কেবল মুহাম্মদ ﷺ-কেই সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন

পবিত্র কোরআনের ১৪তম সূরা ইবরাহীমের ৫২নং আয়াতে, ২য় সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াতে এবং ৩৯তম সূরা যুমারের ৪১নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্যে বোঝা সহজ। আর মহানবী মুহাম্মদ ﷺ শুধু মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের নিকট প্রেরিত হন নি। মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বলেছেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমত ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছি।

যতদূর কোরআনের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানা যায়, আপনি কোরআনের আয়াতের অর্থকে শুধু ঐ সময়ের জন্যে সীমাবদ্ধ করতে পারেন না। কারণ এর অর্থ সর্বকালের জন্যে প্রযোজ্য। সুতরাং 'আলাকা' শব্দের অর্থ মাংস পিণ্ড কিংবা এমন বস্তু যা ঝুলন্ত থাকে। এজন্যে প্রফেসর কেইথ মূর বলেছেন, 'আমি জানি না যে প্রাথমিক পর্যায় ভ্রূণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় থাকে কি-না।' আর তিনি তার পরীক্ষাগারে

গেলেন এবং একটি ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়টিকে মাইক্রোস্কোপ দ্বারা বিশ্লেষণ করলেন অতঃপর তাকে মাংসপিণ্ডের ছবির সাথে তুলনা করে দেখলেন। অতঃপর হুবহু মিল দেখতে পেয়ে তিনি আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেলেন। এটি হচ্ছে মাংসপিণ্ডের ছবি এবং মানব ভ্রূণ। ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আপনাদের যা দেখিয়েছেন তা হচ্ছে এর অন্য একটি উদ্দেশ্য। আমি যদি আপনাদেরকে এ বইটি দেখাই, তাহলে দেখবেন যে এটা দেখতে একটি ত্রিভুজাকৃতির। যদি আমি আপনাদের এটি দেখাই, তাহলে এটির একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য দেখতে পাবেন। ঐ চিত্রটি আপনারা যে আলোকচিত্র দেখেছেন তাতে দেয়া আছে, আর আমি ঐ ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রফেসর কেইথ মূরকে ৮০টি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন, 'যদি আপনারা আমাকে ৩০ বছর পূর্বে এ ৮০টি প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ৫০%-এর অধিক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হতাম না। কারণ ভ্রূণবিজ্ঞান ৩০ বছর পূর্বে মাত্র উন্নতি লাভ করেছে।' তিনি এটি আশির দশকে বলেছিলেন। এখন আমরা কি প্রফেসর কেইথ মূরের বক্তব্যকে বিশ্বাস করি? তাঁর ভিডিও ক্যাসেটটি এখন সর্বত্র পাওয়া যায় 'এটাই সত্য' ভিডিওকৃত বিবরণ।

আল্লাহ তাঁর নিজস্ব আলো পেয়েছেন

আমি পুনরায় পবিত্র কোরআনের ২৫তম সূরা, সূরায়ে ফোরক্বানের ৬১ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ : পবিত্র সেই সত্তা যিনি আকাশে গ্রহপুঞ্জ স্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি প্রদীপ ও আলো স্থাপন করেছেন।

সূর্য এবং চাঁদ উভয়েরই ধার করা আলো.... মুনীর। চাঁদ কে বুঝাতে আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে 'ক্বামার'। 'মুনীর' বা 'নূর' শব্দটি সর্বদাই প্রতিফলিত আলো অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সূর্য'কে বুঝাতে আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে 'শামস'। 'ওহাদ' বা 'দিয়া' শব্দটি সর্বদাই একটি উজ্জ্বল বাতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর এ ব্যাপারে আমি পবিত্র কোরআনের ৭১তম সূরা নূরের ১৫ নং আয়াত এবং ১০ম সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে পারি। আর তিনি বলেছেন যে, যদি এর অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' তাহলে তিনি ২৪তম সূরা আল নূরের ৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিবেন যে, আল্লাহু ছুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছেন نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ 'আসমান ও জমিনের

নূর।' সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়ুন, এবং বিশ্লেষণ করুন যে, এটা কী বলছে। এ আয়াত বলছে 'আল্লাহু হচ্ছেন নূর'। নূর এটা বলছে, 'আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের নূর।'

এটার অর্থ এ রকম যেমন চেরাগদান এবং চেরাগদানে একটি বাতি। 'বাতি' শব্দটি সেখানে ছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজের থেকেই আলো পেয়েছেন, আর এমনকি প্রতিফলিত আলোও। বাতির অভ্যন্তরটা যেন একটি 'সিরাজ' কিন্তু প্রতিফলনকারী যেন চাঁদ। এটা আলোর প্রতিফলনকারী। বাতির নিজস্ব আলো রয়েছে কিন্তু প্রতিফলনকারী যেন চাঁদ। এটা আলোর প্রতিফলনকারী। বাতির নিজস্ব আলো রয়েছে কিন্তু প্রতিফলনকারী বাতি আলোর প্রতিফলন করে– এভাবে, দুটিই একটির ভেতরে । সুতরাং কোরআনের ভাষ্য অনুসারে আল্লাহর নিজস্ব আলো রয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর নিজস্ব আলোর প্রতিফলন ঘটান নিজ স্বভাবেই।

উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন যে, কোরআন বলেছে, 'কোরআন হচ্ছে নূর' এটা প্রতিফলিত আলো। অবশ্যই, কোরআন হচ্ছে আলোর প্রতিফলন এবং আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলার পথ নির্দেশিকা।

মুহাম্মদ ﷺ ও 'নূর' ও 'মিরাজ'

মুহাম্মদ ﷺ-এর মিরাজ হওয়া প্রসঙ্গে বলা যায়, হ্যাঁ, তিনি সিরাজ। মহানবী ﷺ-এর হাদীস এ ব্যাপারে আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছে। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন 'নূর' এবং একই সাথে 'সিরাজ' ও আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর নিজের জ্ঞানও ছিল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও তিনি হেদায়াত লাভ করেছেন। সুতরাং আপনি যদি 'নূর' শব্দটি ব্যবহার করেন 'প্রতিফলিত আলো' অর্থে 'মুনীর' শব্দটিকে 'প্রতিফলিত আলো' অর্থে ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন যে, চাঁদের আলো এর নিজস্ব নয়, এটা প্রতিফলিত আলো।

অন্য যে বিষয়টি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উত্থাপন করেছেন তা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ১৮তম সূরা, সূরায়ে কাহাফের ৮৬ নং আয়াত প্রসঙ্গে। আয়াতটি হচ্ছে – 'জুলকারনাইন সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন পানির গভীরে অস্ত যেতে দেখেছেন.... কর্দমান পানি... চিন্তা করে দেখুন, সূর্য ঘোলাটে পানিতে অস্ত যায় ... অবৈজ্ঞানিক। এখানে যে আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে وَجَدَ 'ওয়াজাদা' যার অর্থ হচ্ছে "যুলকারনাইনে পেল"। আর তা উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আরবি জানেন। সুতরাং আপনি যদি وَجَدَ শব্দটির অর্থ অভিধানে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, এর অর্থ 'সে পেল'। অতএব আল্লাহ তাআলা এখানে 'যুলকারনাইন যা পেল' তাঁর বর্ণনা দিলেন।

যদি আমি বলি যে , 'শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বলল যে, ২+২=৫। এখন আপনারা যদি বলেন, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন ২+২=৫। অথচ আমি তা বলি নি। আমি বলেছি ... "শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বলল যে, ২+২=৫। আমি ভুল করি নি– ভুল করেছে শিক্ষার্থীরা। আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে এরকম– মোহাম্মদ আসাদের মতে, وَجَدَ অর্থ হচ্ছে– 'পাওয়া' 'যুলকারনাইন পেল'। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে– যে আরবি শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে مَغْرِبْ এ শব্দটি 'স্থান' ও 'সময়' উভয়কে বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা সূর্যাস্তের কথা বলি তখন এর অর্থ 'সময়' ধরতে হবে। যদি আমি বলি, 'সূর্য সন্ধ্যা ৭.০০ টায় অস্ত যায়।' তাহলে আমি এখানে 'সময়' অর্থে ব্যবহার করছি। আবার যদি আমি বলি, 'সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়'–এর অর্থ আমি এখানে শব্দটিকে 'স্থান' অর্থে ব্যবহার করছি। সুতরাং এখানে যদি আমি مَغْرِبْ শব্দটিকে 'সময়' অর্থে ব্যবহার করি, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের জায়গায় পৌঁছতে পারেন নি। তাহলে এর অর্থ হবে– তিনি সূর্যাস্তের সময় পৌঁছেছিলেন। সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল।

অধিকন্তু, আপনারা এ সমস্যাটির সমাধান বিভিন্নভাবে করতে পারেন। এমনকি যদি তা ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেন "না, না, এক্ষেত্রে মৌলিক ধারণাটি সঠিক নয়। এর অর্থ.. পাওয়া নয়। আমাদের এটার অর্থ বুঝায় বিশ্লেষণ করা দরকার। কোরআনের আয়াত বলেছে,.... 'সূর্য ময়লাযুক্ত পানিতে অস্ত গেল।' এখন আমরা জানি, যখন আমরা এসব শব্দের ব্যবহার করি, যেমন 'সূর্যোদয়' এবং 'সূর্যাস্ত' সূর্য কি উদিত হয়? বৈজ্ঞানিকভাবে, সূর্য উদয় হয় না, আবার সূর্য অস্তও যায় না। আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানি যে, সূর্য আদৌ অস্ত যায় না। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর ঘুরপাক যাওয়ার ফল। যার প্রেক্ষিতে সূর্য উদয় হয় কিংবা অস্ত যায় বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আপনারা যদি প্রাত্যহিক খবরের কাগজ পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, এতে লেখা আছে– সূর্যোদয় সকাল ৬.০০টা এবং সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৭.০০টা। তাহলে কি সংবাদপত্র ভুল–অবৈজ্ঞানিক! যদি আমি 'দুর্ঘটনা' শব্দটির ব্যবহার করে বলি, 'দুর্ঘটনা' অর্থ হচ্ছে কোনো না কোনো সংঘটিত দুর্বোধ্যতা। শাব্দিক অর্থে 'দুর্ঘটনা' বলতে বোঝায় 'একটি মন্দ তারকা।' সুতরাং আমি যখন বলি... 'এ দুর্ঘটনা' প্রত্যেকে জানে না বা বোঝে যে, আমি কী বলতে চাচ্ছি। তবে অবশ্যই আমি এ শব্দের দ্বারা মন্দ তারকাকে বুঝাতে চাচ্ছি না।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এবং আমি উভয়েই জানি, যখন একজন লোক পাগল হয়, তখন আমরা তাকে বলি মানসিক রোগী। হ্যাঁ কিংবা না? অন্তুতপক্ষে, আমি তাই বলি এবং সেটাই বিশ্বাস করি। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও সেটাই বিশ্বাস

করে থাকবেন। আমরা একজন লোককে একজন মানসিক রোগী বলে অভিহিত করি। এখন 'মানসিক রোগী বলতে আমরা কী বুঝি? এর অর্থ...' 'চাঁদ কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া'। কিন্তু এ শব্দটি কীভাবে 'মানসিক রোগী' অর্থে ব্যবহৃত হয়? একইভাবে, 'সূর্যোদয়' শব্দটি শুধু ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ তাআলাও মানুষের জন্যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এমনভাবে শব্দের ব্যবহার করেছেন, যাতে আমরা তা বুঝতে পারি। সুতরাং এটা শুধু 'সূর্যাস্ত'– এটার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অস্ত যাওয়াকে বুঝায় না– আর সূর্য প্রকৃতপক্ষেই উদিত হয় না।

এভাবে, ব্যাখ্যাটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছে। সুতরাং পবিত্র কোরআনের ১৮তম সূরা, সূরায়ে কাহফের ৮৬ নং আয়াতটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে অসাম স্যপূর্ণ নয়।

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিপরীত নয়

যাহোক, আমি তাকে বিভিন্ন ধরনের উত্তর দিয়েছি কোরআন কোথাও বলে নি যে, সোলাইমান (আ) একটি লাঠির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্রামে ছিলেন। এটা শুধু বলেছেন যে, প্রাণী, কেউ বলে পিঁপড়া হতে পারে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণী আসল এবং কামড় দিল। এটা সম্ভব হতে পারে। হতে পারে সোলায়মান (আ) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং কোনো প্রাণী লাঠিটিকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল আর তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমি পবিত্র কোরআনের সাথে সাম স্যপূর্ণতার নীতি আলোচনা করছি। কারণ আপনি সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি কিংবা অসাম স্যপূর্ণ নীতি যেটারই ব্যবহার করেন না কেন সবই এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

আমি আমার বক্তৃতার শুরুতে পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সূরা, সূরায়ে নিসার ৮২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি, যাতে বলা হয়েছে–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

অর্থ : তারা কি মনোযোগের সাথে কোরআন অধ্যয়ন করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে অবতীর্ণ হতো তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত।

আপনারা সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি কিংবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি যেটারই ব্যবহার করুন না কেন– তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদি আপনারা যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহলে দেখবেন যে, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও পাবেন না যা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিপরীতে যায়।

জ্বীনদের 'ইলমে গায়িব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান নেই

আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে একমত যে, সোলাইমাইন (আ) দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করেছিলেন। উত্তরটি একই আয়াতে দেয়া হয়েছে যে, পরে সোলাইমান (আ) পড়ে গিয়েছিলেন। জ্বিনরা বললেন যে, 'যদি আমরা জানতে পারতাম যে, সোলায়মান (আ) ইন্তিকাল করেছিলেন, তাহলে আমাদেরকে এতো কঠিন পরিশ্রম করতে হতো না।' একথা আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছে যে, জ্বীনদের নিকট 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান ছিল না। কারণ জ্বীনরা নিজেদেরকে অনেক বড় ভেবেছিল; তাই আল্লাহ তাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, তাদের নিজেদের 'অদৃশ্যের জ্ঞান' টুকু পর্যন্ত নেই।

কোরআন নাযিলের ৬০০ বছর পরে ইবনে নাফীস প্রথম রক্তের সঞ্চালন সম্পর্কে বলেছিলেন–

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল 'দুধ উৎপাদন'- শীর্ষক বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, এ ব্যাপারে তিনি কোরআনের ১৬তম সূরা নাহলের ৬৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রক্তের সঞ্চালন গতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ইবনে নাফীস। তিনি কোরআন নাযিলের ৬০০ বছর পরে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইবনে নাফীসের ৪০০ বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে পাশ্চাত্য এ সাধারণ ঘোষণাটি প্রথম দিয়েছিলেন– যেটা ছিল কোরআন নাযিলের ১০০০ বছর পরের ঘটনা।

কোরআন ১৪০০ বছর পূর্বে দুগ্ধ উৎপাদন ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বলেছিল

আপনারা যেসব খাবার খান, তা অন্ত্রে চলে যায় এবং অন্ত্র থেকে খাদ্য থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ওরগ্যানগুলো রক্ত প্রবাহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চলে যায়। কখনো কখনো লিভারের পোর্টাল পদ্ধতির মধ্যেমে ম্যামারি গ্রান্ডে পৌছে যায়। এরই ফলে দুগ্ধের উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর পবিত্র কোরআন এ তথ্যটি সংক্ষিপ্তাকারে এর ১৬তম সূরা সূরায় নাহলের ৬৬ নং আয়াতে আধুনিক বিজ্ঞানের এ তথ্যটি প্রদান করা হয়েছে। যেমন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۔ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۔

অর্থ : আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে, আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকে যা তাদের রক্ত এবং অন্ত্র থেকে বিশুদ্ধ দুধের আকারে বেরিয়ে আসে। তা পানকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অতি সাম্প্রতিককালে মাত্র ৫০ বছর পূর্বে বিজ্ঞান থেকে যা জানতে পেরেছি, পবিত্র কোরআন সে তথ্য আমাদেরকে দিয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। আর একই তথ্যটি পবিত্র কোরআন এর ২৩তম সূরা, সূরায়ে মুমিনুনের ২১ নং আয়াতে পরিবেশন করে বলেছেন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থ : আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে; আমি তার পেট থেকে তোমাদেরকে পান করাই, তাতে তোমাদের অনেক উপকারী বিষয় রয়েছে; আর তা তোমরা ভক্ষণ করে থাক।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, "চতুষ্পদ প্রাণী জাতিগতভাবে বাস করে। পবিত্র কোরআন সূরা আনআমের ৩৮ নং আয়াতে বলেছে–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ طَئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থ : পৃথিবীতে যেসব চতুষ্পদ প্রাণী এবং ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ানো পক্ষীকুল রয়েছে তারা তোমাদের মতো জাতিগতভাবে বাস করে।

আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন যে, 'আপনারা জানেন যে মাকড়সা তার সাথী এবং পিতাকে হত্যা করে ... আমরা কি তা করি? আর সিংহ, হাতিও এভাবে হত্যা করে।' তিনি এসবের আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, পবিত্র কোরআন এদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে নি।

যদি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কোরআন বুঝতে না পারতেন, তাহলে তিনি এটা বলতে পারতেন না যে, কোরআন ভুল। কোরআন বলেছে, 'এরা জাতিগতভাবে বাস করে।' এটা বলা হয়েছে চতুষ্পদ প্রাণী এবং পাখিদের ব্যাপারে, যেগুলো দলবদ্ধভাবে বাস করে যেভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষরা বাস করে। এটা এদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে নি।

বাইবেল আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

বাইবেলে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা উপস্থাপন করতে পারি। আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের উত্থাপিত সব অভিযোগের যথোপযুক্ত জবাব প্রদান করছি– আলহামদুলিল্লাহ। এমন একটি

বিষয়ও নেই, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, কোরআন বিজ্ঞানের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমার উত্থাপিত ২২টি বিষয়ের একটিরও জবাব দেন নি। দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন মাত্র কিন্তু প্রমাণ করতে সক্ষম হন নি। সুতরাং এ ২২টি বিষয়ই প্রমাণ করে যে, বাইবেল গ্রন্থটি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২৫তম বিষয়টি হচ্ছে– প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কিত। লেভিটিকাস-এর ১১তম অধ্যায়ের ৬ নং ধারায় বর্ণিত আছে– 'খরগোশ একটি জাবরকাটা প্রাণী।' আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়। অতীতে মানুষরা খরগোশের নড়াচড়া দেখে এমনটি ভাবত। এখন আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়, এছাড়া খরগোশের স্বয়ংক্রিয় পাকস্থলী নেই। প্রভাবস-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৭নং ধারায় বর্ণিত আছে যে, 'পিঁপড়ার কোনো শাসক বা নেতা নেই।' আজকে আমরা জানি যে পিঁপড়া একটি সুশৃঙ্খল পোকা। তাদের পরিশ্রম করার একটি বিশেষ রীতি রয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একজন নেতা থাকে, তাদের একজন অগ্রগামী এবং অনেক কর্মী বাহিনী থাকে। তাদের একজন নেতা বা শাসক পর্যন্ত থাকে। অতএব, বাইবেল হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক।

বাইবেল বলছে যে, সাপ ধূলা খায়– যা কোনো ভূ-তাত্ত্বিক বইতে বলা হয় নি

অধিকন্তু বাইবেলের জেনেসিসের ৩য় অধ্যায়ের ১৪নং ধারা এবং ঈসায়ীর ৬৫ নং অধ্যায়ে ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'সাপ ধূলা খায়?' কোনো ভূ-তাত্ত্বিক বইতেই একথা বলা হয় নি যে, সাপ ধূলা খায়। লেভিটিকাসের ১১তম অধ্যায়ের ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে 'বিভীষিকাময় বস্তুগুলোর মধ্যে পাখিরা চার পদবিশিষ্ট। এরা একটি বিভীষিকাময় প্রাণী।' আর কোনো কোনো বিশেষজ্ঞরা বলছে যে, 'পাখি' শব্দটি হিব্রু 'উফ' শব্দের ভুল অনুবাদ। নতুন ইন্টারন্যাশনাল সংস্করণে বলা হয়েছে– 'পাখাওয়ালা সৃষ্টি।' কিন্তু এটা বলছে .... 'সকল চার পদবিশিষ্ট পোকাই হচ্ছে বিভীষিকাময়।' এগুলো আপনাদের জন্যে ক্ষতিকর।

আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 'কোন ধরনের পোকার চারটি পা রয়েছে?' মাধ্যমিক স্তর পাস করা একজন ছাত্রও বলবে যে, পোকার পা ছয়টি। পৃথিবীতে এমন পাখি নেই পৃথিবীতে এমন কোনো জীবাশ্ম নেই, আর পৃথিবীতে এমন কোনো পোকা নেই –যাদের পায়ের সংখ্যা চারটি। অধিকন্তু, বাইবেলে এমন প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে যেন এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে ।

ঈসায়ী বইয়ের ৩৪তম অধ্যায়ের ৭ নং ধারার এক শৃঙ্গের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আপনি অভিধানে দেখতে পারেন যে, এক শৃঙ্গ বলতে এমন অশ্বকে বুঝায়–যার শিং একটি। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই যে, আমি যদি কোনো খ্রিস্টানের অনুভূতিতে আঘাত হেনে থাকি তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর সেটা আমার অভিপ্রায়ও ছিল না । এটা ছিল কেবল ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বইয়ের জবাব যে, কোরআন বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর বাইবেলের কোনো একটি বিশেষ অংশ প্রভুর কথা হলেও, সম্পূর্ণ বাইবেল অবশ্যই প্রভুর কথা নয়–এটা কোনো আপস নয়। আর যদি কোরআনের সেই কথা বলেই শেষ করতে চাই, যা পবিত্র কোরআনের সূরা ইসরার ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। নিশ্চয়ই মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব

সর্বপ্রথম ড. মোহাম্মদ, ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এবং ডা. জাকির নায়েককে তাঁদের সুন্দর উপস্থাপনা এবং প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করার ঘোষণা দিলেন। একই সময়ে, তিনি সকলের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, ডা. ক্যাম্পবেল এবং ডা. জাকির নায়েককে যেসব প্রশ্ন করা হবে তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ও 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআন এবং বাইবেল' শীর্ষক শিরোনামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

ডা. ক্যাম্পবেলকে প্রশ্ন : আমি ডা. ক্যাম্পলকে প্রশ্ন করতে চাই যে, নূহ (আ)-এর সময়ের প্লাবন কখন হয়েছিল? বলা হয়ে থাকে যে, এই প্লাবনের সময় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই প্লাবিত হয়েছিল। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এবং পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সবকিছুই প্লাবিত হয়েছিল। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এই প্লাবনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ প্লাবিত হয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল ১৫ কিউবিট (আঠার থেকে বাইশ ইঞ্চির সমপরিমাণ দূরত্ব সমান ১ কিউবিট) আরবি 'কদম' শব্দের অর্থ ফুটের সমপরিমাণ দূরত্ব। সুতরাং আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পবর্তশৃঙ্গের উচ্চতা ১৫ ফুট হওয়ার বিষয়টি সত্য নয়। আপনি জানেন যে, উক্ত শৃঙ্গের উচ্চতা ১৫ ফুটের চেয়ে বহুগুণে বেশি। সুতরাং ওল্ড টেস্টামেন্টে সৃষ্টিতত্ত্বের 'প্রথম' গ্রন্থে এ সম্পর্কিত যে বিবরণ রয়েছে তা কীভাবে সত্য হতে পারে? অর্থাৎ পানি কীভাবে সবকিছুকে প্লাবিত করেছিল? কীভাবে তা পৃথিবীর প্রতিটি পর্বতকে প্লাবিত করতে পারে– যার সর্বাধিক উচ্চতা মাত্র ১৫ ফুট বলা হয়েছে?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : আপনার প্রশ্নের জন্যে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় এটা কেবল একটি প্রবাদ যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা মাত্র ১৫ কিউবিট। যদি সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা ৩০০০ মিটার হয়, ভালো কথা উচ্চতা ১৫ ফুট.....১৫ ফুট সর্বোচ্চ পর্বতের উপরে, এটা হতে পারে। এরপর আমি পবিত্র কোরআনের দিকে দৃষ্টি দিব। আমার মনে হয়, পবিত্র কোরআনের বক্তব্য হতেও বিষয়টি একইভাবে উপলব্ধি করা যায়। কারণ, পবিত্র কোরআনের ১১তম সূরায় ৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَهِيَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ -

অর্থ : আর তা তাদেরকে নিয়ে সামনে বয়ে চলল পর্বতের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে।

আর তখন এটা এমন জায়গায় বলা হয়েছে যেখানে নবীদের তালিকা দেয়া হয়েছে– সেখানে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে কোনো নবী ছিলেন না। আমার জানা মতে, আদম (আ) ও একজন নবী ছিলেন, কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম না যেখানে এ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। আর আমি মনে করি যে, এটা পবিত্র কোরআনেও আছে যে, সমগ্র পৃথিবীই প্লাবিত হয়েছিল।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, আল্লাহ আলোর প্রতিফলন ঘটান এবং তিনি নূরের সৃষ্টি– আমি বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আমার প্রতি একটি প্রশ্ন রেখেছেন যে, সে আমার প্রতিপক্ষ ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথার জবাবে 'নূর' এবং 'আল্লাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যাটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। পবিত্র কোরআনের ২৪তম সূরা, সূরায়ে নূরের ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থ : আল্লাহ পৃথিবী ও আসমানের নূর বা জ্যোতি।

অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন নূর বা জ্যোতি। 'নূর' শব্দের অর্থ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'প্রতিফলিত আলো' বা 'ধারকৃত আলো' সুতরাং প্রশ্নটির উত্তর পুনরায় দেয়া হলো, যদি আপনি আয়াতটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে, এটি বলছে যে, এটা একটি কুলুঙ্গির ন্যায় আলো। কুলুঙ্গিতে একটি বাতি থাকে, যাতে তার নিজস্ব আলো আছে। যার অর্থ আল্লাহর নিজেই আলো এবং তাঁর এই নিজস্ব আলো প্রতিফলিতও হয়।

আল্লাহু ছুবহানাহু ওয়া তা'আলার আলো পুনরায় আল্লাহর নিজস্ব আলোতে প্রতিফলিত হয় যেভাবে একটি বৈদ্যুতিক বাতি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এর ভেতরে একটি টিউব আছে। এ বাতিটিকে বলা যেতে পারে 'সিরাজ' 'ওয়াহাজ' কিংবা 'দিয়া' আর প্রতিবিম্বকে বলা যেতে পারে 'মুনীর' কিংবা 'নূর'-যার অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' বা 'বীর করা আলো'। কিন্তু আপনি যে বাতি সম্পর্কে কথা বলছেন তা প্রকৃতপক্ষে কোনো শারীরিক আলো নয়। বরং এটা হচ্ছে আল্লাহু ছুবহানাহু ওয়াতা'আলার রূহানি বা আধ্যাত্মিক আলো। কিন্তু একটি জবাব, যা আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে দিয়েছিলাম তা আমি পুনরায় যথাযথভাবে উল্লেখ করতে চাই। আর এজন্যে আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : নূহ (আ) এর সময়ের প্লাবন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি এবং কোরআনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বক্তব্য রাখি, কারণ, উভয়

পদ্ধতিতেই পবিত্র কোরআন শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমি যদি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে একমত হই যে, এটাই সঠিক, সেটা বলা হয়েছে যে, প্লাবনের পানি সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের উপরে ১৫ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কিন্তু এটার বর্ণনা ওল্ড টেস্টামেন্টের জীবনবৃত্তান্তের (জেনেসিসের) ৭ নং অধ্যায়ের ১৯ এবং ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে, '.... সমগ্র পৃথিবীই পানির তলদেশে চলে গিয়েছিল।'

অধিকন্তু, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে যে, এ প্লাবনটি নূহ (আ)-এর সময় কালের অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২২ শতাব্দী সালে সংঘটিত হয়েছিল। আজকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদেরকে বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, ব্যাবিলনের ৩য় রাজবংশ এবং মিসরের একাদশ রাজবংশ খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দী সালে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু সে সময়কালের কোনো প্লাবনের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছেন।

কোরআন সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু বাইবেল অসামঞ্জস্যপূর্ণ

সুতরাং, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন, এটা অসম্ভব যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হয়েছিল– সমগ্র পৃথিবী খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দী সালে পানির নিচে নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে কী বলে?

প্রথমত, পবিত্র কোরআন কোনো তারিখ দেয় নি। এটা বলে নি খ্রিস্টপূর্ব ২১ শতাব্দী সালে কিংবা খ্রিস্টপূর্ব ৫০ শতাব্দী সালে– সেখানে এমন কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয় নি।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র কোরআন কোথাও বলে নি যে, সমগ্র পৃথিবী পানির তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন নূহ (আ) এবং তাঁর কওম বা জাতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে। নূহ (আ)-এর জাতি ছিল মানবজাতির একটি শাখা বা বৃহত্তর শাখা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজকে আমাদের বলছে এবং প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণও বলছে যে, "আমাদের কোনো আপত্তি নেই– এটা সম্ভব যে, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ পানির নিচে প্লাবিত হয়েছিল কিন্তু সমগ্র পৃথিবী পানির নিচে নিমজ্জিত হতে পারাটা অসম্ভব। এভাবে, আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য এর বিপরীত।

এছাড়া, যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্টের ৬ নং অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৬ নং ধারাটি পড়েন তাহলে দেখবেন, এটি প্রভু সম্পর্কে বলছে যে, তিনি নূহ (আ)-কে একটি নৌকা তৈরি করতে বলেছিলেন– যার দৈর্ঘ্য হবে ৩০০ কিউবিট এবং প্রস্থ হবে ৫০ কিউবিট ও উচ্চতা হবে ৩০ কিউবিট। ১ কিউবিটে দেড় ফুট। ভাই ক্যাম্পবেল

একটু ভুল বলেছেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্করণ বলেছে যে, ---- ৪৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৭৫ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতা ছিল জাহাজটির। আমি বিষয়টি গণনা করে দেখেছি যে, এর ঘনফল ১৫০ হাজার ঘনফুটের কিছুটা কম এবং আয়তন ৩৩,৭৫০ বর্গফুট। আর বাইবেলে বলা হয়েছে যে, জাহাজ ৩ তলাবিশিষ্ট ছিল– প্রথম তলা, দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলা। সুতরাং, উক্ত আয়তনকে ৩ দ্বারা গুণ করলে এর আয়তন পাওয়া যায় ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুট। বিষয়টি ভেবে দেখুন, পৃথিবীর সব জীবের এক জোড়া করে এই ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুটে তুলে নেয়া হয়েছিল। চিন্তা করে দেখুন, এটা কি সম্ভব? পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন জীব রয়েছে। যদি আমি বলি..... 'এই অডিটোরিয়ামে এক মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়েছে।'

আপনারা কি বিশ্বাস করবেন? আমার মনে আছে, গত বছর কেরালায় আমার এক সভায় এক মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে, এটা ছিল আমার দেয়া লেকচারসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ জনসমাগম। এক মিলিয়ন লোক। আমি লেকচারের শেষটা দেখতে পাই নি। এটা কোনো অডিটোরিয়াম ছিল না– বরং এটা ছিল একটা বড় সমুদ্র উপকূল। আমি সামনে বসা কয়েকজন লোক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি। আপনি যদি ঐ ১ মিলিয়ন জনসমুদ্রের ভিডিও ক্যাসেটটি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ১ মিলিয়ন কত বড়। আরাফার ময়দানে ২$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়। সুতরাং ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুটের কিংবা ১৫০ হাজার ঘনফুটের একটি জাহাজ পৃথিবীর সকল জীবের এক জোড়া প্রাণীর অবস্থান অসম্ভব? তাছাড়া এসকল প্রাণী সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করেছিলেন। তারা সেখানে খেয়েছেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছেন। যদি বলা হয়, ১ মিলিয়ন লোক এই অডিটোরিয়ামে এসেছে'– আপনি কি বিশ্বাস করবেন? সুতরাং, বৈজ্ঞানিকভাবে সেখানে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যা বাইবেলের বর্ণনাকে ভুল প্রমাণিত করে।

ডা. ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আপনি কেন বাইবেলের জালকরণ শীর্ষক পরীক্ষায় নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন না? অথচ মার্কের বইয়ের ১৬তম অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ নং ধারায় বর্ণনা অডিয়েন্সের নিকট এইমাত্র প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনি একজন সত্যিকার খ্রিস্টীয় দর্শনে বিশ্বাসী?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো কথা, আমি ডা. জাকির নায়েকের ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। প্রভু যিশু নিজেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং শয়তান বলেছিল, 'যদি তুমি প্রভুর ছেলে হয়ে থাকো, তাহলে তোমার নিজেকে গীর্জায় নিয়োজিত করো।' আর তখন যিশু বলেছিলেন, 'তুমি তোমার প্রভুকে পরীক্ষা করতে পারবে না।' আমি যদি ঐদিনে সেখানে থাকতাম তাহলে বলতাম, 'হ্যাঁ, আমি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে তোমার সামনে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছি।'

আমি প্রভুকে পরীক্ষা করতাম। বন্ধুগণ, আমার বন্ধু হ্যারি র‍্যানক্লিফ যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর তিনি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন এবং সত্য প্রভু তার ইচ্ছেকে পূরণ করেছিল। এটা একটি আলাদা পরিস্থিতি। আমি প্রভুকে পরীক্ষা করতে পারব না।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পানির দৃষ্টান্ত প্রদান করে থাকে। কারণ, পানির তিনটি অবস্থা রয়েছে। যেমন : কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। বরফ অবস্থায় পানি কঠিন আকার ধারণ করে। একইভাবে, একক প্রভুরই তিনটি অবস্থা তথা এক প্রভুতেই তিন প্রভুর অবস্থান– পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, মা মেরী। বৈজ্ঞানিকভাবে এ ব্যাখ্যাটি কি সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক : প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার পূর্বে একটি মন্তব্য করতে চাই– 'আমাদের প্রভুকে পরীক্ষা করা উচিত নয়।' কিন্তু এখানে আমরা প্রভুকে পরীক্ষা করছি না, আমরা মানব নামক জীবকে পরীক্ষা করছি। আমরা আপনাদের পরীক্ষা করছি আর প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যেকোনো বিশ্বাসী লোক মারা যাবে– সে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারবে। যেহেতু আমরা জানি যে, প্রভু সঠিক– তাই আমরা প্রভুকে পরীক্ষা করছি না। তিনি এটা দেখবেন যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীই কথা বলতে পারবেন। আমরা আপনাদের পরীক্ষা করছি, যাতে আপনারা বিশ্বাসী কিনা তা যাচাই করতে পারি।

এবার প্রশ্নের উত্তরে আসি, বৈজ্ঞানিকভাবে, আমি একমত পোষণ করি যে, পানির ৩টি অবস্থা। যেমন : কঠিন, তরল ও বায়বীয়– বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে, আমরা আরো জানি যে, পানির উপাদানগুলো উক্ত তিন অবস্থারই একরূপই থাকে। H_2O-যাতে হাইড্রোজেনের ২টি অণু এবং অক্সিজেনের একটি অণু। উপাদানসমূহ এবং গঠন একই সমান থাকে। কেবল রূপটা পরিবর্তিত হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই। এখন আমাদের ত্রিত্ববাদের-পিতা, পুত্র এবং মা মেরি রূপের ধারণাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চাই। তারা বলে, "রূপ পরিবর্তিত হয়।" বিতর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিইও, তাহলে উপাদানগুলোর কি পরিবর্তন হতে পারে? প্রভু এবং মা মেরীকে আধ্যাত্মিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। মানব নামক জীবকে গোশত এবং হাড়ের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। তারা কখনোই সমান হতে পারে না।

মানব নামক জীব খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করে অথচ প্রভু বাঁচার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করেন না। সুতরাং তারা সমান নয়। আর এ বিষয়টিই পরীক্ষিত হয়েছিল যীশু খ্রিস্ট (আ)। লুক-এর ২৪ নং অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৩৯ নং ধারায় এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "আমার হাত ধরো এবং হাঁটো– আমাকে চালাও

এবং দেখো, আর আত্মার কোনো মাংস বা হাড্ডি নেই।" আর তখন তিনি তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা দেখলো আর অত্যধিক আনন্দে ফেটে পড়লো। আর তিনি বললেন যে, "আপনার নিকট কি খাওয়ার মতো কোনো গোশত আছে?" আর তারা তাকে অধিক তাপে ঝলসানো মাছ এবং এক টুকরো মৌচাক যা তিনি খেয়েছিলেন। এটা কী প্রমাণ করে? তিনি কী প্রভু ছিলেন? এর প্রমাণ ছিল এটাই যে তিনি প্রভু ছিলেন না। তিনি খেতেন এবং তার গোশত এবং হাড় ছিল অথচ আত্মার কোনো গোশত এবং হাড় থাকে না। এটা প্রমাণ করে যে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রভু, যিশু (আ) এবং মা মেরী–এ তিনজন সর্বশক্তিমান প্রভু নয়। আর ত্রিত্ববাদের ধারণাটির মধ্যে ব্যবহৃত। ত্রিত্ববাদ শব্দটি বাইবেলের কোথাও দেখা যায় না। বরং ত্রিত্ববাদের ধারণাটি ব্যক্ত করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। যেমন, পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সূরা, সূরায়ে নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ـ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ـ

অর্থ : ত্রিত্ববাদের কথা বলো না.......এটা বলা ছেড়ে দাও। এটাই তোমার জন্য সর্বোত্তম পন্থা।

এছাড়া ৫ম সূরা সূরায়ে মায়িদার ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ـ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

অর্থ : যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই। যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।

যিশু খ্রিস্ট (আ) কখনোই বলেন নি যে, তিনি প্রভু

যিশু খ্রিস্ট (আ) কখনোই বলেন নি যে, তিনি নিজেই প্রভু। ত্রিত্ববাদের ধারণাটি বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল একটি ধারা যা ত্রিত্ববাদের ধারণাটির সন্নিকটবর্তী– তা হচ্ছে জন বিরচিত Epistle-এর পঞ্চম অধ্যায়ের ৭নং ধারাটি। এ ধারাটিতে বলা হয়েছে, 'স্বর্গে পিতা, যিশু এবং পবিত্র মা সকল রেকর্ড বহন করবে।' আর এই তিনজনই হচ্ছেন একজন। কিন্তু যদি আপনি এর পরবর্তী সংস্করণটি পড়েন, যা ৩২ জন খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ লিখেছেন তাতে তারা বলেছেন, বাইবেলের এ ধারাটি হচ্ছে একটি প্রক্ষেপণ, একটি বানানো গল্প, একটি মিথ্যা কাহিনী। এটি অন্যায়ভাবে বাইবেলে প্রবেশ করানো হয়েছে।

যিশু খ্রিস্ট (আ) কখনো প্রভুত্ব দাবি করেন নি। সমগ্র বাইবেলের কোথাও একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না যাতে যিশু খ্রিস্ট (আ) বলেছেন, 'আমি প্রভু।' কিংবা যাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমার উপাসনা করো।'

যদি আপনি বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, জন বিরচিত Gospel-এর ১৪তম অধ্যায়ের ২৮ নং ধারায় বলা আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আমার পিতা আমার চেয়ে মহত্তর।' জন বিরচিত ১০ম অধ্যায়ের ২৯নং ধারায় তিনি বলেছেন, 'আমার পিতা সকলের চেয়ে ক্ষুদ্রতম।' ম্যাথিউ বিরচিত Gospel-এর ১২তম অধ্যায়ের ২৮ নং ধারায় তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভুর আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করছি।' লুক বিরচিত Gospel-এর ১১তম অধ্যায়ের ২০তম ধারায় তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভুর আঙ্গুলি দিয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করছি।' জন বিরচিত Gospel-এর ৫ম অধ্যায়ের ৩০ নং ধারায় তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের থেকে কোনো কাজ সম্পাদন করি না।' যেভাবে আমি শুনি, আমি বিচার করি এবং আমার বিচারই সঠিক, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করি না বরং আমার প্রভুর পিতার ইচ্ছায় সবকিছুই করি।

যিশু খ্রিস্ট (আ) প্রভুর অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যুকে জীবনদান করতে পারতেন

যদি কেউ বলে, 'আমার ইচ্ছায় নয় বরং প্রভুর ইচ্ছায়ই সবকিছু করি।' তাহলে সে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান মানে হচ্ছে এমন একজন লোক যে তার নিজ ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করে। যিশুখ্রিস্ট (আ) বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছায় নয় বরং প্রভুর ইচ্ছায়ই সবকিছু করি।' তিনি ছিলেন একজন মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি ছিলেন মহান প্রভুর প্রেরিত সবচেয়ে শক্তিমান রাসূলগণের অন্যতম। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর অনুমতিতে মৃত্যুকে জীবন দান করতে পারতেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারতেন মহান আল্লাহর অনুমতিতে। আমরা যিশুখ্রিস্ট (আ)-কে মহান আল্লাহর প্রেরিত শক্তিমান রাসূলদের অন্যতম হিসেবে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি প্রভু নন আর তিনি তিন খোদার একজনও নন। পবিত্র কোরআন বলেছে, 'হে নবী করীম ﷺ! বলুন, তিনিই প্রভু, যিনি এক ও একক।'

ডা. ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : প্রশ্নটি হচ্ছে যে, আজকে রাতে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। এটা আমাদেরকে উপকার করতে পারে। আর তাই আমি ডা. ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একজন খ্রিস্টান এবং আপনার সহকর্মী হিসেবে বলতে চাই যে, এই পর্বটি কি আপনার হৃদয়কে খুলে দিবে? অন্ততপক্ষে এ আলোচনা কি আপনার হৃদয়পটে এতোটুকু আলো প্রজ্জ্বলিত করবে যা ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আপনাকে অনুসন্ধানী হতে উৎসাহ যোগাবে?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো, আমি মনে করি যে, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে ইতোপূর্বে করা সর্বশেষ প্রশ্নটির উত্তরের সাহায্য নিব। ডা.

জাকির নায়েক বলেছেন, 'এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যিশু বলেছেন যে, তিনি প্রভু।' মার্কের ১৪ : ৬১ ধারায়, তিনি জবাব দেন নি এবং পুনরায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুরোহিতগণ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, 'আপনি কি প্রভুর ছেলে খ্রিস্ট? অন্যকথায়, 'আপনি কি প্রভুর ছেলে খ্রিস্ট?' আর এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রভুর সন্তান খ্রিস্ট।' অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, 'আমি প্রভুর ছেলে।' আর তিনি বলেছেন, 'তিনি স্বর্গীয়।' বাইবেলে এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আমার মনে হয় ডা. জাকির এসব ধারাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়ার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছেন এবং যেখানে যিশু মানবীয় রূপে ছিলেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এমন সব ধারা রয়েছে যাতে তিনি বলেছেন, 'আমি এবং প্রভু (পিতা) একজনই।' এ ধারাটি বলেছে যে, 'আদিতে ছিল একটি কথা, আর এ কথাটি বলেছেন প্রভু আর কথাটি হলেন প্রভু। প্রভু গোশতের তৈরি, আর তিনি আমাদের মাঝেই বাস করেন।'

খ্রিস্টীয় অনুষ্ঠানে পিতা কথা বলছেন এবং বলছেন, 'এই হচ্ছে আমার স্নেহের পুত্র।' যিশু সেখানে ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা সেথায় অবতরণ করেছিল। পিতা (প্রভু) ছেলে এবং পবিত্র আত্মা মা মেরী। এ বিষয়টি আমরা কোনো একটি খাত থেকে তৈরি করি নি। কেবল একটি ছোট বিষয় হিসেবেই নিয়েছি। আর এখন আমার বন্ধু এখানে আমাকে প্রশ্ন করছেন....'আমরা বেশ কিছু বিষয় শিখেছি।' আর আমি সবসময়ই শিখতে চাই। কিন্তু আমি এখনো মনে করি যে, ৫০০ প্রত্যক্ষদর্শী যা দেখেছেন যে, যিশু মৃত্যুকে জীবিত করেছেন– যা আমার নিকট তার ৬০০ বছর পরে আবির্ভূত হওয়া মুহাম্মদ ﷺ-এর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী মনে হয়। আপনাকে ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : ডা. ক্যাম্পবেল প্রথমেই বলেছিলেন যে, তিনি পবিত্র কোরআনে পৃথিবী সম্পর্কে যেসব ভুল-ক্রটির ভাষণ রয়েছে তা আলোচনা করবেন আর আপনি এসব অভিযোগ খণ্ডন করবেন। যাহোক, এটি আলোচনা করা হয় নি যে, বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ কী কী?

ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি বলেছেন যে, আমি বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আলোচনা করি নি। এটা সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে ১০০টি পয়েন্ট বের করতে পারি কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে তা করতে পারছি না। যাহোক, বোন জানতে চেয়েছেন যে, বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে?

বাইবেলে এটা বর্ণিত আছে। ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ৪ নং অধ্যায়ের ৮ নং ধারায় এটা বলা হয়েছে। এ রেফারেন্সটি পরীক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় ডা.

উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ব্যবহার করেছেন। The deir took him (অর্থাৎ, যিশু (আ) উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করার সময় তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর সকল রাজ্য এবং এর গৌরবান্বিত বিষয়সমূহকে দেখানো হয়েছিল। লুক বিরচিত গসপেলের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে.... 'শয়তান তাকে সুউচ্চ পর্বতের ওপর নিয়ে গেল এবং তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যসমূহের গৌরবান্বিত বিষয়সমূহ দেখালো।'

বাইবেল বলছে, পৃথিবী হচ্ছে স্ফীত

এখন আপনি যদি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করেন অর্থাৎ, যদি মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন আর যদি আপনার চোখের দৃষ্টি ভালো থাকে এবং আপনি একই সময়ে হাজার হাজার মাইল দেখতে পান, যদিও আপনি পৃথিবীর সমগ্র রাজ্যসমূহ দেখতে পাবেন না কারণ, আজকে আমরা জানি, পৃথিবী গোলাকার। আপনি পৃথিবীর বিপরীত অংশের রাজ্যসমূহকে দেখতে পাবেন না। এটা কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন পৃথিবী গোলাকার না হয়ে স্ফীত আকার বিশিষ্ট হবে। এটাই বাইবেলের বর্ণনা, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, 'পৃথিবীর আকার হচ্ছে স্ফীত।'

প্রথম কালানুক্রমিক, ১৬ নং অধ্যায়ের ৩০ ধারায় বলা হয়েছে, 'পৃথিবী ঘোরে না'।

আবারও একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ড্যানিয়েল বিরচিত বইয়ের ৪র্থ অধ্যায়ের ১০ ও ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'একটি স্বপ্নে দেখা গেল যে, স্বর্গে একটি গাছ বেড়ে ওঠল, যখন এটি বেড়ে ওঠল তখন এটি উঁচু হলো যে, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকেই ঐ বৃক্ষটিকে প্রত্যেকে দেখতে পারল।' এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকার স্ফীত হয়। যদি গাছটি অনেক উঁচু হয় এবং পৃথিবীর আকার স্ফীত হয় তাহলেই কেবল এটি সম্ভব। আজকে এটি সার্বজনীন গ্রাহ্য বিষয় যে, পৃথিবী গোলাকার। আপনি গোলাকার পৃথিবীর বিপরীত দিক থেকে গাছটি যতই উঁচু হোক না কেন তা দেখতে পাবেন না।

অধিকন্তু, আপনি যদি পড়েন, এটি ১ম কালানুক্রমিকের ১৬ নং অধ্যায়ের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'পৃথিবী ঘোরে না।' Psalms কর্তৃক রচিত বইয়ের ৯৩ নং অধ্যায়ের ১ নং ধারায় এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির করে দিয়েছেন।' যার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী ঘোরে না। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণে এটা বলা হয়েছে যে, 'প্রভু অদ্যাবধি পৃথিবীকে স্থির এবং এর ঘূর্ণায়নকে বন্ধ করে রেখেছেন।'

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন যে, যিশুখ্রিস্ট (আ) বাইবেলের বেশ কয়েক জায়গায় বলেছেন যে, 'তিনি ছিলেন প্রভু।' আপনি আমার Concept of God in

major Religion (বিভিন্ন ধর্মে প্রভুর ধারণা) শিরোনামের ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন, যাতে সকল প্রকার রেফারেন্স এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমি এখানে কেবল তাঁর উদ্ধৃত একটি রেফারেন্সের জবাব দিব। তিনি বলেছেন, 'আমি এবং আমার পিতা একজনই।' এটা জন রচিত বাইবেলের ১০ নং অধ্যায়ের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে। এছাড়া জন রচিত বাইবেলের ১ নং অধ্যায়ের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আদিতে ছিল কেবল একটি কথা বা শব্দ।' যিশু খ্রিস্ট (আ) কখনোই প্রভুত্ব দাবি করেন নি। আপনারা আমার Concept of God in major religion (বিভিন্ন ধর্মে প্রভুর ধারণা) আর Similarities between Islam and Christianity (ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য) শীর্ষক ভিডিও ক্যাসেটটি এ হিসেবে বাইরে পাওয়া যায়। এসব ক্যাসেটে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, যিশুখ্রিস্ট (আ) কখনোই প্রভুত্ব দাবি করেন নি।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী লোক বিষ পান করেও তার বিশ্বাসের জোরে বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে রাসপুটিন যিনি সায়নাইড দ্বারা বিষাক্রান্ত হয়ে ১৬ জন লোককে হত্যা করেছিল কিন্তু এটা তাকে নিজেকে হত্যা করতে পারে নি। সে রক্তশূন্যতার কারণে মারা গিয়েছিল। সে একজন ভালো খ্রিস্টান ছিল না– তার এ সবকিছুই ছিল। আপনি এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ভালো, কেবল একজন ভালো খ্রিস্টানই এ বিষ পান করতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে– এটাকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো প্রশ্ন। আমি ভাবি নি যে, এটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি মনে করি, যদি রাসপুটিন একজন ভালো খ্রিস্টান না হয়, তাহলে তার প্রতি যা ঘটেছিল তা বাইবেলে বর্ণিত বিষয়ের ভিত্তি হতে পারে না। আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম,......যিশু....প্রভু আমাদেরকে সঠিক লাইনের বাইরে চলতে এবং এখনই বিষ পান শুরু করার নির্দেশনা দেন নি। দুঃখিত। এটি প্রভুকে পরীক্ষা করার জন্যে ছিল না। এটা এজন্যেই বলা হয়েছিল যে, এসব বিষয় অবশ্যই ঘটবে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে পল– যিনি গিয়েছিল যখন সে জাহাজ ডুবিতে পতিত হয়েছিল তখন সে আমি মনে করি এটা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে, কিন্তু আমি মনে ভুল জায়গার কথা উল্লেখ করছি। আর সে ভূপাতিত হয়েছিল। আর এভাবে সে আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি সাপ তাকে দংশন করেছিল.......কিন্তু তার কিছুই হয় নি। কিন্তু সে প্রভুকে পরীক্ষা করতে চায় নি– সে আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। এটা ছিল একটি কঠিন পরিস্থিতি।

এটা যেন পৃথিবীর চক্র সম্পর্কে কোনো কিছু বলা। ইসাঈ'র ৪০ : ২২ ধারায় বলা হয়েছে, 'তিনিই প্রভু, যিনি পৃথিবীর চক্রের উপরিভাগে অবস্থান করে আছেন।'

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, পবিত্র কোরআনে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আমি দেখেছি যে, এতে ২০টিরও অধিক আরবি ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। আমি এদের মধ্য থেকে আপনাকে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। তিনি সূরায় বাকারা ও সূরায় হাজ্জে বলেছেন, 'আসাবিউন' কিংবা 'আসাবিরীন' বলা হয়েছে– এটা ১ নম্বর ভুল। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, আপনি বলেছেন, প্রায় একই বিষয় যা সূরা ত্ব-হার ৬৩ নং আয়াতে রয়েছে........এটাও ভুল। এটি কি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন? আর সেখানে এর চেয়েও মারাত্মক ভুল রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক : আমার ভাই একটি অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমাকে আরো অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থ হতে হবে। তিনি ২০টি ব্যাকরণগত সমস্যার কথা বলেছেন। আর তিনি আব্দুল ফাদি কর্তৃক রচিত যে বইয়ের উল্লেখ করেছেন সেটা কি সঠিক? কোরআন কি ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়? আমি বেশ কিছু বিষয় দেখতে সমর্থ হই– আলহামদুলিল্লাহ, আমার চোখের দৃষ্টিশক্তিও বেশ ভালো।

কোরআন হচ্ছে আরবি ব্যাকরণের পাঠ্যবই এবং সকল আরবি ব্যাকরণই কোরআন থেকে সংকলিত

ইনশাআল্লাহ, আমি ২০টি প্রশ্নেরই উত্তর দিব, কারণ আমি উল্লিখিত বইটি পড়েছি। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে সকল আরবি ব্যাকরণই পবিত্র কোরআন থেকে সংকলিত হয়েছে। আর কোরআন হচ্ছে উচ্চমানের আরবি বই। এটা এমন একটি বই যাতে সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্যাকরণের যতসব পাঠ্য বই রয়েছে এদের সবই পবিত্র কোরআনের নিয়ম-কানুনের আলোকে সংকলিত হয়েছে। যেহেতু কোরআন হচ্ছে ব্যাকরণের পাঠ্যবই আর সকল আরবি ব্যাকরণই পবিত্র কোরআন থেকে সংকলিত সেহেতু এর কোনই ভুল থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এটা আপনার জানা রোলার গ্রহণ করার ন্যায় এবং রোলারের একটি পরিমাপ রয়েছে। এখন আপনি বলতে পারেন, পরিমাপটি ভুল– এ ধরনের কথা অযৌক্তিক। দ্বিতীয় বিষয়টিতে বলা যায় যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আপনিও জানেন যে আরবেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও আমার সাথে একমত হবেন যে, বিভিন্ন গোত্রের বিদ্যমান থাকায় আরবি ব্যাকরণও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোন গোত্রে একটি শব্দ স্ত্রীবাচক হতে পারে। ঠিক ঐ শব্দটিই অন্য গোত্রে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দের এ রকম বিভিন্ন লিঙ্গে ব্যবহারের কারণে ব্যাকরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সঙ্গের লিঙ্গ ও বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আপনি কি

ভুলকৃত ব্যাকরণ দিয়ে কোরআন যাচাই করবেন? অবশ্যই না। আরও যে বিষয়টি বলতে চাই, কোরআনের শব্দায়ন এতোই উচ্চ আঙ্গিকের যে, এটা অত্যন্ত উচ্চমানের।

আপনি জানেন যে, ইন্টারনেটে বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। আপনি ১২-২০ ব্যাকরণগত ভুল বইটি সেখান থেকে পড়তে পারেন। আপনি কি মনে করেন যে, খ্রিস্টানরা এসব ভুল গ্রহণ করেছে? আপনি কি জানেন কারা এসব ভুল গ্রহণ করছে? মুসলমানরা। মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ যেমন, জামাক শরিক– তারা কি করেছিল তারা বলেছিল, কোরআনের ব্যাকরণ এতোই উচ্চ মানের যে, এটা আরবি ব্যাকরণের প্রচলিত বই থেকে উন্নততর। তারা আরবি ব্যাকরণের প্রমাণ কোরআন থেকে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আমি আপনাদের দুটি উদাহরণ দিব, যা আপনাদের ২০টি প্রশ্নেরই জবাব দিবে। তারা যে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন তা হচ্ছে আমরা যখন কোরআন পড়ি তখন দেখতে পাই লুত (আ)-এর জাতির লোকেরা সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, নূহ (আ)-এর জাতি রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ (আ)-এর জাতির নিকট একজন মাত্র নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি একটি ব্যাকরণগত ভুল। কোরআনের বলা উচিত ছিল নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল বলা ঠিক হয় নি। আমি আপনাদের সাথে একমত যে, এটা ভুল হতে পারে। কিন্তু আপনারা যদি আরবদের কর্তৃক রচিত বইগুলো পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, কোরআনের সৌন্দর্য কী? পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য হচ্ছে কোরআন কেন 'রাসূল' শব্দের পরিবর্তে 'রাসূলদের' শব্দের ব্যবহার করছে সেটা। আপনারা জানতে পারবেন এটা কেন করা হয়েছে? কারণ, আমরা জানি যে, সকল রাসূলের মৌলিক বাণী একই রকম ছিল। যেমন, প্রভু একজন- আল্লাহর একত্ববাদ– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক ও একজন। লুত (আ)-এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, লুত (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করে প্রকারান্তে তারা পরোক্ষভাবে সকল রাসূলকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখুন সৌন্দর্য কাকে বলে? দেখুন, অলঙ্কারিত্ব আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভাবতে পারেন এটা একটি ভুল। কিন্তু এটা কোন ভুল নয়। একইভাবে কিছু কিছু লোক যেমন আনিস সুরেয়া বলেছেন কোরআন বলেছে যে, 'কুন ফাইয়া কুন' অর্থাৎ, 'হও, অতঃপর হয়ে যায়।'এটা হওয়া উচিত ছিল 'কুন ফা কানা।' অর্থাৎ, 'হয়ে যাও অতঃপর হয়ে গেল।' আরবিতে 'কুন' শব্দের অতীতকাল হচ্ছে কানা সুতরাং 'কুন ফা ইয়াকুন'-এর পরিবর্তে 'কুন ফা কানা' বলা উচিত ছিল। কিন্তু 'কুন ফা ইয়াকুন' বলাটাই অধিকতর যুক্তিসংগত হয়েছে। কারণ এটা বলেছে যে, আল্লাহ যা ছিল, আছে এবং

হবে সবকিছুই সৃষ্টি করতে পারেন। অর্থাৎ, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ তিনকালকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : এটা একটি অনুভূতিমূলক প্রশ্ন– যেটি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে একটু বেশি জানার জন্যে উপস্থাপন করছি। আমি জানতে চাচ্ছি যে, যিশুর মন্ত্রণালয় ৩ বছর স্থায়ী ছিল। সুতরাং যিশু ছিল ঈশ্বরের পর দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র তাই তাঁর শৈশবকাল অর্থাৎ, ১ বছর থেকে ২৭ কিংবা ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত গুরুত্বর্পূ অবদানগুলো কী কী? উপস্থাপনার শুরুতেই ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল পবিত্র কোরআনের ১৮তম সূরা, সূরায়ে কাহাফ থেকে যুলকারনাইনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, যুল কারকানাইন হচ্ছেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। আপনি কি আমাকে এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন যে, যুলকারনাইনই হচ্ছেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : আমি এটা কেবল ইউসুফ আলীর ব্যাখ্যা পড়ে জেনেছি। কিন্তু আসলেই তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট না অন্য কেউ ছিলেন তা যথার্থভাবে বলা অসম্ভব। সূর্য বুধ কিংবা মঙ্গল গ্রহকে স্থাপন করে নি– এটাই সে দ্রব্য যা এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : আমি বাইবেলের ধারাটি সঠিকভাবে জানি না। কিন্তু বাইবেল বলেছে, 'ইউনুস (আ) ৩ দিন ৩ রাত একটি মাছের পেটে ছিলেন, সেভাবে একজন মানুষ কী ৩ দিন ৩ রাত মাটির গর্তে থাকতে পারে।' যিশু (আ) কি বৈজ্ঞানিকভাবে ইউনুস (আ)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পেরেছিলেন।

ডা. জাকির নায়েক : প্রশ্নকারিণী বোন যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন তার বর্ণনা ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১২তম অধ্যায়ের ৩৮ এবং ৪০ নং ধারায় রয়েছে। যখন লোকেরা যিশুখ্রিস্ট (আ) কে বললো, 'আমাদেরকে একটি নিদর্শন বা একটি অলৌকিক মুজেযা দেখান।' যিশুখ্রিস্ট (আ) বললেন 'তোমরা শয়তান এবং ইবলিসের সন্তান, তোমরা নিদর্শন দেখতে চাচ্ছ, তোমাদেরকে কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না। তবে ইউনুস (আ)-এর নিদর্শনের কথা বলছি। ইউনুস (আ) ৩ দিন ৩ রাত একটি তিমি মাছের পেটে ছিলেন, যেভাবে একটি শিশু ভূ-গর্ভে ৩ দিন ৩ রাত অবস্থান করতে পারে।' এটাই হচ্ছে ইউনুস (আ)-এর মুজিযা।

যিশুখ্রিস্ট (আ) তাঁর সমস্ত ডিমগুলোকে একটি থলের ভেতর রাখলেন। আর আপনি যদি ইউনুস (আ)-এর নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চান তাঁর বর্ণনা ২ পৃষ্ঠারও কম যা আমরা সবাই জানি। আর আপনি যদি এটা বিশ্লেষণ করেন যে ইউনুস (আ) তিন দিন তিন রাত মাছের পেটে ছিলেন কিন্তু যিশুখ্রিস্ট (আ)-আমরা গসপেলের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। পড়ন্ত বিকেলে তাঁকে ক্রুশ

থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং পুণ্যসমাধিতে রাখা হয়েছিল। আর রোববার সকালের দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে, পাথরগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁর পূর্ণ সমাধি খালি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট (আ) শুক্রবার রাতে কবরে ছিলেন, তিনি শনিবার সকালেও সেখানে ছিলেন একদিন এবং এক রাত। আর তিনি সেখানে শনিবার রাতেও ছিলেন–সুতরাং দুই রাত এবং এক দিন। রোববার সকালে সমাধি ছিল খালি। সুতরাং যিশু খ্রিস্ট সেখানে দুই রাত এবং একদিন ছিলেন। তাই এটা ৩ দিন ৩ রাত নয়।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইয়ে এর জবাব দিয়েছেন 'তুমি জান, দিনের যেকোন একটি অংশ সমস্ত দিন হিসেবে গণনা করা যায়।' যদি কোনো রোগী আমার নিকট আসেন, কে শনিবার রাতে অসুস্থ ছিল কে সোমবার সকালে অসুস্থ থাকে। আর যদি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কতক্ষণ ধরে অসুস্থ? 'তাহলে তিনি জবাবে বলবেন, ৩ দিন ধরে অসুস্থ।' আমি আপনার সাথে একমত সাম স্যপূর্ণ বক্তব্যে; এ ব্যাপারে আমি খুবই উদার। আপনি বলেছেন, দিনের একটি অংশ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দিন। সুতরাং শনিবার রাত দিনের একটি অংশ– একদিন। রোববার দিনের একটি অংশ পরিপূর্ণ একটি দিন–একদিন ভালো। সোমবার দিনের একটি অংশও পরিপূর্ণ একটি দিন কোনো সমস্যা নেই।

যদি রোগী বলেন, ৩ দিন কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো রোগীই কখনো বলবে না....'তিন দিন এবং তিন রাত।' আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে একথা বলতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি বিভিন্ন প্রকার রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকি। আমি এমন কোনো একজন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করিনি এমনকি কোনো খ্রিস্টান মিশনারি রোগীর সাথেও যে কখনো আমাকে বলেছে যে, সে গত পরশু রাতে অসুস্থ হয়েছে। অর্থাৎ এমন বলে নি 'আমি ৩ দিন ৩ রাত ধরে অসুস্থ।' সুতরাং যিশুখ্রিস্ট (আ) বলেন নি, ৩ দিন তিনি বলেছিলেন, ৩ দিন এবং ৩ রাত । সুতরাং এটি একটি গাণিতিক ভুল। বৈজ্ঞানিকভাবে, যিশুখ্রিস্ট (আ) এটা প্রমাণ করেন নি। এছাড়া আরো বক্তব্য রয়েছে, ঐশী বাণীতে বলা হয়েছে ইউনুস (আ) ছিলেন, যেভাবে মানুষের সন্তান থাকে। কীভাবে ইউনুস (আ) একটি তিমি মাছের পেটে ছিলেন। মাছের পেটে ..... জীবিত না, মৃত্যু? জীবিত– যখন তাঁকে নৌকা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন। তিমি মাছের পেটে, তিনি ছিলেন গভীর সমুদ্রে, জীবিত না মৃত? জীবিত। তিনি জীবিত, না মৃত? জীবিত! তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন.... তখন তিনি জীবিত না, মৃত? জীবিত! তাকে সমুদ্র তীরে উদগীরণ করা হয়েছিল– তখন তিনি জীবিত না মৃত ছিলেন। জীবিত! যখন আমি খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করি যিশুখ্রিষ্ট (আ) কীভাবে পুণ্যসমাধিতে ছিলেন? জীবিত না মৃত? তারা আমাকে বলেছেন, 'মৃত'।

যিশুখ্রিস্ট (আ) ক্রুশবিদ্ধ হন নি

সভাকক্ষে উপস্থিত দর্শকরা বলেছেন, 'জীবিত'। ডা. জাকির নায়েক সংক্ষেপে বলেছেন, 'জীবিত'? আলহামদুলিল্লাহ! এটা কি খ্রিস্টবাদ? যদি তিনি জীবিতই থেকে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন নি– যদি তিনি মৃত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর নিদর্শনকে পরিপূর্ণ করতে পারেন নি। আপনারা এ সম্পর্কিত আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন, 'যিশুখ্রিস্ট (আ) কি সত্যিকার অর্থেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।' আমি প্রমাণ করেছি যে যিশুখ্রিস্ট (আ) ক্রুশবিদ্ধ হন নি। যেহেতু কোরআনের সূরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -

অর্থ : তাঁরা তাঁকে হত্যা করে নি, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করে নি। এটা ছিল কেবল তাদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, যেহেতু আপনি একজন মেডিকেল ডাক্তার। আপনি কি বাইবেলে প্রদত্ত বিভিন্ন মেডিকেল সম্পর্কিত বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবেন? কারণ ইতোপূর্বের আলোচনায় আপনি এসব বিষয়ের জবাব দেন নি। উদাহরণস্বরূপ, রক্ত ব্যবহৃত হয় জীবাণুনাশক প্রতিষেধক হিসেবে, তিক্ত পানি দূষিত হওয়ার পরীক্ষা, আর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে মহিলারা পুত্র সন্তান জন্মদানের চেয়ে কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার প্রাক্কালে দ্বিগুণ সময় ধরে অপবিত্র বা হায়েজা অবস্থায় থাকে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : প্রশ্নের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আর আমি এটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক এমন কিছু প্রশ্ন রেখে গেছেন, যা খ্রিস্টানদের নিকট পরিষ্কার হওয়া উচিত। এটা বলছে যে, পরবর্তী দিনে যখন একদিন হয়ে গেল প্রস্তুতির পর প্রধান পুরোহিত এবং প্রবীণ ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গেল, প্রস্তুতির পর প্রধান পুরোহিত এবং প্রবীণ ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পাইলটের সাথে এবং তারা বলল, স্যার আমরা স্মরণ করছি যে, যখন তিনি জীবিত ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন, আমি ৩ দিন পর পুনরায় জীবিত হব। অতএব, সমাধিতে পানি দাও যাতে ৩ দিন সে উহাতে নিরাপদ থাকতে পারে। সুতরাং তারা এসব শব্দের ব্যবহার করেছিল। অত্র অন্তপরিবর্তনশীলতার সাথে যতদূর পর্যন্ত আমি উদ্বিগ্ন, এসব শব্দের সবগুলোই ৩ দিন, তৃতীয় দিনের পর, যিশুর কবরে যা ঘটেছিল তার সমান। তখন অন্য যে বিষয়টি ঘটেছিল তা হলো তাঁর পুনরুত্থান। সেখানে অন্য আরো একটি বিষয় ছিল– যখন যিশুকে আবদ্ধ করা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার রাতে-----

বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবারের পর --- যখন তাঁকে আবদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন–'আমার শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। আর এ কারণে আমি গণনা করেছিলাম যে ৩ দিন এবং ৩ রাত। এখন, আপনি আমাকে বাইবেলে বর্ণিত এসব স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, বাইবেল প্রভু কর্তৃক রচিত হয়েছে। আর আমি আরো বিশ্বাস করি যে, প্রভু এদেরকে সেখানে স্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রভু যা বলেছেন তার ব্যাখ্যা দেয়া আমার কাজ নয়, আমি বিশ্বাস করি যে, প্রভু এসব বিষয় সম্পর্কে তাঁর বাইবেলে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আসলাম রউফ। আর আমি একজন ছাত্র। আমি জীববিজ্ঞান নিয়ে এখনো অধ্যয়ন করছি। আর আমার শিক্ষক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ইসলামের জবাব পড়ে আশ্চর্যন্বিত হই। অনুগ্রহ করে আপনি ব্যাখ্যা করবেন 'বিবর্তনবাদ' এবং 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল প্রশ্নোত্তর প্রদানে উদারনীতি গ্রহণ করেছেন ..... এমনকি আমিও প্রশ্নোত্তর দিতে উদারনীতি গ্রহণ করে থাকি। পবিত্র কোরআনের কোথাও 'আলেকজান্ডার'- এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে জুলকারনাইন'। যদি কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারক কোন ভুল করতে থাকেন, তবে তা হচ্ছে ব্যাখ্যাগত ভুল। মানুষ ভুল করতে পারে .... কিন্তু প্রভু তাঁর কথায় কোনো ভুল করেন না। বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ... পৃথিবী .... ইসায়ীতে বলা হচ্ছে– গোলাকার। সমস্যা নেই– এতে বলা হয়েছে– গোলাকার, স্ফীত নয়। সুতরাং এক জায়গায় বাইবেল বলছে ---- স্ফীত আবার অন্য জায়গায় এটা বলছে ... গোলাকার। যদি আপনি দুটি বর্ণনার ব্যাপারেই একমত হন, তাহলে এটা গামলার মতো কিছু একটা হয়ে যায়। (দেখুন ..... গামলার আকার কি পৃথিবীর মতো) এটা গোলাকার এবং এটা স্ফীত– এটা পৃথিবীর আকারের অনুরূপ হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত কি বক্তব্য এসেছে এবং 'বিবর্তনবাদ' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে– এ দুটি প্রশ্নই আমার ভাই আমার নিকট জানতে চেয়েছেন। আমি জানি না যে, আমি দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারব কি না? আমি কিছু মনে করব না। আপনি কোনো উত্তরটি চান? প্রথমটি না দ্বিতয়টি? জীববিজ্ঞান? কিংবা বিবর্তনবাদ?

দুটি প্রশ্ন। প্রথমটি জীববিজ্ঞান এবং এরপরেরটি বিবর্তনবাদ। যদি আপনি আমাকে দশ মিনিট সময় দেন, তাহলে আমি দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিব। সঠিক উত্তর সম্পর্কে জানতে চাইলে, আপনি আমার 'The Quran and the modern science' শীর্ষক ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন। যখন আপনি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছুক, তখন আপনাকে অবশ্যই চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে

আলোচনা করতে হবে। আর ডারউইন তার H. M. H. Bugle নামক জাহাজে চড়ে একটি দ্বীপের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, যে দ্বীপের নাম'Calatropis' এবং সেখানে তিনি দেখেছিলেন পাখিরা সুন্দরভাবে বিচরণ করছে। পাখিদের এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি ভাবলেন যে, পাখির লেজ কীভাবে লম্বা এবং ছোট হয়, এভাবে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ব্যাপারে গবেষণা করলেন। কিন্তু তিনি তার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখলেন ...। আমি আমার প্রাকৃতিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রমাণ দিতে পারব না, কিন্তু ভ্রবণতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাসে এটা আমাকে সহায়তা করার কারণে আমি এটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

ডারউইনের তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই

ডারউইনের তত্ত্বটি আদৌ সত্য নয়। এটা কেবল একটি তত্ত্ব। আর আমি আমার আলোচনার শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই....'কোরআন যেকোনো তত্ত্বের বিপরীতে যেতে পারে।' কারণ যেকোনো তত্ত্বের ইউ. টার্ন বা বিপরীত মোড় নেয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু কোরআন কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীতে যেতে পারে না। আর আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে পড়েছি যেন এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু এটা কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। এটির কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই- এতে কিছুটা ভুল ধারণার সংযুক্তি ঘটেছে।

যাহোক, যদি কেউ তার বন্ধুকে বা সহকর্মীকে অপমান করতে চায়, তাহলে সে বলবে- 'যদি তুমি ডারউইনের, সময় উপস্থিত থাকতে তাহলে ডারউইনের তত্ত্বটি সঠিক বলে প্রমাণ করে ছাড়তে।'

ধীরে ধীরে সুকৌশলে প্রবেশ করে তিনি লেজবিহীন বানরের ন্যায় তাকালেন। এখানে ডারউইনের তত্ত্বের সাথে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। আর আমি চারটি জীবাশ্ম সম্পর্কে জানি, যেগুলো এখনো রয়েছে। এ চারটির বিস্তারিত বিবরণ আমি আমার ভিডিও ক্যাসেটে প্রদান করেছি। হেনসিস ক্রয়ের জীববিজ্ঞানে তিনি বলেছেন, এটা অসম্ভব যে, আপনি বানর থেকে রূপান্তরিত হয়েছেন। ডিএনএ-এর কোড অনুযায়ী- এটা অসম্ভব। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন-যাতে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। তবে বেশ কয়েকটি অংশের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। জীববিজ্ঞান বা জীবতত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা, সূরায় আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থ : আমি প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি-তারপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

মৌলিক কথা হলো–দেহের প্রতিটি কোষেই সাইটোপ্লাজম থাকে, যার ৯০%-ই পানি। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর দেহেরই ৫০% থেকে ৯০% পর্যন্ত পানি। চিন্তা করে দেখুন, আরবের মরুভূমিতে বসে কে ভাবতে পারে যে, সকল বস্তুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? অথচ পবিত্র কোরআন একথা ১৪শত বছর পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি উত্তর : আপনি যদি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্টের বক্তব্যের বিপরীত ধারণার ব্যাপারে উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, বাইবেল অবৈজ্ঞানিক এবং বাইবেল প্রভুর পক্ষে হতে আসেনি?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : আমি স্বীকার করি যে, এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমার বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, কিন্তু আমার আরও কতিপয় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎদ্বাণী রয়েছে–যেগুলো আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, যিশু হচ্ছেন মূল ভিত্তি। আর তাঁর বারোজন শিষ্যের সমন্বয়ে গঠিত ইমারতের একটি ভিত্তিপ্রস্তর তিনি। সুতরাং নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ঐ বারোজন সাথী তার বাণী লিখেছিলেন, যখন প্রভু নবুয়তের পরিপূর্ণতা প্রদান করেছিলেন। আমি জানি যে, এ বক্তব্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কিন্তু আমার খ্রিস্টাবদে বিশ্বাস হচ্ছে এভাবে যে, যিশু খ্রিস্টই হচ্ছেন আমার ত্রাণকর্তা।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : 'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ'–এ দুটি ভিন্ন শব্দ, দুটি ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। বাইবেলের ইংরেজি ভাষায় 'একটি পাঠ্য বই' কিংবা 'একটি অনুবাদ' রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে 'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ' উভয়কে একটি এবং একই হিসেবে প্রমাণ করা যায় কি? প্রভু তাঁর বাণীকে ঈসা (আ) এবং মূসা (আ)-এর নিকট কি ইংরেজিতে নাযিল করেছিলেন?

ডা. জাকির নায়েক : এটা একটি সুন্দর প্রশ্ন–'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ' কি একই হতে পারে? 'না'। একটি 'পাঠ্যবই', এবং 'অনুবাদ' যথাযথভাবে এক হতে পারে না; বরং তারা একই হওয়ার কাছাকাছি আসতে পারে। আব্দুল মজিদ দারিয়াবাজির মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করা, কারণ–এর ভাষা হচ্ছে অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ। এটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং মহিমান্বিত–এছাড়া আরবিতে ব্যবহৃত একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে।

বাইবেল ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয় নি

যেহেতু পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ–এবং এ অনুবাদ এবং পবিত্র কোরআন অবশ্যই এক জিনিস নয়। আর যদি অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হলে, সেটা নিতান্তই মানুষের করা ভুল–যে মানুষ অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করবেন এজন্য তাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে; কিন্তু এজন্যে সর্বশক্তিমান

আল্লাহকে এজন্যে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। প্রাসঙ্গিকভাবে যা বলা দরকার তা হলো, বাইবেল কি ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়েছিল? 'না'। বাইবেল ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয় নি। বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্ট হচ্ছে হিব্রু ভাষায় এবং নিউ টেস্টামেন্টে হচ্ছে গ্রিক ভাষায় লিখিত।

যিশু খ্রিস্ট (আ) হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন

যদিও যিশুখ্রিস্ট (আ) হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন, প্রকৃত যে পাণ্ডুলিপিটি এখন আপনাদের নিকট আছে তা হচ্ছে গ্রিক ভাষায় লিখিত। ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল যা এখন আর সচরাচর পাওয়া যায় না। আপনারা কি এটা জানেন? হিব্রু ভাষায় ওল্ড টেস্টামেন্টের যে অনুবাদ পাওয়া যায় তা গ্রিক ভাষা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং প্রকৃত ওল্ড টেস্টামেন্ট যা হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছিল তা বর্তমানের হিব্রু ভাষায়, রচিত ওল্ড টেস্টামেন্ট নয়।

প্রকৃত আরবি ভাষাই পবিত্র কোরআন সংকলত করা হয়েছে

যেহেতু আপনার দ্বৈত সমস্যা–আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটা আপনার অনুবাদ পড়া সংক্রান্ত ভুল ইত্যাদি..., কিন্তু, আলহামদুলিল্লাহ, প্রকৃত আরবি ভাষাই পবিত্র কোরআনে সংরক্ষিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, আপনিও এভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। আরও একটি প্রশ্ন করা হয়েছে–যিশুখ্রিস্ট এবং মূসা (আ)-এর প্রতি সত্যিকারভাবেই কি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল? পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম এবং আমি যা বিশ্বাস করি, যা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনের ৩৮ নং আয়াতে বলেছেন,

'আল্লাহ তা'আলা কতিপয় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যার মধ্য থেকে চারটির নাম উল্লেখযোগ্য–তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআন।'

বর্তমান বাইবেল আসল ইঞ্জিল কিতাব নয়

তাওরাত হচ্ছে ওহী, যা মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যাবুর হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, যা দাউদ (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। ইঞ্জিলও ওহী, যা ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং কোরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহী, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বাইবেল প্রকৃত ইঞ্জিল নয়, যার সম্পর্কে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, তা ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : কিন্তু বর্তমান ইঞ্জিল হচ্ছে একটি, যা সর্বদাই ছিল। ১৮০ খ্রিস্টাব্দের ৭৫% মূল ইঞ্জিলই আমাদের নিকট আছে–যা জন লেয়ার ১০০ বছর পরের। তিনি জীবন্ত ছিলেন এবং লিখেছিলেন। ঐ সময় আপনাদের

পূর্বপুরুষরা জীবিত ছিলেন, যারা তাদের পূর্বপুরুষরা জন-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছিল। এটাই একটি ভালো উদাহরণ এবং একটি ভালো পাঠ্য। বাইবেল হচ্ছে একটি সত্য ইতিহাস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–আপনি যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন সেটা একটি বড় ধরনের গণনা–আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রভুর বিষয়টি, এটা পরিপূর্ণভাবে নিকৃষ্টতর। প্রভু সর্বশক্তিমান এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এতে অবশ্যই ধনী, কিংবা দরিদ্র কিংবা অন্য কিছুর বিষয়ই বিবেচ্য নয়। সুতরাং কিভাবে আপনার সম্ভাবনার বিষয়টি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে? যিশু গরিব ছিলেন–তাকে মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি বলতেন ..“একজন মানুষের সন্তান এমন কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই যেখানে সে মাথা খোঁজার ঠাঁই পাবে।” এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই–আমি দেখি না কীভাবে একটি গণনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। গণনা ছিল এমন যে কিছু লোক এসব ভবিতব্য বিষয় পরিপূর্ণ করতে পারে। আমি আশা করি এটা সাহায্যকারী হবে–আপনাদের ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : এমন কী কী বিষয় আছে, যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, কোরআন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আধুনিক বিজ্ঞান ভুল হলে কি ঘটতে পারে? বিজ্ঞানের পরিবর্তনকে কি কোরআন সর্বদা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে?

ডা. জাকির নায়েক : এটি একটি অত্যন্ত ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর আমরা মুসলমানরা কোরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সংগতি বিধানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হব। অতএব, আমি আমার আলোচনার শুরুতেই বলেছি– আমি কেবল ঐসব বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ব্যাপারেই আলোচনা করব, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত। এ রকম একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উদাহরণ হচ্ছে–পৃথিবী স্ফীত আকারের। এটা কখনো ভুল হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কখনই ইউ-টার্ন করতে পারে না। কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান যেমন Hypothesis এবং Theory ইউ-টার্ন নিতে পারে অর্থাৎ পরিবর্তিত হতে পারে।

কোরআন কখনো প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিপক্ষে যেতে পারে না

আমি কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতের কথা জানি, যারা ডারউইনের তত্ত্বকে পবিত্র কোরআনের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অবচেতন। সুতরাং আমাদের উল্টো দিকে যাওয়া উচিত নয় এবং আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আমাদেরকে অধিক সতর্ক হতে হবে, যাতে আমরা কোনোটি প্রতিষ্ঠিত এবং কোনোটি অপ্রতিষ্ঠিত তা যাচাই করতে পারি। যদি এটা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হয়, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে এটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকবে এবং কোরআন কখনোই এর বিপরীতে যাবে না। আর যদি এটা কাল্পনিক বা ধারণাসূচক হয়, তাহলে এটি সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে।

যেমন, 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বও, যেটি প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণাসূচক বা কাল্পনিক ছিল। বর্তমানে এ তত্ত্বটির যথার্থ প্রমাণের পর..স্টিভেন হকিন্সের মতানুযায়ী–এটি একটি সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যা ইতিপূর্বে একটি Hypothesis বা কল্পনাসূচক ছিল। একবার যদি কোনোটি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এটি আমি ব্যবহার করতে পারি।

আপনারা জানেন যে, একটি কল্পনা ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয়ে থাকে– 'মানুষ জাতিকে এক জোড়া মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে–আদম ও হাওয়া।' আমি এ ধারণাটি ব্যবহার করি না, কারণ বিজ্ঞান এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এটা কোরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, আমাদেরকে এক জোড়া মানব–আদম ও হাওয়া (আ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু আমি এ উদাহরণ দিই না, কারণ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়।

অতএব, যখন কোরআন এবং বিজ্ঞানের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন আপনি ঐসব বিষয়ের মাঝেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চান সেগুলো প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য....এবং ধারণাসূচক কোন তত্ত্ব নয়। কারণ, কোরআন আধুনিক বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে এটা প্রমাণ করতে চাই না যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী–না, না, আদৌ না। তাহলে আমি কি করতে চাচ্ছি? আমাদের মুসলমানদের নিকট কোরআন হচ্ছে চূড়ান্ত ফায়সালা। পক্ষান্তরে নাস্তিক কিংবা অমুসলিমদের জন্যে বিজ্ঞান হতে পারে চূড়ান্ত ফায়সালা। আমি এখানে যে বিষয়টির কথা বলছি তা হচ্ছে–নাস্তিকদের মানের মাপকাঠি এবং তাকে মুসলমানদের মানের মাপকাঠির সাথে তুলনা করছি যেমন, পবিত্র কোরআন।

আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছি না যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী। আমি যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি তা হচ্ছে–যখন আমি তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে আসি, তখন আমি কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করি। আর সেক্ষেত্রে আমি দেখাই যে, তোমাদের বিজ্ঞান যা গতকাল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, পবিত্র কোরআন তা শিক্ষা দিয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, আমাদের মুসলমানদের মানের মাপকাঠি ...অর্থাৎ পবিত্র কোরআন তোমাদের মানের মাপকাঠি অর্থাৎ বিজ্ঞান থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর। সুতরাং আপনাদের অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর কোরআনের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। আশা করি, প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েছেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ডা. জাকির নায়েকের সাথে একমত হয়েছেন যে, তিনি যেসব ভুল দেখিয়েছেন তা আসলে ভুল নয় এবং তিনি সেসবের উত্তর দিতে পারেন নি। তার মানে কি ডা. উইলিয়াম

ক্যাম্পবেল এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, বাইবেলে ভুল রয়েছে এবং বাইবেল প্রভুর বাণী নয়?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : বাইবেলে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না–যেগুলোর জবাব এ মুহূর্তে আমি দিতে চাই না। আর আমি অপেক্ষা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত এর একটি জবাব আসে। এমন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে বাইবেল সত্য যেমন– শহরের বর্ণনা, কে রাজা, এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ। আর আমি মনে করি এটাই বড় প্রমাণ যে, বাইবেল ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : প্রশ্নটি হচ্ছে– 'বাইবেলে আরো কোন গাণিতিক বৈপরিত্য বিদ্যমান আছে কি?' 'ইসলামে কি আরও কোনো গাণিতিক বৈপরিত্য বিদ্যমান আছে?' এটা কি বাইবেলে আছে না ইসলামে আছে? আমি জানি না।

ডা. জাকির নায়েক : আমি উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দিব। কারণ ...'সেখানে আরও অধিক কিছু আছে কি?' এটা বাইবেলের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। কারণ, আমি বৈপরিত্য সম্পর্কে আলোচনা করছি। যাহোক, ইসলাম প্রসঙ্গে আসা যাক। পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সূরা সূরায় নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ـ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : তারা কি সযত্নে কোরআনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না?–এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে অবতীর্ণ হত তা হলে তারা এতে অনেক বৈপরিত্য পেত?

তাই পবিত্র কোরআনের কোথাও একটিও বৈপরিত্য নেই। এবার বাইবেলের মধ্যে বৈপরিত্য সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। পাঁচ মিনিট এ আলোচনার জন্যে পর্যাপ্ত সময় নয়। এমনকি যদি তারা আমাকে পাঁচদিন সময় দেয়, তাহলেও এ আলোচনার শেষ হবে না। যাহোক, আমি মাত্র কয়েকটি পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করব।

2nd Kings-এর ৮ম অধ্যায়ের, ২৬ নং ধারায় বর্ণিত আছে যে, ...'আহেজিয়া ছিলেন ২২ বছর বয়সের, যখন সে রাজত্ব শুরু করেছিল।' 2nd Chronicles-এর ২২তম অধ্যায়ের ২ নং ধারায় বলা হয়েছে ... 'তিনি ছিলেন ৪২ বছর বয়সের, যখন সে রাজত্ব শুরু করেছিল।' এখন প্রশ্ন হল তিনি কি ২২ বছর বয়সের ছিলেন না ৪২ বছর বয়সের ছিলেন? এটা নিঃসন্দেহে গাণিতিক বৈপরিত্য। এছাড়া 2nd

Chronicles-এর ২১তম অধ্যায়ের ২৩নং ধারায় এটা বলেছে– 'জোরাম, আহেজিয়ার পিতা তার ৩২ বছর বয়সে রাজত্ব শাসন করা শুরু করেছিলেন আর তিনি ৮ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন, অবশেষে ৪০ বছর বয়সে মারা যান। তাৎক্ষণিকভাবে ...আহেজিয়া তার ৪২ বছর বয়সে পরবর্তী শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখন, পিতা ৪০ বছর বয়সে মারা গেলেন তার পরপরই পুত্র ৪২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কীভাবে পুত্র পিতার চেয়ে দুই বছরের বেশি বয়সের হতে পারে? আমার কথা বিশ্বাস করুন, এমনকি হলিউডের কোনো ফিল্মেও, আপনি এমন কোনো আজগুবি কাহিনী সৃষ্টি করতে পারবেন না?

হলিউড ফিল্মে, আপনি ইউনিকর্ন (একশৃঙ্গ) সৃষ্টি করতে পারেন, যার বিবরণ আমি আমার আলোচনায় উপস্থাপন করেছি। ইউনিকর্ন ....আপনি কনক্রোড়ায়াসিস করতে পারেন, যার সম্পর্কে বাইবেল আলোচনা করছে। আপনি হলিউডে কনক্রোড়ায়াসিস, ড্রাগন এবং সারপেন্টের চিত্র দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি হলিউডের কোনো ফিল্মে এটা দেখতে পাবেন যে, কোনো পুত্র তার পিতার চেয়ে. দুই বছরের বড়। এমনকি এটা কোনো অলৌকিক মোজেযাও হতে পারে না। অলৌকিকভাবেও এটা হওয়া সম্ভব নয়। অলৌকিকত্বে, আপনি দেখবেন যে, এখন শিশু কুমারী মায়ের পেটে জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু এটা দেখবেন না যে, একজন পুত্র তার পিতার চেয়ে দুই বছরের বড়।

আবার, যদি আপনি পড়েন, তাহলে দেখবেন বাইবেলের 2nd Samuel-এর ২৪তম অধ্যায়ের ৯নং ধারায় বলা আছে– 'যেসব লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৮০০ হাজার লোক ইসরাঈলি এবং ৫০০ হাজার লোক বিশ্বাসঘাতক।' যদি আপনি অন্য জায়গায় দেখেন তাহলে দেখবেন 1st Chronicles-এর ২১তম অধ্যায়ের ৫ম ধারায় বলা হয়েছে..... '১ মিলিয়ন..একশত হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল ইসরাঈলি। আর দশ হাজার চারশত ষাটজন লোক ছিল জুডস বা বিশ্বাসঘাতক।' এখন প্রশ্ন হলো যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ইসরাঈলিদের সংখ্যা কি ৮০০ হাজার না ১ মিলিয়ন–১০০ হাজার ছিল? আবার জুডসের সংখ্যা কি ৫ লাখ ছিল না ১০,৪৬০ জন ছিল? এটা পরিষ্কার একটি বৈপরিত্য।

এছাড়া আরও একটি বৈপরিত্য হলো বাইবেলের 2nd Samuel-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩নং ধারায় বলা হয়েছে– 'সউলের কন্যা মিশেলের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না।'একই বইয়ের ২১তম অধ্যায়ের ৮নং ধারায় বলা হয়েছে– 'সউলের কন্যা মিশেলের পাঁচটি পুত্র সন্তান ছিল।' এখন, এক জায়গায় এটা বলছে, 'কোনো পুত্র সন্তান ছিল না' আবার অন্য জায়গায় এটা বলছে..'৫ পুত্র ছিল।'

এছাড়া আরও একটি বৈপরিত্যের কথা বলছি। যদি আপনি পড়েন, তাহলে দেখবেন ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১ম অধ্যায়ের ১৬ নং ধারায় যিশুখ্রিস্ট (আ)-এর বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আবার লূক-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩নং ধারায় এটি বলছে, 'যিশুর পিতা ছিলেন জ্যাকব। – ম্যাথিউ-এর ১ম অধ্যায়ের ২৬নং ধারা এবং লূক-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩নং ধারায় বলা হয়েছে 'যিশুর পিতা ছিলেন হ্যাইলি।' এখন প্রশ্ন হলো, 'যিশুর কি দুজন পিতা ছিলেন?' যে শিশুর দুজন পিতা আপনি তাকে কি বলে ডাকবেন? অথবা তার পিতা কি জ্যাকব না হ্যাইলি? এটা পরিষ্কার একটি বৈপরিত্য।

উপসংহার : পরিশেষে ডা. সাবীল আহমেদ উত্তর আমেরিকার মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি টানেন এই বলে, আমি আপনাদের ধৈর্য ধরে অনুষ্ঠান শ্রবণ করার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথিদের, যারা আমাদের জন্যে এখানে অত্যন্ত ভালো বক্তৃতা উপস্থাপন করেছেন।

সুন্নাত ও বিজ্ঞান

SUNNAT & SCIENCE

[রাসূল (সা.)-এর কার্যাবলি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এর বিশ্লেষণ]

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাত ও বিজ্ঞান

এ বক্তৃতায় পবিত্রতা অর্জন, মিসওয়াক, অজু ও নামাযের শরিয়তী মর্যাদা এবং সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি দৃষ্টিতে এর উপকারিতা গবেষণার আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. ইসলামে পবিত্রতা অর্জন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সকল প্রশংসা সে অভিভাবকের জন্য, সালাত ও সালাম তাঁর নবী করীম ﷺ-এর ওপর, তাঁর বংশধর ও পরিবারের ওপর।

ইসলামে تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ অর্থ : 'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও'-এর নির্দেশ এসেছে। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার চরিত্রে রঞ্জিত হও। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা অত্যন্ত পবিত্র। তাঁর সত্তা সকল প্রকারের খারাবি থেকে পবিত্র। একথা প্রসিদ্ধ যে, পরিচ্ছন্নতার ওপর আল্লাহর জ্যোতি আছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি চুরি-চুকারি এবং ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র। কোন ধরনের ফেরেববাজি, রিয়াকারী এবং হিংসা-বিদ্বেষ যেমন তাঁর সত্তার সাথে খাপ খায় না কৃপণতা, তেমনি সংকীর্ণতার মত খারাপ দোষগুলো থেকে তিনি সদা-সর্বদা সত্তাগতভাবে পাক পবিত্র। তাঁর গুণাবলি পবিত্র ও প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত এবং মাজীদ। সুতরাং নির্দেশ হলো, হে মুসলমানগণ মাখলুক বা সৃষ্টি জীব হওয়ার কারণে তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তোমরাও চরিত্র এবং প্রভুর গুণাবলি নিজেদের মধ্যে ধারণ কর।

বাস্তবিকপক্ষে এটা স্পষ্ট যে, একজন প্রকৃত আমলদার মুসলমানের জীবন সকল দিক থেকে পাক-পবিত্র, সকল প্রকারের অনিষ্টকারী জীবাণু থেকে সংরক্ষিত। তিনি সকল প্রকারের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পাক-ছাফ হয়ে থাকেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না। চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচার করবেন না। গালি-গালাজ করবেন না। সর্বদা সত্য বলবেন এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবেন। প্রদর্শনী থেকে আত্মরক্ষা করবেন। ফেরেববাজি, ধোঁকাবাজি কখনো করবেন না। নিজস্ব কাজ ও কথায় সকল মুসলমান নিজেদের দৃষ্টান্ত নিজে হবেন। অপরকে কখনো কষ্ট দিবেন না এবং ক্ষতি করবেন না। বরং

সর্বদা অন্যদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দুর্বলদের সাহায্য করবেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন এবং অন্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ

অর্থ : প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলমান তিনি যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

আরেকটি সুউচ্চ ঘোষণা রয়েছে, নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস না চাবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' (সহীহ আল-বুখারী, ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা ঈমানের অঙ্গ অধ্যায় ১৩নং হাদীস।)

সকল মুসলমানের জন্য নির্দেশ হলো হালাল খাবে, হারাম থেকে বেঁচে চলবে, নিজের চিন্তাধারাকে পাক-পবিত্র রাখবে। দেহকে পবিত্র রাখবে, পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখবে, নিজ কথা ও কাজকে পবিত্র করবে, মিথ্যা বলবে না এবং কার্যাবলিও পবিত্র রাখবে। যেন এ অনুভূতি হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র দেহ।

ইসলামি শিক্ষায় নামাযের বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। নামায আদায়ের জন্য পূর্ব শর্ত হলো, ব্যক্তির দেহ পাক-পবিত্র হবে। তার পোশাক পবিত্র হতে হবে এবং তিনি অজুবিশিষ্ট হবেন। নামাযের পূর্বে সকল প্রকারের শারীরিক পবিত্রতা আবশ্যক। নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ـ

অর্থ : পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি ছাপা -১১৮)

অপর স্থানে ঘোষণা করেন :- اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' (সুনানে তিরমিযী আরবি ছাপা - ১৯০)।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, এক মুসলমানের জন্য তার ঈমানের অংশ হলো সর্বদা পবিত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র থাকবে। ইসলাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতার শিক্ষা এমন পরিমাণ দিয়েছে যে, অমুসলমানদের পথিকৃৎগণও একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইসলাম যে পরিমাণ পবিত্রতার ওপর জোর দিয়েছে অন্য

কোনো ধর্ম তা দেয় নি। অতএব ডা. রবার্ট স্মিথ, বিখ্যাত সার্জন মাসলামা, দক্ষ সার্জারি লিখেছেন, 'আমরা পবিত্রতার আমল ইসলাম থেকে শিখেছি।'

সবচেয়ে বড় গান্ধা ঐ জিনিস যা মানুষের দেহ থেকে পায়খানা পেশাবের আকারে বের হয়। ইসলাম এগুলো বের হওয়ার পর উত্তমরূপে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা) অর্জন করার নির্দেশ দেয়।

যেহেতু নির্দেশ আছে যে, যদি মানুষের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে এ প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্থাৎ ইস্তিঞ্জা করবে। প্রথমে উত্তমরূপে মাটির ঢেলা দ্বারা পরিষ্কার করবে এরপর দুইবার পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করবে। অথবা পুনরায় পানি দ্বারা যথেষ্টভাবে ধৌত করবে।

পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলার দিকে পিঠ অথবা মুখ করা যাবে না, চাই সেটা খোলা জায়গা হোক বা ঘর হোক। যদি ভুল করে এমন করে তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নিবে। পেশাব-পায়খানা করার সময় খালি মাথায় যাবে না এবং বাতাসমুখী হয়েও বসা যাবে না।

পায়খানা-পেশাবখানায় যাওয়ার সময় মুস্তাহাব হলো বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দুয়া পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

অর্থ : আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি খবীস (দুষ্ট) জ্বিন পুরুষ এবং জ্বিন নারী থেকে তোমার আশ্রয় চাই। (ফাতহুল বারী খ-১ আরবি পৃ-২৪৪; সহীহ বুখারী খ-১, আরবি পৃ-৪৫; সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি পৃ-২৮৩)

আবার টয়লেটে পায়খানা করতে প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখবে, যখন বসার নিকটবর্তী হবে তখন শরীর থেকে কাপড় গুছিয়ে নিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেহ খুলবে না। পা ছড়িয়ে বা-পায়ের ওপর জোর দিবে এবং চুপ থেকে প্রয়োজন সারবে। যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গের গোড়া থেকে আগার দিকে চাপ দিবে যাতে পেশাব যে ফোঁটা ভেতরে রয়েছে তা বের হয়ে যায়। অতঃপর পানি, মাটির ঢেলা অথবা একের পর অন্যটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। এর পূর্বে তিনটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে অতঃপর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা ধোবে। পানির পাত্র এমন উঁচুতে রাখবে না যাতে ছিটা গায়ে লাগার আশঙ্কা থাকে। প্রথমে পেশাবের স্থান ধোবে পরে পায়খানার স্থান। পায়খানার স্থান ধোয়ার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের জোর কমিয়ে ঢিলে রাখবে এরপর উত্তমরূপে ধোবে, যাতে ধোয়ার পর হাতে কোন গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর কোনো পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে

নিবে। যদি কাপড় না থাকে তাহলে বারবার হাত দ্বারা মুছবে। একথা স্মরণ রাখবে যে, খাড়া হওয়ার পূর্বে শরীর ঢেকে নিবে এবং বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করবে এবং এ দুয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ ـ

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার নিকট থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দিয়েছেন এবং উপকারী দ্রব্য নিকটবর্তী করেছেন।

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আরো একটি দুয়া রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে। যখন রাসূল ﷺ হাজত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন তখন সে স্থান ত্যাগ করে পড়তেন غُفْرَانَكَ -'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।' (যাদুল মায়াদ, খ-২, আরবি পৃষ্ঠা -৩৮)

ইস্তিঞ্জা পানি অথবা মাটির ঢেলা দিয়ে অথবা উভয়ের দ্বারা করা উচিত। হাড় অথবা গোবর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। কেননা এগুলোর মধ্যে ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে।

২. আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

পায়খানা পেশাব মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্যতম। নবী করীম ﷺ প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মানবকল্যাণ ও সহজতর পথ-নির্দেশনা দিতেন। যদি নবী করীম ﷺ -এর জীবন জিন্দেগী আলোচনা ও বুঝা যায় তাহলে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহজতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যাবে।

আজ পৃথিবী পুনরায় তাঁর তরীকার দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে পন্থায় নবী করীম ﷺ আমাদের জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতাগুলো নিম্নে পেশ করা হলো–

১. রাসূল ﷺ পায়খানা-পেশাবের জন্য অনেক দূর হেঁটে যেতেন। **পায়খানা-পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার আলোকে কয়েকটি বাস্তব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।**

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি চলা ফেরার ওপর জোর দিচ্ছে এমনকি আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লিখা রয়েছে 'পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন?'

একথা পরিষ্কার যে, পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এই জ্ঞানগত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে চলার দিকে আহ্বান জানানো। বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণ রসায়ন) এক দক্ষ পণ্ডিত এক পয়েন্টে তিনি বলেন–

'যখন থেকে শহরের পত্তন ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষ ক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কেননা যখন থেকে দূরে পায়খানা-পেশাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধরা, গ্যাস, পেট ও পাকস্থলীর পীড়াগুলো বেড়ে চলেছে।'

চলার দ্বারা অন্ত্রগুলোর নড়া-চড়া বেড়ে যায়, যার দ্বারা পায়খানা-পেশাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার মধ্যেই পেশাব করি এবং বাইরে চলে যাই না, এ জন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় থাকতে হয়।

২. রাসূল ﷺ পায়খানা-পেশাবের জন্য কাঁচা এবং নরম জমিন বাছাই করতেন। এর মধ্যেও অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। একটি বিশ্লেষণে দেখা যাক–

লিউভাল পল (Louval Poul) নিজের পুস্তক 'স্বাস্থ্যবিধি'-তে লিখেছেন–

'মানবতার স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন থেকে আমরা মাটির ওপর পায়খানা পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জমিন (ফ্লাশ, কমোড এবং ডব্লিউ-সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে শুরু করেছি। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে জাতিগত দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বেড়ে গিয়েছে এবং এর প্রভাব পেশাবের গ্লান্ডস (Prostate Glands)-এর ওপর পড়ে।'

মূলত যখন মানুষের দেহ থেকে বর্জ্য বের হয় তখন মাটি এগুলোর জীবাণু এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে লুফে নেয়। যেহেতু ফ্লাশ ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি নেই। এজন্য ঐ সব ক্ষতিকর জীবাণুর প্রভাব যা মাটি লুফে নিত, ফ্লাশে পেশাব করার কারণে এ সব জীবাণুর প্রভাব দুবার আমাদের দেহের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে রোগের দিকে ধাবিত হয়।

আরো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার লিখেন : 'নরম ও কর্ষিত জমিন সর্ব জিনিসকে শোষণ করে নেয়। যেহেতু পেশাব এবং পায়খানা জীবাণু যুক্ত বর্জ্য, এজন্য এমন জমিন দরকার যা এগুলোকে শোষণ করতে এবং একে ছিটার প্রতিবন্ধক হয়ে শরীর এবং দেহের ওপর পড়া থেকে ফিরায়। যা ফ্লাশ টয়লেট দ্বারা হতে পারে না, সেখানেও ছিটার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বর্জ্যকে শোষণ করার কোনো গুণ নেই। ফ্লাশে প্রস্রাব করার কারণে বর্জ্যের বাষ্প শোষণ হতে পারে না যার কারণে বর্জ্য থেকে ভেসে আসা বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।'

এই পশ্চিমা সভ্যতা কমোড-এর প্রচলন করেছে যাতে মানুষ এর ওপর চেয়ারের মত বসে পায়খানা-পেশাব করে। কমোডের ব্যবহারে লোকেরা উত্তমরূপে বর্জ্য

মুক্ত হতে পারে না। কেননা এটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। এ ধরনের কমোডের কারণে পায়খানা সঠিকভাবে বেরও হয় না। এছাড়াও কমোডের ব্যবহারের পর পৃথক স্থানে বসে লজ্জাস্থান ধোয়ার প্রয়োজন হয়।

ডব্লিউ সি (W.C.) এক প্রকারের চেয়ার যাকে ইউরোপের লোকেরা পেশাব-পায়খানার জন্য ব্যবহার করে। ডব্লিউ সি-এর ওপর চেয়ারের মতো বসে পেশাব-পায়খানা করা যায়। এ পদ্ধতি মানুষের স্বাস্থ্য সুস্থতার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ধরনের চেয়ার সদৃশ জিনিসের ওপর পায়খানা-পেশাব করায় বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কিছু শারীরিক কমতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো।

১. ডব্লিউ সি (W.C.)-এর ওপর বসে পায়খানা-পেশাব করায় অঙ্গের টানা খেছা হয় যার দ্বারা মানবদেহের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

২. ডব্লিউ সি (W.C.)-র সহায়তায় পায়খানা করার কারণে প্রয়োজন পূরণ পরিপূর্ণভাবে হয় না, যার পরিণামে বিভিন্ন রোগের জন্ম হয়। যেমন– ধরা, বামা, পাকস্থলীর জ্বালা, লজ্জাস্থানের ক্ষত, লজ্জা স্থানের জ্বালা-পোড়া, গ্যাস ইত্যাদি।

৩. ডব্লিউ সি (W.C.)-তে পায়খানা-পেশাব করার জন্য চেয়ারের মতো বসতে হয়, যার কারণে পায়খানার সঠিক এবং প্রাকৃতিক বহির্গমন সম্ভব হয় না। এবং বর্জ্য বৃহদন্ত্রে আটকে রয়ে যায়। যা অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়।

৪. ডব্লিউ সি (W.C.)-এর ওপর পায়খানা-পেশাবের দ্বারা পরবর্তীতে পেশাবের ফোঁটা পড়ার অধিক আশঙ্কা থাকে। আর এ ফোঁটা পড়ার কারণে ক্ষতসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।

৫. ডব্লিউ সি (W.C.) -তে পায়খানা-পেশাব করলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না, যে কারণে অন্ত্র এবং পাকস্থলীতে অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন : পাকস্থলীর জ্বালা, বদ হজম এবং আলসার।

৬. এটা নতুন সংবাদ যে W. C. স্থাপন শরীরের প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিপরীত। যখন সুন্নাত মুতাবিক পায়খানা-পেশাব করা হয়, তখন শক্তি পুরো শরীরকে ঢিলে করে দেয় এবং পায়খানার দ্বারকে পায়খানা বের করার উপযোগী করে দেয়। কিন্তু W. C. ব্যবহারে পূর্ণ শরীর ঢিলে হয় না এবং পায়খানার স্থানও সংকীর্ণ থাকে। যার কারণে মন, লিভার, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগ-বালাই হয়ে থাকে।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখানো পন্থা খুবই উপকারী। এছাড়া কোনো ধর্মেই এরূপ কোনো দৃষ্টান্তই মিলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের নবী করীম ﷺ

-এর পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা ও আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। রাসূল ﷺ কী পরিমাণ সৌন্দর্যের সাথে মানুষের অপবিত্রতা ও পবিত্রতার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন যে আজ (এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে) চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞগণ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'বাস্তবেই নবী মুস্তফা ﷺ-এর পবিত্রতার বিধানের কোনো তুলনা নেই এবং রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত এবং প্রদর্শিত পন্থা খুবই উপকারী।'

বর্তমানে প্রথমোক্ত 'ফ্লাশ' পদ্ধতি প্রাকৃতিক নিয়ম-পদ্ধতির নিকটবর্তী। এজন্য এর ক্ষতি কমোড এবং W.C. (ডব্লিউ. সি.) থেকে অনেক কম। কিন্তু কাঁচা পায়খানা এবং নরম মাটিতে পায়খানা-পেশাব করায় যে ধরনের উপকারিতা তা সেখানে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে যেহেতু মাটি এবং খোলা ময়দান সকল স্থানে পাওয়া সহজ নয় এ কারণে বর্তমানে ফ্লাশ পদ্ধতি উত্তম।

৩. রাসূল ﷺ পা ছড়িয়ে এবং বাম পায়ের ওপর জোর দিয়ে চুপ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়খানা-পেশাব সারতেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ফিজিওলজির একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, 'আমি মারাকাশ ছিলাম। একজন ইহুদি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। ডাক্তার যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। যখন আমি আমার নাম লিখালাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি কি মুসলমান?'

আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। মুসলমান এবং পাকিস্তানিও।'

ইহুদি ডাক্তার বলতে লাগলেন, তোমাদের পাকিস্তানে যদি স্বয়ং তোমাদের নবীর একটি পন্থা জীবিত হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানিরা কয়েকটি রোগ থেকে বাঁচতে পারে। আমি কৌতূহলবশত ব্যাকুল হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : 'ডাক্তার সাহেব সেটা কোন পন্থা?'

ইহুদি ডাক্তার বললেন, তা পায়খানা-পেশাবের পন্থা। যদি পায়খানা-পেশাবের জন্য ইসলামি পদ্ধতিতে বসা হয় তাহলে এপেন্ডিসাইটিস, স্থায়ী ধরা রোগ পাইলস এবং গোর্দার রোগ জন্ম নিবে না। যদি মুসলমান স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর পদ্ধতিতে পায়খানা-পেশাব সমাধা করে তাহলে এ সব পীড়া থেকে বাঁচতে পারে।'

পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেন, 'আমি আমার নবী করীম ﷺ -এর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। আমার আফসোস হলো যে, আমি দ্বীনী জ্ঞানার্জনের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করি নি যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মাসয়ালাগুলো শিখে নিব। এ সময় আমার এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আমি এ

ইহুদি ডা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মারাকেশে একজন দ্বীনী আলেম ছিলেন। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলাম। যখন তিনি এ পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, তখনই আমি এরপর আমল শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার কিছু সময় লাগল, কিন্তু এর উপকারিতা খুব শীঘ্রই আমার বুঝে আসল এবং এ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি পায়খানা-পেশাবের জন্য ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যে পদ্ধতিতে নবী করীম ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান নবী করীম ﷺ -এর এই পায়খানা-পেশাবের পদ্ধতির ওপর ধারাবাহিক রিসার্চ (গবেষণা) করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতা স্বীকার করছে।

স্বাস্থ্য এবং জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের নবী করীম ﷺ-এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের নবী করীম ﷺ -এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করাতে গ্যাস, বদ হজম, ধরা রোগ এবং গোর্দার রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায়, এবং বিশেষ করে নবী করীম ﷺ -এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এ সব পীড়াকে মূলোৎপাটন করেও দেয়।

৪. রাসূল ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিল ব্যবহার করতেন এবং ঢিল বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূল ﷺ -এর এ সুন্নাতের মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হলো–

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নতমানের রোগ নিরাময়ের অংশ মওজুদ রয়েছে। যেহেতু পায়খানা ও পেশাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং এতে জীবাণু ভর্তি হয়ে থাকে এ কারণে এটা মানব চর্মে লাগা সবচেয়ে ক্ষতিকর। যদি এর কোনো অংশ চামড়ার ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অগণিত পীড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন– ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দুনিয়াকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল; কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির সকল অংশ জীবাণু ধ্বংসকারী। যখন ঢিলের ব্যবহার হবে তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে এর ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণ লেগে থাকা সব জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। বরং গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের ক্যান্সার থেকেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন মাটির ঢেলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটির ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করেছেন।

মোটকথা আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারগণের এ সিদ্ধান্ত এই যে, এ সব মাটির মানুষ, পুনরায় মাটি থেকে আরোগ্য লাভ করে। চাইলে পৃথিবীর সব ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পদ্ধতিগুলোর দ্বারা রোগ থেকে সুরক্ষা মিলবে।

আজকাল ইস্তিঞ্জা এবং পবিত্রতার জন্য টিস্যু পেপার অথবা টয়লেট পেপার ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা আগ্রহের সাথে এগুলোর ব্যবহার করে। সব লোকের ধারণা যে টয়লেট পেপারের চেয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার আর কিছুতে হয় না। অথচ টয়লেট পেপার দ্বারা কিছু না কিছু ময়লা শরীরের ওপর অবশিষ্ট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যদি গোসলের প্রয়োজন হয় তাহলে লোকেরা এভাবে টয়লেট পেপার দ্বারা অবশিষ্ট ময়লার সঙ্গে পানিতে বসে যায়, যার দ্বারা শুধু ঐ রোগই বাড়ে না বরং পাত্রের সকল পানি ময়লা ও গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যা গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যদি এতদসত্ত্বেও মানুষ এর দ্বারা গোসল করে তাহলে তার সর্বশরীর নাপাক ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এতো সেই পশ্চিমা সংস্কৃতি যার মধ্যে মানুষের ক্ষতি নিহিত। যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কখনো অনুসরণীয় হতে পারে না। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন–

'নতুন সংস্কৃতির ডিমগুলো পচা।'

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরীর এক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট এক ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি এই সংশ্লিষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন–

ভাই বলুন তো, এই নরম কোমল ও চিকন টয়লেট পেপার তৈরিতে কোনো মারাত্মক কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় কি?

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলতে লাগলেন, 'ডাক্তার সাহেব! এগুলো তৈরিতে অগণিত কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, কিছু কেমিক্যাল তো ক্ষতিকরের চূড়ান্ত, যার দ্বারা চর্ম রোগ, এক্সিমা এবং চর্মের রং পরিবর্তনের মতো রোগের জন্ম হয়ে থাকে।'

এ সময়ে সব ইউরোপীয় টয়লেট পেপার ব্যবহার করছে। অতীত দিনের সংবাদে এ সংবাদ প্রচার করেছে যে, বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল, তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর শামিল ছিল। বোর্ডের বক্তব্য হলো, এ ধ্বংসকারী পীড়াগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং পানি ব্যবহার না করার কারণে বেড়ে চলেছে। ইউরোপ আমাদেরকে কাগজের আকারে যে তোহফা (উপহার) দিয়েছেন তা আমাদের জন্য লাভজনক না ক্ষতিকর তার ফায়সালা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।

যেহেতু ইউরোপীয়গণ ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু টয়লেট পেপারের ওপর নির্ভর করে এবং পানি ব্যবহার করে না এজন্য টয়লেট পেপার তাদের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হচ্ছে, তবে যদি টয়লেট পেপারের সাথে সাথে পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের ক্ষতি সমান সমান হয়ে যায়।

৫. রাসূল ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিলা ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন 'পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত।' (ছহীহ মুসলিম, ফিতরাতের অভ্যাস অধ্যায় আরবি, ছাপা নম্বর ৬০৪)

কিন্তু ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পরিবর্তে টিস্যু পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে, যার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে–এর মধ্য থেকে ইতিপূর্বে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আরো কিছু বর্ণনা করছি।

এক ইউরোপীয় ডাক্তার 'কিনান ডিউস' পুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধনপূর্বক বলেন–

যদি আপনারা এরূপ জিন্দেগী যাপন করতে থাকেন যে, পায়খানার স্থানকে পানি ব্যতীত টয়লেট পেপার দ্বারা পরিষ্কার করতে থাকেন, তা হলে আপনাদেরকে খুব শীঘ্রই নিম্ন লিখিত রোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

২. ভগন্দর অথবা ফিস্টুলা

৩. ভাইরাসজনিত রোগ

৪. চর্মের ইনফেকশন।

প্রস্রাব এবং ময়লা থেকে ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে না। যার কারণে অবশিষ্ট ভারী ময়লা ও আবর্জনা লোম ও দেহে আটকে বিভিন্ন রকম রোগ জন্ম লাভে সহায়তা করে।

পানি সৃষ্টির প্রতি এক মহা নিয়ামত। এটা সকল নাপাকীকে পাক বা পবিত্রতায় রূপান্তর করে। ইসলাম পবিত্রতার বিধানকে এ পরিমাণ স্পষ্ট ও পাক বানিয়ে দিয়েছে যে, একে অমান্য করার সুযোগ নেই। এমনকি অমুসলিম বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণও এর প্রশংসা না করে পারে নি।

জন্ট মিলন প্রাচ্যবিদের বক্তব্য হলো, "ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। সব ধর্ম এ থেকে নিজেদের পবিত্রতার অধ্যায় পূর্ণ করে। ইসলামের ইস্তিঞ্জার পন্থাও নজিরবিহীন। এর দ্বারা দেহের ওপর বর্জ্যের অণুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোনো দেহকে পানি ব্যতীত পরিষ্কার করা হয়, তবে অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, দেহের সম্পূর্ণ অংশ কখনোই পরিষ্কার হবে না, বরং বিভিন্ন

রোগের বাহক হয়ে যাবে। আবার পানির ব্যবহারে দেহের এ অংশের (লজ্জাস্থানের) উষ্ণতার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা খুবই উপকারী হয়, যাতে এর দ্বারা পাইলস ইত্যাদি হতে পারে না। যদি পানি ব্যবহার করা না হয় তাহলে পায়খানা-পেশাবের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো ছাড়াও অন্য অঙ্গগুলোর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩. নিষিদ্ধ কার্যাবলি

রাসূল ﷺ পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য জোরালো নির্দেশাবলি দিয়েছেন। এ ছাড়াও পেশাবের সময় খাড়া হয়ে ও চলার সময় এবং পানিতে, রাস্তায় ছায়াদার বা ফলদার বৃক্ষের নিচে, বায়ুমুখী হয়ে গর্তের মধ্যে, গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আর গোবর, হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা এবং কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানির পাত্র থেকে ডান হাত দ্বারা পানি ঢালতে এবং বাম হাত দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে, পায়খানা-পেশাবের পর কোনো জিনিস (সাবান অথবা মাটি) দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে এবং পায়খানা-পেশাবের সময় পর্দার প্রতি সতর্ক খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব শিক্ষার মধ্যে অগণিত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। এ সব উপকারিতার মধ্য থেকে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে–

১. হাদীসগুলোতে অত্যধিক পরিমাণে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচার ওপর শাস্তির বাণী এসেছে এবং মুহাদ্দিসীন স্ব-স্ব সংকলিত কিতাবে এরূপ বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে পেশাব থেকে বাঁচা, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পেশাব এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে পেশাব থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা বেশিরভাগ কবর আযাব পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে হয়।

প্রাচ্য বি. ড. জান্ট মিলন বলেন, রাণের ক্ষত ও ফাঙ্গাস, চর্ম উঠা রোগ, মৃগী এবং এর পার্শের এ্যালার্জী এবং বিশেষ অঙ্গের রোগী যখন আমার নিকট আসে তখন তার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হয় যে, সে কি পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে? এদের মধ্যে বেশিরভাগই পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে না, পুনরায় দুরারোগ্য ও সমস্যা জটিল পীড়া নিয়ে আমাদের নিকট আসে।

জিনসের প্যান্ট-এর চেইন ও বোতাম খুলে পেশাব করার পর পুনরায় ইস্তিঞ্জা ব্যতীত ততক্ষণাৎ বেঁধে নেয়ার অবস্থায় পেশাবের ফোঁটাগুলো দেহের অঙ্গগুলোর ওপর পড়তে থাকে, যার দ্বারা চর্মরোগ এবং অন্যান্য রোগ জন্মলাভ করে।

আল্লাহর কসম! রাসূল ﷺ -এর শিক্ষা কতইনা উচ্চমানের যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাজার বছরের পুরাতন পূর্বের বর্ণিত যে, পেশাব নাপাক ময়লা কয়েকটি রোগের জন্মদাতা এবং কবর আযাবের কারণ। সুতরাং এ থেকে আত্মরক্ষা কর।

২. রাসূল ﷺ পেশাবকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফকীহগণ বলেন, যদি সওয়ারীর ওপর আরোহণরত অবস্থায় পেশাবে চাপ দেয় তাহলে সওয়ারী থামিয়ে প্রথমে পেশাব করবে।

এভাবে যদি জামায়াতের সময় হয়ে যায় এবং পেশাবে চাপ দেয় তাহলে প্রথমে পেশাব করে অজু করে তারপর জামায়াতে শরিক হবে। কোনো কাজ কারার সময় পেশাব আসলে প্রথমে পেশাব করে নিতে হবে। পেশাবকে বাধাগ্রস্ত না করা এবং সময়মত পেশাব করার মধ্যে নিম্নলিখিত ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে।

মেডিকেলের মূলনীতিতে রয়েছে যে, যখনই পেশাব বা পায়খানার বেগ আসবে তখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। মেডিকেলে আবশ্যকীয় প্রয়োজন পেশাব- পায়খানাকে বাধাগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মেডিকেল ফিল্ডের সাথে সম্পৃক্ত সিনিয়রগণ বলেন, জরুরি প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব)-কে বাধাগ্রস্ত করলে অনেক রোগ হয়, এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের। এ ছাড়া পাকস্থলী, স্নায়ু গোর্দান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো সময় জরুরি প্রয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করায় বমি ও চক্কর আরম্ভ হয়ে যায়, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়।

রাসূল ﷺ স্থির (বদ্ধ) পানিতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এর ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে দেয়া হলো−

ডোবা, পুকুর, খাদ ও ঝিলের বদ্ধ পানিতে যদি পায়খানা পেশাব করা হয়, তা হলে পানিতে জীবাণু প্রবেশ করে সব পানি দূষিত ও ক্ষতিকর রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি কোনো জীবজন্তু (পাখি, পশু, মানুষ ইত্যাদি) ঐ পানি পান করে তাহলে তারা বেশ কিছু মারাত্মক রোগের শিকার হয়ে যাবে। এরূপ পানি পানকারীর জ্বালানি, উত্তাপ, টাইফয়েড, ভাইরাসজনিত জন্ডিস, অন্ত্রে কীটের ডিম্বাণু জন্ম লাভ করে, যা ধ্বংসকারী রোগসমূহ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও বদ্ধ পানিতে পেশাবকারী নিজেও কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন− যখন বদ্ধ পানিতে পেশাব করা হয়, তখন পেশাব ছিটে শরীরে পড়ে, যা কিছু রোগের পক্ষে কাজ করে। বদ্ধ পানিতে পেশাব করাতে এক প্রকারের তাপ উঠে যা পেশাবকারীকে কয়েক প্রকারের পীড়ায় আক্রান্ত করে। এই ভাপ-এর

কারণে ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি শেষ হয়ে যায়। মানুষ চোখের রোগে আক্রান্ত হয় এবং তা মস্তিষ্ক ও গীলার ওপরও ঘোরতর প্রভাব ফেলে।

এ সব কারণে রাসূল ﷺ বদ্ধ পানিতে পেশাব ও পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। যাতে কোনো লোকের কারণে প্রাণী অথবা অন্য কোনো মানুষের কোনোরূপ কষ্ট না হয় এবং ইসলামি সমাজ সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং রোগপীড়া থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবাহিত পানিতে পেশাব করতেও নিষেধ করেছেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবাহিত পানি যেমন সমুদ্র, নদী, খাল ইত্যাদির উপকূলে গ্রামের পর গ্রাম বসবাস করছে। বহু মানুষ ও প্রাণী এ পানি থেকে উপকার লাভ করে। যদি বর্জ্যের কারণে এ পানি ময়লাযুক্ত হয়ে যায় তাহলে চলতে চলতে জীবাণুর স্তূপ জমে যায় এবং রোগ ছড়িয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এ নদী বা খাল ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য পানি অতিক্রম করে, তখন তার শরীর যতখানি পানিতে ভিজে তাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ পানি দ্বারা এ্যালার্জী, ফোঁড়া, ফেন্সী এবং ভাবাই ক্ষত ইত্যাদিও ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও যখন কোনো ব্যক্তি প্রবাহমান পানিতে পেশাব করে তা থেকে দুর্গন্ধ ওঠে যা থেকে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য সীমাহীন ক্ষতি হয়।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ চলাচলের স্থান ও রাস্তায় পেশাব করতে খুবই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি, চিকিৎসাগত উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

রাস্তায় সব কিছু চলাচল করে এবং যখন রাস্তায় পেশাব করা হয় তখন পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের মাধ্যমে তা রাস্তায় চলাচলকারীদের দেহে সংক্রমিত হয়, যার দ্বারা শ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু যদি কোনো মানবদেহে পৌঁছে তাহলে হৃদরোগ, পেটের পীড়া, বাত রোগের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

৬. হাদীসসমূহ এবং ফিকহের কিতাবে ছায়াদার এবং ফলদার বৃক্ষের নিচে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কয়েকটি প্রাকৃতিক, ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা হলো–

ছায়াদার বৃক্ষ লোকদের দাঁড়ানো ও বিশ্রামের স্থান। এখানে বর্জ্য ত্যাগ করা চূড়ান্ত রকমের অন্যায় এবং এ থেকে নিশ্চিতই খারাপ প্রভাব পড়ে। এ ধরনের বৃক্ষের নিচে উপবেশনকারীর বেশ কয়েক প্রকারের রোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ফলদার বৃক্ষ যেখানে লোকদের দাঁড়ানো ও আরাম করার স্থান, এটা ফল আহরণের স্থানও বটে এবং লোকেরা তার ছায়ায় বসে ফলও খায়। যদি সেখানে আবর্জনা করা

হয় তাহলে সেখানে বসে খাওয়া মুশকিল হবে এবং মানুষ কষ্ট পাবে। এছাড়া ফলদার বৃক্ষ থেকে নিজে নিজেও ফল পড়ে থাকে। যদি ফলদার বৃক্ষের নিচে পায়খানা পেশাব করা হয় তাহলে ঐ ফলগুলো অবশ্যই এ ময়লার মধ্যে পড়বে। যে কারণে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবে না এবং যদি কেউ এ ফল খেয়ে ফেলে (যেমন অবুঝ শিশু ইত্যাদি) তাহলে সেও কয়েক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, যার দ্বারা অনেক কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

৭. হাদীস এবং ফিকহে বাতাসের দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

যদি বাতাসমুখী হয়ে পেশাব করা হয় তাহলে বাতাস প্রবাহের কারণে ঐ পেশাব উল্টে-শরীর, চেহারা ও কাপড়ের ওপর পড়বে, যা দ্বারা দেহ ও কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। যদ্দরুন এ পেশাবের জীবাণু এ পেশাবের রাস্তা থেকে দেহে প্রবেশ করে এ্যালার্জি, খোস পাঁচড়া, রক্তদূষণ এবং আরো কয়েকটি চর্মরোগ সৃষ্টি করবে।

যদি বায়ুর দ্বারা পেশাব উল্টে মুখ এবং চোখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে অনেক কঠিন ক্ষতি হয়। যেমন– চোখ যাবে, ক্ষত হবে, চোখে চুলকানী হবে, চোখ থেকে পানি পড়বে এবং এর সাথে সাথে চোখের বেশ কয়েকটি রোগ সৃষ্টি হবে। যদি চিকিৎসা না হয় তাহলে এ রোগগুলো বৃদ্ধি পেয়ে সারা শরীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। যদি বায়ুমুখী হয়ে পেশাব করা হয় এবং পেশাব উল্টে মুখে প্রবেশ করে তা হলে তা দ্বারা কয়েক প্রকারের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন– মুখের রোগ হয়ে যায়। এছাড়া মুখে তখন মাড়ির পুঁজ ও দাঁতের রোগ সৃষ্টি হবে। জিহ্বাও খারাপভাবে প্রভাবিত হয় এবং গিলাও খারাপ হবে যাতে পানি পর্যন্ত লাগানো যাবে না।

৮. নবী করীম ﷺ গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। যেরূপ মিশকাত শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মারজাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কখনোই গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবি পৃষ্ঠা ৪৩)।

গর্তাদির মধ্যে পেশাব থেকে বিরত থাকার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো–

যদি বিষাক্ত প্রাণীর গর্তে পেশাব করা হয় তাহলে এ প্রাণী বাইরে বের হয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা প্রবল।

কিছু মাটির গর্ত এমনিতেই হয়ে থাকে এবং সে গর্তাদির মধ্যে এসিড এবং নাইট্রোজেন জমা হয়ে থাকে। যদি এর মধ্যে পেশাব করা হয়, তাহলে পেশাব যেহেতু নিজেই এক প্রকারের এসিড সেহেতু অন্য প্রকারের এসিডের সাথে এটি মিলিত হয়ে বাষ্প উঠে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে।

৯. রাসূল ﷺ গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আরো ইরশাদ করেছেন : এর দ্বারা অগণিত কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, গোসলের স্থানে পেশাব না করা উচিত। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান ও মেধার ওপর প্রভাব পড়ে স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এবং কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। (Science and Health) 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' নামে একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিনে বর্ণিত আছে : গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা যৌন রোগ বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা সামাজিক ধ্বংস সৃষ্টি হয়। গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা মানুষ শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা আরো অনেক ধরনের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

১০. নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন, এর ওপর বায়হাকী শরীফের জাবির (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন যে, কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না। (বায়হাকী শরীফ, খ-১, পৃ-১০৬)

ইসলাম বসে পেশাব করার নির্দেশ দান করে। কেননা দাঁড়িয়ে পেশাব করার দ্বারা অগণিত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে থাকে। যেহেতু পেশাব হতে জীবাণু বের হয় এবং অনেক সময় এর মধ্যে অনেক রোগ (সিফিলিস, গণোরিয়াম মূত্রাশয়ে জীবাণুর ইনফেকশন ইত্যাদি)-এর কারণে পুঁজ জমা হয়। খাড়া হয়ে পেশাব করাতে এর ছিটে শরীর ও পোশাককে ময়লাযুক্ত করে এবং এর দ্বারা অনেক রোগের সৃষ্টি হয়।

দাঁড়িয়ে পেশাব করায় Prostatitis-এর ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তা প্রসারিত হয়ে বেড়ে যায় এবং যার কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি পেশাব ফোঁটা ফোঁটা আসে এবং ফোঁটাও পাতলা হয়ে যায়। এছাড়াও আরো কিছু রোগ জন্ম লাভ করে।

১১. নবী করীম ﷺ গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন। 'গোবর (প্রাণীর বর্জ্য), হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ।' (সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-১৩০) (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবি পৃ-৪২)

গবরের মধ্যে অগণিত ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। কেননা এটা এক প্রাণীর বর্জ্য (পায়খানা) এবং সকল বর্জ্যই জীবাণু পূর্ণ থাকে। গোবরের মধ্যে টিটেনাস এবং টাইফয়েড-এর জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। যদি গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয় তাহলে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে অসুখ করে ছাড়ে। এছাড়াও এর দ্বারা লজ্জাস্থানের অনেক পীড়া হয়ে থাকে। যেমন– খোস-পাঁচড়া, পুঁজ পড়া, লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ইত্যাদি।

হাড়ের গোশত খেয়ে যখন বাইরে নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁকে প্রাণীরা (কুকুর-বিড়াল) চেটে খায়। কিছু প্রাণীর লালার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে। যেমন– কুকুরের লালায় এক বিশেষ ধরনের জীবাণু থাকে, যা তার ভক্ষণকৃত হাড়ে সংক্রমিত হয়। এর সাথে ও হাড়ের ওপর মাটি, ময়লা ধুলাবালি ও দুর্গন্ধ জমে যায় এবং এ ধরনের ময়লা-ধুলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যদি এ হাড় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে যাবতীয় জীবাণুর সাথে সাথে কুকুরের বিশেষ জীবাণুও দেহের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। যার দ্বারা রক্তদূষণ, হার্ট, জঠর, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ হয়।

হাড়ের উপরিভাগ, অসমান, রুক্ষ ও ধারালো হওয়ায় এর দ্বারা মানবদেহ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়াও হাড়ের ওপর ভূমির হিংস্র জানোয়ার থেকে এমন জীবানু থাকে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না, যেগুলো কষ্টদায়কও বটে। ইস্তিঞ্জা করার সময় এদের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে।

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন যে, 'আমি এক নওজোয়ানকে এ হাদীস মুবারক শুনালাম যে হাড়, গোবর এবং বিষ্ঠা দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা যাবে না, তখন সে ঠাট্টা করল। এর মধ্যে কোনো একদিন তার প্রয়োজন হলো এবং পায়খানা করার পর সে হাড় দিয়ে পরিষ্কার করল। যে কারণে পায়খানার স্থানে কঠিন যন্ত্রণা হলো এবং ফুলে গেল। এতে যা হয়েছে তা হলো সে যে হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছিল এর মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র এবং বিষাক্ত পিপড়া ছিল যা সে দেখেনি।'

যখন সে পরিষ্কার করার জন্য এ হাড়কে পায়খানার রাস্তায় রাখল তখন এ সকল পিঁপড়া তাকে কামড়িয়েছে।

৪. এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন

এ নওজোয়ানের যখন অতিরিক্ত কষ্ট হলো তখন সে আমার নিকট ভুলের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য লজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার জন্য আসলো। আমি তাকে বললাম, 'যে নেক বান্দার হাদীসকে তুমি ঠাট্টা করেছিলে, তার উপর দরূদ পাঠাও। আল্লাহ তায়ালা এবং তদীয় রাসূলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বৎস, যখন সে এ সকল কাজ করল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে মুসীবত থেকে মুক্ত করে দিলেন। হাড় ও গোবরের মধ্যে কয়েক প্রকারের মারাত্মক কীট থাকে। এ কারণে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী এ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ রয়েছে।

১২. রাসূল ﷺ এর ইরশাদ মোতাবেক কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করা, পেশাব-পায়খানা করার সময় মুখ পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে

সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন।' (ছহীহ বুখারী, আরবি, পৃ-৫৭; ছহীহ মুসলিম, খ-১, আরবি, পৃ-১৩০; সুনানে আবী দাউদ, খ-১, পৃ-৩; (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবি, পৃ-২৪, ৪২)

পায়খানা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করার মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে

ডা. ডারভীন, ডা. লিডবীব, ডা. আলেক্সান্দ্রা-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'কসমগ ওল্ড, এর মানবব্যবস্থা জীবনের জন্য সহযোগী। খানায়ে কাবার চারদিক থেকে বের হওয়া Positive Rays(ধনাত্মক রশ্মি) যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পেশাব, পায়খানা ও থুথু যা পুরোপুরি Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) কাবার দিকে নিক্ষেপ করাতে মানুষের জন্য ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হয়। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট 'ডাক্তার কামিন বীম' এ কথাকে নিজ পরীক্ষা জীবনের অংশ বানিয়েছেন যে, মুসলমানদের কা'বার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) পুরো সৃষ্টি জগতের ওপর পড়ছে এবং সেদিক Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) (থুথু, পেশাব, এবং পায়খানা ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা ক্ষতির কারণ।

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– 'পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাত্র থেকে পানি ডান হাত দ্বারা ঢেলো এবং পরিষ্কার করার জন্য বাঁ হাত ব্যবহার করো। সাবধান! ইস্তিঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করো না। যখন কোনো লোক পায়খানা-পেশাবের জন্য যায়, তখন লজ্জাস্থান নিজ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (ছহীহ বুখারী খ-১ আরবি পৃষ্ঠা -২৭; ছহীহ মুসলিম খ-১, আরবি, পৃষ্ঠা -১৩০; মিশকাতুল মাসাবিহ আরবি পৃষ্ঠা -৪২)

রাসূল ﷺ -এর এ বাণীর মধ্যেও কয়েক প্রকারের প্রাকৃতিক, চিকিৎসাগত এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা পাওয়া যায়, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ইস্তিঞ্জা শুধু বাঁ হাত দিয়েই করা উচিত। এর কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। ডান হাত থেকে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) এবং বা হাত থেকে Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) বের হয়। যদি ইস্তিঞ্জার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে শরীরের রশ্মির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর খারাপ প্রভাব মস্তিষ্ক এবং হারাম মগজ (Spinal cord)-এর ওপর পড়ে।

এ ছাড়াও যেহেতু ডান হাত দ্বারা খানা খাওয়া হয় সুতরাং যদি ইস্তিঞ্জার জন্যও ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে খানা খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহারের সময় দুর্গন্ধ ও জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

১৪. পায়খানা পেশাবের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মাটিতে হাত ঘষে ঘষে ধুতেন। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে যেমন–

পায়খানা পেশাবের পর উভয় হাত ধৌত করা নবী করীম ﷺ-এর সুন্নত। এর দ্বারা মানবদেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়ে থাকে।

যেমন : আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরি। তাতে হাত খালি থাকে এর দ্বারা হাতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ জীবাণু অথবা বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যাল থাকে যা আমাদের হাতকে ময়লাযুক্ত করে। যদি হাত না ধুয়ে খানা খাওয়া হয়, কিংবা খাবারের প্লেটে হাত ঢুকিয়ে দেই, কুলি করা হয়, নাকে পানি দেয়া হয়, তাহলে এ সকল জীবাণু সহজে আমাদের খাবার, মুখ ও নাকের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দেহকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী হাত ধোঁয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার প্রফেসর 'ডাক্তার শাহেদ আতহার' ঠিকই লিখেছেন–

"Hand washing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However non-Muslim did not know that hand washing is so important it has been ordered in Quran 1400 years ago." (Health guidelines from Quran and Sunnah. p-60)

'বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে জীবাণু ছড়ানো রোধ করার জন্য হাত ধোয়ার ওপরে জোর দেয়া হয়েছে। অথচ অমুসলিমদের জানা নেই যে, হাত ধোয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার নির্দেশ ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে দেয়া হয়েছিল।'

যখন আমরা হাত ধুই তখন আঙুলের মধ্য থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন এক বৃত্ত তৈরি করে যার ফলে আমাদের ভেতরের বৃত্তশীল বিদ্যুতের শৃঙ্খলার বেগ বেড়ে যায় এবং বিদ্যুতের রশ্মি এক পর্যায়ে হাতের মধ্যে আসে। এ কাজের দ্বারা হাত সুশ্রী হয়ে যায়। সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়ায় আঙুলের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা পত্রের ওপর পরিবর্তন হয়ে সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়।

রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল এই যে, পায়খানা পেশাবের পর হাতকে মাটি দ্বারা ঘষে ঘষে ধৌত করতেন। যাতে হাতে লাগানো জীবাণুগুলো এবং কিছু জীবাণু এমনও হয় যে সাধারণ পানি দ্বারা তা ধ্বংস হয় না, এ জন্য এ হাতগুলোকে মাটি অথবা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মও।

মাটি উচ্চ পর্যায়ের এ্যান্টি সেপটিক। এমনকি এর দ্বারা কুকুরের জীবাণুও (যা সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণু) খতম করার শক্তি ও তাক্‌ত আছে। এ জন্য এটি সাধারণত জীবাণুগুলোকে দ্রুত গতিতে শেষ করে দেয়। আর এভাবে হাত ধোয়া প্রাকৃতিক দাবিও বটে।

৫. মিসওয়াক

ইসলাম এবং মানবস্বাস্থ্য

ইসলাম যেমন মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি মুসলমানদের দেহ ও পোশাকের পবিত্রতারও নির্দেশ ও শিক্ষা দেয়। যদি ইসলামি পবিত্রতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে তার মাপকাঠি বিজ্ঞানের পন্থার চেয়েও উত্তম ও সমুজ্জ্বল হিসেবে চোখে পড়বে। নামাযের পূর্বে মিসওয়াক ও অজুর নির্দেশ প্রদান করে। এটা আত্মিক ও শারীরিক উভয় দিকের উপকার সাধন করে। এ জন্য স্বয়ং মিসওয়াককে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

একজন মুসলমান পাঞ্জেগানা নামাজে একদিনে ১৫ বার মুখ পরিষ্কার করে। এ থেকে পরিষ্কার যে, মুসলিম নামাযী ব্যক্তির মুখ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। নামাযীকে নামাযের মধ্যে মহান স্রষ্টা ও মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করতে হয়, এ কারণে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় কাজ। মুখ পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ আসে। সঙ্গী নামাযীও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতে পারেন। এ ছাড়াও ময়লা মুখ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কীর্তন ও ইবাদত করার দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং নামাযে খুশু খুজুও অর্জিত হয় না। যদি মিসওয়াক ও পানি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায় তাহলে মুখে এমন রশ্মি তৈরি হয় যার দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত ও প্রশংসা কীর্তনের মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়।

মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য মিসওয়াক করতে থাকায় দাঁত মজবুত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। দাঁতের নানা রকমের রোগের আশঙ্কা থাকে না। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মানুষের আস্বাদন শক্তি বেড়ে যায়। তারা গলা ইত্যাদির রোগ থেকে বেঁচে থাকে। মিসওয়াক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হলো–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি বলেছেন, মিসওয়াককে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা এর মধ্যে পনেরোটি সৌন্দর্য রয়েছে।

ক. মুখকে পাক-ছাফ করে

খ. আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে যান

গ. শয়তান অসন্তুষ্ট হয়

ঘ. প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়

ঙ. আমার (রাসূল ﷺ-এর) সুন্নত আদায় হয়

চ. ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়ে যায়

ছ. পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়

জ. গরমের কষ্ট দূর হয়ে যায়

ঝ. মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়

ঞ. মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়

ট. কফ কেটে যায়

ঠ. মাড়ি শক্ত হয়ে যায়

ড. মিসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালোবাসে

ঢ. দারিদ্র্য এবং সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়

ণ. মেসওয়াক করে যে নামায আদায় করা হয়, তার ছওয়াব ষাট গুণেরও অধিক হয়।

২. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করতে অলসতা করো না, কেননা এটা মাড়ির দাঁতের ব্যথা দূর করে। দাঁত উজ্জ্বল থাকে এবং এর ব্যবহারে স্মৃতিশক্তিও বেড়ে যায়।

৩. রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন : 'জুমুআর দিনে মিসওয়াক করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।'

৪. মুহাম্মদ ﷺ বর্ণনা করেন : নবীদের গুণাবলির মধ্যে একটি হলো মিসওয়াক করা।

৫. নবী করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন : 'খানা খাবার পর মিসওয়াক করা দুজন কমবয়সী গোলাম আযাদ করার চাইতে উত্তম।'

৬. দয়ার্দ্র ও নরম দীল নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : মিসওয়াক করে নামায আদায় করা ঐ নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ ছাওয়াব বেশি, 'যে নামাজের পূর্বে অজু করা হয় নি।'

৭. নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন : জিব্রাঈল আমীন মিসওয়াক-এর এত দূর ফযিলত বর্ণনা করেছেন যে, এটি ব্যবহারের এত তাকীদ দিয়েছেন যে, মনে হয় আমার আশঙ্কা হতো যে, মিসওয়াক আমার উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়ে যাবে।

৮. নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন : 'তোমরা মিসওয়াক দ্বারা নিজেদের মুখ পাক ছাফ রাখ, কেননা এটি মুখের হক।'

৯. عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ـ

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, যদি আমার নিকট কষ্ট মনে না হতো যে, মিসওয়াক করা উম্মতের ওপর কঠিন হয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার হুকুম (আবশ্যকীয়) করে দিতাম। (ছহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ.- ৫৮৯)

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন : 'মিসওয়াক করা নবীগণের সুন্নতের মধ্যে একটি সুন্নত।' (সুনানে তিরমিযী বিয়ের ফযিলত ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ১০৮০)

১১. রাসূল ﷺ মিসওয়াক করার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

ক. মিসওয়াক করা নবীগণের পন্থা এবং তাদের অনুসরণ ও তাদের হেদায়াত তলব করা।

খ. মিসওয়াককারীর সঙ্গে ফেরেশতা মুসাফাহা করে এবং মহত্ত্ব ও উজ্জ্বলতার কারণে তার আগে পিছে থাকে।

গ. মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।

ঘ. মিসওয়াককারীর সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণ ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত যায়।

ঙ. সকল ফেরেশতা এবং আরশ বহনকারীগণ মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

চ. মিসওয়াককারীর জন্য বেহেশ্তের আট দরজা খোলা হয়ে যাবে, যাতে সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে।

ছ. কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক ইসলামের গণ্ডিতে আশ্রয় নিবে, কিয়ামতের দিন তাদের সংখ্যাসম নেকী মিসওয়াককারীদের দেয়া হবে।

জ. মিসওয়াককারীর জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।

ঝ. সব নবী ও রাসূলগণ মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ঞ. মিসওয়াককারীর কোন কিছু মুখস্থ করার শক্তি বেড়ে যায়।

ট. আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীর দিলে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন।

ঠ. মিসওয়াককারীর জন্য খাবার সময়ে শক্ত থেকে শক্ত গোশ্তও নরম হয়ে যায়।

ড. মিসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের ব্যথা দূর হতে থাকে।

ঢ. মিসওয়াককারীর কবর মিসওয়াকের বরকতে প্রশস্ত করা হবে।

ণ. আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বরকত মিসওয়াককারীর ঘরে অবতীর্ণ হয়।

ত. মিসওয়াককারীর সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

থ. প্রত্যেক দাঁত এবং আঙ্গুলের করের সংখ্যানুপাতে পাঁচ পাঁচটি নেকী মিসওয়াককারীর আমলনামায় (মিসওয়াক বা ব্রাশ করার কারণে) লিখা হয়।

দ. মৃত্যুর সময় মৃত্যুর ফেরেশতা রূহ কবজ করার জন্য মিসওয়াককারীর নিকট খুবই ভালো আকৃতিতে আসে, যেরূপে নবী রাসূল পাকের নিকট আসেন।

ধ. মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) মিসওয়াককারীর রূহ এমতাবস্থায় নিয়ে যাবে যেন তিনি পাক পবিত্র থাকবেন।

ন. দুনিয়া থেকে পুনরুত্থানের পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা মিসওয়াককারীকে সুস্বাদু শরাবে তুহুর দ্বারা আপ্যায়ন করবেন।

প. মৃত্যুর পর মিসওয়াককারীর কবরে দুনিয়ার সমান প্রশস্ততা তৈরি করা হবে।

ফ. জমিনের কীট-কীড়া এবং কষ্টদায়ক প্রাণী মিসওয়াককারীকে কষ্ট দেবে না।

ব. কিয়ামতের দিন মিসওয়াককারীদেরকে নবীদের মতো পোশাক পরানো হবে।

ভ. আল্লাহ্ তায়ালার মহান দরবারে মিসওয়াককারীদেরকে নবীদের মতো সম্মান হবে।

ম. আল্লাহ্ তায়ালা মিসওয়াককারীদেরকে নবী ও শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

য. শেষ বিচারের দিন আমলের দাঁড়িতে মিসওয়াককারীর পাল্লা ভারী থাকবে।

র. মিসওয়াককারীর জন্য ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিবেশী হিসেবে জান্নাতে মহল বা বাসস্থান তৈরি হবে।

ল. মিসওয়াককারী আমার (রাসূল ﷺ-এর) সুপারিশ দ্বারা ভূষিত হবেন।

ব. সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, মিসওয়াককারী আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে।

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীগণের দশটি সুন্নত বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিসওয়াক করাও রয়েছে।

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন : 'মিসওয়াক মুখকে পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ।

১৪. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ দিন বা রাতে যখনই শোয়া থেকে উঠতেন, তখন অজু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, যিনি রাত্রি জাগরণ করেন তার মিসওয়াককরণ অধ্যায় পৃ-৫৭)

১৫. আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করে– 'যখন বান্দা মিসওয়াক করে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার তিলায়াত খুব মনোযোগ সহকারে শুনে অতঃপর তাঁর খুব নিকটে এসে যায়, এমনকি তার মুখের ওপর রেখে দেয়। কুরআন-মাজিদের যে শব্দই এ নামাযীর মুখ থেকে বের হয় সোজা ফেরেশতার পেটে চলে যায়। এ জন্য তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মুখ সাফ রাখ।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খ-২ পৃ-২৬)

১৬. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন : "মিসওয়াক করে দু'রাকায়াত নামায পড়া, মিসওয়াক ব্যতীত ৭০ রাকায়াত পড়ার চেয়ে উত্তম।" (জাওয়ায়েদ খ-২ পৃ-২৬৩)

১৭. শুরাইহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? সাইয়েদা আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন–

'রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।' (সহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ-৫৯০)

১৮. যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ নিজ ঘর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি মিসওয়াক করতেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ-২, পৃ -২৬৬)

ইসলামের নবী করীম ﷺ দুনিয়ার মধ্যে অতুলনীয় পথপ্রদর্শক-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। ইতিহাস মহানবী ﷺ-এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম ছিল, অক্ষম আছে এবং অক্ষম থাকবে। রাসূল ﷺ জীবনের যে নিয়ম পেশ করেছেন তাও তুলনাহীন। রাসূল ﷺ মানব জীবনের কোনই প্রাথমিক প্রয়োজন ছেড়ে দেননি। তদুপরি রাসূল ﷺ শুধু মৌখিক (Theoretically) হিদায়াতই দান করেন নি, বরং স্বয়ং আমলের (Practically) দিক থেকেও সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান করেছেন। নবী করীম ﷺ স্বয়ং আমল করে সকল লোকের জন্য নিজ আমলকে সুন্নাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার তাঁর সুন্নাতের ওপর আমলকারীদের জন্য অনেক প্রতিদান ও ছওয়াবের সুসংবাদও দান করেছেন।

মিসওয়াক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশনার ওপর তিনি খুবই চিন্তা করেছেন যে, কী পরিমাণ আগ্রহ ও জোরের সাথে রাসূল ﷺ মিসওয়াকের উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যবহারের ওপর কী পরিমাণ পছন্দ প্রকাশ করেছেন।

আজকাল ব্রাশ (Tooth Brush) এবং পেস্ট (Paste) ব্যবহারের এক নতুন সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পেস্ট এবং ব্রাশ যেমন পরিমাণ উপকার দান করে তেমনি ক্ষতিও করে। এরূপ নতুন সংস্কৃতির চমকের দিকে আকৃষ্ট লোক, সস্তা, সহজ, উপকারী এবং প্রাকৃতিক জিনিস মিসওয়াককে ত্যাগ করে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। লোকেরা দাঁত, মাড়ি, গলার রোগের শিকার হয়ে দেহের বহুলাংশের রোগের কারণ নিজেরাই সৃষ্টি করছে।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা হতো তাহলে দুনিয়ার মধ্যে দাঁতের রোগ এবং ডেন্টাল সার্জনের অস্তিত্ব এতটা আসত না এবং লোকেরা এত কষ্টও ভোগ করত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক এর ব্যবহারের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন এজন্য যে, এর মধ্যে অনেক চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

মিসওয়াক : নতুন চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মিসওয়াক ও জীবাণু

মিসওয়াক জীবাণু হত্যাকারী Anti Septic, এটা মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর করে। এর ব্যবহারে মুখের ভেতরের জীবাণু মরে খতম হয়ে যায়। এভাবে মিসওয়াককারী ব্যক্তি মুখের রোগ থেকে বেঁচে থাকেন। নতুন গবেষণা অনুযায়ী কিছু এমন জীবাণুও হয় যা প্রচলিত ব্রাশ এবং পেস্ট দ্বারা দূর হয় না বরং সেগুলোকে শুধু মিসওয়াকই শেষ করতে পারে।

মিসওয়াক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা এবং মেডিক্যাল সাইন্স প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য অটুট থাকে। মিসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক সবল হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকে। যদি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যার দ্বারা চোয়াল ও মাড়িতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের রোগের কারণ হয় এবং এর দ্বারা হার্টের রোগও হয়ে থাকে।

মিসওয়াক এবং দাঁতের স্বাস্থ্য

মানুষ খানা খায়, পানি পান করে এবং বহু রকমের জিনিস খেয়ে থাকে। আর খানার ছোট ছোট কণা দাঁতের মাঝে জমতে থাকে। যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করার দ্বারা বের হয় না। এর দ্বারা দাঁতের মধ্যে দুর্গন্ধ জমা হয়ে থাকে, যা বহু রোগের পথ সুগম করে। উল্লেখ্য যে, এভাবে লোকের দাঁত ময়লাযুক্ত হলে খারাপ গন্ধ আসতে থাকে। নিকটে উপবেশনকারী ব্যক্তি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতের সাথে মাড়িও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাড়িতে পুঁজ জমা হয়, যার

দ্বারা অসহ্য রকমের ব্যথা শুরু হয়। এর প্রভাব শুধু দাঁতের ওপরই পড়ে না বরং এই সমস্যা এবং পুঁজ আরো বড় হয়ে মাড়িও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্যা আরো বড় হয়ে গলায়ও প্রভাব ফেলে থাকে। এর প্রভাবে গলা খারাপ হতে থাকে এবং সাথে সাথে সর্দি-কাশি, সর্দি-জ্বর ইত্যাদির প্রকোপ বেড়ে যায়। বুকের ছাতির ওপর কফ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। যার দ্বারা মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয়। এর প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি কমজোর হয়ে যায়। যখন চোখ খারাপ হয়ে যায় তখন এই পুঁজ এবং সমস্যার কারণে কান ও পাকস্থলীও প্রভাবিত হয়। এমনকি এসব জীবাণু দেহের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ঐ দাঁতগুলো মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না করাতে মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। জীবন তো স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নাম। জীবনে যদি সুস্থতাই না থাকে তাহলে জিন্দেগীর মূল্য কোথায়? বৎস! মিসওয়াক ছাড়া উপায় নেই এবং মিসওয়াক ব্যতীত কখনোই পুঁজ, দূষণ ও কঠিন জীবাণু কখনো দূর হতে পারে না।

মিসওয়াক ও গলা

যেসব রোগীর গলা খারাপ হয়, তারা টনসিলের রোগী। এ সব রোগী নিয়ম মাফিক মিসওয়াক ব্যবহার করলে সুস্থ হয়ে যায়, এরূপভাবে যদি কোনো রোগীর গলার নালী বড় হয়ে যায় তাহলে তিনি শাহতুত এর শরবত এবং নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক করলে আরাম পেয়ে থাকেন।

মিসওয়াক ও মুখের ফোঁড়া

অনেক সময় মুখের মধ্যে গর্মি, দুর্গন্ধ, এবং অদৃশ্য জীবাণুর কারণে ফোঁড়া হয়ে যায়। এ সব ফোঁড়ার মধ্যে এমন কিছু ফোঁড়াও আছে যেগুলো বের হয়ে আসে আবার কখনো গোপন হয়ে থাকে। এটা খুবই কষ্ট ও ক্ষতিকর হয়। এ জীবাণুগুলো পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে, পুরো মুখকে নিজের আক্রান্ত স্থলে পরিণত করে। যার কারণে খাবার গ্রহণ করা মুশকিল ও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং রোগী ক্ষুধার কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যদি মুখে প্রতিদিন নিয়মিত তাজা মিসওয়াক করা হয়, এর লালা উত্তমরূপে মুখে মিলে যায় ফলে এ রোগ হয় না আর যদি হয়ও তাহলে নিয়ম মাফিক মিসওয়াক করার দ্বারা রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও দৃষ্টিশক্তি

চোখের রোগ ও দৃষ্টির রোগের মধ্যে দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা বড় ধরনের স্থান দখল করে আছে। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাবারের কণার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। যার ফলে চোখের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে এবং এভাবে এতে যদি দাঁতের দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ব্যক্তি চোখের জ্যোতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। কম দৃষ্টিশক্তির রোগীদের অনেকে এমন রোগী হয়ে থাকে যার

রোগ অন্যান্য অনেক কারণের সাথে দাঁতের ব্যাপারে তাদের গাফলতি সবচেয়ে বড় কারণ হয়।

মিসওয়াক ও কান

কিছু এমন রোগীও হয় যারা কানের প্রদাহ, পুঁজ এবং ব্যথায় কাতর থাকে। মাসের পর মাস চিকিৎসা করালেও তাদের এ কষ্ট থেকে মুক্তি মেলে না। যখন উত্তমরূপে এ সকল রোগীদের পরীক্ষা করা হয়, তাহলে জানা যায় যে এদের মাড়িতে পুঁজ হয়ে গেছে এবং এর পুরা মুখ দুর্গন্ধে ভরপুর। যখন মাড়ির চিকিৎসা করা হয় এবং নিয়মমত তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা হয় তখন কানও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও পাকস্থলী

বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রায় ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের সমস্যা সংশ্লিষ্ট রোগ। বিশেষত বর্তমানে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন (তিনজনে একজন) পেটের রোগে আক্রান্ত।

মিসওয়াক না করার কারণে মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়, যে কারণে মাড়িতে পুঁজ জমা হয় এবং কিছু অদৃশ্য জীবাণুও মুখে সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খাদ্যের সাথে মাড়ির পুঁজও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যার কারণে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়ে যায়। মাড়ির পুঁজের কারণে ভক্ষিত অংশ ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যে কারণে পাকস্থলী ও জঠরের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা মুশকিল হয়ে যায়। যদি জঠর ও পাকস্থলীর রোগের চিকিৎসার পরে দাঁতের দিকে মনোযোগ দেয়া যায় অর্থাৎ নিয়মিত মিসওয়াক করা যায় তাহলে রোগের দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যায়।

মিসওয়াক এবং সার্বক্ষণিক কফ কাশি

সার্বক্ষণিক কফ-কাশিতে ভোগে সে এমন এক রোগি যার কফ আটকে গেছে, যখন সে মিসওয়াক করে তখন ঐ কফ ভেতর থেকে বের হওয়া শুরু হয় এবং এ রোগীর মাথা হাল্কা হয়ে যায়।

প্যাথলজিস্ট বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, সার্বক্ষণিক সর্দির জন্য মিসওয়াক প্রতিষেধকের চেয়ে কম নয়। এমনকি মিসওয়াকের স্বতন্ত্র ও বিধিমত ব্যবহারে নাক ও গলার অপারেশন অনেক কমে যায়।

মিসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ

এক লোকের মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসত। এ বেচারা বিভিন্ন প্রকারের ভালো ভালো টুথ পেস্ট এবং মিনজান ব্যবহার করেন এ ছাড়াও অনেক ডাক্তারের থেকে অনেক ওষুধও ব্যবহার করেছেন; কিন্তু কোনো উপকার হয় নি।

কোনো একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তিনি পিলুর ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। পুরাতন লোম ফেলে প্রত্যহ নতুন মাথা দ্বারা মিসওয়াক করতে থাকেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই সুন্নাতের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

মিসওয়াক ও গুরু নানক

গুরু নানক-এর ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তিনি নিজ হাতে মিসওয়াক রেখে দিতেন। তিনি এর দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং বলতেন ওহে এই লাকাড় নাও, এটা সকল রোগ নিয়ে নিবে।

বড়ই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কথা এই যে, যদি মিসওয়াক নিয়ে ব্যবহার করো, তাহলে রোগ যেতে থাকবে এবং যদি এ ব্যাপারে অসলতা কর তাহলে অসুস্থ হয়ে যাবে।

মিসওয়াক এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রোগ

একলোকের গলা, ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছিল, এবং এ সাথে ঘাড় ফুলা ছিল। গলার আওয়াজও ছোট হয়ে আসছিল মেধাশক্তিও কমছিল, এর সাথে মাথাও ঘুরছিল। এ ব্যক্তি মেধাবিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু সবই ফলহীন প্রমাণিত হলো। কারো পরামর্শে তিনি নিয়মমাফিক মিসওয়াক করতে থাকলেন। এভাবে যে, মিসওয়াককে দু'টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করেন এবং এ পানি দ্বারা গড় গড় করতেন। এছাড়াও যেখানে ফুলা ছিল সেখানে কিছু ওষুধের প্রলেপও দিয়েছেন। এ চিকিৎসা বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। একে বিশ্লেষণ করা হলে জানা যায় তার থাইরয়েড গ্লান্ড ইনফেক্টেও ছিল। যার প্রভাব সারা দেহের ওপর পড়েছিল। এই মিসওয়াক এর চিকিৎসা দ্বারা তার এ রোগ দূর হয়ে যায় এবং তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মিসওয়াক ও হার্টের পুঁজযুক্ত ঝিল্লি

হাকীম 'এস. এম. ইকবাল' আখবারে জাহান পত্রিকায় লিখেন : এক রোগীর হার্টের ঝিল্লিতে পুঁজ ছিল। সে চিকিৎসা করাচ্ছিল; কিন্তু কোনো উপকার হচ্ছিল না সর্বশেষে হার্টের অপারেশন করে পুঁজ বের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজ আবার ভরে গেল। সকল দিক থেকে হতাশ হয়ে ঐ রোগী আমার নিকট আসলো। আমি তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তার মাড়ি খারাপ এবং তার মধ্যেও পুঁজ আছে এবং এই পুঁজ হার্টের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এ পরীক্ষা ডাক্তারগণ গ্রহণ করে নিলেন। হার্টের অপারেশনের পরিবর্তে এর দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং তাকে পিলুর মিসওয়াক করতে বলা হলো– যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করেন।

টুথ ব্রাশ

পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত যে, যে টুথ ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে জীবাণুর স্তূপ জমা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হওয়ার আশু আশঙ্কা রয়েছে। পানি দ্বারা পরিষ্কার করার ফলে ঐ জীবাণু পরিষ্কার হয় না এবং তার বৃদ্ধি চলতে থাকে। এছাড়াও ব্রাশ-এর ব্যবহারে দাঁতের ওপরের ঔজ্জ্বল্য এবং সাদা আবরণ উঠে যায়। এর কারণে দাঁতের মাঝের ফাঁকাও বেড়ে যায় এবং দাঁতের মাড়ির স্থান ছুটে যেতে থাকে। এ কারণে খাদ্যের যে অংশগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে তা দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয় এবং অবশেষে সারা দেহে রোগের কারণ হয়ে যায়। এ কারণে এ সকল বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর আমল করা দরকার। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা মিসওয়াক করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

মিসওয়াক-এর প্রকারভেদ

মিসওয়াক-এর জন্য ঐ সকল গাছের ডাল উপযুক্ত যার আঁশ নরম হয়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মাড়ির ক্ষতি না হয়। সর্বোত্তম এবং উন্নতমানের মিসওয়াক নিম্নলিখিত জাতের হয়ে থাকে।

১. পিলু ২. নিম ৩. বাবলা ৪. কানীর।

১. পিলু

পিলুর মিসওয়াক উপহারের সমতুল্য, যা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। সাহাবী আবু খাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি ঐ দলের মধ্যে ছিলাম যারা রাসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির ছিল। রাসূল ﷺ আমাদের পিলু গাছের লাকড়ি মিসওয়াক করার জন্য আমাদের পাথেয়ের মধ্যে দিলেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খ-২, পৃ-২৬৮)

পিলুর মিসওয়াক নরম আঁশযুক্ত হয়, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। বেশির ভাগ অনুর্বর, ঊষর, বিরান ও জঙ্গলে এটি হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, বিভিন্ন জিনিস যা মস্তিষ্কের খোরাক ও সহযোগী এবং এর মধ্যে একটা ফসফরাসও বটে। পিলুর মিসওয়াকে বিদ্যমান ফসফরাস লালা এবং লোম কূপের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় যার দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয়।

২. নিম এবং বাবলা

নিম গাছের মিসওয়াকও অনেক উপকারী। এতে দাঁতের সামগ্রিক রোগসমূহের প্রতিরোধকারী চিকিৎসা রয়েছে। এ গাছ সাধারণভাবে পাঞ্জাবে পাওয়া যায়, এরপর

হলো বাবলার মিসওয়াকের মর্যাদা। এর দ্বারা দাঁত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং এটা দাঁতকে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ থেকে রক্ষা করে।

মনে রাখতে হবে সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত মিসওয়াক তাজা হওয়া দরকার। যদি প্রথমে শক্ত জাতীয় মিসওয়াক ব্যবহার করতে হয় তাহলে কঠিন আঁশগুলো কেটে দিন এবং দাঁতের দ্বারা নতুন মাথা চিবিয়ে আঁশ বানিয়ে নিন।

৩. কানীর

কানীর দুপ্রকারের হয়ে থাকে। সাদা ফুলবিশিষ্ট এবং লাল ফুলবিশিষ্ট। এ জাতের গাছ বেশরিভাগ পার্ক, উদ্যান ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। এর মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা দাঁতের সব কষ্ট, পাইরিয়া ইত্যাদি শেষ হয়ে যায় এবং দুরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে যায়। এ মিসওয়াক ঝাঁজালো হয়ে থাকে কিন্তু এর এই ঝাঁজ দাঁতের জন্য সীমাহীন উপকারী। ডাক্তারগণ এর চাপ এর মধ্যে মওজুদ অণুগুলোকে দাঁতের ঔজ্জ্বল্য, মজবুতী এবং পাইরিয়ার মতো রোগের জন্য খুবই উপকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে এর সাথে তার ব্যবহারের জন্য ঐ জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন যা এর (মানুষের) স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তার বিশেষ বান্দাগণ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে এ সকল জিনিসের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। এ সকল জিনিসের মধ্যে মিসওয়াক এমন যা সকল নবীর সুন্নাত এবং অধিকাংশ রোগের নিরাময়।

৬. অজু, ইসলাম ও মানবস্বাস্থ্য

পবিত্রতা শিক্ষা

ইসলাম যেখানে মুসলমানদের আত্মিক পবিত্রতার নির্দেশ দেন সেখানে তার শিক্ষা মুসলমানদের শরীর ও পোশাক-এর পবিত্রতারও শিক্ষা দেয়, যদি ইসলামের পবিত্রতার পন্থার ওপর চিন্তা করা যায়, তাহলে এর পন্থা বিজ্ঞানের মাপকাঠির পথের চেয়েও উচ্চতর এবং উন্নততর বলে পরিলক্ষিত হয়। নামাযের পূর্বে অজুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা আত্মিক ও দৈহিক উভয় উপকারিতার সহায়ক। এ কারণে স্বয়ং অজুকে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়।

অজু করার তরীকা

এক স্থানে একজন অমুসলিম বিজ্ঞানী এক মুসলমানকে অজু করতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, কব্জি থেকে কনুই অংশ ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানিকে নিচ থেকে নয় বরং কনুই থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি এ পন্থা দেখে

বড়ই প্রভাবিত হলেন। এরপর তিনি মাথা ও ঘাড়ের ওপর মাসেহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, মাথা ও ঘাড় ধোয়া হলো না, যাতে উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মাথা ও ঘাড় না ধুয়ে হাত বুলালেন (মাসেহ করলেন) যাতে প্রশান্তি ছাড়াও শিরার মধ্যে কম্পনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ধোয়ার দ্বারা হয় না।

যেহেতু কোমর ও ঘাড়ের সম্পর্ক শ্লেষার উৎস স্থলের সঙ্গে এবং মস্তিষ্ক, শিরার কার্যাবলিতে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ পদ্ধতিকে দেখে (সেই অমুসলিম বিজ্ঞানী) এমনই প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের সামনে নিজ শির নত করে দিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ১৩০০ বছর পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব নামাজের পূর্বে পবিত্রতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন তিনি নবী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

অজুর মহান দৈহিক উপকারিতা

প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ আলমগীর খাঁ এবং আর সি.পি. জীবাণু থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অজুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন–

'অজু স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলনীতির একটি। এটি জীবাণুর বিরুদ্ধে এক অতি বড় ঢাল। যে সব জীবাণুর কারণে বহু রোগ জন্ম লাভ করে থাকে। এ সকল জীবাণু আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বায়ু, জমিন এবং আমাদের ব্যবহৃত সব জিনিসের ওপর এ কষ্টদায়ক (জীবাণু) প্রভাব বিস্তার করে আছে।

মানবদেহ একটি দুর্গের ন্যায়। ছিদ্র পথ অথবা জখমের স্থান ছাড়া এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নাক মুখের ছিদ্রগুলো সর্বদা জীবাণুর আক্রমণের মধ্যে আছে এবং আমাদের হাতগুলো এসব জীবাণুকে ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে (আত্মঘাতী) সাহায্য করে থাকে। অজুর মাধ্যমে আমরা শুধু এসব ছিদ্রের মধ্যেই নয় বরং আমাদের দেহের ঐ সব অংশের দিনে কয়েকবার ধৌত করা হয়, যা কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং সহজে জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে, এজন্য অজু আমাদের অনেক রোগ থেকে রক্ষা করার উত্তম এক মাধ্যম।'

অজু এবং মানবদেহ

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (যিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়ে 'চিকিৎসা ও আঘাত' বিভাগের প্রধান এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনীয়াত-এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন) অজুর দৈহিক উপকারিতার বিষয়ে লিখেছেন–

'অজুর দ্বারা মানুষের ঐ সব অঙ্গ যা খোলা থাকে যেমন– হাত, মুখ, নাক, চোখ, চেহারা ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব অঙ্গগুলো সব সময় খোলা

থাকায় এবং এগুলো দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধ ও নোংরা জিনিসের সাথে মিলে থাকে এবং বেশিরভাগ সক্রিয় রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। অজুর মাধ্যমে এ সব আবর্জনা ধৌত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। অজুর আরও উপকারিতা এই যে, ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে যে অবসাদগ্রস্ততা, ক্লান্তি মানব প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় তা অজুর পরে দূর হয়ে যায়। মানুষের মন-মগজে সতেজতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্য যে অজু শিরার কেন্দ্রগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে।' (ইসলামের স্বাস্থ্যগত মূলনীতি, পৃ-৩১, ডা. সাইয়েদ হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী, প্রকাশক হাইয়া আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

অজুর উপকারিতা

তুরস্কের ডাক্তার নূর বাকী, 'অজু স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম'-এর অধীনে অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি (Blood circulatory system)-এর ওপর অজুর প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর লিমপাটিক সিসটেম (Lymphatic System)-এর ওপর অজুর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন যা নানা প্রকারের রোগ ব্যাধি থেকে সুরক্ষার নিয়ম। সর্বশেষে অজু এবং শারীরিক বৈদ্যুতিক স্থিতি-এর ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করেছেন। (A Static electricity of the body)

ডাক্তার নূর বাকী-এর দৃষ্টিতে যে পদ্ধতিতে অজু করা হয় এর উদ্দেশ্য দেহের মধ্যেকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর কয়েকটি দিক হলো–

১. দেহকে সংরক্ষণের জন্য লিমফটিক ব্যবস্থা (Lymphatic System)-এর সঠিক পদ্ধতিতে কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, দেহের কোনো ক্ষুদ্র অংশেরও নজর করা যায় না, অজু এ কাজের দায়িত্ব বহন করে।
২. দেহের মধ্যেকার সংরক্ষণের নিয়ম এর নড়া-চড়া করার জন্য কেন্দ্রস্থল এ স্থান যা নাকের পিছনে নাসারন্ধ্রের মধ্যে হয়ে থাকে এবং এ সকল স্থান ধৌত করা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।
৩. ঘাড়ের দুপাশে অজুর দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করার লিম্‌ফটিক পদ্ধতি (Lymphatic Systam) এর 'ক্রুয়ে কার্লানের' মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অজুর পানি প্রবাহ

একজন নামকরা জার্মানি গুণী ও প্রাচ্যবিদ 'জাওয়াকীম ডী যুলফ 'স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের শিক্ষার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার পরে এ সত্যকে স্বীকার করে তিনি লিখেন–

গোসল দ্বারা সারা দেহ এবং অজুর দ্বারা এর অঙ্গগুলো পাক করা জরুরি যা সাধারণ কাজকর্ম অথবা চলা-ফেরার মধ্যে খোলা থাকে। মুখ পরিষ্কার করা মিসওয়াক

করা, নাকের ভেতরকার ময়লা-আবর্জনা দূর করা এ সকলই স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ আবশ্যকগুলোর বড় শর্ত হলো পানি প্রবাহের ব্যবহার, যা বাস্তবে জীবাণুর অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করে।

অজু ও গোসল

ইসলামে শারীরিক পবিত্রতার ওপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে অজুকে আবশ্যক ও ফরজ করা হয়েছে। এরূপভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনের পরে স্বামী-স্ত্রীর গোসল করা এবং হায়েজ নেফাসের পর মহিলাদের গোসল করা অত্যাবশ্যক। এর কারণ এই যে, বীর্যের বস্তুগুলো এবং হায়েজ নেফাসের দুর্গন্ধময় রক্ত জীবাণুর বাহন। এজন্য আবশ্যক যে, এ নাপাকিগুলো দেহ থেকে পূর্ণরূপে দূর করা যাতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিস তারপর প্রতিপালিত হয়ে বহুসংখ্যক হয়ে দেহকে কোনো রোগে আক্রান্ত না করতে পারে। এছাড়াও শরীরকে পানি দ্বারা ধৌত করায় তার সুপ্রভাব আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাও গোপন নয়, তবে এখানে শুধু দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার বিষয় আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

যদি এশার সালাত আদায় করার পরে মানুষ ঘরোয়া কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় অথবা এভাবে বেকার বসে থাকে এবং তার অজু চলে যায় তাহলে উত্তম হলো যে, সে অজু করে শোবে। কেননা অজু করে শোয়াতে পূর্ণ প্রশান্তি এবং গাঢ় ঘুম আসবে এবং শরীরও পূর্ণভাবে জীবাণু থেকে পবিত্র হবে।

যদি হাতগুলোতে জীবাণু ইত্যাদি থাকে তাহলে ঘুমের মধ্যে তা সহজে মুখ; নাকের রাস্তায় দেহে প্রবেশ করে। এছাড়াও যদি খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু এবং যাবতীয় পোকা আঙ্গুলের ফাঁক এবং খাবার কণার ওপর আক্রমণ করে থাকে। এজন্য নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

'যে ব্যক্তি রাতে এ অবস্থায় শোয় যে, তার হাতে খাদ্যের কণা ছিল, এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হলে সে নিজেকে যেন খারাপ বলে যে, তার অলসতার কারণে এরূপ হয়েছে।'

নবী করীম ﷺ শোয়ার পূর্বে নিয়মমাফিক অজু করতেন। বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন–

'যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে কর, তখন অজু কর, যেভাবে নামাযের জন্য অজু করা হয়।' (ছহীহুল বুখারী, অজু অধ্যায়, হাদীস নং ২৪২)

ডাক্তার ইমতিয়াজ লিখেছেন, রাসূল ﷺ বলেন যে, শোয়ার পূর্বে হাত, মুখ এবং অন্যান্য অংশ ধোয়া আবশ্যক। কেননা, দিন ভর মাটি, ময়লা, ধুলা ও জীবাণুগুলো ছিদ্রে জমা হয়ে চামড়াকে দূষিত করে থাকে। মুখ ধোয়ার দ্বারা চোখের মধ্যে জমা হওয়া ধুলাবালিও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ দৈহিক পবিত্রতার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক আছে যে, সে সপ্তাহে অন্তত এক দিন গোসল করবে এবং নিজের মাথা ও দেহকে ধৌত করবে।'

এক ঘটনায় বিশ্ব সম্রাট (নবী করীম ﷺ) স্বয়ং এরশাদ করেন : 'প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে কোনো খানাপিনার জিনিসে হাত লাগানোর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার নিজেদের হাত ধোবে।'

দেহকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। পরিষ্কার কাপড় পরবে এবং গোসল করবে– এগুলো পরিচ্ছন্নতার অংশ। এসব পদক্ষেপ দেহের ওপর থাকা সব সময়ের জীবাণু এবং অন্যান্য জীবাণুকে ধুয়ে প্রবাহিত করে এবং চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। যাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কমতি থাকে তাদের এসব জীবাণু সংক্রমিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগের সৃষ্টি করে এবং চর্মের বদৌলতে দেহের বাকি অঙ্গগুলো যেমন– হাড়, পিঠ এবং জোড়া ইত্যাদির ওপর প্রভাব ফেলে। এ সব রোগ থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হলো যে, বার বার গোসল করতে হবে এবং দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যদ্দারা চর্মের ওপরে থাকা জীবাণু ধুয়ে যায় এবং মানুষের চর্ম ও দেহ এ জীবাণুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

মুসলমান পুরুষ ও নারীদের ওপর কয়েক অবস্থায় গোসল ফরজ হয়ে যায়, (কোন কোন কারণে গোসল ফরজ হয়–এর বর্ণনা ফিকহর কিতাবগুলো যেমন– বাহারে শরিআত, কানুনে শরিআত, নূরুল ইজাহ, কুদুরী, আসান ফিকাহ, কানযুদ দাকায়িক হেদায়া, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে দেখুন।)

জানাবাতের অবস্থায় গোসল করার মধ্যেও অনেক হেকমত রয়েছে : চিকিৎসা বিজ্ঞান সাক্ষী দেয় যে, জানাবাতের অবস্থায় ঘামও ঘন হয়ে যায় এবং ঘামের সাথে মিশে যে ময়লা দেহের ওপর জমে যায়, তাকে যদি ঘষে ঘষে পরিষ্কার না করা হয় তা হলে তা খোস-পাঁচড়ার উপযোগী হয়। নিয়মিত গোসলকারী এরূপ চর্মরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। রোগের প্রতিরোধ ছাড়াও গোসলের এক বড় উপকার এই যে, গোসলের দ্বারা শরীরে সতেজতা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। খারাপ চিন্তা-ভাবনা থেকে মনমগজ মুক্তি পায় এবং অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি এবং ফরজ আদায় করার জন্য মনের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ অনুভব করা যায়। যার দ্বারা দেহ সুস্থ থাকে।

স্বনামধন্য জার্মান প্রাচ্যবিদ 'জাওয়াকীম ডী যুলফ' লিখেন : গোসল ও অজুর কর্তব্যগুলো একান্তই কল্যাণ ও উপকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (ছালিহুল আকলিয়াহ লিআহকামিন্ নাকলিয়াহ পৃ. ৪০৬।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নামাজ ফরজ করেছেন এবং এর জন্য অজুকেও ফরজ করেছেন। অজু ব্যতীত নামাজ হয় না। যদি অজুর আমলের ওপর চিন্তা করি তাহলে এর মধ্যেও হেকমাত নিহিত রয়েছে। বারবার মুখ, হাত ও পা ধোয়ার দ্বারা, কুলি করার দ্বারা, নাকে পানি দেয়ায়, সকল অংশের ওপর থাকা জীবাণু চলে যায়, এভাবে নামাযী বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

বর্ণিত গবেষণার কারণে কেউ এ কথা বলে না যে, অজু ও গোসলের মানবিক উদ্দেশ্য দেহকে সুরক্ষিত করার বিধানকে শক্তি দেয় না। তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী অজু সুন্দর স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র'-তে একথা প্রকাশ করেছেন যে, 'তাঁর দৃষ্টিতে চেহারার সৌন্দর্য এবং চর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অজু একটি ঢাল। তাঁর মতে 'প্রশান্তির বিদ্যুৎ' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব চামড়ার নিচের ছোট ছোট পিঠের পর এর ধারাবাহিকতায় পড়ে যে, অবশেষে এ কাজ করা ছেড়ে দিতে হয়। এ কারণে যে, সময়ের শুরুতে চিড় ধরা শুরু হয় এবং এটা চেহারা থেকে আরম্ভ হয়। এ আমল সারা দেহের ওপরও প্রভাব ফেলে থাকে।

অনেক লোক এ সব লোকদের উজ্জ্বল চেহারার গোপন তথ্য জানার পর নিজের জীবনে অজু করার অভ্যাস গড়েছেন। যে কেউ অজুর অভ্যাস রাখে সে নিশ্চিতই স্বাস্থ্যবান এবং অবশেষে অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী চামড়ার মালিক হন। আমাদের সময়ে এ এক মুজিযা যে, যখন সৌন্দর্যের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হচ্ছে অথচ এর দশগুণ অধিক খরচের দ্বারাও অজুর বরকতের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ ফারুক কামাল এম. ফার্মেসী (লন্ডন ইউনিভার্সিটি) বিভিন্ন মানুষের অঙ্গের ওপর অজুর প্রভাব উল্লেখ করে লিখেন : মানুষ যখন মুখ ধোয় তার দ্বারা চোখ ধৌত হয়, নাক পরিষ্কার হয় চেহারার চর্ম ধৌত হয়। যার কারণে চর্মের ওপর এক তেজোদীপ্ততা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং চর্মের প্রদাহ থেকে মানুষ রক্ষা পায়। কনুই পর্যন্ত হাত ও পা সুন্দরভাবে ধোয়ার দ্বারা মানুষ চর্মরোগের থেকে রক্ষা পায় এবং এ কাজ দ্বারা রক্ত যেখানে যেখানে পানি পৌছায় সেসব স্থানে পরিসঞ্চালন বেড়ে যায় । ময়লা আবর্জনা বের হওয়াতে চামড়ার রঙে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ চমক সৃষ্টি হয়। সকল নামাজের সঙ্গে মিসওয়াকেরও হুকুম আছে। এরও বহু প্রকারের উপকারিতা রয়েছে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। মাথা ও ঘাড় মাসেহ দ্বারা মানুষের হালকা পাতলা লেগে থাকা ময়লা ও ধুলোবালি দূর হয়। এ দ্বারা চুলের সৌন্দর্য বজায় থাকে। অজুর দৈহিক উপকারিতার সাথে সাথে আত্মিকভাবেও মানুষ অনেক প্রশান্তি অনুভব করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় এবং স্মরণ শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অজুর মধ্যে দেহের ঐ সকল অংশ ধোয়াকে আবশ্যক করা হয়েছে যা খোলা থাকে এবং ঐগুলোই জীবাণু প্রবেশের প্রধান প্রধান পথ।

ডাক্তার শাহেদ আতহার (ক্লিনিক্যাল এসোসিয়েট প্রফেসর অভ ইন্টারন্যাল মেডিসিন ইন্ডাইন্ড কৃনিলজী, ইউনিভার্সিটি আইডিয়াল স্কুল অভ মেডিসিন) অজুর ডাক্তারি উপকারিতা লিখতে গিয়ে লিখেন– " Washing all the exposed areas of the body, hand, feet, face, mouth, etc 5 times a day is a healthy preventive procedure." (Health guidelines from Quran and Sunnah. P.—60)

শাহ আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দার মেডিকেল কলেজ এর সাথে যুক্ত ডাক্তার হাসান গজনবী তাঁর এক প্রবন্ধে (Islam and medicine নামে) অজু সম্পর্কে লিখেন–"A Pre-requisite of prayers yet one of the most hygienic procedure as it usually keeps the exposed parts of our body clean and also the parts of entry like mouth and nose thus avoiding infection."

অর্থাৎ নামাযের পূর্বশর্ত অন্যতম সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি যা সাধারণত দেহের খোলা অংশগুলো পরিপূর্ণ রাখে এবং (জীবাণু) প্রবেশের পথগুলো যেমন– মুখ, নাক, এভাবে ইনফেকশন থেকে রক্ষা পায়।

৭. অজুর ফযিলত

হাদীস নং– ১ : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি নবী করীম ﷺ-এর থেকে একথা বলতে শুনেছি যে, "মুমিনের অলংকার কিয়ামতের দিন ঐ পর্যন্ত পৌছাবে, যে পর্যন্ত অজুর পানি পৌছায়।" (সহীহ মুসলিম, অলংকার পৌছান অধ্যায় পৃ.– ৫৮৫)

হাদীস নং– ২ : হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন–

اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ
فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ ـ

অর্থ : অবশ্যই আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় ডাকা হবে যে, তাদের অজুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে। এজন্য যে ব্যক্তি নিজ ঔজ্জ্বল্যকে বাড়াতে চায়, সে যেন তা বাড়ায়।

হাদীস নং– ৩ : আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি অজু করল এবং সুন্দরভাবে করল, তার গুনাহ দেহ থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি অজুকারীর গুনাহগুলো তার নখের নিচ থেকে বের হয়ে যেতে থাকে। (সহীহ্ মুসলিম, গুনাহ বের হওয়া অধ্যায়, পৃ-৫৭৮)

হাদীস নং- ৪ : আমীরুল মুমিনীন ও খালীফাতুল মুসলিমীন সাইয়েদুনা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-

لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ اَلْوَضُوْءَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

অর্থ : যে কেউ পূর্ণ অজু করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ-১, আরবি পৃ.-৫৪২)

হাদীস নং-৫ ঃ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন –

مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَ الْوُضُوْءِ الَّتِىْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهٗ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذٰلِكَ وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ ـ

অর্থ : যে অজু করার সময় সকল অঙ্গ একবার ধৌত করে, এটা ফরজের মর্যাদা পায়, এ ছাড়া অজুই হয় না। আর যে ব্যক্তি অজুর মধ্যে সকল অঙ্গ দুবার ধৌত করে তার দ্বিগুণ প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি অজুর মধ্যে অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধৌত করে তবে এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। (মুসনাদে আহমদ, খ-২ আরবি পৃ. ৯৮)

হাদীস নং- ৬ : আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি নামাযের ইচ্ছায় অজু করার জন্য ওঠে, অতঃপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে, তাহলে তার হাতের গুনাহ প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়, অতঃপর যখন কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে, তাহলে তার জিহ্বা এবং গিরাগুলোর গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন চেহারা ধৌত করে, তখন স্বীয় গুনাহগুলো থেকে এরূপভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন আজই

তার মাতা তাঁকে জন্ম দিলেন। অতঃপর যখন নামাজ পড়ার জন্য খাড়া হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা এ নামাজের কারণে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। যদি (শুধু) বসেও থাকে, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে বসে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, খ.-৫, আরবি পৃ.-২৬)

হাদীস নং-৭ : খলিফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, অতঃপর أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়, তাতে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, অজুর পরে মুস্তাহাব দুয়া অধ্যায়, পৃ.-৫৫৩)

হাদীস নং-৮ : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

وَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ وَرَقَةٍ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি অজু করার পর বলে, ওহে প্রভু! পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমারই নিকট ফিরে আসি। তাহলে এ দুয়াগুলো এক কাগজে লিখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত ছিঁড়বে না (বরং এর উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হবে।) (ওয়াকিফাতুজ জাহাবী, খ-১, আরবি, পৃ. ৫৬৩)

অজু করার ত্বরীকা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা অজুর বিষয় উল্লেখ করে স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং মাসেহ কর তোমাদের

মাথা (অংশ বিশেষ) এবং ধৌত কর তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত।" (৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৬)

অজুর ফরয

অজুর ফরয চারটি, যথা– যা উল্লিখিত পবিত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ফরয : মুখমণ্ডল, অর্থাৎ কপাল থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত এ পরিমাণ ধোয়া যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে।

দ্বিতীয় ফরজ : বাহুদ্বয় কনুই পর্যন্ত এভাবে ধোয়া যাতে কোনো স্থান শুষ্ক না থাকে।

তৃতীয় ফরজ : মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা,

চতুর্থ ফরজ : টাখনুসহ পা ধোয়া যেন কোনো স্থান পানি প্রবাহ থেকে খালি না থাকে।

অজুর সময় এই চার ফরজের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক অন্যথা সর্ব সম্মতিক্রমে অজু শুদ্ধ হবে না।

অজুর সুন্নাত

১. অজুর নিয়ত করা।

২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. তিনবার হাতগুলোকে কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৫. তিনবার কুলি করা এবং দাঁতের ওপর আঙ্গুল মিলানো।

৬. তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

৭. তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া

৮. তিনবার কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।

৯. প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করা।

১০. পুরো মাথা মাসেহ করা।

১১. কান মাসেহ করা।

১২. দু পা তিন বার করে ধোয়া।

১৩. প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা ধোয়া।

১৪. দাড়ি খেলাল করা।

১৫. হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

১৬. অঙ্গগুলোকে ডলে ডলে গুরুত্বসহ ধোয়া।

১৭. ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে ধৌত করা।

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু

আমীরুল মুমিনীন খলিফাতুল মুসলিমীন উসমান গনী (রা) অজুর পানি চাইলেন এবং অজু করলেন, তিন তিন বার নিজ হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করলেন, এরপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন, এরপর তিনবার নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, এরপর তিনবার কনুইসহ স্বীয় ডান বাম হাত ধৌত করলেন, এরপর তার মাথা মাসেহ করলেন, এরপর তিনবার টাখনুসহ ডান পা ধৌত করলেন, এরপর কনুইসহ তিনবার বাম পা ধৌত করলেন, এরপর উসমান গনী (রা) ইরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ অজু করতে দেখেছি : (মুসলিম সালাতের গুণাবলি অধ্যায় খ-১, আরবি−১২০)

অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা

এখন অজুর ধারা অনুযায়ী অজুর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করব।

হাত ধোয়া

যখন অজু শুরু করা হয় তখন সর্ব প্রথম দুহাত তিনবার ধোয়া হয়, এরূপ করা নবী করীম ﷺ এর সুন্নাত। হাদীস শরীফে এরূপ কাজকে গুনাহ থেকে পাক করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করে–

فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ -

অর্থ : যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে। (সুনানে নাসায়ী : মাথাসহ দুই কান মাসেহ অধ্যায় : ১০৩ নম্বর)

যেহেতু হাত ধোয়ার দ্বারা মানবদেহে প্রচুর পরিমাণে উপকার সাধিত হয়, এর কয়েকটি আলোচনা করা হল–

আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরে থাকি, যেহেতু হাত খোলা থাকে, এতে হাতের ওপর বিভিন্ন রোগের জীবাণু বা বিভিন্ন কেমিক্যাল (Chemicals) মওজুদ থাকে যা আমাদের হাতকে কলুষিত করে। যদি হাত না ধুয়ে কুলি করা হয় বা নাকে পানি দেয়া হয় তাহলে এ সব জীবাণু সহজেই আমাদের মুখ বা নাকের মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহকে নানা প্রকারের রোগে আক্রান্ত করে। এজন্য হাত ধোয়ার ওপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন ধরনের

রোগ আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার অধ্যাপক ডাক্তার শাহেদ আতহার এম.ডি লিখেছেন–

"Hand woshing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However Non-Moslim did not know that hand washing is so important has been ordred in the Quran 1400 yeas ago". (Health Guidelines from Quran and Sunnah. P. 60)

'বর্তমানে হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। অমুসলিমগণ জানেন না যে, হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আল কুরআনে সেই ১৪০০ বছর পূর্বে।'

খাজা শামসুদ্দিন আজিমী লিখেছেন, 'যখন আমরা অজু করি তখন আঙ্গুলের ফাঁকগুলো থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন বৃত্ত তৈরি করে যে, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূরীকরণের বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলার শক্তি বেড়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক সীমা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঝলক দেয়। এ কাজের দ্বারা হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সঠিক পদ্ধতিতে অজু করার দ্বারা আঙ্গুলের মধ্যে এমন লাবণ্য তৈরি হয়, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা সিটের ওপর পরিবর্তন করার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়ে যায়।'

কুলি করা

অজুর সময়ে তিনবার কুলি করা সুন্নত। এর দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ.

অর্থ : যখন মুমিন বান্দা অজু করার সময় কুলি করে, তখন তার মুখের সকল গুনাহ ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩) (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

কুলির দ্বারা দাঁতের মধ্যকার খানার ঢুকে থাকা কণা মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যদি দাঁতের অভ্যন্তর থেকে এ সব কণা বের না করা যায় তাহলে এগুলো দাঁত, মস্তিষ্ক এবং গলার বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে যায়।

'কুলি করার দ্বারা যা মুখকে পরিষ্কার করে, তা দাঁতের রোগ থেকেও মুক্ত করে, চোয়াল মজবুত হয় এবং দাঁতের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, রুজি বেড়ে যায়, এবং মানুষ টনসিলের রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

নাকে পানি দেয়া

নাকে পানি দেয়াও দয়াল নবী করীম ﷺ-এর সুন্নত। ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দিবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে। এভাবে হাদীস শরীফে নাক পরিষ্কার করারও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : **"মুমিন যখন অজু করার সময় নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, তখন নাকের** গুনাহ্ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়।" (এ সব গুনাহ্ বলতে ছগীরা গুনার কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ্ বিশেষভাবে তাওবা ও ফিরে আসার সিদ্ধান্তে মাফ হয়ে থাকে। – অনুবাদক) (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি- পৃ. ২৬৩)

সুনানে নাসায়ী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

فَاِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ ـ

অর্থ : মুমিন বান্দা অজু করার সময় যখন নাক ধোয়, তখন নাকের সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ্ দু কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

নাক ধোয়া এবং পরিষ্কার করার মধ্যে যেখানে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সেখানে চিকিৎসাগত উপকারিতাও অর্জিত হয়। কুলি করার পর নাকে পানি দেয়া হয়, নাক মানব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ দেয়ার যোগ্য অঙ্গ। নাকের উত্তম যোগ্যতা এই যে, আওয়াজকে অন্তরঙ্গ করে এবং সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আঙ্গুল নাকের ছিদ্রের নাসারন্ধ্রকে দাবিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে আপনার নিকট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। নাকের মধ্যেকার পর্দাগুলো আওয়াজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মস্তকের জ্যোতি একত্রিত করে। বিশেষ অংশগুলো পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাকের বড় ভূমিকা রয়েছে। নাক ফুসফুসের জন্য বায়ুকে পরিষ্কার, গরম এবং উপযুক্ত বানায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যহ প্রায় শত ঘনফুট বায়ু নাকের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে। বায়ুর এত বড় পরিমাণে একটি বড় কক্ষ ভরে যাবে। বরফের মওসুমে জমা এবং শুষ্ক দিনে আপনি বরফের ময়দানে স্কেটিং (Skating) শুরু করে দিন; কিন্তু আপনার ফুসফুস শুষ্ক হাওয়ার দ্বারা সমস্যায় পড়ে না। সে এর এক অযুতাংশও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যদিও এমতাবস্থায় তার এত বায়ুর প্রয়োজন হয় যা গরম ও আর্দ্র হাওয়ায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ৮০% আর্দ্র এবং ৯০° ফারেনহাইট উষ্ণ বায়ু চায়। ফুসফুস জীবাণু থেকে পবিত্র ধোয়া অর্থাৎ ধুলা ও ময়লামুক্ত বায়ু চায়। এরূপ পরিমাণ বায়ু জমাকৃত একটি এয়ার কন্ডিশন ছোট ট্রাংকের সমান হবে অথচ নাকের মধ্যে কুদরতের নিয়ম একে এমন সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত (Intagrated) করে দিয়েছেন যে সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা।

নাক বায়ুকে আর্দ্র করার জন্য $\frac{1}{4}$ গ্যালন (এক চতুর্থাংশ গ্যালন) আর্দ্রতা প্রতিদিন তৈরি করে থাকে। পরিষ্কার এবং অন্যান্য শক্ত কাজ নাসারন্ধ্রের চুলগুলো করে থাকে। নাকের মধ্যে এক খাদক ঝাড়ু আছে। এ ঝাড়ুর মধ্যে অদৃশ্য শলাকা রয়েছে যা হাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছানো ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবাণুগুলো মেশিনের মতো ধরা ছাড়াও অদৃশ্য শলাগুলোতে এক প্রতিরোধী মাধ্যম রয়েছে যাকে ইংরেজিতে Lysonimun বলা হয়। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাক চোখগুলোকে Infection থেকে রক্ষা করে।

যখন কোনো নামাযী অজু করার সময় নাকের ভেতর পানি দেয় তখন পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক রশ্মি অদৃশ্য লোম-এর কার্যকরী শক্তি বাড়ায় যার ফলে মানুষ অসংখ্য অদৃশ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

মুখমণ্ডল ধোয়া

অজু করার সময় একবার চেহারা ধোয়া ফরজ এবং তিনবার ধোয়া নবী করীম ﷺ এর মুবারক সুন্নাত। চেহারার সীমা মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। হাদীস শরীফে চেহারা ধৌত করা রহমতের কারণ। এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.

অর্থ : অজুকারী যখন নিজ চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার গুনাহগুলো ঝরে যায় এমনকি চোখের পালকের শিকড় থেকেও বের হয়ে যায়।

এরপরে রাসূল ﷺ আরো বর্ণনা করেন : অজুকারী যখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধোয়, তখন সকল গুনাহ এবং অপরাধ এমনভাবে পাক হয়ে যায়, যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করল। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩)

মুখমণ্ডল ধোয়ার অনেক বেশি চিকিৎসাগত, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। নিচে কিছু বর্ণনা করা হলো−

চেহারা ধোয়ার বড় হেকমত নিহিত রয়েছে যে, এর দ্বারা অবয়বে নম্রতা ও সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়। ময়লা ধুলার দ্বারা বন্ধ লোমকূপ খুলে যায়। চেহারা উজ্জ্বল, পূর্ণ আকর্ষণ ও ভীত হয়ে যায়। মুখ ধোয়ার সময় পানি যখন চোখের মধ্যে যায় তখন এর দ্বারা চক্ষুর অবয়বে শক্তি পৌঁছায়। গোলকের সাদা এবং মণির মধ্যে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। অজুকারীর চোখ পূর্ণ আকর্ষণীয় সুশ্রী ও নিদ্রালু হয়ে যায়। চেহারার ওপর তিনবার হাত বুলানোতে সীনা ও মস্তিষ্কের ওপর প্রশান্তি আসে।

আজকাল যখন আমরা ঘর থেকে বের হই এবং আমাদের চলাচল এমন স্থান দিয়ে হয় যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যেমন অনেক স্থানে ময়লা ধুলার বর্জ্য স্তূপ পড়ে রয়েছে অথবা প্রাণী বা মানুষের বর্জ্য খোলা পড়ে রয়েছে, কোথাও বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ যেমন নাড়ী ভুড়ি, রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ সব স্থান জীবাণুর স্বর্গরাজ্য এবং যখন এটা খোলা পড়ে থাকে তখন এর জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে এবং যখন মানুষ এ সব স্থান অতিক্রম করে তখন এ সব জীবাণু মানুষের হাত, চেহারার ওপর আক্রমণ করে এবং আমরা যখন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ বার আমাদের চেহারা মোবারক ধৌত করি তখন এ সব জীবাণু থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি যা চেহারায় পৌছানোর পর নাক-মুখের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ ঘটায়।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা ময়লা-আবর্জনা। শিল্পের উন্নতি আমাদেরকে এ কঠিন সমস্যার ব্যাপারে অধিক সজাগ করে। কারখানার চিমনি থেকে বের হওয়া গ্যাস এবং গাড়ির সাইলেন্সার থেকে বের হওয়া ধূয়া দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ আবহাওয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড ব্যতীত সালফার-ডাই-অক্সাইড মিশে যাচ্ছে। যদি এ সব গ্যাস হাওয়ার মধ্যে বেশি বেশি থাকে এবং একজন মানুষের ঘামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে চেহারার ওপর থাকা ঘামের ফোঁটা এই গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস (কার্বন এসিড, সালফিউরিক এসিড) এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই ঘাম দ্বারা সৃষ্ট এসিড মানব চর্মকে খারাপ করে দেয়। এজন্য চেহারা ধোয়ার দ্বারা ঘাম এবং বিষাক্ত ক্যামিক্যাল ইত্যাদি ধুয়ে চলে যায় এবং মানুষ চর্মরোগ এবং চেহারার অ্যালার্জী থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

অজুর মাধ্যমে চেহারা ধোয়ার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে পারে। চোখের অসুখের সময় ডাক্তারগণ বার বার চোখ ধোয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হাকীম মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ চাগতাঈ-এর মতে অজু করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায় মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে তাহলে চোখের রোগ থেকে মানুষ বেঁচে যায় এবং যে সব চোখে কাচে আর্দ্রতা কমে, তা শেষ হয়ে যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

দিনের মধ্যে বারবার অজুর জন্য চেহারা ধৌত করার কারণে এর সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লেডি বিচার এক আশ্চর্য ও চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার বক্তব্য হলো যে, মুসলমানদের কোনো প্রকারের কেমিক্যাল জাতীয় লোশনের প্রয়োজন নেই। তারা ইসলামি অজুর মাধ্যমে চেহারা ধুতে থাকে এবং মুসলমানগণ কয়েকটি রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

দাড়ি খিলাল করা

অজু করার সময় হালকা দাড়ি ধোয়া যায় এবং ঘন দাড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করে চুলগুলোকে ভিজানো হয়। এটা নবী মুস্তফা ﷺ-এর সুন্নাত।

দাড়ি ধোয়া অথবা খিলাল করার দ্বারা চুলের গোড়া ভিজে যায় এবং সেগুলো মজবুত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। দাড়ি খিলাল করার দ্বারা সব প্রকারের জীবাণু (Common Germs) এবং (Contaglious Germs) ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। দাড়ির চুলে জমে থাকা পানি গলায় শক্তি যোগায়। এভাবে থাইরয়েড গ্লান্ড এবং গলার সকল রোগ থেকে বাঁচায়।

ইসলামের নবী করীম ﷺ-এর সব কথায় হেকমত ও কল্যাণ রয়েছে। অজু ও নামাজ-এর বিধানাবলি যা একাধারে প্রভুর সন্তুষ্টি ও আত্মিক উন্নতি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। ঐভাবে মানব দেহ এবং দুনিয়ার জীবন এর কয়েকটি সমস্যা থেকে বেঁচে যায়।

আজ দুনিয়ার মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের জীবনে কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতার নিশ্চয়তা একমাত্র এবং একমাত্র ইসলামের বিধানের ওপর আমল করা, অপর কোনো ধর্ম এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ঐ কারণে সব ধর্ম বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

অজু করার সময় কনুইসহ হাত একবার ধোয়া ফরজ এবং তিনবার ধোয়া সুন্নাত। মুমিন বান্দার এ ধরনের আমলকে রহমতের কারণও বানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ .

অর্থ : যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে। (সুনানে নাসায়ী : মাথাসহ দুই কান মাসেহ অধ্যায় : ১০৩ নম্বর)

বাহুর এ অংশে বিভিন্ন প্রকারের রক্তনালী বা শিরা রয়েছে। এর মধ্যে শিরা (Arterie) এবং রগ (Veins) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেহের এ অংশ বিভিন্ন প্রকার রোগকে চিহ্নিত করার জন্য বড়ই সাহায্যকারী। এখান থেকে রগের অনুসন্ধান (Pulse) এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। এ অংশগুলো ধোয়া এবং ম্যাসেজ করার দ্বারা মানবদেহের ওপর ধনাত্মক (উপকারী) প্রভাব পড়ে থাকে। পানি রক্তের উত্তাপকে কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure) কে কমিয়ে দেয়।

মাথা মাসেহ্ করা

এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা ফরজ এবং একবার পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। মুসলমানদের এক আমলকেও খারাপ কাজের কাফফারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ ـ

অর্থ : অজুকারী যখন মাথা মাসেহ্ করে, তখন তার মাথা থেকে গুনাহ্সমূহ্ ঝরতে থাকে এমনকি তার দুই কানের নিচ থেকেও। (সুনানে নাসায়ী মাথাসহ কান মাসেহ্ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

মাথা মাসেহ্ করার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক হেকমত পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞানবান বলতে জানেন যে, মাথার ওপরের চুল মানুষের এন্টেনার (Antenna) কাজ করে থাকে। এ কথা সব অনুভূতিসম্পন্ন লোকই জানে যে, মানুষ তথ্যের গুদামের নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো কাজের ব্যাপারে খবর না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না।

যেমন খানা আমরা তখন খাই যখন ক্ষুধা লাগে, পানি তখন পান করি যখন ভেতর থেকে পানি পানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শোবার জন্য বিছানার ওপর ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি যখন আমাদের এ খবর মিলে যে, আমাদের শিরাগুলোর আরামের প্রয়োজন। খুশির জযবা বা অনুভূতি আমাদের ওপর ঐ সময় প্রকাশিত হয়, যখন আমাদের খুশির বিষয়ে কোনো খবর জমা হয়। এরূপে অসন্তুষ্টি, রাগ ইত্যাদিও খবরের ওপর নির্ভর করে হয়।

অজু করার নিয়ত মূলত আমাদের এ কথার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে যে, আমরা এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্য করছি। অজুর বিধান পূর্ণ করার পর যখন আমরা মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছি তখন আমাদের মেধা আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি থেকে ঘুরিয়ে আল্লাহ তায়ালার সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। মাসেহ করার সময় যখন আমরা মাথার ওপর হাত বুলাই মাথার চুলগুলো (Antenna) এ কথাকে গ্রহণ করে যা সকল প্রকারের কুসংস্কার, বঞ্চনা এবং আল্লাহ তায়ালার গণ্ডির বিপরীত, অর্থাৎ বান্দার মেধা এ সংবাদকে গ্রহণ করে যা সকল সংবাদের মূল উৎস (আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা)-এর রাস্তাই আমাদের রাস্তা।

কান মাসেহ্ করা

কান মাসেহ করা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। কানের ভেতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙুল দ্বারা এবং বাইরের দিক (পিঠ) আঙুল দ্বারা মাসেহ করার মাধ্যমে

কানের সকল প্রকারের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং এর দ্বারা শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে থাকে। যখন কানগুলো মাসেহ করা হয় তখন হৃদয়ের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে থাকে।

পা ধোয়া

দু'পা টাখনুসহ একবার ধোয়া ফরজ এবং তিন তিন বার ধোয়া রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সুন্নাত। হাদীস শরীফে পা ধোয়াকেও গুনাহের কাফফারা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ.

অর্থ : অজুকারী যখন পা ধৌত করে, তখন পায়ের গুনাহ নির্গমন করতে থাকে এমনকি পায়ের নখগুলোর নিচ থেকে বের হতে থাকে। (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু' কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

পা শরীরের অংশ যা চলার সময় সবচেয়ে বেশি ময়লা, ধুলা, কাদা, জীবাণু ও আবর্জনার মধ্যে থাকে। এ জন্য দু' পাকে দিনে একের অধিকবার ধোয়া আবশ্যক এবং ডায়াবেটিকস রোগীদের জন্য তো পা-এর হিফাযত খুবই জরুরি কেননা ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে বেশি ইনফেক্শন হয়ে থাকে।

'মস্তিষ্ক সংবাদ গ্রহণ করে এবং এ সংবাদগুলো তরঙ্গের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়। সংবাদের প্রত্যেক তরঙ্গ একটি অস্তিত্ব রাখে, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আন্দোলিত হওয়া। নিয়ম হলো, আলো হোক কিংবা পানি– এর জন্য প্রবাহ আবশ্যক এবং প্রবাহের জন্য আবশ্যক হলো যে, তা প্রকাশ হবে এবং বিলীন হবে। যখন কোনো বান্দা পা ধৌত করে, তখন অতিরিক্ত আলোর চাপে (Poison) আর্থিং (Earth) হয় এবং মানবদেহ বিষাক্ত বস্তু থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

নামায : আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবস্বাস্থ্য

যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবতীয় আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যেরও খুব কাছ থেকে খুব খেয়াল রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন, এভাবে নামাযও আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখে।

নামাযের মধ্যে শেফা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আমার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, তখন রাসূল ﷺ আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে ইরশাদ করেন : 'তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে?. আমি বললাম, 'জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'দাঁড়াও এবং নামায আদায় কর। কেননা নামাযের মধ্যে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে।' (সুনানে ইবনে মাজা, চিকিৎসা অধ্যায়, খ-২, হাদীস নং ৩৪৫৮)

নবী করীম ﷺ -এর বাণী এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, সালাত কায়েম করা শারীরিক রোগের জন্যও আরোগ্য, তবে শর্ত এই যে, পূর্ণ আদরের সাথে নবী করীম ﷺ এর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করতে হবে।

সালাতের প্রভাব

সালাত দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের রক্ষা ও হিফাযতের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের প্রভাব রাখে এবং উভয়ের ক্ষতিকর বস্তু বের করে দেয়। দুনিয়াতে যত লোক কোন, রোগ-বিপদ ও সমস্যার শিকার হয় এর সঙ্গে সালাত আদায়কারীর সংশ্লিষ্টতা কম থেকে কম হয়ে থাকে এবং এর শেষ ফল সবদিক দিয়ে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে।

রোগ থেকে মুক্তি

ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের দৃষ্টিতে, নামায থেকে যেমন আত্মিক আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ হয়, ঐরূপ এর মধ্যে দৈনিক স্বাস্থ্যেরও বিষয়াদি মওজুদ আছে। নামাজের আরকান যদি উত্তমভাবে এবং নিয়ম মতো আদায় করা যায়, তাহলে এর দ্বারা কয়েক প্রকারের শারীরিক রোগ থেকেও মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বড় ইহসান

আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের ওপর ফরজ করে বড়ই ইহসান করেছেন, নামায যেখানে আমাদের আত্মিক উন্নতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি দান করে এবং খারাপ থেকে ফিরিয়ে পবিত্রতার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করায়, অনুরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও নামাজ সাহায্যকারী বটে। শরীরকে কেতা-দুরস্ত রাখতে, শিরার কষ্ট ও জোড়াগুলোর রোগ থেকে বাঁচাতে এবং খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে নামায অনেক প্রভাবশীল জিনিস। মানব স্বাস্থ্যের জন্য নামাযের একটি উপকারিতা এও যে, এটি আমাদের রক্তের কলেস্টরেল অর্থাৎ চর্বিকে কমানোর ক্ষেত্রে একটা সীমা পর্যন্ত কাজ করে।

সালাত এবং দেহের বর্ধন ও উন্নতি

ডাক্তার ও হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পি এইচ. ডি. প্রধান চিকিৎসা ও আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়) তাঁর লেখা 'ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি'-তে লিখেন–

'যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য ব্যায়ামও সংযম হিসেবে গণ্য হবে। যার দ্বারা মানুষের সকল অঙ্গের বৃদ্ধি উত্তম হবে এবং তার শক্তি বাড়বে। এছাড়াও জোড়াগুলোর সচলতা সুস্থ থাকবে এবং জোড়াগুলো তাদের কাজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে থাকবে এবং জোড়াগুলো বিভিন্ন প্রকারের রোগ যেমন জোড়া শক্ত হওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। এ ছাড়াও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ম, রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং পচনপ্রক্রিয়ার ওপরও উত্তম প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানুষ জীবনভর বিভিন্ন প্রকারের রোগ ও শারীরিক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে আর মানুষ জীন্দেগীর কর্তব্যসমূহ সঠিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আদায় করতে থাকবে।' (ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি, পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

সর্বোত্তম ব্যায়াম

নামায একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম, যা মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না। অন্য সব ধর্মের মধ্যে এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়া ও শক্তিশালী হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের সকল অঙ্গগুলোতে পড়ে এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬, *প্রাগুক্ত*)।

৯. সালাতের রহস্য

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী-এর ধারণা এই যে, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নামাযের রহস্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রাখতে অক্ষম। তিনি লিখেন–

No science has power to unrave or outline the mysteries of prayer. In particular, to view prayer merely as a physical exercise is as ridcoulous as believing that there is nothing more to the Universe than the air we breathe.

অর্থ : কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের রহস্য উপলব্ধি বা রহস্যের উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, পৃথিবীতে আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

উত্তম ব্যবস্থাপত্র

ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও এর দৈহিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দেন নি। এভাবে তিনি লিখেছেন–

It today even materialits acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.

অর্থ : আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, জোড়ার ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য আজ নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।

কেমিস্ট্রির ব্যবস্থাপত্র

নামাযের ব্যায়াম যেমন বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যম, এটা তেমনি এরূপ ভেতরের অঙ্গগুলো যেমন– হৃদয়, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং দেহের সকল গ্লান্ড (Glands) ইত্যাদি সুদৃঢ় করে ও উন্নত করে এবং দেহের শিডিউল এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে।

নামাযের প্রচলন যদি হতো তাহলে

কিছু রোগ এরূপও আছে যেগুলো থেকে নামায চালু করার দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, কেননা নামায আদায়ের মাধ্যমে দেহে এ সব রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ডাক্তার হাসান গজনবীর এ বাক্যগুলো চিন্তার খোরাক জোগায়। তিনি লিখেন–

In addition to saving us from the sins and elevating us to the heights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. They keep our body active, help digestion and save us from nuscase and joint diseaes through regular balanced exercise. They help the circulation of blood and also nitifate the bad effect of cholesterol. Prayers a vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyses. diabetes mellitus etc.. Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission from their doctor to leave bad. (Islamic Medicine .. P.-68)

অর্থ : আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর সাথে সালাত আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় ধরনের সাহায্য করে। এটি আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখে, হজমে সাহায্য করে, আমাদেরকে জড়তা ও জোড়ার রোগ থেকে নিয়মিত সুষম ব্যায়ামের দ্বারা রক্ষা করে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালনে এবং কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সালাত হার্ট এ্যাটাক,

প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ..... হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত, যেমনিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন। (*প্রাগুক্ত*)

পশ্চিমারা আজ হরেক রকমের ব্যায়াম করছেন যাতে তাদের দেহের কলেস্টেরল গড়মাত্রা সীমাতিক্রম না করে। এ ছাড়াও এদের দেহ সব প্রভাবশীল পন্থায় কাজ করে। তাঁরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি নামায যা কোনোরূপ ব্যায়াম নয় অথচ তা নানারূপ ব্যায়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। তা স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। যেমন জার্মানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েফ'-এ প্রসিদ্ধ জার্মান মান্যবর ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডি জুলফ এ সত্যকে প্রকাশ করেছেন তার জবানীতে। তিনি লিখেছেন– যদি ইউরোপে ইসলামি নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়াম ও নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না। (আল মাসালিহুল আমলিয়াহ লিল আহকামিশ শরইয়াহ পৃ.-৪০৬)

সর্বোত্তম পর্যায়ের চিকিৎসা

এক পাকিস্তানি ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ইউরোপে ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য গিয়েছেন। যখন সেখানে সম্পূর্ণ নামাযের ব্যায়াম পড়ালেন এবং বুঝালেন তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমরা এতদিন পর্যন্ত নামাযকে এক ধর্মীয় আবশ্যক বলেই জানতাম এবং পড়তে থাকতাম, অথচ এখানে তো আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয় যে, নামাযের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

ডাক্তার সাহেব তাকে একটি তালিকা প্রদান করেন যা নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে নিরাময় হয়–

১. মানসিক রোগ (Mental Diseases)

২. স্নায়বিক রোগ (Nerve Diseases)

৩. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)

৪. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ
(Restlessness, Depression and Anxiety)

৫. হার্টের রোগ (Heart Diseases)

৬. জোড়ার রোগ (Arthritis)

৭. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to Uric Acid)

৮. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

৯. চিনি রোগ (Diabetes Mellitus)

১০. চোখ এবং গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E.N.T Diseases)।

মনস্তাত্ত্বিক রোগ

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন– গুনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। যার বর্ণনা পুস্তকের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে বাদ দিতে হচ্ছে। একই সঙ্গে নামায দ্বারা পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়াও দৈহিক ও মেধাগত উপকারিতাও হয়। আজ ইসলামি ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক।

ব্যায়াম ও নামায

নামাযের রুকনগুলো এককভাবে ব্যাখ্যা করলে তার আলোকে দেখা যায় নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের মধ্যেই বিশেষ অঙ্গ ও জোড়ার আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ অঙ্গগুলোর ব্যায়াম হয়। শরীরতত্ত্ব বিদ্যার (Physiology) একটি মূলনীতি এই যে, যখন মানুষ নড়াচড়ার ইচ্ছে করে তখন সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে নড়াচড়া স্নায়ুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে উদ্দীষ্ট কাজ করে থাকে এবং যখন নামায আদায়ের সুরতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন এ আকার একটি ব্যায়ামের প্রকৃতি গ্রহণ করে যার দ্বারা অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। এভাবে নামাযের সব রুকন আদায়ের মাধ্যমে মানবের সব অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব দেহের সতেজতা ও শক্তি বহাল থাকে এবং দৈহিক কার্যাবলি প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।

সামগ্রিক ইবাদত

নামায একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম, যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদকে দেহের মধ্যে বাড়তে দেয় না। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যা আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযের মধ্যেই রয়েছে যে এটা সমগ্র ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব সমগ্র মানব অঙ্গের ওপর সমভাবে পড়ে এবং দেহের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত থাকে। (ইসলামি স্বাস্থ্য বিধি, পৃ.–৩৬, মু. কামালুদ্দীন হামদানী)

কঠিন বস্তু সচল করা

নামাজ আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্য ব্যায়াম এ জন্য এর মধ্যে দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদা এগুলোর বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়া হয়ে থাকে এবং নামাযী এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর অবস্থান, পরিবর্তিত হতে থাকে ও নামাযে দেহের অধিকাংশ জোড়া নাড়াচাড়া করতে থাকে এবং এর সাথে বেশির ভাগ অদৃশ্য অঙ্গগুলো পাকস্থলী, অন্ত্র, শ্বাস যন্ত্র, এবং খাদ্যের অঙ্গগুলো এসবের গঠনে নড়াচড়া এবং পরিবর্তন আসে। অতঃপর এ অবস্থায় কোনো কথা নিষেধকারী যে এ সব নড়াচড়ার দ্বারা কিছু অঙ্গ শক্তি অর্জন করবে এবং অপ্রয়োজনীয় আবশ্যিক জিনিসগুলো সচল না হবে? (তিব্বে নববী, পৃ.-৩৯৯, ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ)

১০. নামাযের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

এখন ধারাবাহিকভাবে নামাযের কিছু আরকানের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করা হলো–

১. তাকবীরে তাহরীমা

যখন আমরা হাতগুলোকে কান পর্যন্ত উঠাই তখন বাহু, ঘাড়ের পিঠ এবং কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম বহুত উপকারী। যখন এই ব্যায়াম নামাযীর দ্বারা নামায পড়ার মাধ্যমে একাকী হয়ে যায় এবং এই ব্যায়াম প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা থেকে রক্ষা করে।

নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

মস্তিষ্কে কোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেড়ে যায়। এ সব বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা সচল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে কোটি কোটি কোষের মতো গর্তও হয়, মস্তিষ্কের একটি গর্ত এরূপ আছে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছবি নিতে থাকে এবং বিভক্ত করতে থাকে। এই ছবি খুবই কালো হয় এবং খুবই চমকদার হয়।

একটি গর্ত আছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এবং এ সব গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ঐ সব কথাও হয়ে থাকে যেগুলোকে অনুভূতি দৃষ্টি ও অনুমান করতে পারে. এবং যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সংশোধন নাম দিয়ে থাকি। নামাযী যখন হাত উঠিয়ে উভয় কানের লতির নিকট নেয় তখন এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুবই সূক্ষ্ম তাপ

নিজ কনডেন্সর (Condensor) বানিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এই গর্তের সেল/ কোষগুলোকে চার্জ করে দেয়। যাকে অনুভূতি দেখতে ও আন্দাজ করতে পারে। এই কোষগুলো চার্জ হয়ে মস্তিষ্কে আলোর ঝলকানি হয় এবং এ ঝলকানি দ্বারা সব স্নায়ু প্রভাবিত হয়ে এই গর্তের দিকে মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক সংশোধন নিহিত রয়েছে। সাথে সাথে হাতের মধ্যে এক তেজী প্রবাহ মস্তিষ্ক থেকে স্থানান্তর হয়।

কিয়াম বা দাঁড়ান

কিয়াম বা দাঁড়ানোর দ্বারা দেহ সম্পূর্ণরূপে অনঢ় ও শান্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও মানবদেহের ওপর বহু প্রকারের প্রভাব আচরিত হয়। তা এরূপ–

যখন নামাযী কিরাআত শুরু করে এবং নবী করীম ﷺ এর নির্দেশনা মুতাবিক উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন, যে ব্যক্তি তা কানে শোনে, এ সব কুরআনের আয়াতের আলোগুলো সারা দেহে প্রবাহিত হয়, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য এক বিরাট পরশ পাথর।

কিয়াম দ্বারা দেহের প্রশান্তির পদ্ধতি অনুভূত হয়। নামাযী যেহেতু কিয়ামের মধ্যে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করতে থাকে এ কারণে তার দেহ এক জ্যোতির বৃত্তের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লেপ্টে থাকে এবং সে যতক্ষণ এ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'নূর' থেকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বলে এর বেষ্টনীর মধ্যে থাকেন।

কিয়ামের মধ্যে নামাযী যে অবস্থায় থাকে যদি আমরা প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ (৪৫) মিনিট পর্যন্ত এ অবস্থায় খাড়া থাকি তাহলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উন্নতমানের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। কিয়ামের দ্বারা পরবর্তী মস্তিষ্ক (Pons) যার কাজ হলো আচরণ, প্রচলন এবং মানব দেহের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করা, শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ এমন এক মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে থাকে যে, যার দ্বারা মানুষ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।

হাত বাঁধা

হাত বাঁধার সময় কনুইর আগে-পিছে থাকা পেশি এবং বগলের পিছের নড়ার পেশি অংশ নেয় এবং সেগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

নামাযে বাম হাত নিচে বাঁধা হয় এবং ডান হাত দ্বারা তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়। মূলত মানব অঙ্গগুলোর ডান ও বাম দিকের কার্যকরণ পৃথক পৃথক। ডান অংশ থেকে বিশেষভাবে ডান হাত থেকে অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বের হয় যা ধনাত্মক (Positive) হয়ে থাকে। সর্বদাই ডানহাতের ধনাত্মক রশ্মি (Positive

rays) বাম হাত থেকে স্থানান্তর হয়ে শক্তি, সামর্থ্য এবং নড়াচড়ার কারণ হয়ে যায়, যার কারণে মানবদেহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং মানুষ পেরেশান বা অস্থির হয় না।

নামাযে নারী ও পুরুষ এক স্থানে হাত বাঁধেন না, বরং পুরুষ নাভীর নিচে এবং নারী বুকের ওপরে হাত বাঁধেন। এর দ্বারাও মানব দেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়। পুরুষ যখন নাভী বা তার নিচে হাত বাঁধে তখন উভয় হাত থেকে তরঙ্গ বের হয় যা ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) হয়ে থাকে।

এখন এই তরঙ্গমালার মিশ্রণে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় যা নাভীর মাধ্যমে স্নায়ু পর্যন্ত পৌছে যায় দ্বারা প্লীহা, বৃক্ক (Adrenal Glands) শক্তিশালী হয়, যার দ্বারা যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও সচল হয়।

মহিলাগণ নিয়তের পর যখন বুকের ওপর হাত বাঁধে তখন তার হার্টে স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণতা প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি ও উন্নতি পায় যার ওপর বাচ্চাদের খাদ্য সীমিত হয়ে থাকে। নামায প্রতিষ্ঠাকারী মায়েদের দুধে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, মহিলাগণ যখন বুকের ওপর হাত রাখে এক বিশেষ মুরাকাবা করে, যাতে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছুর ওপর প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করে (যেমন নামাযে হয়) তাহলে এ অবস্থায় এক বিশেষ প্রকারের রশ্মি (Rays) সৃষ্টি হয়, যা ডাক্তারদের কথায় হালকা নীল অথবা সাদা রঙের হয়ে থাকে যা তার দেহে প্রবেশ করে ও বের হতে থাকে এবং তার দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ দেহ কখনো কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে না।

রুকু

হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমরকে ঝুকানোর অবস্থাকে রুকু বলা হয়। এ নড়াচড়ায় দেহের সকল পেশির ব্যায়াম হয়ে যায়। এর মধ্যে নিতম্বের জোড়া ঝোঁকানো (Flexion) হয়, কনুইগুলো সোজা টান (Extended) হয় এবং মাথাও সোজা হয় এ সময় সব পেশি শক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু পেট কোমরের পেশি ঝোকে এবং সোজা হবার সময় কাজ করে। এভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম রুকুর মধ্যে হয়ে যায়।

সম্মানিত ডাক্তারগণ রুকু এবং সিজদাকে টাখনু এবং কোমর ব্যথার রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুকুর মধ্যে হারাম মগজ (Spinal Cord)-এর কাজ কারবার বৃদ্ধি পায় এবং ঐ রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় তিনি এ রোগ থেকে খুব দ্রুত আরাম পেয়ে থাকেন। রুকু দ্বারা কোমর ব্যথার রোগী অথবা

এমন রোগী যার হারাম মগজ ফুলে (Inflamation of spinal cord) গিয়েছে, তিনি খুব দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন।

রুকুর দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের নলার অবসাদগ্রস্ত রোগী চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। রুকুর দ্বারা মস্তিষ্ক ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঞ্চালন (Circulation of Blood)-এর কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সিজদা

সিজদার মধ্যে নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও কনুই এর ওপর ঝোঁকানো (Flexion) হয়ে থাকে। যখন নলা এবং রানের পিছনের পেশি এবং কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগুলো এর বাইরের দিক থেকে টান লাগে। এর সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও চেপে যায়।

সিজদার মধ্যে নারীদের হাঁটুর সাথে বুক মিলানো উত্তম। এটা গর্ভাশয়ের পিছনের (Retrorersions of Uterus)-এর উত্তম চিকিৎসা। সিজদার মধ্যে আরো অনেক শারীরিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। মস্তিষ্কের জন্য রক্তের খুব প্রয়োজন। কেননা সে সব অঙ্গের মূল। কিন্তু এর অবস্থান স্থল এরূপ যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌঁছানো কিছুটা মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে একত্রিত করার জন্য সিজদা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আমল।

মস্তিষ্ক সাধারণ অবস্থায় বেশির ভাগ সময় হার্ট থেকে উঁচু থাকে, এজন্য মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না, সিজদার দ্বারা মস্তিষ্কে হার্টের নিচে পড়ে এজন্য এ সময় এর রক্ত সহজে পৌঁছায়।

সিজদা যত দীর্ঘ হবে ততই বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এভাবে নবী করীম ﷺ দীর্ঘ সিজদার ফযিলত বর্ণনা করেন। এর ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত সুস্থ থাকে। যেকোন বয়সে মহান রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কৃত লম্বা সিজদার দ্বারা আত্মিক, মস্তিষ্ক, মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের জন্য সহযোগী হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফের মতে 'সিজদায় উভয় হাত এবং সব অঙ্গের এক মোহের সাথে প্রসারিত করা এবং সংকুচিত করা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করে।' (আল মানালিহুল আকলিয়াহ, লিল আহকামিন নকলিয়াহ পৃ.- ৪০৬)

নামাযী ব্যক্তির চেহারার ওপর সতেজতা থাকে। কেননা নামায এবং সিজদার কারণে এর সব শিরার মধ্যে রক্ত পৌঁছায়। যে নামায পড়ে না তার চেহারার ওপর এক ধরনের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে।

কা'দা বা বৈঠক

দু অথবা চার রাকআত পর আমরা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসি, একে কা'দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে, কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে এজন্য এ সব অঙ্গে হালকা পাতলা ব্যায়াম হয়ে যায়।

ব্যায়ামের এ নিয়ম যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ চুপ থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে বা সংশ্লিষ্ট হালকা পাতলা ব্যায়াম করতে হবে। নামাযেও রুকু এবং সিজদার পরে বৈঠকে বসা এ নিয়মগুলোর উত্তম প্রকাশ।

সালাম ফিরানো

অস্ত্রোপচার মেডিকেল কলেজ মুলতানের ডাক্তার কাজী আব্দুল ওয়াহেদ-এর মতানুযায়ী নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা ডানে বায়ে ফিরানোর প্রয়োজন হয় এবং এক নামাজে এরূপ কয়েক বার (ফরজ সুন্নাত মিলে) করার প্রয়োজন হয়। এরূপকারীর হার্টের রোগ (Heart Diseases) এবং এর মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকে এবং খুব কমই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সালাম ফিরানোর সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি সক্রিয় থাকে। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান করেছেন। এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম ইত্যাদি) ওপর টিকে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে সচল রাখে। থেমে থেমে নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন হয় জামায়াতে পড়ার জন্য। এটা এক উচ্চমানের ব্যায়াম হিসেবে মানা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চলাচলের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যাওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যাতে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে নামাজ আদায়ের জন্য নড়াচড়া করতে থাকে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের নিকট স্বীয় দাসত্ব এবং বন্দেগী পেশ করতে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা এবং তদীয় রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা আবশ্যক করেছেন। এ সময়গুলো বিভিন্ন হওয়ার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা পাওয়া যায়। এক মুসলমান নামাযী পাঁচ সময়ে এ নামাজগুলো আদায় করেন এবং এ ছাড়াও তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। যার সময় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে।

এখন নামাযগুলোর বিভিন্ন সময় হওয়ার বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাগত উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা কিছু এরূপ :

তাহাজ্জুদের উপকারিতা

অভিজ্ঞজনদের অনেক বিশ্লেষণ এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপকারিতা অর্জনের বিষয় প্রমাণিত–

১. তাহাজ্জুদের সময়ে সালাত আদায় করা অস্বস্তি ও নিদ্রাহীনতার চিকিৎসা।

২. তাহাজ্জুদ সালাত হার্টের রোগের জন্য বড় ধরনের ওষুধ।

৩. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা স্নায়ুর সংকোচন ও বন্ধনের জন্য উপকারী।

৪. মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ করে পাগল হওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যার জন্য শেষ চিকিৎসা হলো তাহাজ্জুদ।

৫. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা দৃষ্টির রোগগুলোর পরিপূর্ণ চিকিৎসা। তাহাজ্জুদ নামায বিশেষভাবে এ সব লোকের জন্য নিরাময় যারা প্রত্যেক জিনিস দুটি দুটি দেখে।

৬. তাহাজ্জুদের নামাজ মানবদেহে বুদ্ধি, আনন্দ এবং অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করে যা নামাযীকে সারাদিন উৎফুল্ল রাখে।

এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে একান্ত নৈকট্য হাসিল করে। রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পরে এটা বুঝতে হবে যে, মধ্যরাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগে আগে তাহাজ্জুদের সালাতের সময়। নামাযী যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে তখন ঐ সময় তার মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তার অনুভূতি অদৃশ্য নড়াচড়া এবং অদৃশ্য রশ্মিগুলো সহজে গ্রহণ করে নেয়। এজন্য সুফিয়া কেরাম (র) বলেন, যে আল্লাহর ওলী যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। তাহাজ্জুদ গোযার-এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল ও মারেফাত অর্জনের সর্বশেষ সিঁড়ি হলো তাহাজ্জুদের সালাত।

ফজরের সময়

যখন রাত শেষ হয়ে আসে, তখন ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায ফরজ করা হয়েছে। যা হালকা এবং যখন প্রকৃতির ওপর চাপ নেই। সারারাত আরাম করার পর যখন পাকস্থলীও খালি হয়ে যায়, কঠিন শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এরূপ করায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য এ সময় হালকা ও

সংক্ষিপ্ত নামাজ নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। বরং কোনো নামাযী যেন এই চার রাকআত নামায পড়ে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে। ফজর নামায পড়ে লোকেরা নিজ অবসাদগ্রস্ত দেহকে পুনরায় সক্রিয় ও চলমান করে। এরপর সারাদিন যাবৎ নিজ রিযক ও জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজকর্মে মনোযোগ দেয় এবং মস্তিষ্ক পুনরায় চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সুবহে সতেজ প্রকৃতি এবং আলোতে মানুষ নামাযের জন্য বাইরে বের হয় এবং পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, এতে সতেজ পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশ থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

ফজর নামাযের জন্য নামাযীকে নিজ দেহকে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। সে অজু করে নিজ দেহের অঙ্গগুলোকে ধোয়, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। যদি এগুলো না করে তাহলে মুখ এবং দেহের ওপর জীবাণু লাগতে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণ মানুষ নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এজন্য ফজরের নামাজ ফরজ হওয়ার এক কারণ এই যে, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মমাফিক হও।

জোহরের সময়

দিন শুরুর সাথে সাথে মানুষ জীবিকা অর্জনের মধ্যে লেগে যায়। ধুলা-ময়লা তার গায়ে লাগে। কিছু কেমিক্যাল হাত পায়ে লাগার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা মানুষ জীবাণু বিযুক্ত বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন তার দেহের ওপর জীবাণু আক্রমণ করে থাকে। এছাড়াও দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে করতে শ্রান্তিও অনুভূত হতে থাকে। এ কারণে একজন নামাযী জোহর নামাযের জন্য অজু করে যাতে স্বীয় হাত, মুখ, পা ইত্যাদি ধৌত করে যাতে রোগের কোনো আশঙ্কা না থাকে।

ক্লান্ত দেহ জোহরের নামায পড়ে আরাম ও প্রশান্তিও অনুভব করে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়, যার দ্বারা শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। এ সব উপকারিতা একজন নামাযীর জোহরের নামাযের সময় অর্জিত হয়।

দুপুর পর্যন্ত কঠিন গরম পড়ার কারণে সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যেতে শুরু করে। যদি এ ক্ষতিকর গ্যাস মানবদেহের ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে যায়। তার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয় এবং সে পাগলামিরও শিকার হয়ে থাকে। তাই সে দুপুরের সময় জোহর নামায পড়ার জন্য অজু করে নিজ দেহকে পুনরায় সতেজ ও প্রশান্তময় করে। অজুর দ্বারা সে বিষাক্ত গ্যাস থেকে নিজ দেহকে বাঁচিয়ে নেয় এবং কয়েক প্রকারের জীবাণুকে স্বীয় দেহ থেকে বের করে। এজন্য স্বয়ং স্রষ্টা এ গ্যাস উঠার সময় অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় জোহরের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আসরের সময়

জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, পৃথিবী দুই ধরনের (গতিতে) চলে। যেগুলো হলো : ১. লম্ব, ২. বৃত্তীয়।

যখন সূর্য ঢলতে থাকে, তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে এমনকি আসরের সময় ঘূর্ণনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। এ কারণে মানুষের ওপর দিনের অনুভূতির পর রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে, প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। এতে আবার নামাযের সময় মানুষের সচেতন অনুভূতির ওপর অচেতন অনুভূতির প্রভাব শুরু হয়, যার দ্বারা মানুষ স্বীয় আরামের অনুভূতি করতে থাকে।

যে কোনো নামাযী আসর নামাজের জন্য অজু করে নিজে নিজে জাগতিক সমস্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিতে পারে এবং স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদতে লেগে যেতে পারে, যার দ্বারা অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত না হয় এবং অচেতন অনুভূতির আক্রমণকে সহ্য করার যোগ্য হয়ে যায়।

নামাযে নূরানী রশ্মি নামাযীকে প্রশান্তি প্রদান করে। যার কারণে সে আত্মার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং আসরের সালাত আদায় করে আত্মিক নড়াচড়া গ্রহণ করতে থাকে।

মাগরিবের সময়

মানুষ সারাদিন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায় এবং নিজ ও পরিবারের জন্য রুজী কামাই করে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করে যে সেই মহান সত্তা এগুলো অর্জন করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন। এটা আনন্দের মধ্যে হয়, যার দ্বারা অন্তর এক বিশেষ প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। মাগরিবের সময় সে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হাজিরা দিয়ে নিজ দাসত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করে এবং নূরানী তরঙ্গমালা দ্বারা ভরে যায়, যা তার আত্মাকে প্রশান্তি প্রদান করে। এই আলোকিত অদৃশ্য তরঙ্গমালার প্রভাব এদের বাচ্চাদের উপরও পড়ে যাতে তারা শিষ্ট ও সৌভাগ্যবান হয়। যে মুসলমান মাগরিবের সালাত বৈধ পন্থায় নিয়মমাফিক আদায় করে তার সন্তানগণ স্বীয় পিতামাতাকে মান্য করে। এ ধরনের নামাযীদের বাচ্চাগণ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে এবং তাদের ঘরের চতুর্দিকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে।

এশার সময়

মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভী। যখন সে কাজকর্ম থেকে ফিরে ঘরে আসে, খানা খায় এবং স্বাদ ও লোভের কারণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। যদি সে খাওয়ার পর

পরই শুয়ে পড়ে, তাহলে সে ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয়। মানুষ যদি সারা দিন ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত খাওয়ার পরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে যায় তাহলে সে অস্থির থেকে যাবে। শোয়ার আগে এবং অতিরিক্ত খানা খাওয়ার পরে কমবেশি ব্যায়াম করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

বৎস! দিনের ক্লান্তিকর ঘাম এবং অতি খাবার খাওয়া লোভী মানুষের জন্য এশার নামায কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কম নয়। এশার নামায দ্বারা শান্তি, আনন্দ সহজ হয় এবং সাথে সাথে নামাযের শৃঙ্খলার মাধ্যমে খানা হজমের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে।

এভাবে এশার নামাযের মতো দীর্ঘ নামায আদায় করে শোয়া ব্যক্তি যারা রাতে প্রশান্তি ও আরামের ঘুম ঘুমাবে এবং তার খানাও হজম হয়ে যাবে। বর্তমানে চিকিৎসায় অভিজ্ঞগণও শোয়ার পূর্বে হালকা-পাতলা ব্যায়ামের ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, এই ব্যায়াম কয়েক প্রকারের ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা করে। হকপন্থিগণ এও বলেন যে শোয়ার পূর্বে নামাযের চাইতে সুন্দর ব্যায়াম আর নেই।

১১. নামায ও দার্শনিকবৃন্দ

শেষ কথা এই যে নামায যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, সেখানে দৈহিক ব্যায়ামও। এ ব্যাপারে কতিপয় দার্শনিকের মতামত নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

১. রিভরান লীবান

ইউরোপীয় দার্শনিক রিভরান লীবান নামাযের ফযিলতের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

আমি কয়েকবার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপাসনার সাথে মুসলমানদের নামাযের তুলনা করেছি। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামি নামায উত্তম। আমি উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামি নামায কয়েক নামাযের সমষ্টি। এর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও গুণকীর্তন ছাড়াও এক স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। ইসলামি নামাযে আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো এই যে, এর মধ্যে কুরআন তিলওয়াত, রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদ, কাকুতি মিনতি এবং আশ্চর্য ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর কান্নাকাটিও।

আমি বেশিরভাগ জুমুআর দিন আলেক্সান্দ্রার জামে মসজিদে শুধু ইসলামি নামাযের অবস্থা দেখার জন্য যেতাম। আমি যখন খতীবের জোশে ভরা বক্তৃতা, কাতারগুলোর ধারা, রুকু, সিজদার গুরুত্ব এর ওপর চিন্তা করি তখন আমার

অন্তরের ওপর আশ্চর্য রকমের প্রভাব পড়ে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পেরে ছিলাম যে, ইসলাম আমাকে আহ্‌বান করছে এবং তার ইবাদতের পূর্ণ পদ্ধতি আমার আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। (দি লেকচার অফ বমীচার-পৃ. ৪৭)

২. রায়ন জেমস মর্ডিলার

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক রায়ন জেমস মর্ডিলার বলেন, গোঁড়ামি দ্বারা কাজ আদায় করা সহজ কিন্তু সত্য বলা দোষের এবং আমি বর্তমানে এই সমস্যা সংকুল কাজ (সত্য বলা)কে বাছাই করে নিচ্ছি। আমি বারবার মুহাম্মদী বন্ধুদের (মুসলমানদের) সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছি এবং তাদের বিশ্বাসের ব্যাখ্যার মধ্যে মশগুল ছিলাম। চৌদ্দ শতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই মুসলমান নিজ পয়গম্বর (আ) কে মহব্বত ও আনুগত্য করছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কশীল সকল জিনিসেও ভালবাসা রাখে। খ্রিস্টান জগতের জন্য মুসলমানদের এই মহব্বত এবং একনিষ্ঠতার মধ্যে এক শিক্ষা রয়েছে।

ইসলামি আবাদীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অনুসরণ– যার নাম নামায। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ করে। কেননা নামাযীও খারাপ দিকে ঝোঁকে এবং নজর দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি যে দিনে পাঁচ বার নামায পড়ে অর্থাৎ এক মাসে একশ পঞ্চাশ বার নিজ আল্লাহ তায়ালা থেকে তাকওয়া অর্জন এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করে, অবশেষে একদিন সে নিজের ওয়াদায় পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ সে বাস্তবিকই পরহেযগার; মুত্তাকী হয়ে যায়।

৩. সেন্ট হিটলার

সেন্ট হিটলার রোমের প্রসিদ্ধ পাদরি স্বীয় পুস্তক 'The Pray' তে লিখেছেন–

আমি যে যে ইসলামি রাষ্ট্র সফর করেছি, সেখানে উপাসনালয়গুলো অবশ্যই দেখেছি। এ ধারাবাহিকতায় ইসলামি নামাযের ওপরও চিন্তা করেছি। আমার দৃষ্টিতে এটা এক উত্তম প্রকারের ইবাদত। যখন এক আল্লাহতে ইবাদতকারী নিজস্ব সব কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা-কীর্তনের গান গায় তখন রূহ অস্তিত্বে আসে। তখন অবশ্যই ঐ নামাযী স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

এমনকি সে সব শক্তির সাথে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। যার ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং অন্তর কলুষমুক্ত হয়। বাড়তি এই ইবাদতের মধ্যে দৈহিক শক্তির আনুগত্যও রয়েছে। আমি দেখেছি যে, নামাযী ব্যক্তি দুর্বল নয় বিশেষত ফজর নামাযের জন্য ভোরে উঠা এক আশ্চর্য রকম প্রভাব রাখে।

৪. প্রফেসর ডা. বার্থস যুজফ

আমেরিকার বিখ্যাত প্রফেসর ও ডাক্তার বার্থস জুযফ এর জীবনের অভিজ্ঞতা 'নামায ও ইসলাম' শিরোনামে এক সাক্ষাৎকারের আকারে প্রকাশ হয়েছে। যার মধ্যে ডাক্তার সাহেব লিখেছেন।

'আমি গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, বাস্তবিকই নামায পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যায়াম (Exercise) এবং এর মধ্যে কোনো কমতি বা বাড়তির সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত এই ব্যায়ামের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অদৃশ্য পদ্ধতিতে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান, গাম্ভীর্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি বুঝে নামাযের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।'

নামাযের মধ্যে হাত উঠানো, আবার বাঁধা, দৃষ্টিকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত রাখা, অতঃপর হাত ছেড়ে দেয়া এবং সামনে ঝুঁকে রুকু করা এরপর সিজদারত অবস্থায় মাথা নত করে হৃদয়কে মস্তিষ্কের দিকে রক্তকে গতির সাথে এবং বেশি পরিমাণে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং থেমে থেমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বসা বাস্তবিকই এক পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যায়াম-এর পন্থা।

৫. মিস্টার এম. কিং

মিস্টার এম. কিং প্রকাশ করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এ কথায় চলে যে, যখন দুনিয়াবী কাজ এবং সামগ্রিক আনন্দে লিপ্ত থাকে তখন আত্ম সংশোধন বিষয় খেয়াল থাকে না এবং কিছু কিছু আনন্দের আবশ্যকীয় ফল এই যে, মানুষ স্বীয় স্রষ্টার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় যখন আমরা (মিস্টার এম. কিং) এ কথার ওপর চিন্তা করি যে, ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন এবং তাদের বাধ্য করেছে যে, সর্বাবস্থায় স্বীয় ফরজ আদায় করবে, তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নামায এক উত্তম প্রকারের হেদায়াত।

যখন সত্য বিশ্বাসের অনুসারী কোনো ব্যক্তি (মুসলমান সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে) একনিষ্ঠ ও মুহাব্বতের সাথে স্বীয় স্রষ্টা ও মালিককে স্মরণ করে, তার গুণকীর্তন ও পবিত্রতার ঘোষণা করে তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং এই ক্ষমতাশালী ও পবিত্র সত্তা থেকে সাহায্য চায় তখন তাঁর আত্মা নিশ্চিতই এক পবিত্র অবস্থায় পৌঁছে যায়, এবং তার দিল ও দিমাগ থেকে ব্যক্তি পূজার মোহ দূর হয়ে যায়।

আমি উচ্চ স্তরের মুসলমানদের দেখেছি যে, সে স্বীয় প্রভাব ও মর্যাদার কারণে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখেন এবং কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক তাদের সঙ্গে কথা বলার

হিকমত রাখে না। অথচ যখন নামাযের সময় হয় তখন একজন বিশাল মর্যাদাশালী ব্যক্তি অনাড়ম্বর মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তার অপরিচিত ভাইদের সাথে মিলে ইমামের নেতৃত্বে ফরজ নামাজ আদায় করে। এ দৃশ্য থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, এই ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠতা ও রিক্ততার শিক্ষা রয়েছে এবং এর মধ্যে সমতার মর্যাদা দৃশ্যমান হয়।

সমতার বড় ঘটনা এই যে, ইসলামের রাসূল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ) আশ্চর্যজনকভাবে আমির-ফকির এবং ছোট-বড়কে এক সারিতে সমবেত করেছেন এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিঃস্ব ও অহংকারকে যাদুকরীভাবে পাশাপাশি করে দেখিয়েছেন। আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, নামায একটি উত্তম ইবাদত।

৬. স্যার উইলিয়াম ক্রাক্স

স্যার উইলিয়াম ক্রাক্স স্বীয় গ্রন্থ আধ্যাত্মিক "Research in the Phominon of Spiritualism" -এ লিখেছেন–

যদি কোনো মানসিক রোগী মুসলমানদের নামায খুশুখুযু (ভয় ও নম্রতা) এবং ধ্যানের সাথে পড়তে শুরু করে তাহলে সে খুব শীঘ্রই এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

৭. ভয়েস এডমার্ল

পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ভয়েস এডমার্ল স্বীয় পুস্তক "Ten Voice Usborne"-এ লিখেন– যদি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছাতে চাও তাহলে নামায পড়, নামায পড়, নামায পড়।

৮. দিওয়ান শিং মাফতুন

দেওয়ান শিং মাফতুন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ইন্ডিয়ান লিডার এবং সাংবাদিক। তিনি 'রিয়াসাত (নেতৃত্ব)' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা নির্দিষ্ট বৃত্তে খুবই প্রসিদ্ধ হয়। দিওয়ান শিং মাফতুন এই প্রবন্ধে লিখেছেন–

'নামায সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়, যে শৃঙ্খলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতা শিখতে চায় সে যেন নামাযের ওপর চিন্তা করে। নামাযে মালিক ও চাকরের পার্থক্য ঘুচে যায়, যখন এই কাতারে মাহমুদ ও আয়ায (বাদশাহ ও ফকির) এক সঙ্গে এবং এক সারিতে দাঁড়ায়। যদি মুসলমান নামায পড়তে আরম্ভ করে তখন তা-ই বিজয়ী হয় যা তারা কুরআনে বলেন। নামায ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের সর্বোত্তম উপায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাও খুশি এবং সৃষ্টিও সন্তুষ্ট থাকে।'

অভিজ্ঞ ইংরেজ

এক মুসলমান ইউরোপে নামায আদায় করছিলেন তখন এক ইংরেজ ব্যক্তি, দাঁড়িয়ে একে দেখতে থাকেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন তখন ইংরেজ জিজ্ঞেস করলেন–

'তুমি কোন কিতাব থেকে এই ব্যায়ামের পদ্ধতি শিখেছ? আমিও আমার পুস্তকে ব্যায়ামের এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছি এবং এই পদ্ধতিতে ব্যায়ামকারী দীর্ঘ জটিল ও কঠিন কষ্টকর রোগ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকবে। যদি দাঁড়ানো ব্যক্তি ব্যায়াম রত অবস্থায় সোজা নিচে সিজদায় চলে যায় তবে এর দ্বারা স্নায়ু ও হার্টের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে, এজন্য আপনি যেমন (রুকু) করলেন আমিও আমার পুস্তকে এরূপ লিখেছি এবং আমি এও লিখেছি যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে। এর মধ্যে হাত বেঁধে রাখবে। অতঃপর (রুকুর ন্যায়) ঝুঁকে হাত এবং কোমরের ব্যায়াম করবে। এরপর মাথা জমিনে রেখে ব্যায়াম করবে। এ ধরনের ব্যায়াম শুধু অভিজ্ঞদের কথায়ই রয়েছে। সব লোক এর সৌন্দর্য সম্পর্কে জানে না। আপনি এই ব্যায়াম কার কথার ওপরে করেছেন?

ঐ মুসলমান বলতে থাকলেন

আমি মুসলমান। আমার দ্বীনে ধর্মীয় বিধানে নির্দেশ রয়েছে এরূপ করতে, আমি আপনার পুস্তক দেখিওনি। আমরা মুসলমানগণ আজ থেকে চৌদ্দশত বছরের বেশি সময়ব্যাপী আমাদের নবী করীম ﷺ-এর প্রদর্শিত এই আমল প্রত্যহ নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বার করি।

ইংরেজ এ কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং এই মুসলমানের নিকট থেকে অধিক জ্ঞান হাসিল করতে থাকলেন।

১০. রোগ বিশেষজ্ঞ

এক পাকিস্তানি যিনি হার্টের রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া গেলেন। ওখানে এক বড় বিখ্যাত অভিজ্ঞ হার্টের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিলেন। সাথে আট দিনের জন্য তিনি নিজে ফিজিও ওয়ার্ডে বিশেষভাবে ডাক্তারের উপস্থিতিতে ব্যায়াম করার নির্দেশনা দিলেন। এ ব্যায়াম খুশু খুযুর সাথে নামাজের মতো ছিল। রোগী উপযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যায়াম করতে থাকলে ডাক্তার বললেন–

আপনিই প্রথম রোগী যিনি এত শীঘ্রই সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করছেন। অন্যথায় আট দিনে তো রোগী শুধু ব্যায়ামের পদ্ধতিই শিখে থাকে : মুসলমান রোগী বললেন–

'আমি মুসলমান এবং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আমাদের নামাযের মতই।' এ কথা শুনে ডাক্তার আট দিন বাদ দিয়ে অন্য দিন এই মুসলমান রোগীকে কিছু ওষুধ দিলেন এবং ঐ ব্যায়ামের নির্দেশনা দিয়ে ছুটি দিয়ে দিলেন।

১১. ডাক্তার সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী

ডাক্তার সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচডি, প্রধান চিকিৎসক আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।) নিজ লেখা "ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি"– এতে লিখেন : "যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার দেহের জন্য এটা এক ব্যায়াম হিসেবে গণ্য হবে, যা দ্বারা যাবতীয় মানব অঙ্গসমূহ এর উন্নতি ও বৃদ্ধি হবে এবং এর শক্তি বেড়ে যাবে। এটা ব্যতীত শ্বাসপদ্ধতি, রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি এবং হজম পদ্ধতির ওপরও উত্তম প্রভাব পড়ে এবং মানুষ জীবনব্যাপী রোগ ও শারীরিক সমস্যা থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (ইসলামে স্বাস্থ্যবিধি পৃ.-৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত।)

অন্য এক স্থানে লিখেন : নামায এক উত্তম ইসলামি ব্যায়াম যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না।

সব ধর্ম মিলে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নাই যার মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের আন্দোলন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযীর জন্যই অর্জিত হয় যে এটা একান্তই ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়ামও বটে, যার প্রভাব মানুষের সব অঙ্গের ওপর পড়ে থাকে এবং দেহের সব অঙ্গের মধ্যে আন্দোলন ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য সঠিক থাকে। (*প্রাগুক্ত*-পৃ. ৩৬)

পশ্চিমের অধিবাসীগণ এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি নামায যা কোনো ব্যায়াম না হয়েও তা বিভিন্ন ব্যায়ামের কাঠামো) গ্রহণ করে যাতে সে স্বাস্থ্যসম্মত থাকে। যেমন জার্মানির প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েফ'-এ নামি জার্মানি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ এ সত্যকে তার এ উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন–

'যদি ইউরোপে ইসলামি নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়ামের নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না।' (আল মাহালিহ আকলিয়্যাহ লিল আহকামিন নকলিয়্যাহ পৃ. ৪০৬)

সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী লিখেন–

'যখন নামায আদায়ের পদ্ধতিতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন এক ধরনের ব্যায়াম হয়ে যায়, যার দ্বারা অঙ্গগুলো এবং জোড়াগুলোর উন্নতি,

বৃদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যায়। এছাড়া নামাযের রুকনগুলো আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের ব্যায়াম অন্য কোনো মাধ্যম ব্যতীত হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব দেহের সতেজ ও শক্তি স্থায়ী থাকে এবং দৈহিক ক্রিয়া-কর্ম প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।' (*প্রাগুক্ত-পৃ.* ৩৬)

১২. ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী

ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইউরোপে যান। যখন সেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ নামাযের মতো ব্যায়াম পড়ানো হয় এবং বুঝানো হয় তখন এই ব্যায়াম দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা নামাযকে এক ধর্মীয় ফরজ বুঝতাম এবং পড়তে থাকতাম অথচ এখানে আশ্চর্য রকমের আবিষ্কার হয়ে থাকে যে, নামাযের মত ব্যায়ামের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নির্মূল হয়ে যায়।

১৩. হাকীম মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চাগতাঈ

'নামাযের ব্যায়ামসমূহ যা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য সৌন্দর্যের মাধ্যম তা অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো যেমন– হার্ট, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং সব প্রকারের গ্লান্ডস (Glands)-এর উন্নতিও বৃদ্ধি করে এবং দেহকে রুটিনমাফিক ও সুন্দর বানায়।'

চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জা, মিসওয়াক, অজু ও নামায এমন ইবাদত যেগুলোর মাধ্যমে দেহ ও আত্মা উভয়ের হেফাযত করা হয় এবং নিজ দেহকে বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে সুরক্ষিত রেখে থাকে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান ও বুঝ

এ অধ্যায়ে নবী করীম ﷺ-এর স্বাস্থ্য এবং বুঝ ও মেধার ব্যাপারে উচ্চতর নতুন ধরনের বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শক্তি ও সামর্থ্য এবং তাঁর বুঝ ও মেধার ব্যাপারে অমুসলিমদের বক্তব্য সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

اِصْطَفٰى : নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) আল্লাহ তায়ালার বাছাইকৃত বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে (আ)– রিসালাতের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। একে কুরআনী পরিভাষায় اِصْطَفٰى বলা হয়েছে।

নবীগণ নিষ্পাপ। তাদের থেকে চিন্তা ও ইজতিহাদের ভুল হয় না এবং আসল আখলাকের ত্রুটিও হয় না। প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে তাদের আবেগ, চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও প্রকৃতি সবই পবিত্র হয়।

মানসিক রোগ

যে লোক থেকে গুনাহ সংঘটিত হয় না সে পাপের অনুভূতি (Guilt Complex)র রোগসমূহ থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। এ ছাড়া যা মানসিক ঈমান, তাকওয়া, ইবাদত, দুয়া এবং চরিত্রের সম্পদের মালামাল, তিনি সর্বোচ্চ মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী হয়ে থাকেন। যেহেতু আম্বিয়া কেরামের মধ্যে উক্ত গুণগুলো সর্বোত্তম পর্যায়ে ছিল এজন্য তাঁরা সব রকমের মনতাস্তাত্ত্বিক রোগ থেকে মুক্ত থাকতেন।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা যে ব্যক্তিত্বকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তিনি কেবল তার যুগের সকল মানুষ থেকে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিলেন না, বরং দৈহিক দিক থেকেও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

নবীগণের রোগ-ব্যাধি

অনেক আলেম এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেন যে, নবীগণের এমন রোগ হতো না, যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছতার প্রকাশ পায়। কেননা তিনি যদি এরূপ রোগের শিকার হয়ে যান তাহলে প্রচারের কর্তব্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ঘাটতি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

এ ব্যাপারে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ (র) مِرْاٰۃُ الْمَنَاجِيْح شَرْحِ مِشْكٰوةِ الْمَصَابِيْح। গ্রন্থে লিখেছেন যে নবীগণের দিকে এ ধরনের রোগের সম্পৃক্তকরণও গুনাহের কাজ।

اَلْحَقُّ الْمُجْتَلٰى فِىْ حُكْمِ الْمُبْتَلٰى صَفَرَ عَفْوَانِ تَقْدِيْمُ -

ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী প্রকাশক, মারকাযে মজলিশে রেজা, লাহোর সেপ্টেম্বর-১৯৯২)

আইয়ুব (আ)-এর রোগ

এখানে আইয়ুব (আ)-এর উল্লেখ অশোভন হবে, যার উল্লেখ ইস্রায়েলি বর্ণনায় কুষ্ঠ রোগ এবং জীবাণু ঘটিত বলে নির্ধারণ করেছেন। আইয়ুব (আ) কখনো শ্বেতী বা

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হননি; বরং তাঁর দেহ মুবারকের ওপর, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি ও ঘামাচি বের হয়েছিল যার দ্বারা তাঁকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী (র) নবীগণের গুনাহের প্রতিরোধ এবং আইয়ুব (আ)-এর পবিত্র দেহে কুষ্ঠ রোগের প্রতিবাদ করে লিখেন ঃ

'সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, মায়াযাল্লাহ আইয়ুব (আ)-এর কুষ্ঠ রোগ ছিল। আবার কিছু অগ্রহণযোগ্য পুস্তকেও একথা লিখিত রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে, এ সব কথা সম্পূর্ণ ভুল এবং কখনো তাঁর অথবা অন্য কোন নবীর কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ হয় নি।'

এ জন্য এ বিষয়ে সবাই একমত যে, সব নবীর ঐ সব রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণার কারণ হয়। কেননা নবীগণের ওপর প্রচার ও হেদায়াত করার কাজ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। তাই এ কথা প্রকাশ্য যে, যখন সাধারণ লোকেরা ঐ সব রোগ-ব্যাধি থেকে ঘৃণা করে তাঁদের থেকে দূরে চলে যাবে তাহলে তাবলীগের কর্তব্য কীভাবে আদায় হবে? (আযায়িবুল কুরআন পৃ. ২২১, আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী, প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ, ভারত।)

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর দুয়া

এটা ঠিক যে, নবীগণের রোগ হতো, তবে তাদের কখনো এ ধরনের রোগ হতো না যা সাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য। নবীগণের মধ্যে কারো কারো রোগ হওয়ার উল্লেখ কুরআন মাজীদে এসেছে। যদি নবীগণ রোগ-ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত থাকতেন তাহলে নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আ) এ কথা বলতেন না– (২৬ নং সূরা শূরার ৮০ নং আয়াত)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ

অর্থ : আর আমি যখন রোগগ্রস্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য প্রদান করেন।

প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর রোগ

কুরআন মাজীদে আইয়ুব (আ)-এর রোগের উল্লেখ রয়েছে অথচ রোগের নাম বলা হয় নি। এ রোগ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই ছিল। আল্লাহর রাসূলগণ পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ এরও ওফাতের পূর্বে রোগ হয়েছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম (উর্দু) পৃ. ৪২৫)

ইমাম বুখারী (রহ), আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে রাসূল ﷺ-এর রোগ হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়, ৫৫৪, হাদীস-১৫৭৫)

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তেষট্টি বছরের জিন্দেগীতে সর্বদা সুস্থ ও শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁর মিশন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে পূর্ণরূপে সবল ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ জীন্দেগীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেছিলেন।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য

এ বিষয়ে এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী বাণী খাকসার তাহরীক লিখেছেন : উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক স্ত্রী খাদীজা (রা) থেকে পর পর পাঁচ বা ছয়জন বাচ্চার সুস্থতার সাথে জন্ম হওয়া এবং পূর্ণ বয়স পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য থাকা, এ কথার প্রমাণ যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বরং তার কোন যৌন অথবা মরণ ঘাতি রোগ ছিল না। তাঁর একষট্টি বছর বয়সে মারিয়া (রা)-এর গর্ভ থেকে বাচ্চা হওয়া অন্তত তাঁর যৌন শক্তির সুস্থতার অধিক প্রমাণ।

মস্তিষ্কের রোগ যদি তাঁর থাকত তাহলে এ মহান ব্যক্তিত্ব (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা বীরত্ব এবং দৃঢ়তা দ্বারা তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করতে পারতেন না।

এক বিশ্বজনীন ও চূড়ান্ত প্রকারের সমাধান যুক্ত আইন পেশ করতে পারতেন না। বরং স্বীয় (নবুওয়ত ঘোষণার পরের) ২৩ বছরের জীবনবাজি এবং কঠিন অতিবাহনের জীবনে কয়েক বার অসুস্থ এবং কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। (অথচ এরূপ হননি) এর বিপরীত রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ জীবনে তাঁর মৃত্যুর রোগ ব্যতীত অন্য কোনো রোগের কথা শুনা যায় নি। (রাসূলে সাদিক পৃ.-৩২ আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী, তারতীব ও সংক্ষেপ গোলাম কাদীর খাজা।)

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা

মাশরেকী সাহেবের একথা গুরুত্বের দাবি রাখে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর রোগ ব্যতীত কোনো সময়েই অসুস্থ হন নি। যেসব স্থানে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহের এক এক অংশের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কোনো অসুস্থতার বর্ণনা করেন নি।

স্বাস্থ্য

যখন কোনো মানুষ নিজস্ব অঞ্চলের পরিবেশ ব্যতীত অন্য কোনো শহর অথবা অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন ওখানকার আবহাওয়া এর স্বাস্থ্যের ওপর কোনো না কোনো রূপে প্রভাব ফেলে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিশু বয়সে এবং যৌবন বয়সে ব্যবসায়িক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় স্বাধীন প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও যুদ্ধের জন্য সফর করতে থাকেন, অথচ কোনো দিন অসুস্থ হন নি। সাহাবী আজমাঈন যখন মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন তখন প্রায় সব সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সময়েও আল্লাহ তায়ালা সুস্থ রেখেছিলেন।

ভ্রমণ

এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী লিখেছেন : সব যুদ্ধের মধ্যে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর মধ্যে শত শত মাইল ভ্রমণ করেছিলেন বরং মাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। কোনো একবারও তাঁকে কোনো রোগে আক্রান্ত করে নি। মদিনার জ্বরের প্রকোপে যা মুসলমান মুহাজিরদের ওপর প্রথম বছর আসে– শুধু রাসূল ﷺ ঐ জ্বর থেকে রক্ষা পান। (রাসূলে সাদেক, পৃ.-৩২, আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী তারতীব সংক্ষেপ, গোলাম কাদীর খাজা)

বিষ মিশ্রিত গোশত

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সারাজীবন রোগ-ব্যাধি থেকে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। এমনকি খায়বরের বিজয়স্থলে যখন হারছ এর কন্যা যীনত (সালাম বিন মাশকাম ইহুদির স্ত্রী) বকরির ভুণা গোশত রাসূল ﷺ-এর খিদমতে দিল। এ গোশত বিষমিশ্রিত ছিল। নবী করীম ﷺ-এ গোশত থেকে এক টুকরো উঠিয়ে মুখে রাখেন এবং চিবানোর পর তা থু থু করে ফেলে দেন। এক সাহাবী বশর বিন বারা (রা) এক লোকমা খেয়ে মারা যান অথচ আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মহিলা স্বীকার করে যে, গোশত বিষাক্ত ছিল। সে আরো বলে–

'আমি মনে করেছি যে, যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা বিষ দ্বারা আপনার নিকট থেকে মুক্তি পাব, আর আপনি যদি নবী হন তাহলে অবশ্যই আপনি এ বিষয়ের সংবাদ পেয়ে যাবেন।' (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় নং ৫১০, হাদীস নং-২৮৮) (ইবনে হিশাম খ-২, ২৩২-২৩৩ পৃ. (তিব্বে নববী, পৃ-২৩৬, ২৩৭, ইবনে কাইয়িম)

১২. নবী করীম ﷺ -এর বুঝ ও মেধা

প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এ কারণে তিনি সব লোকের চাইতে মেধা ও যোগ্যতার দিক দিয়েও পূর্ণতার ও উন্নততম ছিলেন। তিনি বুঝ, বীরত্ব, প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও অদ্বিতীয়।

পূর্ণত্ব

নবী, রাসূল পথ প্রদর্শক এবং ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তায়ালার দিক-নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। নবীগণের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা সারা পৃথিবীর সব ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে হয়ে থাকে। এরূপভাবে আমাদের নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞানও সারা পৃথিবীতে বসবাসরতদের মধ্যে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ।

রাসূল ﷺ-এর জ্ঞান

এভাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আসসালিহী 'সুবুলুল হুদা'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যদি জ্ঞানের একশত অংশ ধারণা করা যায় তাহলে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে প্রদান করেছেন এবং এক অংশকে সারা পৃথিবীবাসীকে প্রদান করেছেন। (সুবুলুল হুদা, খ-৭, পৃ. ১১ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী)

একশ ভাগের একভাগ জ্ঞানের পূর্ণত্ব

যদি এ কথার আলোকে বিভিন্ন স্তরের মেধাবী লোকদের কার্যাবলির এবং সার্বিক হিসাব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পূর্ণমানব ইতিহাসের জ্ঞান হরণকারী কার্যাবলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি উদঘাটন, পূর্ণ জাতির উপকারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে অভিজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গির হিসাব গ্রহণ করে আজকের মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। যেহেতু এ সব মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ একশত ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম তাহলে রাসূল ﷺ এর জ্ঞানকে কিভাবে আন্দাজ করতে পারে? যার একার জ্ঞানের ভাগ হলো ৯৯ (নিরানব্বই)।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব

এভাবে সম্মানিত পীর শাহ আল আযহারী (রহ.) 'দ্বিয়াউন নবীতে' উল্লেখ করেন : নবী করীম ﷺ এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নাই যে, নবীগণের সরদার স্বীয় বিশাল বিজ্ঞতার দ্বারা সকল প্রকারের লোকদের ইসলামের সাঁচে এভাবে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন যে, তার মেজাজ ও ফিতরাত (প্রকৃতি) পরিবর্তন করে রেখে দিবেন। (দ্বিয়াউন নবী ﷺ

খ-৫, পৃ. ২৭১ মুহাম্মদ করম শাহ, প্রকাশক দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনস, লাহোর।)

জ্ঞানকে অপারগকারী সীরাত

কাজীউল কুযাত (বিচারকদের বিচারক) কাজী ইয়াজ রহমাতুল্লাহ স্বীয় পৃথিবী খ্যাত কিতাব কিতাবুশ শিফা বি তারীফি হুকূমিল মুস্তফা'তে লিখেন–

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূল ﷺ সকল মানুষের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। যদি কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক রাসূল ﷺ-এর চিন্তা-তদবিরের ওপর সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে যা স্বীয় খোদায়ী সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়গুলোর সংশোধনের জন্য বাছাই করেছেন এবং রাসূল ﷺ-এর সচ্চরিত্র ও বিস্ময়কর জীবন কাহিনী সামনে রেখে যখন তাঁর রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর দৃষ্টি বুলাবে, যা রাসূল ﷺ সকল বিশেষ ও সাধারণ বিষয়ের সাথে বিবেচনা করে এর সাথে এ খেয়ালও রাখে যে, রাসূল ﷺ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন নি। অতীতের কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না, কোন কিতাবও অধ্যয়ন করেন নি।

এতদ্সত্ত্বেও কীভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর প্রবাহিত করে ছাড়লেন। আহকামে শরিয়তকে কীভাবে আন্দাজে পেশ করলেন যে, শোনার সাথে সাথে শ্রোতার মেজাজ তা না মেনে উপায় নেই। এ সব বক্তব্যের ওপর দৃষ্টি দেয়ার পর একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, সর্বশেষ নবী জ্ঞান-বুদ্ধিতে সকলের পূর্ণ চন্দ্রেরও সামনে এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, এ পন্থার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। (কিতাবুশ শিফা বিতারীফী হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-১২৯, ১৩০, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী)

বিশাল জ্ঞানের অধিকারী

এটা এমন এক বক্তব্য যে সম্পর্কে কোনো লম্বা চওড়া বিশ্লেষণ বা বক্তৃতার আবশ্যকতা নেই। কেননা এ বক্তব্য গৃহীত এবং সুপ্রসিদ্ধ বটে। এখানে নবী করীম ﷺ-এর জীবনের একটি ঘটনা নকল করা হলো যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও বুঝ ও চৌকষ-এর দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিলেন।

যখন মক্কার কুরাইশগণ কাবা শরীফের নির্মাণ করতে বিল্ডিং-এর জন্য প্রত্যেক গোত্র পৃথক পৃথক পাথর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল এবং তৈরি করতে মশগুল রইল। যখন এ বিল্ডিং রুকন পর্যন্ত পৌছাল তখন প্রত্যেক গোত্র চাইলো যে, তারা

তা পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল যে, যা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত যাবে। প্রত্যেক গোত্র ঝগড়ার দিকে অগ্রসর হলো।

বনু আব্দুদ্দার এক পেয়ালা রক্ত ভরে রাখলো এবং তাদের সব সঙ্গীদের হাত এ রক্তে চুবিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। রক্তের মধ্যে হাত ঢুকানোর অর্থ এই ছিল যে, আমরা জীবন দিব; কিন্তু পিছু হটবো না।

এ ধরনের উত্তেজনার মধ্যে চার-পাঁচ রাত অতিক্রম হলো এবং কোনোভাবে এ বিষয়ের কোনো সমাধান হলো না। সর্বশেষ সব কুরাইশ মসজিদে হারামে সমবেত হয়ে পরামর্শ করতে থাকে কি করা যায়? কুরাইশদের সবচেয়ে বয়স্ক বুজুর্গ আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখযুম বলেন–

হে কুরাইশগণ! তোমরা এক কাজ করো– তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দরওয়াজা দিয়ে প্রথমে মসজিদে আসবে তার ফায়সালা মেনে নাও এবং তিনি যে ফায়সালা করেন তা মেনে নাও। ইবনে সায়াদ-এর বর্ণনা মুতাবিক এ রায়ে স্থান পায় যে, নবী শায়বা দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে তিনি হাজরে আসওয়াদ রুকনের ওপর উঠাবেন, সবাই এরপর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। লোকেরা দরওয়াজার দিকে অপেক্ষা করে বসে থাকে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নিব। এ সময় মুহাম্মদ ﷺ সেখানে তাশরীফ রাখেন। সব লোক তাঁকে দেখে খুবই খুশি হন এবং বলতে থাকেন : অবশ্যই ইনি আল-আমিন। তিনি যে ফায়সালা করবেন আমরা এর ওপর খুশি আছি। যখন হুজুর ﷺ পৌছালেন তখন সবাই বললেন : আমরা আপনার ফায়সালা মেনে নিয়েছি, আপনি ফায়সালা করে দিন। হুজুর ﷺ বর্ণনা করেন : আমার নিকট এক খণ্ড কাপড় নিয়ে আস। লোকেরা কাপড় নিয়ে আসলে রাসূল ﷺ স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা হাজরে আসওয়াদ কাপড়ের ওপর রেখে ঘোষণা করেন–

তোমরা সব লোক সব গোত্র থেকে এই কাপড় ধর এবং একে উঠিয়ে দেওয়ালের পাশে নাও। যখন সব গোত্রের লোকেরা এই কাপড় (যার মধ্যে হাজরে আসওয়াদ ছিল) এর স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ওটাকে উঠিয়ে দেওয়ালে রেখে দেন। এভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর ওপর ভবন হতে থাকে। (সীরাতে ইবন হিশাম, খ-১, পৃ.-১২৭, তবাকাতে ইবন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২২৫, তারীখে তাবারী, খ-১, পৃ.-৬৮)

বিভিন্ন গোত্রের নির্ভরশীলতা

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই প্রজ্ঞা ও বীরত্ব যুদ্ধের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গোত্রগুলোকে রক্তপাত থেকে বাঁচাল। এ ঘটনা থেকে একথা প্রকাশ পায় যে,

রাসূল ﷺ কে সালিশ বানানোর সময় সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তাঁর বুঝ ও ধীশক্তির ওপরে সকলের পূর্ণ নির্ভরতা ছিল। তাঁরা জানতেন যে, তিনি সবচেয়ে মেধাশক্তিসম্পন্ন। কেননা তিনি যে কোনো পন্থা অবশ্যই বের করবেন যার ওপর সব গোত্র একমত হয়ে যাবেন।

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অবস্থার ওপর অগ্রিম সতর্ক

নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে আল্লামা যাইনী দিহলান আসসীরাতুন নব্বীয়াহ'তে লিখেন–

'আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীব নবী ﷺ কে সব সৃষ্টির প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়ের ওপর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যাতে মহানবী ﷺ অবস্থার সংশোধন করতে পারেন এবং উত্তম অবস্থাগুলোর দিকে লোকদেরকে দিকনির্দেশনা দেন।

আল্লাহ তায়ালা নবী করীম ﷺ কে তাঁর সব বান্দার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিতে পারেন এবং এ কাজ এ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়াবলির সংশোধন না করেন এবং এ কথার পরিধি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানার ওপর নির্ভর করে এ জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী ﷺ-কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তৈরি করেছিলেন।

রাসূল ﷺ সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সামষ্টিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন, যার দ্বারা তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থার দাবি পূর্ণ হত। (সীরাতে নব্বীইয়াহ, খ-৩, পৃ. ২৩, আহমদ ইবনে যাইনী দিহলান। দ্বিয়াউন নবী করীম ﷺ খ-৫, পৃ.-২৭২)

জ্ঞানগত মর্যাদা

কাজীউল কুজাত আল্লামা কাজী ইয়াজ (র) রাসূল ﷺ-এর জ্ঞানগত মর্যাদার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلاً وَّ اَفْضَلُهُمْ رَاْيًا ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সব লোকের চাইতে উত্তম ছিল।(কিতাবুশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-৮২ কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।)

মরুভূমির অণুকণা

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) থেকে এ বর্ণনা ও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মানব সভ্যতার শুরু থেকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সব মানুষকে যে, বুঝ ও প্রজ্ঞা

দান করেছেন, ঐ বুঝ ও প্রজ্ঞা নবী করীম ﷺ-এর মুকাবিলায় এতটুকুও নয় রেত-এর একটি কণা দুনিয়ার সব মরুভূমির কণার তুলনায় যা হয়। (দ্বিয়াউন নবী ﷺ খ-৫, পৃ. ২৭৩, পীর মুহাম্মদ করম শাহ্, দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর)

নিরক্ষর নবীর বুঝ ও প্রজ্ঞা

ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূল ﷺ বুঝ ও মতের দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর (যিনি কোনো শিক্ষকের নিকট পড়েন নি) ছিলেন, অথচ জ্ঞান ও মতামতের দিক থেকে সকলের থেকে ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। (আরবের ইতিহাস পৃ.-১০৩, মসিয়ে সিদিভ, অনুবাদ মৌলভী আব্দুল হালীম আনসারী)।

চূড়ান্ত পর্যায়ের ধীশক্তি সম্পন্ন

ইংরেজ ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) মহানবী ﷺ সম্পর্কে স্বীয় পুস্তক (Hero and Hero Wdrship)-এ লিখেছেন :

'একথা ঠিক যে, রাসূল ﷺ অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূল ﷺ-এর পর্যবেক্ষণ ছিল গভীর এবং স্মৃতিশক্তি ছিল প্রচণ্ড রকমের।' (অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবী, পৃ.-৪১, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া খান, জাহানজীব বুলাক, আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর)

বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ

ইউরোপের এক বড় মর্যাদাশালী কে. টি. লাওল এর বক্তব্য হলো : মুহাম্মদ ﷺ একজন বড় রাষ্ট্রপতি, একজন বড় বিজয়ী, অনেক বড় জ্ঞানী ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি পাগল ছিলেন না

মক্কার কাফিরগণ যখন প্রতিরোধের কোনো সাধারণ ভাষা হারিয়ে ফেলল তখন তারা তাঁকে পাগল বলতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাকীমে বর্ণনা করেছেন–

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ـ

অর্থ : হে প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার রবের করুণায় পাগল নন।

কুরআন মাজীদের এ ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা সার্বক্ষণিক অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনি পাগল নন, পাগল ছিলেন না এবং কখনো পাগল হবেন না।

হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের গুরুত্ব দেয় (এর সম্মান রক্ষা করে) সে পাগলামি এবং মাথা খারাপ হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কোনো কোনো বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এর জ্ঞান কখনো লোপ পাবে না (অর্থাৎ সে বোধহীন হবে না)। (মাওয়াহিবুর রহমান, প্যারা-২৯, পৃ. -২৮, সাইয়েদ আমির আলী মালহাবাদী)

এ তো ঐ ব্যক্তির মর্যাদা যিনি কুরআন মাজীদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর মর্যাদা কী হবে?

১৩. রাসূল ﷺ-এর দৈহিক শক্তি

পাহলোয়ানদের চাইতেও অধিক শক্তি

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মর্যাদাবান বান্দা নবী করীম ﷺ-কে প্রচুর দৈহিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) 'মাদারিজুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে লিখেন : রাসূলে আকরাম ﷺ-এর শক্তি, বাহুর শক্তি এবং মজবুতি এতই ছিল যে, বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর (পাহলোয়ান) তাঁর সামনে দাঁড়াতেও পারত না।

রুকানা পাহলোয়ান

রুকানা আরবের একজন বিখ্যাত পাহলোয়ান ছিলেন, যার দৈহিক শক্তির বিশাল সুখ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি এক শত লোকের মুকাবিলা করে পরাজিত করে দিতেন। এ ব্যাপারে সুনানে তিরমিযিতে রয়েছে–

'একদিন নবী করীম ﷺ আরবের কোন পাহাড়ি এলাকায় (মক্কার কোনো ঘাঁটি) চলতে চলতে রুকানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বিশ্ব নেতা নবী ﷺ-এর এ অভ্যাস ছিল যে, যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন রাসূল ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত অবশ্যই দিতেন।'

যেহেতু রাসূল ﷺ রুকানাকেও দাওয়াত দিলেন যে, তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবা করে নাও এবং অংশীহীন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আন।

রুকানা বলল, আমি এক শর্তের ওপর এ দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত আছি, তা হলো এই যে, যদি আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে আমি ঈমান আনবো।

নবী করীম ﷺ এ শর্তে রাজি হলেন এবং ইরশাদ করেন ঃ রুকানা! যদি তুমি এ শর্তের ওপর ঈমান আনার ওয়াদা কর তাহলে আমি এ শর্ত পূরণ করতে তৈরি আছি।

সাথে সাথে রুকানা নেংটি পরে ময়দানে এসে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ ও তাশরীফ নিলেন। রাসূল ﷺ বাজু (বাহু) ধরলেন এবং এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে ফেলে দিলেন। সে হয়রান এবং পেরেশান হয়ে গেল, কিন্তু পুনরায় উঠল এবং বলতে থাকল–

আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অসাবধানতার মধ্যে আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনি আমাকে আরেকবার পরাজিত করতে পারলে আমি ঈমান গ্রহণ করব। রাসূল ﷺ তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রাসূল ﷺ প্রস্তুতি নিলেন, তার বাহু ধরে ফেললেন এবং জমিনের ওপর ফেলে দিলেন। তার এ ব্যাপারে সামান্যতম ধারণা ছিল না যে তাকে ফেলে দেয়া যাবে। লজ্জিত অবস্থায় আবার উঠলেন এবং তৃতীয়বারের মতো আবার কুস্তির দাওয়াত দিলেন। রাসূল ﷺ তাকে এ কথা বলেন নি যে, দু'বার আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি এবং আল্লাহর রাসূল পুনরায় তার সঙ্গে কুস্তি লড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে এমনভাবে ঝটকা দিলেন যে, চোখের পলকে জমিনে ফেলে দিলেন। সে এবার আর অস্বীকার করতে পারল না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কালিমা শাহাদাত পড়েন এবং ঘোষণা করেন যে, এটা কোনো দৈহিক শক্তি নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রূহানী শক্তি দ্বারা তিনবার পরাজিত করেছেন। আমি একথা স্বীকার করে নিলাম যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল।

কুস্তিগীর আবুল আসাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রুকানা ছাড়াও আরো অনেক লোক কুস্তি লড়াই করেছেন এবং তিনি সকলের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। এদের মধ্যে আবুল আসাদ নামের একজন বড় কুস্তিগীর ছিলেন। যে গরুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে যেত এবং লোকজন তার নিচ থেকে চামড়া টেনে বের করার পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। চামড়া ফেটে যেত কিন্তু নিচ থেকে বের হতো না।

একদিন তিনি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে কুস্তি লড়তে চাইলেন। তিনি আরো বললেন, যদি আপনি আমাকে জমিনের ওপর ফেলতে পারেন তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনবো। নবী করীম ﷺ তাকে জমিনের ওপর চিৎ করে ফেলে দেন অথচ সে ঈমান আনেনি।

পরিপূর্ণ পবিত্র দেহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ মুবারক পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রকমের পবিত্র ছিল। হযরত উম্মে মা'বাদ (রা) রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেট বড় হওয়া এবং পেট সামনের দিকে বেড়ে যাওয়ার দোষমুক্ত

ছিলেন। (আল অফা বিআহওয়ালি মুস্তফা, পৃ.-৪৫২, ইমাম আব্দুর রহমান ইবন জাওযী।)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ মুবারক ভারসাম্যপূর্ণ ছিল।

দ্রুত চলমানতা

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : 'আমি দ্রুত চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় রাসূল ﷺ থেকে দ্রুত আর কাউকে দেখিনি। যখন রাসূল ﷺ চলতেন তখন মনে হতো জমিন নিজে নিজে জড়িয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি চলতেন তখন পূর্ণ শক্তি দ্বারা চলতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চলন বড়ই মাপা মাপা হতো এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর গতির মুকাবিলা কেউ করতে পারতো না। (কিতাবুশ শিফা, পৃ.-৮২, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।) (দ্বিয়াউন নবী খ-৫, পৃ.-২৭৪, পীর করম শাহ, আজহারী, দ্বিয়াউল কুরআন পাবঃ লাহোর।)

এ দীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নবীগণ (আ) সকল প্রকারের ঘৃণার উদ্রেককারী রোগমুক্ত ছিলেন, বিশেষত আমাদের নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহ তায়ালা এ সব রোগ থেকে রক্ষা করেছেন এবং নবী করীম ﷺ মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক বুঝ ও মেধা এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ছিলেন।

পোশাকের নিয়মাবলি

DRESS CODE

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ
আলী হোসাইন মাহীদ
শেষ বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সম্পাদনা
আব্দুল্লাহ সাঈদ খান
শেষ বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পোশাকের নিয়মাবলি

ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে পরিশীলিত করার জন্য বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের অভিবাদন কেমন হবে তার পোশাকের মূলনীতি কি, মুসলিম হিসেবে তার মধ্যে কি ধরনের চিহ্ন বা লেভেল থাকা উচিত ইসলামে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামে মুসলমানদের পোশাকের প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি মুসলিমরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের মধ্যে যে চিহ্ন বা লেবেল প্রকাশ করবে, তার প্রতিও ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ রচনায় মুসলিমদের অভিবাদন, পোশাক এবং অন্যান্য লেবেল সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

সালাম

মানুষ একে অন্যের কল্যাণ কামনা করে সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম হোক। সালাম কল্যাণেরই একটি নমুনা।

প্রশ্ন আসতে পারে ইসলামে আসলে সালামের গুরুত্বটা কি?

শুরুতেই কুরআনের কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে–

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ـ

অর্থ : আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন : তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা আল-আনআম : ৫৪)

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ـ

অর্থ : আর তোমাদের যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাষ গ্রহণকারী। (সূরা আন্ নিসা : ৮৬)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় অভিবাদন বা সালাম-এর ক্ষেত্রে একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে বলে 'আসসালামু আলাইকুম', তাহলে অপরজন এর উত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওরাহমাতুল্লাহ্' কিংবা কেউ যদি বলে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহ' তাহলে অপরজন এর উত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওরাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু'। অর্থাৎ আল্লাহর দয়া, শান্তি, রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক। কিংবা কেউ যদি আসসালামু আলাইকুম-এর উত্তরে শুধু ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম বলে তবে উত্তরটা বলা উচিত একটু বেশি আবেগ দিয়ে, হৃদয়ের গভীর থেকে। অতএব সালাম-এর উত্তর দিতে হবে অধিকতর উত্তম পন্থায় কিংবা অন্ততপক্ষে সমানভাবে।

তবে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তাদেরকে যখন তাদের অধীনস্থরা সালাম দেয় তখন তারা ওয়ালাইকুম সালাম বলে, কিংবা মাথা নাড়ায়, সালামের কোন উত্তরই এরা দেয় না। এই মুসলিমরা মূলত আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার আদেশ অমান্য করছে।

অন্যান্য অভিবাদন

এবার দেখা যাক বিভিন্ন সমাজে কোন ধরনের অভিবাদন প্রচলিত আছে। এসব অভিবাদনের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত যেটা ইংরেজিতে "Good Morning," আফ্রিকান ভাষায় এটা বলা হয়, 'খাইয়েমোরা আসাকাবানা,' চীনা ভাষায় 'চাও সুং'।

এখন ধরা যাক আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, একদম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় একজন লোক আরেকজনকে বললো, "Good Morning", বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় পানি জমে গিয়েছে আর লোকটি বলছে 'শুভ সকাল'। এখানে সকালটা শুভ বলার অর্থ কী?

আবার ধরা যাক একটি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক সকালে স্কুলে আসার আগে স্ত্রীর সাথে বাসা থেকে ঝগড়া করে বেরিয়েছেন। হয়তো স্কুলে আসতে আসতে স্ত্রীকে অভিশাপ দিচ্ছেন আর চিন্তা করছেন স্ত্রীর সাথে আর জীবনেও কথা বলবো না। কিন্তু তিনি স্কুলে এলে ক্লাসে ঢুকার সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রী সবাই মিলে বলে উঠবে "Good Morning Sir." এই লোকটার সকাল কি আসলেই শুভ ছিল?

অভিবাদনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিবাদন হল ইসলামি রীতিতে অভিবাদন, আস্‌সালামু আলাইকুম। হতে পারে সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা স্ত্রীর সাথে বা বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে। এরপরও 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'– এটাই একমাত্র সঠিক অভিবাদন।

আমাদের তরুণ সমাজের মাঝে আরেক ধরনের অভিবাদন প্রচলিত আছে। দুই বন্ধুর যখন দেখা হয় তখন তারা একজন আরেকজনকে বলে "Hi." উত্তরে অপর বন্ধুও বলে "Hi" এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই "Hi" শব্দের অর্থ কি? তাহলে কেউ বলতে পারবে না। স্থানীয় হিন্দী ভাষায় এই "হাই" শব্দটার অর্থ আফসোস করা। ইংরেজি "High" অর্থ উপরের অবস্থান। এছাড়া এই "হাই" এর আরেক অর্থ মাদকে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। তাহলে এই "Hi" শব্দটা অভিবাদন হিসেবে গণ্য করা যায় কি?

আরেকটি অভিবাদন প্রচলিত আছে 'Hello'। Oxford Dictionary-তে এই Hello শব্দটার অর্থ দেয়া হয়েছে অনানুষ্ঠানিক অভিবাদন (Informal Greetings)। আরেকটা অর্থ বলা হয়েছে টেলিফোনে যেটা দিয়ে কথা শুরু করা হয়। এই শব্দটা প্রথম প্রচলন শুরু হয় বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল থেকে, যিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায় একবার গ্রাহাম বেল ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। তখন কথাবার্তা শুরু করার জন্য তিনি বলেছিলেন 'Hello', যাতে অন্যপাশের লোক তার কথা বলতে পারে আর তিনিও তাড়াতাড়ি বের হতে পারেন। এই Hello বলার প্রচলনটা শুরু হয়েছে তখন থেকে, আর এখন এটি প্রচলিত, যদিও এর সঠিক অর্থ নেই।

খুব অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বের লোকেরা যীশুখ্রিস্টের অভিবাদন ব্যবহার না করে এই Hello শব্দটা ব্যবহার করেন। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টে গসপেল অব লুক-এর ২৪ নং অধ্যায়ের ৩৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

সেই তথাকথিত ক্রুসিফিকশান-এর পর যীশুখ্রিস্ট উপরের ঘরে গেলেন শিষ্যদের সাথে দেখা করতে। তিনি তখন তাদেরকে অভিবাদন জানালেন, 'সালামালাইকুম।' যদি হিব্রু থেকে আরবি করা হয় এর অর্থ দাঁড়ায় 'আস্সালামু আলাইকুম' অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমাদের প্রিয় নবী হযুহম্মদ ﷺ সবসময় লোকজনকে আগে অভিবাদন জানাতেন। সেই সময় নবীজির অনেক সাহাবী চেষ্টা করেছেন নবীজিকে আগে সালাম দিতে কিন্তু কখনই পারেন নি। নবীজি সবসময় আগে সালাম দিতেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আবু হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

'আরোহী আগে অভিবাদন জানাবে পথচারীকে আর পথচারী অভিবাদন জানাবে তাকে, যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দল অভিবাদন জানাবে তার চেয়ে বড় দলকে।' (সহীহ্ মুসলিম : খণ্ড-৩, বুক অব সালাম অধ্যায়, হাদীস-৫৩৭৪)

আরো বলা হয়েছে– 'এটা প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার তার ভাইদের কাছে যে অভিবাদনের উত্তর পাবেন।' (সহীহ মুসলিম, খণ্ড-০৩, বুক অব সালাম অধ্যায়, হাদীস-৫৩৭৮)

মুমিনের যে কয়টি অধিকার আছে তার ভাইয়ের কাছে তার মধ্যে অন্যতম হল–

১. সালামের উত্তর দেয়া।

২. হাঁচির উত্তরে বলা– 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ'।

৩. অসুস্থ কোন মানুষকে দেখতে যাওয়া।

৪. জানাযায় অংশ গ্রহণ করা।

অর্থাৎ একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিবে এবং সালাম-এর প্রতিউত্তর পাবে– এটা নবীজির নির্দেশ এবং কুরআনেরও স্পষ্ট নির্দেশনা (সূরা আনআম : ৫৪)

এখন, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা নবীজির এই আদেশ (সালাম) মেনে চলবো যদি আমি বুঝতেই না পারি আমার সামনে যে লোকটা আছে সে একজন মুসলমান?

মুসলিমদের লেবেল

একটি কনফারেন্সের কথা চিন্তা করা যাক। সাধারণত কোন কনফারেন্সে প্রতিনিধিরা বিশেষ ব্যাজ পরেন। ব্যাজের মধ্যে তাদের নাম, পদমর্যাদা কিংবা যেখান থেকে তিনি এসেছেন সে জায়গার নাম লেখা থাকে। যদি কনফারেন্সটা হয় জ্ঞানী লোকদের, তাহলে হয়ত ব্যাজে ব্যক্তির পেশা লেখা থাকতে পারে, যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা অ্যাডভোকেট। ধরা যাক, কনফারেন্সটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসাক্ষেত্র সম্পর্কে লেখা আছে। যেমন : কার্ডিওলোজিস্ট বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিউরোলোজিস্ট বা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ, ইউরোলোজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ, পেডিয়াট্রিসিয়ান বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলোজিস্ট বা প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি বুকে ব্যথা হয় বা সে যদি হৃদপিণ্ড সম্পর্কে জানতে চায় তবে সে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাজ দেখে, যিনি কার্ডিওলোজিস্ট তাকে প্রশ্নটা করবেন। আবার কেউ যদি মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানতে চায় সে প্রশ্ন করবে নিউরোলোজিস্ট-এর কাছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের ব্যাজটা তার লেবেল হিসেবে কাজ করছে যেটা দেখে উক্ত চিকিৎসকের কাছে তার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন করা হচ্ছে। সুতরাং লেবেল কোন ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক পরিচয় বহন করে।

অনুরূপ মুসলিমদের লেবেল থাকা প্রয়োজন যেটা দেখে অতি সহজে বুঝা যাবে যে তিনি একজন মুসলিম। যেমন : একজন মুসলিম ব্যক্তি যদি একটি ব্যাজ পরেন যেখানে اَللّٰهُ (আল্লাহু) লেখা আছে অথবা লেখা আছে اَللّٰهُ। اِلَّا। اِلٰهَ। لَا (লা ইলাহা ইল্লালাহু) তাহলে কোন ব্যক্তি তাকে দেখে বুঝতে পারবেন যে তিনি একজন মুসলিম। এমনও হতে পারে যে, কোন অমুসলিম ব্যক্তি উক্ত ব্যাজ দেখে সেটা সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হল। সেক্ষেত্রে উক্ত মুসলিম ব্যক্তি তার অমুসলিম ভাইটিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলিমের পক্ষে এভাবে সবসময় লেবেল হিসেবে ব্যাজ লাগিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিমদের এমন একটা লেবেল থাকা উচিত যা মুসলিমরা বহু বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে। আর তা হল দাড়ি রাখা এবং টুপি পরা। সুতরাং মুসলিমরা লেবেল হিসেবে দাড়ি রাখতে পারেন এবং টুপি পরতে পারেন।

দাড়ি রাখা

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামে টুপি পরা ও দাড়ি রাখার প্রয়োজনীয়তা কি? আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য কি টুপি পরতেই হবে কিংবা দাড়ি রাখতেই হবে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি সব জানেন। আল্লাহ তাআলার জন্য এটা জরুরি নয় যে কোন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে চিনতে হলে, তার দাড়ি ও টুপি দেখে চিনতে হবে। তিনি তো অন্তর্যামী। বরং এটা প্রয়োজন মানুষেরই জন্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে দেখে তাকে মুসলিম হিসেবে আমরা তখনই চিনতে পারব যখন দেখব তার দাড়ি আর টুপি আছে।

পবিত্র কোরআনে সরাসরি দাড়ি রাখা বা টুপি পরার কথা বলা হয় নি। তবে কোরআনে একটি আয়াত আছে যেখানে দাড়ি সম্পর্কে বলা আছে। কোরআনে এসেছে,

মুসা (আ) তাঁর কওমের (গোষ্ঠির) নিকট ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর কওম গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তিনি হারুন (আ)-কে প্রশ্ন করলেন এবং হারুন (আ) জবাব দিলেন।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ ۔

অর্থ : হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথার চুলও টেনো না।.... (সূরা তাহা : ৯৪)

অর্থাৎ এখানে বুঝা যাচ্ছে মুসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ)-এর দাড়ি ধরেছিলেন। অন্যকথায়, হারুন (আ) যিনি একজন আল্লাহর নবী; তাঁর দাড়ি ছিল। কিন্তু এখানে

দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায় না। তবে, কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে,

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।'

এবং দাড়ি রাখার ব্যাপারে হুকুম এসেছে সহীহ হাদীসে।

কোরআনের উপরোক্ত কথাটি উল্লেখ আছে, সূরা আলে ইমরানের ১৩২নং আয়াতে, সূরা নিসার ৫৯নং, সূরা মায়িদার ৯২নং, সূরা আনফালের ১নং, ২০ নং ও ৪৬নং, সূরা নূরের ৫৪নং ও ৫৬নং, সূরা মুহাম্মদের ৩৩নং, সূরা মুজাদিলার ১৩নং, সূরা তাগাবুনের ১২নং আয়াতসহ আরো কিছু সংখ্যক আয়াতে। যেখান থেকে স্পষ্ট যে, রাসূলের আনুগত্য করাটাও আল্লাহর আনুগত্য করার মতই জরুরি।

এখন হাদীসে এসেছে, নাফি (রা) উল্লেখ করেছেন, ইবনে উমর (রা) বলেন– আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন–

'পৌত্তলিকরা যা করে তোমরা তার উল্টা কর। দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাট।'

এর পরের হাদীসে এসেছে, 'ইবনে উমর (রা) উল্লেখ করেছেন– নবী করীম ﷺ বলেন– তোমরা গোঁফ ছোট করে কাট আর দাড়ি রাখ।'

(সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-৬৫, হাদীস নং-৭৮১)

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে দাড়ি রাখা মুস্তাহাব এবং কারও কারও মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তবে যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর, এ কারণে রাসূল ﷺ এর নির্দেশ অনুসরণ করা ফরজ। সুতরাং দাড়ি রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজ।

এখন দাড়ি রাখা ফরজ হোক বা মুস্তাহাব-ই হোক একজন প্রকৃত মুসলিম দাড়ি রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালোবেসে দাড়ি রাখে, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দাড়িতে মানাক অথবা না মানাক সে সওয়াব পাবে। বরং যে ব্যক্তি দাড়ি রাখল অথচ তাকে দাড়িতে মানায় না, সে আরও অধিক পরিমাণে সওয়াব পাবে। প্রশ্ন হতে পারে, অমুসলিমরাও তো দাড়ি রাখে, তাহলে দাড়ি রাখলেই একজন ব্যক্তিকে কিভাবে মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যাবে? উত্তর হল–

যদি পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে জরিপ করা হয়, তবে দেখা যাবে, যারা দাড়ি রাখে তার ৭৫ শতাংশের বেশি-ই হল মুসলিম। যেসব অমুসলিম লোক দাড়ি রাখে তাদের দাড়িটা বিশেষ ধরনের হয়, এছাড়াও তারা তাদের বিশেষ ধর্মীয় চিহ্ন যেমন ক্রস, টিকা ইত্যাদি পড়ে যা দেখে চেনা যায় যে এরা অমুসলিম।

টুপি

এখন আসা যাক টুপির ব্যাপারে। টুপির ব্যাপারে কোরআনে কোন কথা আসে নি এবং নবী করীম ﷺ-এর হাদীসেও এ ব্যাপারে সরাসরি কোন নির্দেশ নেই। সুতরাং টুপি পরা ফরজ নয়, তবে এটা নবী করীম ﷺ এর সুন্নত। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবীজি যখন আসলেন তখন একটা কালো পাগড়ি পরলেন। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৬, হাদীস নং-৬৯৮)

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম ﷺ বাইরে বেরোতেন তখন তিনি কাপড়ের একটা অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন।

আরেক হাদীসে এসেছে– আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, যে বছর নবীজি মক্কা বিজয় করেন, মক্কায় প্রবেশের সময় তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। (সহীহ বুখারী খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৭, হাদীস নং-৬৯৯)

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সর্বদা মাথা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। তা যেকোন কাপড় দিয়েও হতে পারে অথবা হতে পারে টুপি দিয়ে। এছাড়াও টুপি পরার বেশ কিছু উপকারিতা আছে। যেমন, কোন মুসলিম ব্যক্তি টুপি পরে থাকলে কোন অমুসলিম ব্যক্তি, যে ঐ ব্যক্তিটিকে চিনে না, হয়ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, সে কেন টুপি পরেছে। সেক্ষেত্রে ঐ অমুসলিমটিকে মুসলিম ব্যক্তিটি ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার একটা সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।

আগের দিনের লোকেরা টুপি পরা কোন ব্যক্তিকে দেখলে বুঝত যে, সে একজন মুসলিম এবং সে বিশ্বস্ত। তাই তার ওপর তারা আস্থা স্থাপন করত। কিন্তু এখন কতিপয় মুসলিমের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডের কারণে টুপি পরা ব্যক্তিদের মাস্তান ও জঙ্গি মনে করা হয়। কিন্তু কিছু মুসলিমের ভুলের জন্য টুপি পরা বা দাড়ি রাখা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। বরং টুপি পরে ও দাড়ি রেখে একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করে এবং সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিমের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, টুপি সংক্রান্ত এ বদনাম ঘুচে যাবে এবং মুসলমানদের এই লেবেলের গৌরব পুনরুদ্ধার হবে।

মুসলিম হিসেবে পরিচয় প্রদান

অনেক মুসলিম আছেন, যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পান কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কিত অমুসলিমদের ভুল ধারণা ও প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে

পারেন না। এ ধরনের মুসলিমদের উচিত অমুসলিমদের কমন প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়া। তাহলে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় তো পাবেন-ই না বরং অমুসলিমদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া তার জন্য সহজ হবে। নিজেদের পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে শিখ সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের বিশেষ ধরনের পাগড়ি পরে থাকে ও দাড়ি রাখে। এগুলো হল তাদের লেবেল যা তারা পরে এবং এভাবে নিজেদের শিখ হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এমন কি শিখরা যদি আর্মি, নেভি কিংবা জয়েন্ট ফোর্সে যোগ দেয় সেখানেও তারা তাদের এই লেবেল ত্যাগ করে না। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একবার কানাডা সরকার পাগড়ি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তখন একজন শিখ পাগড়ি পরার জন্য কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং সে জিতে যায়। অর্থাৎ পাগড়ি পরে নিজের শিখ পরিচয় প্রকাশ করার জন্য সে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করে। অথচ কতিপয় মুসলিম নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পান। এমন কি কোথাও চাকরিতে ঢুকতে গেলে যদি শর্ত থাকে যে দাড়ি রাখা যাবে না, তারা তখন দাড়ি চেঁছে ফেলেন, এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক।

বরং টুপি না পরলে এবং দাড়ি না রাখলে অর্থাৎ নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করলে আপনি অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুশরিক হিসেবেও প্রতিপন্ন হতে পারেন। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যায়, একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করুন যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, হজ্জ করেছেন, যাকাত দেন এবং রমজানে রোজাও রাখেন। অন্য কথায় তিনি একজন খাঁটি মুসলিম কিন্তু তিনি মাথায় টুপি পরেন না এবং তার মুখে দাড়ি নেই। অর্থাৎ তার ইসলামি লেবেল নেই। মনে করুন লোকটি একদিন এক ফলের দোকানে গেল ফল কিনতে। ভদ্রলোকের আগেই জানা ছিল যে ফলের দোকানের বিক্রেতা একটি মুসলিম ছেলে। তাই ভদ্রলোকটি দোকানে যাওয়ার পর ছেলেটি তাকে সালাম না দেয়ায় তিনি বিস্মিত হলেন এবং সালাম না দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি জবাবে বলল যে, সে ভেবেছিল লোকটি একজন হিন্দু, কারণ লোকটির মুখে দাড়ি কিংবা মাথায় টুপি নেই। অর্থাৎ ছেলেটি লোকটিকে একজন মুশরিক প্রতিপন্ন করল। –একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কি হতে পারে যদি তাকে মুশরিক ভাবা হয়। একজন মুশরিকের প্রতিফল সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

'আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছে তাকে মাফ করে দেন।'

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ করল। (সূরা নিসা : ৪৮)

অন্য আয়াতে আছে–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ـ

অর্থ : আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া আর সব গুনাহই মাফ করে দেন, যার বেলায় তিনি ইচ্ছে করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করল সে তো গোমরাহীতে বহুদূর চলে গেল। (সূরা নিসা : ১১৬)

আবার সূরা মায়িদায় উল্লেখ করা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। আর মসীহ বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। দোযখই তার ঠিকানা। এখন যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদাহ : ৭২)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ শিরক করে এবং সে অবস্থায়ই মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

এখন, ভদ্রলোকটির লেবেল না থাকার কারণে যদি তাকে মুশরিক প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে ছেলেটি নয় বরং ঐ লোকটিই দোষী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং লেবেল দিয়ে যদি উদ্দেশ্য বা পরিচয় বুঝা যায় তাহলে সে লেবেলটাই থাকা উচিত।

মুসলিম মহিলাদের লেবেল

মুসলিম মহিলাদের লেবেল হল হিজাব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

'(হে নবী!) মুমিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন চোখ নিচু রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তাদের সাজসজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু

ছাড়া যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের ওপর তাদের উড়নার আঁচল দিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে তাদের সামনে ছাড়া – তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ, যাদের অন্য কোন চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না। তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজসজ্জা লোকদের জানানোর উদ্দেশ্যে মাটির ওপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। (হে মুমিনগণ!) তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।'

হিজাব পালনের নিয়মগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিজাবের নিয়ম প্রধানত ৬টি। প্রথম নিয়মটি পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক এবং বাকি পাঁচটি উভয়ের জন্য একই।

১. পুরুষ এবং নারীর হিজাবের বিস্তৃতি বা সীমা :

   পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য পুরো শরীরটাই ঢেকে রাখতে হবে শুধু মু``, হাতের কবজি এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী পায়ের পাতা ব্যতীত। আবার, অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে, মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজিও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত।

২. পোশাক এমন আঁটসাঁট হবে না যে, শরীরের কাঠামো দেখা যায়। যেমন : পুরুষদের স্কীন টাইট জিন্‌স পরার অনুমতি নেই।

৩. পোশাক এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে শরীরের কাঠামো বুঝা যায়। যেমন : জর্জেট বা এ ধরনের কোন কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক।

৪. পোশাকটা এমন আকর্ষণীয় হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গের কেউ আকৃষ্ট হয়।

৫. অবিশ্বাসীদের বিশেষ কোন চিহ্ন বুঝায় এমন কোন পোশাক বা লেবেল পরা যাবে না। যেমন : ক্রুশ, যা খ্রিস্টানদের একটি প্রতীক; কপালে ওম লেখা, মাথার টিকা, যা হিন্দু-ইজমের প্রতীক।

৬. এমন পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মত। যেমন : পুরুষদের এক কানে দুল পরার অনুমতি ইসলামি শরিয়ায় নেই।

নারীদের হিজাবের এ ধরনের নিয়মের কারণ কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে জানা যায়।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থ : হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের এক অংশ তাদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আহযাব : ৫৯)

আয়াতটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি পরিবারে দু' জমজ বোন আছে। তারা উভয়ই খুবই সুন্দর। এখন তারা যদি মুম্বাই-এর কোন একটি রাস্তায় হেঁটে যায় এ অবস্থায় যে, তাদের একজন পূর্ণাঙ্গ হিজাব পরিহিত এবং অপরজন পরেছে একটি স্কার্ট এবং একটি মিনি এবং এমতাবস্থায় যদি রাস্তায় একজন মাস্তান বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করবার জন্য, তাহলে, ঐ ছেলেটি কোন মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করবে? স্বাভাবিকভাবেই বখাটেটি ঐ মেয়েকেই উত্ত্যক্ত করবে যে স্কার্ট আর মিনি পরে আছে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে নারীদের হিজাব পালন করতে বলা হয়েছে যেন তাদেরকে কেউ উত্ত্যক্ত না করে।

অবশ্য কোন কোন মুসলিম নারী এ ধরনের অযুহাত পেশ করতে পারেন যে, তারা যখন মাথায় স্কার্ফ পরেন বা চাদর দিয়ে গা ঢেকে রাখেন কিংবা হিজাব পরেন তখন তাদের দিকে অন্যরা তাকিয়ে থাকে এবং এভাবে বিনা কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এর উত্তর হল, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কেননা তিনি এমন পরিবেশে হিজাব পরেছেন যেখানে অনেকে হিজাব পরেনি। এক্ষেত্রে কোন পুরুষ হিজাব পরিধানকারী মহিলার দিকে তাকায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, লোলুপ দৃষ্টিতে নয়। বরং পুরুষরা স্কার্ট আর মিনি পরা মহিলার দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে, বোরকাটা কালোই হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। ইসলামি শরিয়ার কোথাও একথা বলা হয় নি। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ না করার শর্তে, বোরকা যেকোন রঙেরই হতে পারে, যেমন : বাদামি, নীল বা সাদা রঙের বোরকা ইত্যাদি।

নামের পদবি

এখন আসা যাক নামের পদবি প্রসঙ্গে। নবী করীম ﷺ-এর জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনি কখনও পরিবারের পদবি বদলাতে বলেন নি। কারণ পরিবারের পদবি বংশের পরিচয় বহন করে। ইসলামে বংশের পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

এমন অনেক মুসলিম আছেন যাদের নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত। বিশেষ করে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম পাওয়া যায়। যেমন : কোনকানী

অঞ্চলের মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের নামেই ঠাকুর, প্যাটেল, গাভাস্কার ইত্যাদি উপাধি বা পদবি পাওয়া যায়। অনুরূপ গুজরাট অঞ্চলে আছে শাহ, দেশাই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পদবি দেখে বুঝার উপায় থাকে না যে লোকটি মুসলিম নাকি হিন্দু। তবে পদবি দেখে লোকটি কোন অঞ্চলের তা বুঝা যায়। এ কারণে, কারো নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত হলে কোন সমস্যা নেই। তবে তাদের নামের প্রথম অংশটা এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের সহজে মুসলিম হিসেবে চেনা যায়। যেমন: আবদুল্লাহ, সুলতান, মুহাম্মদ, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু এক ধরনের সুবিধাবাদী মুসলিম আছে, যাদের নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত যেমন ঠাকুর বা প্যাটেল, তারা পরিস্থিতির সুবিধা নিতে চান। ধরা যাক, কারও নাম মুহাম্মদ নায়েক। সে যদি একজন সুবিধাবাদী মুসলিম হয়, তবে সে কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে তার পুরো নাম বলবে অর্থাৎ মুহাম্মদ নায়েক বলবে। কিন্তু কোন অমুসলিমের সাথে দেখা হলে বলবে এম. নায়েক। এক্ষেত্রে এম. নায়েক বলতে মনোয়ার নায়েক বা মনোজ নায়েক উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ যেন নাম শুনে বুঝা না যায় যে সে অমুসলিম না কি মুসলিম এবং এভাবে সে পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। সে ব্যবসায়ী হলে এভাবে হয়ত সে মুসলিম, অমুসলিম দুধরনের কাস্টমার-ই অধিক পরিমাণে পাবে। কিন্তু এভাবে পরিচয় গোপন করা এক ধরনের প্রতারণা। অথচ, ইসলামে প্রতারণা নিষিদ্ধ।

সুতরাং নামের পদবিটা, কিংবা নামটাও যদি অমুসলিমদের মত হয় কোন সমস্যা নেই, তবে নামকে গোপন করে সুবিধা নেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং একজন মুসলিমের তার মুসলিম পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত এবং উচিত ইসলামি লেবেল পরিধান করা।

লেবেলের উপকারিতা

স্কুলের বিশেষ ইউনিফর্ম থাকে, যা দেখলে বুঝা যায় যে সে কোন স্কুলে পড়ে। যেমন : ভারতের সেন্ট পিটার্স স্কুলের ইউনিফর্ম হল ছাইরঙা প্যান্ট আর সাদা শার্ট। কেউ এ ধরনের পোশাক পরলে সাথে সাথে বুঝে যাবেন সে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ছাত্র। এমনিভাবে Islamic Research Foundation তথা IRF এরও একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা লেবেল আছে। আর তা হল দাড়ি ও টুপি। ইসলামের লেবেলটাকে IRF তার লেবেল হিসেবে বেছে নিয়েছে। যারা শিক্ষানবিস চিকিৎসক তারা পাস করার আগ পর্যন্ত তাদের নাম যাই থাকুক পাস করার পর তার নামের আগে ডা. শব্দটি যোগ হয়। যেমন : মি. নায়েক থেকে ডা. নায়েক। এটি একটি সম্মানজনক পদবি। কারও নামের সাথে ডাক্তার শব্দটা শুনলে মানুষ বুঝতে পারে তার কাছে চিকিৎসার জন্য যাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি লেবেল দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝা যায় তবে সেটাই পরা উচিত। একজন মুসলিমের নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে গর্ব করা উচিত। হতে পারে, একজন মুসলিম যদি দাড়ি রাখে এবং টুপি পরে তাহলে কোন ব্যক্তি যার আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন সে ঐ ব্যক্তিটির কাছেই যাবে, যার মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি আছে।

ইসলামী লেবেল পরলে আল্লাহ ও রাসূলকে মানার কারণে আপনি তো সওয়াব পাবেনই বরং সাথে সাথে এই লেবেলের অন্যান্য উপকারিতাও আছে যা আপনি পেতে পারেন। যেমন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন এলাকায় যায় যেখানে সে নতুন এবং এ সময় নামাজের সময় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মসজিদের ঠিকানা তার কাছেই জিজ্ঞেস করবে যাকে সে দেখামাত্রই মুসলিম বলে ভাববে। সুতরাং সে দাড়ি ও টুপিওয়ালা কোন ব্যক্তির কাছেই মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। আবার, ঐ ব্যক্তি যদি এমন এলাকায় যায় যা অমুসলিম অধ্যুষিত এবং যেখানে হালাল খাবারের সন্ধান পাওয়াটা মুশকিল। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিটি এমন একজন লোককেই বেছে নেবে যার দাড়ি আছে এবং যিনি টুপি পরেন, ফলে তাকে মুসলিম মনে করা যায়।

ইসলামি লেবেলের আরেকটি উপকার হল, কোন বাড়িতে যদি এমন কোন পোস্টার টাঙানো দেখা যায় যেখানে আরবিতে লেখা رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا বা هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى অথবা اَللّٰهُ اَكْبَر তাহলে সহজে বুঝা যাবে এটি একটি মুসলিমের বাসা। কোনো অফিসের দেয়ালে অনুরূপ কোন পোস্টার, যাতে কোরআনের আয়াত বা কোন দোয়া লেখা আছে, দেখলে বুঝা যায় যে এই অফিসের মালিক একজন মুসলিম। এমনিভাবে কোন গাড়িতে যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা স্টীকার লাগানো থাকে, তাহলে বুঝা যাবে গাড়িটি একজন মুসলিম ব্যক্তির। এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে সে সহজেই তাকে খুঁজে পাবে।

আবার এরকম লেবেলও আছে যার কারণে কোন দোয়াও শেখা সম্ভব হতে পারে। যেমন : কোন গাড়িতে যদি এ ধরনের যন্ত্র লাগানো থাকে যে গাড়ি চালু করা মাত্র তা বলতে শুরু করে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখিয়ে যাওয়া দোয়া, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুবহানাল্লাজি সাখ্খারালানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিন' এবং দোয়াটি বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, সেক্ষেত্রে দোয়াটি যার মুখস্থ নেই তার শেখা হয়ে যাবে। প্রযুক্তির কল্যাণে এ ধরনের আরও অনেক লেবেল তৈরি হচ্ছে।

এছাড়াও কোন অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যদি মিল্লাত নগরী নামে একটি শহর থাকে যেখানে বিভিন্ন বিল্ডিং-এর নাম আল-মদিনা, আল মাক্কাহ, আরাফাহ ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে এটি একটি মুসলিম নগরী।

এভাবে মুসলিম পরিচয় দেয়া উত্তম এবং এভাবে পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে হীনমন্যতার পরিচয় কেবল তখনই দিতে পারে যখন তার মনে এ কথাটি প্রোথিত না হয় যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন।

কিন্তু যদি কেউ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানে, এর নির্দেশগুলো মানে এবং নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তবে সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। কোরআনে এসেছে–

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী। (সূরা ইসরা-৮১)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. ডা. আবু বকর তাহের : ১৯৯৩ সালের Riot-এর সময় যারা ইসলামের লেবেল লাগাতো তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হত। সুতরাং যে অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগালে জীবনের ঝুঁকি থাকে ঐ অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগানো কি উচিত হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সব নিয়মেরই কিছুটা ব্যতিক্রম থাকে। অনুরূপ ইসলামি শরিয়াহ-ও সেই সুযোগ দেয় যে জীবনের ঝুঁকি থাকলে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন : কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলিমের মাথায় বন্দুক ধরে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি মুসলিম না অমুসলিম। সেক্ষেত্রে ঐ মুসলিমের জন্য নিজেকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেয়া গোনাহ-এর কারণ হবে না। সুতরাং কোন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যদি Riot হয়, সেখানে কোন মুসলিম তার জীবন বাঁচাতে নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করতে পারবে এবং ইসলামি লেবেল খুলে ফেলতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের লেবেল না খোলার কারণে নিহত হয়, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : তোমরা মৃত জীবের রক্ত, শূকরের গোশত খাবে না এবং এমন সব জিনিসও খাবে না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারও নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কেউ যদি খুব বেশি ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায়, সে যদি ঐসব জিনিস থেকে কিছু খায়, কিন্তু তার যদি আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকে এবং ঠেকা পরিমাণের বেশি না খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা বাকারা : ১৭৩)

সূরা আনআমের ১৪৫নং, সূরা মায়িদার ৩নং এবং সূরা নাহলের ১১৫নং আয়াতেও একই কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, শূকরের গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন স্থানে যায় যেখানে শূকরের গোশত ছাড়া আর কোন খাবার নেই এবং গোশত না খেলে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে তাহলে সেখানে ততটুকু পরিমাণ শূকরের গোশত খাওয়া যেতে পারে যতটুকু না খেলে একজন বাঁচে না।

সুতরাং এখান থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি শরিয়াহ যেসব ক্ষেত্রে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় সেসব ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে।

প্রশ্ন ২. আজম নায়ের : কোন অমুসলিমকে কি আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে? অথবা, কোন অমুসলিম সালাম দিলে কি তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলা যাবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : অমুসলিমদের সালামের জবাবের ব্যাপারে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, যদি তারা আসসালামু আলাইকুম বলে তবে তাদের সালামের জবাবে বলতে হবে আলাইকুম। তারা তাদের মতের উৎস হিসেবে সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খণ্ডের সালাম অধ্যায়ের ৫৩৮০ থেকে ৫৩৯০ পর্যন্ত ১১টি হাদীসকে নিয়েছেন, যেখানে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আছে। প্রথম দিককার হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদি ইহুদিরা বলে আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন। তখন তাদের জবাব নবী করীম ﷺ বলতে বলেছেন, আলাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ক্ষেত্রেও সেটাই হোক। অর্থাৎ যদি কোন মুসলিম জেনেশুনে আপনার অকল্যাণ কামনা করে বলে আসসালামু আলাইকুম আপনি তাদের বলবেন আলাইকুম অর্থাৎ আপনারও তাই হোক। ঐ বিশেষজ্ঞগণের অভিমতও এই।

তবে, কোরআনে সূরা নিসায় বলা হয়েছে, 'যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন এর চেয়ে আরও ভালভাবে এর জবাব দাও। অথবা, কমপক্ষে ঐভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।' (সূরা নিসা : ৮৬)

সুতরাং কোরআনের এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন অমুসলিমের অভিবাদনের জবাবে অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে আরও উত্তমভাবে অভিবাদন জানানো যাবে।

এখন অমুসলিমদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য জেনে নেয়া যাক। পবিত্র কোরআনের সূরা মারিয়মে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক বাবাকে সালাম দেন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা চান।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার রবের নিকট আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইব। আমার রব আমার ওপর বড়ই মেহেরবান। (সূরা মারিয়ম-৪৭)

সূরা ত্বো'হার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে–

فَأْتِيَاهُ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ

অর্থ : মুসা (আ) এবং হারুন (আ) কে আল্লাহ নির্দেশ করলেন, যখন ফেরাউন ও অন্যান্যের কাছে যাবে তারা যেন বলে শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে।

এর অনুসরণে আমাদের নবী করীম ﷺ ও অমুসলিমদের কাছে লিখিত চিঠিতে লিখিয়েছিলেন যে, শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে। আর সূরা ফুরকানের ৬৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ

অর্থ : রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।

সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াতে আছে–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ـ

অর্থ : যখন তারা (মুসলিম) কোনো বাজে কথা শুনে, তখন এ কথা বলে তা থেকে সরে যায়, আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে শামিল হতে চাই না।

অর্থাৎ, কোরআন তাদেরকেও সালাম দিতে বলছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে। সুতরাং অমুসলিমদের সালাম দিলে কোনো সমস্যা নেই। তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সালাম একটা অভিবাদন এবং তা অমুসলিমদেরও দেয়া যেতে পারে। সালাম সৌজন্যতারও বহিঃপ্রকাশ।

পূর্বোক্ত সূরা মারিয়মের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কুরতুবী তাবারীর বরাত দিয়ে তার তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে সালাম কথাটার অর্থ হল শান্তি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এটা অনুমতি আছে যে তারা অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবে। নাকামাও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। কুরতুবীর বরাত দিয়ে ওয়াইনা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূরা মুমতাহিনার ৮নং ও ৪নং আয়াতের উল্লেখ করেন। সূরা মুমতাহিনার ৮নং আয়াতে আছে–

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

অর্থ : যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয় নি, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

সূরা মারিয়মের ৪নং আয়াতে এসেছে, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ আছে...।'

আয়াতদ্বয় থেকে ওয়াইনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইবরাহীম (আ) যদি তার মুশরিক পিতাকে সালাম দিতে পারেন তাহলে মুসলিমদেরও এ অনুমতি আছে যে তারা অমুসলিমদের সালাম দেবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, অমুসলিমদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো যায় কিনা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : হ্যাঁ। তিনি নিজে তাঁর সঙ্গীদের সাথে এমনটাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। এছাড়া আবু উসামা (রা)ও অমুসলিমদের সালাম দিতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষজ্ঞদের এক অংশের মতে সালাম দেয়া যাবে। আমি বিশেষজ্ঞদের এই অংশের সাথে একমত। অর্থাৎ আপনি অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবেন এবং অমুসলিমদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন ৩. জনৈক প্রশ্নকারী : আমরা জানি, টাই খ্রিস্টানদের প্রতীক, মুসলমানদের জন্য টাই পড়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : অনেক মুসলিম আছে যাদের ধারণা টাই হল ক্রসের প্রতীক। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টানদের কোন ধর্মগ্রন্থেই বলা নেই যে, টাই ক্রসের প্রতীক।

হাদীস অনুসারে মুসলমানরা এমন কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে না যে পোশাক অমুসলিমদের কোন বিশেষ প্রতীকের মত হয়। তবে বাইবেলে কোথাও বলা নেই যে টাই ক্রসের প্রতীক। বরং এটি একটি কালচারাল পোশাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশের লোকেরা টাই পরে তাদের পোশাক আটকে রাখত এবং সেখান থেকেই টাইয়ের উদ্ভব হয়।

একদল মুসলিম আছেন যারা পশ্চিমা কালচার পছন্দ করেন না এবং পশ্চিমাদের সবকিছুতেই প্রতিবাদ করেন। তবে আমার মতে আমাদের উচিত পশ্চিমাদের যে কাজগুলো খারাপ সেগুলোর প্রতিবাদ করা এবং যেগুলো ভালো সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো নিরপেক্ষ সেগুলোতে প্রতিবাদ করার দরকার নেই। কেউ যদি প্রমাণ সহকারে এটা উপস্থাপন করতে পারে যে টাই ক্রসের প্রতীক। তাহলে সেটা পরিধান করা যাবে না। শরিয়ত মুসলমানদের এ অনুমতি দিয়েছে যে, মুসলিমরা সে পোশাক পরতে পারবে যা শরিয়তের সীমার বাইরে যায় না। কিন্তু যেগুলো ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে যায় সেগুলো পরা যাবে না। যেমন : হাফপ্যান্ট, শর্টস ইত্যাদি। এগুলো যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক, কিন্তু শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হওয়ায় এগুলো পরার অনুমতি নেই।

খ্রিস্টানরা গাড়ি আবিষ্কার করেছিল। তাই বলে কি আমরা তাদের আবিষ্কৃত গাড়িতে চড়ব না?

সুতরাং টাই পরার অনুমতি আছে। কারণ এটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।

প্রশ্ন ৪. জনৈক প্রশ্নকারী : কিছু মুসলিম আছে, যারা এ অজুহাতে মাথায় টুপি পরেন না এবং মুখে দাড়ি রাখেন না যে, তাদের হয়ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ (যেমন ঃ ঘুষ দেয়া, ঠকানো, মিথ্যা বলা) করতে হতে পারে। তাদের যুক্তি হল এক্ষেত্রে তাদের যদি মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যায় তাহলে ইসলামেরই বদনাম হবে। এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল হতাশাবাদী এবং আরেক দল আশাবাদী। হতাশাবাদীরা সবসময় নেগেটিভলি চিন্তা করে। তারা ইসলামের লেবেল পরতে চায় না এই ভেবে যে, হয়ত কোন সময় তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে, যেমন ঃ ঘুষ খাওয়া, কাউকে ঠকানো, মিথ্যে বলা কারণ তারা ইসলামের বদনাম ছড়াতে চায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইসলামি লেবেল লাগানোর কারণে কোন ব্যক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের লেবেলের দিকে খেয়াল করে উক্ত অনৈসলামিক

কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। এতে করে সে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন উপকার থেকে হয়ত বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু পরকালে এর বিনিময় পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনে সূরা ইসরার ৮১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। সত্যের সামনে মিথ্যা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি আশংকা করেন যে, তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে এবং এ অবস্থায় তাদের ইসলামি লেবেল থাকলে ইসলামেরই বদনাম হবে, তাদের উচিত হতাশাবাদী না হয়ে আশাবাদী হওয়া। সেক্ষেত্রে তারা আরও ভাল মুসলিম হতে পারবেন।

প্রশ্ন ৫. ফুরকান আহমেদ : আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি যেখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি। আমি দেখেছি যেসব মুসলিম দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তাদেরকে তারা অন্যভাবে দেখে। ফলে দাড়ি না রাখলে এবং টুপি না পরলে তাদের সাথে মেশা এবং তাদেরকে ইসলাম বুঝানো সহজ হয়। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম প্রচারের জন্য মাথায় টুপি এবং দাড়ি কি বাদ দিতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۔

অর্থ : মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমত ও সৎ উপদেশ দ্বারা আর তাদের সাথে তর্ক কর এবং তাদেরকে যুক্তি দেখাও উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত হিকমতসহকারে উপস্থাপন করা গেলে টুপি এবং দাড়ি কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। বরং টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পেশ করা সহজ হয়। টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে দাওয়াত দেয়া কঠিন হয়– এ ধরনের চিন্তাভাবনা ভুল এবং এটি হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। যদি কেউ মানে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। একদিকে আপনি নিজেই ইসলামের লেবেলগুলো পরিধান করছেন না তথা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন, অন্যদিকে সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে ডাকছেন। এ ধরনের কাজ প্রতারণার শামিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বৃদ্ধ লোক, যার এক পা

কবরে চলে গেছে বলা যায়। সে যদি বলে যে, তার কাছে যাদুর পানি আছে, যে পানি খেলে শক্তি বাড়বে, একশত বছর বেশি বাঁচা যাবে এবং এই কথা বলে সে প্রতি বোতল পানি একশ টাকা দরে বিক্রি করতে চায়, তাহলে আপনি কি সেই পানি কিনবেন? কখনই না। কারণ প্রশ্ন জাগবে যে, ঐ যাদুর পানিতে যদি এতই শক্তি থাকে তাহলে তিনি-ই কেন আগে তা গ্রহণ করছেন না? সুতরাং লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলছে।

অতএব, কোন মুসলিম যদি দাড়ি না রাখে এবং টুপি না পরে কিন্তু ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তো সে বরং ঐ অমুসলিমদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্য বলে মেনে নিল। বরং সে একধরনের প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল।

মাথায় টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে নিশ্চয়ই মানুষের স্বভাব বদলায় না। সুতরাং আপনি দাড়ি রাখুন ও মাথায় টুপি দিন এবং হিকমত অবলম্বন করে দাওয়াত দিন, এতে আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ৬. জনৈক প্রশ্নকারী মহিলা : হিন্দু কেউ মারা গেলে কি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা যাবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : প্রকৃতপক্ষে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন কোরআনের একটি আয়াত। এর অর্থ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মুসলিমদের সাথে সাথে অমুসলিমদের জন্যও এ কথাটা প্রযোজ্য। অমুসলিমরাও আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাদেরকেও তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এমনকি সে যদি মুশরিকও হয় তাহলে এটা প্রযোজ্য। সুতরাং অমুসলিম কেউ মারা গেলে এই দোয়াটা পড়া যাবে। তবে কোন মুশরিক মারা গেলে তাদের জন্য এই বলে দোয়া করা যাবে না যে, 'ও আল্লাহ! তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।' পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। সুতরাং কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দোয়া করা যাবে না। তবে কেউ যদি মুশরিক থেকে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে মারা যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

অনেকের ধারণা, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই এ দোয়াটা পড়া যেতে পারে। যেমন : কেউ যদি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রশ্ন ৭. ফিরোজ : কতিপয় মুসলিম মেয়ে আছে যারা বাসা থেকে বোরকা পরে বের হয় এবং কলেজের গেটে এসে বোরকা খুলে ফেলে। তারা জিন্স টিশার্ট ইত্যাদি পরা থাকে। তারা ছেলেদের সাথে সেভাবে মেলামেশা করে এজন্য তাদেরকে বলা হয় খারাপ চরিত্রের মেয়ে। এজন্য কিছু লোক ভাবে

যে, যারা বোরকা পরে তারা খারাপ চরিত্রের মেয়ে। আর এ কারণে যারা প্রকৃতপক্ষেই বোরকা পরে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এমনও কিছু মেয়ে আছে যারা অমুসলিম, কিন্তু তারা বোরকা পরে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময় নিজেদের লুকানোর জন্য। এ ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : মুসলিম মহিলাদের গায়রে মোহাররম পুরুষ তথা পরপুরুষের সামনে হিজাব পালন করা ফরজ। যদি কোন মেয়ে বোরকা পরে এমন কলেজে যায়, যেটা শুধু মেয়েদের জন্য, সেক্ষেত্রে তারা ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে যেসব কলেজে সহশিক্ষা চলে অর্থাৎ যেখানে ছেলে ও মেয়েরা একসাথে পড়ালেখা করে সেসব কলেজে এ ধরনের কাজ অনুমোদিত নয়। যদি এ ধরনের কাজ করে তার মানে এ নয় যে বোরকাটাই সমস্যা বরং সমস্যা হচ্ছে বোরকা পরিহিতার। সুতরাং এ ধরনের কাজ করলে কোন মুসলিম নারীই আর বোরকা পরবে না এ ধরনের চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক।

প্রত্যেক সমাজের ভেতরে কিছু কুলাঙ্গার থাকে, এদের দেখে কেউ যদি ভাবে যে, এরা বোরকা পরেও খারাপ কাজ করছে, অতএব আমি বোরকাই পরব না, এ ধরনের সিদ্ধান্ত হবে একেবারেই ভুল। যেমন : একজন ব্যক্তি গাড়ির দোকানে গিয়েছে গাড়ি ক্রয় করতে। সে মার্সিডিজ বেন্জ-এর সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি দেখে গাড়িটি পরীক্ষা করতে চাইল এবং এমন একজন ড্রাইভারকে গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে বসালো যে গাড়ি চালাতে জানে না। এ অবস্থায় ঐ গাড়িটি যদি না চলে, তাহলে কি গাড়ির দোষ হবে নাকি ড্রাইভারের?

সুতরাং কেউ যদি বলে, যে আমি বোরকা পরব না, কারণ কিছু মেয়ে, ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে এবং সুযোগ সুবিধা নেয়, এটা ঠিক এমন কথাই হবে যে, ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারে না বলে, মার্সিডিজ একটা বাজে গাড়ি। হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল, সে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাই বলে কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে ঘৃণা করব? কখনই না। কারণ সে একজন খারাপ দৃষ্টান্ত। সুতরাং যদি কোন মেয়ে এই কাজ করে, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের উচিত হবে, এভাবে চিন্তা করা যে, কিছু মেয়ে আছে যারা বোরকা পরে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে, সেহেতু আমরাও বোরকা পরব এবং প্রমাণ করে দেব যে, মুসলিম মহিলারা ভাল।

যেসব মেয়েরা না জানার কারণে এ ধরনের আচরণ করছে এবং যাদের চরিত্রগত দুর্বলতা আছে আমরা তাদের জানাব এবং হিকমাতসহকারে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কতিপয় অমুসলিম আছে যারা বোরকা পরে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য। তাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করা উচিত। তারা অনৈতিক কাজ করার জন্য যদি বোরকা

পরে তাহলে আমরা তাদের বুঝাতে পারি যে তাদের নিয়ত ভুল এবং বোরকার উদ্দেশ্য হল শালীনতা বজায় রাখা কিন্তু তাদের তো এ কথা বলতে পারি না যে বোরকা পরা ভুল। আর মানুষদের কাছে হিজাব পালনের প্রয়োজনীয়তা ও কারণ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

প্রশ্ন ৮. জনৈক নওমুসলিম : ইসলামে ধূমপান এবং পান খাওয়া অনুমোদিত কি না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ইসলামে ধূমপান অনুমোদিত কি-না এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেমরা সে সময়ের জ্ঞানের আলোকে বলেছিলেন, এটা মাকরূহ। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞদের মতামতটাও পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায় ধূমপানের কারণে। যারা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায়, তাদের মধ্যে ৯০% হল ধূমপান করার কারণে। যারা ব্রংকাইটিসে মারা যায় তার ৭০%, হৃদরোগের কারণে যারা মারা যায় তার ২০%-এর কারণ হল ধূমপান। এ ধূমপান ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে থাকে ক্ষতিকর নিকোটিন এবং টরে। সিগারেট শুধু ধূমপায়ীর ক্ষতি করে না বরং তার প্রতিবেশীরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, চেইন স্মোকারদের স্ত্রীদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ একটিভ স্মোকিং তো ক্ষতিকর বটেই প্যাসিভ স্মোকিং আরও বেশি ক্ষতিকর। প্যাসিভ স্মোকিং-এ ধূমপায়ীর ধোঁয়াটা অরেকজনের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধূমপান করলে ধূমপায়ীর ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে। গলায় ঘা হবে, পেপটিক আলসার হবে, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে, যৌনশক্তি কমে যাবে, ক্ষুধা কমে যাবে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। এমনকি স্মৃতি-শক্তিও কমে যাবে। এসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আলেমরা ৪০০-এর বেশি ফতোয়া দিয়েছেন যে, ধূমপান করা হারাম। তাই, এটা কারও ভালো লাগুক বা না লাগুক, ইসলামে এটার অনুমতি নেই।

আর পান খাওয়ার ব্যাপারে কথা হল, পানে তামাক থাকলে তা হারাম এবং তামাক না থাকলে খাওয়ার অনুমতি আছে। অর্থাৎ ইসলামে যেকোনভাবে তামাক নেয়াটাই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৯. যুবায়ের : হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল ﷺ-এর দাড়ি এক মুঠোর চেয়ে একটু বড় ছিল। প্রশ্ন হল, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ এর নির্দেশ হল পৌত্তলিকরা তথা মুশরিকরা যা করে তার বিপরীত কাজ কর। মুখে দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট কর। নবীজির এই নির্দেশ বিস্তারিত জানা যায়, নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীদের জীবনী থেকে। বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ে (৬০নং অধ্যায়) ৭৮০ নং হাদীসে বলা হয়েছে, 'নাফি (রা) ইবনে ওমর (রা)-কে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, মুখে দাড়ি রাখ আর গোফকে ছোট করে রাখ।'

এছাড়া আরও বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) হজ্জ ও ওমরার পরে হাতের মুঠো দিয়ে দাড়ি ধরে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলতেন। আর সাহাবীগণই জানতেন নবীজি ﷺ কি চাচ্ছেন। সুতরাং কেউ সাহাবীগণকে অনুসরণ করেন সেটা উত্তম।

এখান থেকে জানা গেল যে, দাড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হল মুঠোর নিচেরটুকু কেটে ফেলতে হবে। এমন দশটিরও বেশি হাদীস আছে, যেখানে বলা আছে যে, সাহাবীগণ এভাবে দাড়ি রাখতেন।

বুখারী শরীফের ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৬০নং) ৭৮০ নং হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, 'তোমরা দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে রাখ'

এসব হাদীস থেকে দেখা যায় যে, দাড়ি রাখা হল প্রথম শর্ত এটা ফরজ। এরপর অধিক তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে সাহাবীদের অনুসরণে দাড়ি রাখতে হবে। এছাড়াও গোঁফ ছোট করতে হবে। সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থাবলি অনুসারে সাহাবীরা এমনভাবে গোঁফ ছোট করতেন যেন ওপরের ঠোঁটের চামড়া দেখা যায়। তাকওয়া বেশি অর্জন করতে চাইলে আরও ছোট করা যাবে। আর গোঁফ বড় করলে কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় গোঁফ লাগতে পারে, যেটা অস্বাস্থ্যকর।

অতএব, প্রথমে মুখে দাড়ি রাখতে হবে এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন ১০. জনৈক প্রশ্নকারী : বাবা, ভাই বা স্বামীর পক্ষে এ অনুমতি আছে কি যে, মেয়ে, বোন বা স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করবে, যদি তারা পর্দা করতে না চায়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ইস্‌লাহ তথা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো। প্রথমত, হিকমাহ দিয়ে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি

দিয়ে বোঝাতে হবে যে, হিজাব পালন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে যদি কাজ না হয়, বাধ্য বা জোর করা যেতে পারে। যেমন : পিতা কন্যাকে বলতে পারে যে, হিজাব না পরলে কলেজে যাওয়ার টাকা দেব না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করা যেতে পারে।

ফরজ কাজের ব্যাপারে জোর করার অনুমতি আছে তবে এক্ষেত্রে সীমাও আছে। যেমন : নামাজ পড়া ফরজ। এটার ব্যাপারে সীমার মধ্যে থেকে জোর খাটানো যেতে পারে। একইভাবে হিজাবের ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে যে, আমি তোমাকে ওটা দেব না কারণ তুমি হিজাব পালন কর না। তবে বাধ্য করার পূর্বে অবশ্যই হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। এরপরও কাজ না হলে সীমার মধ্যে থেকে বাধ্য করার অনুমতি আছে।

অনেকের ধারণা, স্বামী শুধু স্ত্রীর ব্যাপারে জোর খাটাতে পারে। স্ত্রী কেন স্বামীর ওপর জোর খাটাতে পারবে না? স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের ওপর জোর প্রয়োগ করা যেন তারা ভাল মুসলিম হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একজন ভুল পথে থাকলে অপরজনের সে ভুলটা ভাঙ্গতে হবে। কারণ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ

অর্থ : তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের পোশাক বা পরিচ্ছদের মত। তাই এটা দেখতে হবে যেন দুজনেই সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকে।

প্রশ্ন ১১. সৈয়দ সাহাব আলী : টুপি পরা ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : টুপি পরার একটি উপকারিতা হল, আপনি সানবার্ন থেকে রক্ষা পাবেন। এছাড়াও শিশির বা বৃষ্টির পানি আপনার মাথায় পরবে না; এতে আপনি ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবেন।

দাড়ির উপকারিতা হল, যারা দাড়ি রাখে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেমন : ফুসফুসের ইনফেকশন, গলার ঘা ইত্যাদি। তবে দাড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সুতরাং যে দাড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গিয়ে পাঁচ বার ওযু করে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও দাড়ি রাখলে মুখের চামড়ায় ক্যান্সার হয় না।

প্রশ্ন ১২. মো: রফিক : প্যান্ট গোড়ালির উপরে পরা কি আবশ্যক? আর এটা কি একটা লেবেল?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সহীহ বুখারীর ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৪নং অধ্যায়) ৬৭৮ নং হাদীসে বলা হয়েছে, আমাদের নবীজি বলেছেন যে, পুরুষদের প্যান্টের যে অংশ গোড়ালির নিচে ঝুলানো থাকে, সে অংশটা দোযখে যাবে। এছাড়া একই গ্রন্থের ৫নং অধ্যায়ের ৬৭৯-৬৮৩ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে, যার প্যান্ট টাখনুর নিচে মাটিতে ঝুলানো থাকে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেবেন।

সুতরাং আমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথা অনুযায়ী গোড়ালির নিচে যায় এমন প্যান্ট পরা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল এটা লেবেল কি– না? উত্তর হল, এটা লেবেলের-ই অংশ। তবে তা টুপি অথবা দাড়ির মত স্পষ্ট লেবেল না, কারণ প্যান্টের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না। সুতরাং যাদের খোদাভীতি বেশি এবং যারা নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণ করতে চান, তাদের উচিত গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরা।

প্রশ্ন ১৩. জনৈক মহিলা : অমুসলিম কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম বদলানো কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : লেকচারে বলা হয়েছিল যে, নবী করীম ﷺ কারও পদবী বদলাতে বলেন নি। কারণ পদবীতে তাদের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে তাও বুঝা যায়। আর নামের ক্ষেত্রে, নামের প্রথম অংশে যদি শিরক করার মত কিছু থাকে তাহলে তার নামটা বদলানো উচিত। যেমন : কারও নাম রাম বা লক্ষ্মণ। এ নামের দেবতাগুলোকে অমুসলিমরা পূজা করে। এর মধ্যে শিরকের উপাদান আছে। সুতরাং এ নামগুলো থাকলে তা বদলানো উচিত। এ শর্ত ছাড়া পূর্ববর্তী নামটা রাখাও যেতে পারে আবার বদলানোও যেতে পারে।

আমাদের নবী করীম ﷺ কোন কোন ক্ষেত্রে নাম বদলান নি কিন্তু নামে শিরকের উপাদান থাকলে তা বদলে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রার নাম ছিল আবদে শামস ও আব্দুল উয্যা। রাসূল ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আব্দুর রহমান। আসওয়াদ নাম বদলিয়ে আবইয়ায রাখেন। অনুরূপ আবুল হারেস, বাররা আছিয়াহ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলেন। সুতরাং মুসলমান হলে ইসলামি নাম হওয়া আবশ্যক।